তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৭
তৃতীয় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৮২

উপদেষ্টা পরিষদ :
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার
আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডক্টর সুকুমার সেন
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোকচিত্র :
শ্রীমোনা চৌধুরী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

সাহায্যে এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কাহিনীটি সরল রেখার আকারে বিন্যস্ত—কোথাও কোন জটিলতা নেই। খুনের দায়ে ধরা পড়েছে সে—আত্মরক্ষার্থে অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক খুন, কিন্তু তা প্রমাণ করার মত মনের অবস্থা তার নেই। খুন করার পরমুহূর্ত থেকেই সে ফাঁসি যাবার কথা চিন্তা করে নিদারুণ আতঙ্কে অধীর হয়ে উঠেছে—মৃত্যুভয়ের বিদ্যুৎরেখায় তার সমগ্র চেতনার আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেছে। যখন তাকে জেলে নিয়ে আসা হয়েছে তখন সে বিকারগ্রস্ত অর্ধোন্মাদ। যে কদিন জেলে ছিল ক্রমাগত চীৎকার করে কেঁদেছে, প্রতি রাত্রে তার আর্ত চীৎকার অন্য কয়েদীদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। প্রণয়িনী বাসিনীর ক্ষণদর্শনের ফলে সে কয়েকটি মুহূর্ত এক ধরনের বুদ্ধিহীন প্রশান্তি ও আনন্দ অনুভবের সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি—বাসিনীর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কের ভূত আবার তার ঘাড়ে এসে চেপেছে। কারাজীবন কালি কামারকে স্পর্শ করতে পারে নি। তার প্রবেশ ও প্রস্থান দুইই একান্তভাবে নিঃসঙ্গ। তার অসহায় নৈরাশ্য ও আতঙ্কের যে ভয়াবহ চিত্র লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা অবিস্মরণীয়।

দ্বিতীয় ব্যতিক্রম নরু। এই আদর্শনিষ্ঠ গান্ধীবাদী তরুণটির স্বল্পকালস্থায়ী কারাজীবন ও মৃত্যুর মহিমা জেলখানার অন্ধ-তমসার মধ্যে স্বর্গীয় আলোকের দীপ্তি ফুটিয়ে তুলেছিল—নন্দনকাননের পারিজাতগন্ধ নরকের পূতিগন্ধকে সাময়িক ভাবে চাপা দিয়ে ফেলেছিল। অত্যাচারের প্রতিবাদে তার অনশনে মৃত্যুবরণের পণ সাধারণ কয়েদীদের মনে একটা উদ্‌ভ্রান্তির সঞ্চার করেছিল। এ কেমন মৃত্যু? এ মৃত্যুর উদ্দেশ্য কি? এতে কি ফলই বা হবে? তারা সোজা বোঝে, সোজা প্রশ্ন করেছিল, 'ইস্‌মে কেয়া ফায়দা বাবু? জান যায়েগা আপকা, দুনিয়া য্যায়সা চলতা রহা ঐসি মজেমে চলতে রহেগা।'—কিন্তু এই মহামরণের প্রভাব তারা এড়াতে পারে নি, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য তারা নিজেদের জীবনের অর্থহীন হীনতা অনুভব করতে পেরেছিল—ভাল হবার একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা তাদের সবারই মনে একবার করে উঁকি দিয়েছিল; উমেশের মত নরপ্রেতও তার অশ্লীল গানের বই তুলে রেখে শাস্ত্রপাঠের হাস্যকর ব্যাকুলতায় ব্যাকরণকৌমুদীর পাতা ওল্‌টাতে শুরু করেছিল।

এ প্রভাব চিরস্থায়ী হয় নি। জেলের জীবন আবার তার অভ্যস্ত হৃদয়হীন পঙ্কিলতার স্তরে নেমে এসেছে। তাহলে কি নরুর মৃত্যু সত্যই ব্যর্থ হয়েছে? এমন কথা তারাশঙ্করের পক্ষে বিশ্বাস করা একেবারেই অসম্ভব। কালি কামারের মৃত্যু যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন সে মৃত্যুর সঙ্গে নরুর মৃত্যুর তুলনা হয় না। নরুর মৃত্যু যারা প্রত্যক্ষ করেছে, তারাশঙ্কর বিশ্বাস করেন তাদের প্রত্যেকের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অবচেতনার মণিকোঠায় পরিবর্তনের একটা করে ক্ষুদ্র বীজ সঞ্চিত হয়েছে—তারা নিজেরাও সে সম্বন্ধে সচেতন নয়। ভবিষ্যতে একদিন এই সব বীজ একসঙ্গে অঙ্কুরিত হবে—একটা বিরাটতর মহত্তর পরিবর্তনের সূচনা হবে সেইদিন। আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গ ব্যর্থ হতে পারে এমন সম্ভাবনাকে তারাশঙ্কর মনের কোণেও ঠাঁই দিতে পারেন না। তারাশঙ্কর cynic নন।

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কালিন্দী

উৎসর্গ

পরম প্রীতিভাজন বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের

করকমলে

লাভপুর, বীরভূম

ভাদ্র ১৩৪৭

নদীর ও-পারে একটা চর দেখা দিয়েছে।

রায়হাট গ্রামের প্রান্তেই ব্রাহ্মণী নদী—ব্রাহ্মণীর স্থানীয় নাম কালিন্দী, লোকে বলে কালী নদী; এই কালী নদীর ও-পারে চর জাগিয়াছে। এখন যেখানে চর উঠিয়াছে পূর্বে ওইখানেই ছিল কালী নদীর গর্ভভূমি। এখন কালী রায়হাটের একাংশ গ্রাস করিয়া গ্রামের কোলে কোলে বহিয়া চলিয়াছে। গ্রামের লোককে এখন বিশ হাত উঁচু ভাঙন ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে নামিতে হয়।

ওই চরটা লইয়া বিবাদ বাধিয়া উঠিল। রায়হাট প্রাচীন গ্রাম। এখানকার প্রাচীন জমিদার-বংশ রায়েরা শাখা-প্রশাখায় বহুধা বিভক্ত। এই বহুবিভক্ত রায়-বংশের প্রায় সকল শরিকই চরটার স্বামীত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত এক হাতে লাঠি ও অপর হাতে কাগজ লইয়া অগ্রসর হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার মাথা গলাইয়া আসিয়া প্রবেশ করিল জন দুয়েক মহাজন এবং জন কয়েক চাষীপ্রজা। সমস্ত লইয়া বিবদমান পক্ষের সংখ্যা এক শত পনেরোয় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিরোধী। জমিদারগণের প্রত্যেকের দাবি—চর তাঁহার সীমানায় উঠিয়াছে, সুতরাং সেটা তাঁহারই খাস-দখলে প্রাপ্য। মহাজন দুইজনের প্রত্যেকের দাবি,—তাঁহার নিকট 'আবদ্ধীয়' জমির সংলগ্ন হইয়া চর উঠিয়াছে, সুতরাং চর তাঁহার নিকট 'আবদ্ধীয়' সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত এবং নাকি তাহাই হইতে হইবে। প্রজা কয়েক জনের দাবি—কালীর গ্রাসে এপারে তাহাদের জমি গিয়াছে, সুতরাং ওপারে যে ক্ষতিপূরণ কালী দিয়াছে সে প্রাপ্য তাহাদের।

রায়-বংশের বর্তমানে এক শত পাঁচ জন শরিক, বাকী খাজনার মকদ্দমায় জমিদারপক্ষীয়-গণের নাম লিখিতে, তিন পৃষ্ঠা কাগজ পূর্ণ হইয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে যোগ দিয়াছেন এক শত দুই জন। বাকী তিন পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের মালিক নিতান্তই সঙ্গতিহীন নাবালক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষ কিন্তু এখানকার বহুকালের দুইটি বিবদমান পক্ষ। এক পক্ষ রায়-বংশের দৌহিত্র বংশ, অপর পক্ষ রায়-বংশেরই সর্বাপেক্ষা ধুরন্ধর ব্যক্তি কূট-কৌশলী ইন্দ্র রায়। ইন্দ্র রায়ের হাত গরুড়ের তীক্ষ্ণ নখরের মত প্রসারিত হইলে কখনও শূন্য মুষ্টিতে ফেরে না, ভূখণ্ডও বোধ করি উপড়াইয়া উঠিয়া আসে। এই ইন্দ্র রায়ের অপেক্ষাতেই বিবদমান পক্ষ সকলেরই উদ্যত হস্ত এখনও স্তব্ধ হইয়া আছে, অন্যথায় এতদিন একটা বিপর্যয় ঘটিয়া যাইত।

অপর পক্ষ—ইন্দ্র রায়ের বংশানুক্রমিক প্রতিপক্ষ রামেশ্বর চক্রবর্তী। তিনিও এক কালে ইন্দ্র রায়ের সমকক্ষ ব্যক্তি ছিলেন; কূট বুদ্ধি অপেক্ষা ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁহার বড়; দাম্ভিকতার প্রতিমূর্তি। ইন্দ্র রায়ের সহিত দ্বন্দ্বে ইন্দ্র রায়কেই অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতেন; প্রতি ক্ষেত্রে তিনি সাক্ষী মানিতেন ইন্দ্র রায়কে। ইন্দ্র রায় মিথ্যা বলিলে তিনি হাসিয়া তাঁহার দাবি প্রত্যাহার করিয়া বলিতেন, 'তোমার সাক্ষী দেওয়ার ফী দিলাম ইন্দ্র। মিছেই খরচ করে সাক্ষীদের তুমি জুতো কিনে দিলে।' বাড়ি ফিরিয়া তিনি গ্রামে বড় একটা খাওয়া-দাওয়া জুড়িয়া দিতেন।

কিন্তু যে কালের গতিতে যদুপতি যান, তাঁহার মথুরাপুরীও গৌরব হারায়, সেই কালের প্রভাবেই বোধ করি সে রামেশ্বর আজ আর নাই। তিনি নাকি দৃষ্টিহীন হইয়া অন্ধকার ঘরে বিছানায় পড়িয়া আছেন ভূমিশায়ী জীর্ণ জয়স্তম্ভের মত। চোখে নাকি আলো একেবারে সহ্য হয় না, আর মস্তিষ্কও নাকি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সম্পত্তি পরিচালনা করে প্রাচীন নায়েব যোগেশ মজুমদার; যোগেশ মজুমদারের অন্তরালে আছেন শান্ত বিষাদপ্রতিমার মত একটি নারীমূর্তি—রামেশ্বরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুনীতি দেবী। দুইটি পুত্র—বড়টির বয়স আঠারো, ছোটটি সবে পনেরোয় পা দিয়াছে; সম্প্রতি মজুমদার সুনীতি দেবীকে অনেক বলিয়া কহিয়া বড়টিকে পড়া ছাড়াইয়া বিষয়কর্মে লিপ্ত করিয়াছেন। অবশ্য লেখাপড়াতেও তাহার অনুরাগ বলিয়া কিছু ছিল না। এই বিবাদ আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতেই মজুমদার এবং রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহীন্দ্র এখানে নাই—তাহারা দূর মহালে গিয়াছে মহাল পরিদর্শনে। লোকে বুঝিল, হয় ইন্দ্র রায় প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষায় আছেন, নয় সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছেন, উপযুক্ত সময়ে ছোঁ মারিয়া বসিবেন।

চাষী প্রজারা এতটা বোঝে নাই, তাহারা সেদিন আসিয়া ইন্দ্র রায়কেই ধরিয়া বসিল, হুজুর, আপনি একটা বিচার করে দ্যান।

অতি মৃদু হাস্যের সহিত অল্প একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি বলিলেন, কিসের রে?—যেন তিনি কিছুই জানেন না।—কার সঙ্গে ঝগড়া হল তোদের?

উৎসাহিত হইয়া প্রজারা বলিল, আজ্ঞে, ওই লদীর উ-পারের চরটার কথা বলছি। ই-পারে আমাদের জমি খেয়ে তবে তো লদী উ-পারে উগরেছে; আমাদের জমি যে পয়োস্তি হল—তার খাজনা তো আমরা কমি পাই নাই, আমরা তো বছর বছর লোকসান গুনে যাচ্ছি।

বাঁ হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে রায় বলিলেন, বেশ তো, লোকসান দিয়ে দরকার কি তোদের? লোকসানী জমা ইস্তফা দিলেই পারিস। বাঁ হাতে গোঁফে তা দেওয়া রায়ের একটা অভ্যাস। লোক বলে, ওই সঙ্গে তিনি মনে মনে বুদ্ধিতে পাক মারেন।

প্রজারা হতভম্বের মত রায়ের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আজ্ঞে, ই তা হলে বিচার কি করলেন আপনি?

হাসিয়া ইন্দ্র রায় বলিলেন, তোরা যা বলবি, তাতে সায় দেওয়ার নামই তো বিচার নয় রে! বিচারের তো একটা আইন আছে, সেই আইনমতেই তো জজকে রায় দিতে হয়।

প্রজারা হতাশ হইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। যাইবার পথে তাহারা পরামর্শ করিয়া উঠিল গিয়া রামেশ্বরবাবুর বাড়ি। কাছারিতে মালিক কেহ নাই, চাকরটা বলিল, বড়বাবুও নাই, নায়েববাবুও নাই, কর্তাবাবুর সঙ্গে তো দেখা হবেই না।

প্রজারা গ্রামেরই লোক, তাহারা সকল সংবাদই রাখে, তাহারা জানে, এখন এ বাড়ির সব কর্মের অন্তরালে একটি অদৃশ্য শক্তি কাজ করে, পরমাশক্তির মত তিনিও নারীরূপিণী। তাহারা বলিল, আমরা মায়ের সঙ্গে দেখা করব।

চাকরটা অবাক হইয়া গেল, এমন ধারার কথা সে কখনও শোনে নাই। সে বলিল,

তোমরা কি ক্ষেপেছ নাকি ?

রামেশ্বরবাবুর ছোট ছেলে অহীন্দ্র পাশেই একখানা ঘরে পড়িতেছিল, সে এবার বাহির হইয়া আসিল। খাপখোলা তলোয়ারের মত রূপ—ঈষৎ দীর্ঘ পাতলা দেহ, উগ্রগৌর দেহবর্ণ, পিঙ্গল চোখ, মাথার চুল পর্যন্ত পিঙ্গলাভ। তাহাকে দেখিয়া প্রজারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল। এ-বাড়ির বড় ছেলে মহীন্দ্রকে দেখিয়া তাহাদের ভয় হয়, দশটা কথার পর মহীন্দ্র একটা জবাব দেয়, তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া পর্যন্ত সে কখনও কথা বলে না। আর এই ছোটদাদা-বাবুটির রূপ যতই উগ্র হউক না কেন, এমন নিঃসঙ্কোচ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার, এমন মধুমাখা মিষ্ট কথা তাহারা কাহারও কাছে পায় না। গল্প লইয়া তাহাদের সহিত তাহার মিলনক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন চাষীদের কাছে সাঁওতাল-বিদ্রোহের গল্প শুনিতে যায়, সে নিজে বলে দেশবিদেশের কত গল্প। সমুদ্রের ধারে সোমনাথ শিবমন্দির লুঠের কথা, আমেরিকার সাহেবদের সঙ্গে বিলেতের সাহেবদের লড়াইয়ের কথা। তাহারা বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া শোনে। অহীন্দ্রকে দেখিয়া তাহারা পরম উৎসাহের সহিত বলিল, ছোটদাদাবাবু কবে এলেন ?

অহীন্দ্র এখান হইতে দশ মাইল দূরে শহরের স্কুলে পড়ে। অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, কাল সন্ধ্যাবেলা এসেছি, চারদিন ছুটি আছে। তারপর, তোমরা এসেছ কোথায় ? দাদাও বাড়ি নেই, নায়েব-কাকাও নেই।

তাহারা বলিল, আপনি তো আছেন দাদাবাবু, আপনি আমাদের বিচার করে দ্যান।

খিলখিল করিয়া হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, আমি বিচার করতে পারি নাকি, দূর দূর !

তাহারা ধরিয়া বসিল, না দাদাবাবু, আপনাকে আমাদের এ দুঃখের কথা শুনতেই হবে। না শুনলে আমরা দাঁড়াব কার কাছে ? নইলে নিয়ে চলুন আমাদের মায়ের দরবারে। আমরা না খেয়ে পড়ে থাকব এইখানে।

অহীন্দ্র মায়ের কাছে গেল। সুনীতি স্বামীর জন্য আহার প্রস্তুত করিতেছিলেন। অহীন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন, কি রে অহি ?

মা ও ছেলের এক রূপ, তফাৎ শুধু চুল ও চোখের। মুখ, রং ও দেহের গঠনে অহি যেন মায়ের প্রতিবিম্ব—কেবল পিঙ্গল চুল ও চোখ তাহার পিতৃবংশের বৈশিষ্ট্য। সুনীতির বড় বড় কালো চোখ, চুলও ঘন কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার বড় ছেলে মহীর সহিত তাঁহার কোন সাদৃশ্যই নাই, সর্ব অবয়বে সে তাহার পিতার অনুরূপ।

অহি সকল কথা মাকে বলিয়া বলিল, ওরা একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে মা। কি বলব ওদের ? ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া মা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, সে কখনও হয় অহি ? আমি কেন দেখা করব ওদের সঙ্গে ? তুই একথা বলতে এলি কি বলে ?

অহি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল। মা হাসিয়া পিছন হইতে ডাকিয়া বলিলেন, অমনি চললি যে ?

অহি পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বলি গে ওদের সেই কথা।

কই, একবার মুখখানা দেখি।

ছেলে ফিরিয়া দাঁড়াইল, মা তাহার চিবুকখানা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, এমন 'ফুলটুস' ছেলে

আমি কোথাও দেখি নি। একেবারে ফুলের ঘায়েও রাগ হয়ে যায়।

সত্য কথা, মায়ের সামান্য কথাতেই অহির অভিমান হইয়া যায়। এ সংসারে তাহার সকল আব্‌দার একমাত্র মায়ের উপর। শৈশব হইতেই সে বাপের কাছে বড় ঘেঁষে না, তাহার বড় ভাই মহীন্দ্র বরং পিতার কাছে কাছে ফিরিয়া থাকে। দুই ভাই প্রকৃতিতে যেন বিপরীত। মহীন্দ্র অভিমান জানে না, সে জানে দুর্দান্ত ক্রোধে আত্মহারা হইয়া আঘাত করিতে, শক্তিবলে আপনার ঈপ্সিত বস্তু মানুষের কাছ হইতে আদায় করিয়া লইতে। ইস্পাতের মত সে ভাঙিয়া পড়ে, তবু কোনমতেই নত হয় না। আর অহি খাঁটি সোনার মত নমনীয়—আঘাতে ভাঙে না অভিমানে বাঁকিয়া যায়।

মা আবার প্রশ্ন করিলেন, রাগ হল তো অমনি?

না।

না কেন? আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তুই বুঝি ওদের বলেছিস, মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিবি?

অহি বলিল, বলি নি, কিন্তু দেখা করতে ক্ষতি কি?

ক্ষতি নেই, বলিস কি তুই? রায়-বাবুরা যে হাসবে, বলবে, বাড়ির বউ হয়ে চাষা প্রজাদের সঙ্গে কথা কইলে!

বলুক গে। তাই বলে ওরা ওদের দুঃখের কথা বলতে এলে শুনবে না? আর, এমনধারা মুসলমান নবাববাড়ির মত পর্দার দরকারই বা কি? আজকাল মেয়েরা দেশের কাজ করছে! ইউরোপে—এই যুদ্ধে—

বাধা দিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, তোর মাস্টারিতে আর আমি পারি নে অহি। তা তুই নিজে শুনে যা বলতে হয় বল না; সেইটেই আমার বলা হবে! আমি মহীকে বলব, আমিই বলেছি এ কথা।

ছেলে জেদ ধরিল, না, সে হবে না, তোমাকেই শুনতে হবে। আমি বরং দরজায় দাঁড়িয়ে থাকব। ওরা বাইরে থাকবে, তুমি ঘরে থাকবে।

শেষে তাহাই হইল। অহীন্দ্রকে মধ্যে রাখিয়া সুনীতি প্রজাদের অভিযোগ শুনিতে বসিলেন। তাহারা আপনাদের যুক্তিমত দাবি জানাইয়া সমস্ত নিবেদন করিল, প্রকাশ করিল না শুধু ইন্দ্র রায়ের নিকট শরণ লইতে যাওয়ার কথা এবং রায়-মহাশয়ের সুকৌশল প্রত্যাখ্যানের কথা। তাহারা বক্তব্য শেষ করিয়া বলিল, আপনার চরণে আমরা আশ্রয় নিলাম মা, আপনি ইয়ের ধর্মবিচার করে দ্যান। কালীর গেরাসে আমাদের সবই গিয়াছে মা, আমাদের আলু লাগাবার জমি নাই, আখ লাগাবার জায়গা নাই, আর কি বলব মা,—চাষীর বাড়িতে ছোলার ঝাড় ওঠে না গম ওঠে না। আমরা তবু তো কখনও খাজনা না-দেওয়া হই নাই।

সুনীতি বলিলেন, তোমরা বরং ও-বাড়ির দাদার কাছে যাও। অহিকে তোমাদের সঙ্গে দিচ্ছি। ও-বাড়ির দাদা অর্থে ইন্দ্র রায় মহাশয়। প্রজারা ইন্দ্র রায়ের নাম শুনিয়া নীরব হইয়া গেল। রংলাল চট করিয়া বুদ্ধি করিয়া বলিল, আজ্ঞে না মা, উনি জমিদার বটেন; কিন্তু

বুদ্ধিতে উনি জেলাপির পাক। যা করতে হয় আপুনি করে গ্যান!

সুনীতি বলিলেন, ছি বাবা, এমন কথা কি বলতে হয়। তিনিই হলেন এখন গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এ বাড়ির মালিকের অসুখের কথা তোমরা তো জান! মহী হাজার হলেও ছেলেমানুষ। আমি স্ত্রীলোক। সমস্ত গ্রামের জমিদার নিয়ে যে বিবাদ, তার মীমাংসা কি আমার দ্বারা হয় বাবা? যদি কখনও ভগবান মুখ তুলে চান, মহী অহি উপযুক্ত হয়, তবেই আবার তোমাদের অভাব-অভিযোগের বিচার এ-বাড়িতে হতে পারবে। এখন তোমরা ও-বাড়ির দাদার কাছেই যাও। অহি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।

প্রজাদের মধ্যে রংলালই আবার বলিল, আজ্ঞে মা, তিনিও খামচ তুলেছেন। সেই তো আমাদের ভয়, নইলে অন্য জমিদারের সঙ্গে লড়তে আমাদের সাহস আছে। না হয় দশ টাকা খরচ হবে।

সুনীতি বলিলেন, তিনিও কি চরটা দাবি করেছেন না কি?

মুখে বলেন নাই, কিন্তু ভঙ্গী সেই রকমই বটে। গাঁসুদ্ধ জমিদারই দাবি করেছে মা, আমরাও দাবি করছি, আবার মহাজনেরাও এসে জুটেছে। দাবি করেন নাই শুধু আপনারা। অথচ—

অথচ কি মোড়ল? ওতে কি আমাদেরও অংশ আছে?

বার বার হতাশার ভঙ্গীতে মাথা নাড়িয়া রংলাল বলিল, কি আর বলি মা? আর বলবই বা কাকে? আইনে তো বলছে, চর যে-গাঁয়ের লাগাড় হয়ে উঠবে, সেই গাঁয়ের মালিক পাবে। তা চরখানি তো রায়হাটের সঙ্গে লেগে নাই। লেগে আছে উ-পারের চক আফজলপুরের সঙ্গে। তা আফজলপুর তো আপনাদেরই ষোল আনা। আর ই-পারে হলেও তো তারও আপনারা তিন আনা চার গণ্ডার মালিক।

অন্য প্রজারা রংলালের কথায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। মানুষ বৃদ্ধ হইলে ভীমরতি হয়, নহিলে দাবি জানাইতে আসিয়া এ কি বলিতেছে বুড়া! সুনীতি একটু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, দেখ বাবা, তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমরা দাবি করছ চর তোমাদের প্রাপ্য, এপারে কালী নদীতে জমি তোমাদের গেছে, ওপারের চরে সেটা তোমাদের পেতে হবে। আবার—

মধ্যপথেই বাধা দিয়া লজ্জিতভাবে রংলাল বলিল, বলছি বৈকি মা, সেটা হল ধর্মবিচারের কথা। আপনি বলেন, ধম্ম অনুসারে আমাদের পাওনা বটে কি না?

সুনীতি নীরবেই কথাটা ভাবিতেছিলেন, পাওয়া উচিত বৈকি। দরিদ্র চাষী প্রজা—আহা-হা!

রংলাল আবার বলিল, আর আমি যা বলছি—ই হল আইনের কথা। আইন তো আর ধম্মের ধার ধারে না। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোই হল আইনের কাজ।

সুনীতি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া শেষে বলিলেন, আচ্ছা, আজই আমি মহীকে আর মজুমদার ঠাকুরপোকে আসতে চিঠি লিখে দিচ্ছি। তাঁরা এখানে আসুন; তারপর তোমরা এস। তবে

একথা ঠিক, তোমাদের ওপর কোন অবিচার হবে না।

রংলাল আবার বলিল, শুধু যেন আইনই দেখবেন না মা, ধম্মপানেও একটুকুন তাকাবেন।

সুনীতি বলিলেন, ধর্মকে বাদ দিয়ে কি কিছু করা যায় বাবা? কোন ভয় নেই তোমাদের।

প্রজারা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

সুনীতি বলিলেন, তুই ওবেলা একবার ও-বাড়ির দাদার কাছে যাবি অহি।

২

সুনীতি রায়-বংশের ছোট বাড়ির মালিক ইন্দ্র রায়কে বলেন—দাদা। কিন্তু ইন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। ইন্দ্র রায় রামেশ্বর চক্রবর্তীর প্রথমা পত্নী রাধারাণীর সহোদর। চক্রবর্তী-বংশের সহিত রায়-বংশের বিরোধ আজ তিন পুরুষ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে; রায়-বংশের সকলেই চক্রবর্তীদের প্রতি বিরূপ, কিন্তু এই ছোট বাড়ির সহিতই বিরোধ যেন বেশী। তবুও আশ্চর্যের কথা, রামেশ্বর চক্রবর্তীর সহিত ছোট বাড়ির রায়-বংশের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল।

তিন পুরুষ পূর্বে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল। রায়েরা শ্রোত্রিয় এবং চক্রবর্তী-বংশ কুলীন। সেকালে শ্রোত্রিয়গণ কন্যা সম্প্রদান করিতেন কুলীনের হাতে। রামেশ্বরের পিতামহ পরমেশ্বর রায়-বংশের মাঝের বাড়ির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহ করিয়াও তিনি শ্বশুর বর্তমানে কখনও স্থায়ীভাবে শ্বশুরালয়ে বাস করেন নাই। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি যেদিন এখানে আসিয়া মালিক হইয়া বসিলেন, রায়েদের সহিত তাঁহার বিবাদও বাধিল সেই দিনই। সেদিনও রায়েদের মুখপাত্র ছিলেন ওই ছোট বাড়িরই কর্তা—এই ইন্দ্র রায়ের পিতামহ রাজচন্দ্র রায়। সেদিন পরমেশ্বর চক্রবর্তীর শ্বশুরের অর্থাৎ রায়-বংশের মাঝের বাড়ির কর্তার শ্রাদ্ধবাসর। রাজচন্দ্র রায়ের উপরেই শ্রাদ্ধের সকল বন্দোবস্তের ভার ন্যস্ত ছিল। মজলিসে বসিয়া রাজচন্দ্র গড়গড়ার নল টানিয়া পরমেশ্বর চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিলেন। পরমেশ্বর নলটি না টানিয়াই রায়-বংশধরের হাতে সমর্পণ করিলেন। তার পর নিজের ঝুলি হইতে ছোট একটি হুঁকো ও কল্কে বাহির করিয়া একজন চাকরকে বলিলেন, কোন ব্রাহ্মণকে দে, জল সেজে এই কল্কেতে আগুন দিয়ে দিক। তিনি ছিলেন পরম তেজস্বী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।

রাজচন্দ্র সম্বন্ধে পরমেশ্বরের শ্যালক, তিনি বলিলেন, ভণ্ডামিটুকু খুব আছে কুলীনদের।

হাসিয়া পরমেশ্বর বলিলেন, গুণ্ডামির চেয়ে ভণ্ডামি অনেক ভাল রায় মশায়।

রাজচন্দ্র উত্তর দিলেন, গুণ্ডামির অর্জিত ভূ-সম্পত্তি কিন্তু বড়ই উপাদেয়।

কথাটি শুনিয়া রায়-বংশের সকলেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

পরমেশ্বর কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলেন না, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই মৃদু-হাস্যের সহিত উত্তর দিলেন, শুধু

ভূমি-সম্পত্তিই নয় রায় মশায়, গুণ্ডাদের কন্যাগুলিও রত্নস্বরূপা ; যদিও দুষ্কুলাৎ।

এবার মজলিসে যে যেখানে ছিল, সকলেই হাসিয়া উঠিল ; হাসিলেন না কেবল রায়েরা। ফলে গোলও বাধিল। শ্রাদ্ধ অন্তে ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় রায়েরা একজোট হইয়া বলিলেন, পরমেশ্বর চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে এক গড়গড়ায় তামাক না খেলে আমরাও অন্ন গ্রহণ করব না।

পরমেশ্বর আপনার ছোট হুঁকাটিতে তামাক টানিতে টানিতেই বলিলেন, তাতে চক্রবর্তী-বংশের কোন পুরুষের অধোগতি হবে না। ব্রাহ্মণ-ভোজনের অভাবে অধোগতি হলে রায়-বংশেরই হবে।

অতঃপর রায়দের মাথা হেঁট করিয়া খাইতে বসিতে হইল। কিন্তু উভয় বংশের মনোজগতের মধ্যবর্তী স্থলে বিরোধের একটি ক্ষুদ্র পরিখা খনিত হইল সেই দিন।

পরমেশ্বর ও রাজচন্দ্রের সময়ে বিরোধের যে পরিখা খনিত হইয়াছিল তাহা শুধু দুই বংশের মিলনের পক্ষে বাধা হইয়াই প্রবাহিত হইত, গ্রাস কিছুই করে নাই। কিন্তু পরমেশ্বরের পুত্র সোমেশ্বরের আমলে পরিখা হইল তটগ্রাসিনী তটিনী ; সে তট ভাঙিয়া কালী নদীর মত সম্পত্তি গ্রাস করিতে শুরু করিল। মামলা-মকদ্দমার সৃষ্টি হইল। রাজচন্দ্রের পুত্র তেজচন্দ্রই প্রথমটা ঘায়েল হইয়া পড়িলেন। সোমেশ্বরের একটা সুবিধা ছিল, সমগ্র সম্পত্তিরই মালিক ছিলেন সোমেশ্বরের জননী। সোমেশ্বরের মাতামহ দলিল করিয়া সম্পত্তি দিয়া গিয়াছিলেন কন্যাকে, কাজেই সোমেশ্বরের দায়ে তাঁহার সম্পত্তি স্পর্শ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। এই সময়ে বীরভূমের ইতিহাস-বিখ্যাত সাঁওতাল-বিদ্রোহ হয়। সোমেশ্বর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সাঁওতালদের সহিত যোগ দিয়া বসিলেন। কপালে সিন্দুরের ফোঁটা আঁকিয়া তিনি নাকি সাঁওতাল-বাহিনী পরিচালনাও করিয়াছিলেন। এই লইয়া মাতা-পুত্রে বচসা হয়, পুত্র তখন বিদ্রোহের উন্মাদনায় উন্মত্ত। সে মাকে বলিয়া বসিল, তুমি বুঝবে না এর মূল্য, শ্রোত্রিয়েরা চিরকাল রাজসরকারের প্রসাদভোজী, সেই দাসের রক্তই তো তোমার শরীরে।

মা সর্পিণীর মত ফণা তুলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কি বললি ? এত বড় কথা তোর ? তা, তোর দোষ কি, পরের অন্নে যারা মানুষ হয় তাদের কথাটা চিরকাল বড় বড় হয়, সুর পঞ্চমে উঠেই থাকে।

সোমেশ্বর বলিলেন, তোমার কথার উত্তর তুমি নিজেই দিলে, কাকের বাসায় কোকিল মানুষ হয়, সুর তার পঞ্চমে ওঠে, সেটা তার জাতের গুণ, কাক তাতে চিরকাল ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে।

ওদিকে তখন তেজচন্দ্র সদরে সাহেবদের নিকট হরদম লোক পাঠাইতেছেন। সে সংবাদ সোমেশ্বরও শুনিলেন, তাঁহার মাও শুনিলেন। সোমেশ্বর গর্জন করিয়া উঠিলেন, রায়হাট ভূমিসাৎ করে দেব, রায়-বংশ নির্বংশ করে দেব আমি।

সত্য বলিতে গেলে, সে গর্জন তাঁহার শূন্যগর্ভ কাংস্যপাত্রের নিনাদ নয়, তাঁহার অধীনে তখন হাজারে হাজারে সাঁওতাল উন্মত্ত শক্তি লইয়া ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছে। সোমেশ্বরের গৌরবর্ণ রূপ, পিঙ্গল চোখ, পিঙ্গল চুল দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত,

বলিত, রাঙা-ঠাকুর। সোমেশ্বরের মা পিতৃবংশের মমতায় বিহ্বল হইয়া পুত্রের পা চাপিয়া ধরিলেন। সোমেশ্বর সর্পদষ্টের মত চমকিত হইয়া সরিয়া আসিয়া নিতান্ত অবসন্নের মত বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, তুমি করলে কি মা, এ তুমি করলে কি? বাপের বংশের মমতায় আমার মাথায় বজ্রাঘাতের ব্যবস্থা করলে?

মা ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া লক্ষ আশীর্বাদ করিলেন, ছেলে তাহাতে বুঝিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সোমেশ্বর বলিলেন, এ পাপের স্খালন নেই মা, তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, রায়-বংশের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করবে না।

সেই রাত্রেই তিনি নীরবে গোপনে গৃহত্যাগ করিলেন, একবস্ত্রে নিঃসম্বল অবস্থায়, হাতে শুধু এক উলঙ্গ তলোয়ার। ঘর ছাড়িয়া সাঁওতালদের আস্তানা শাল-জঙ্গলের দিকে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন, পিছন হইতে কে বলিল, এত জোরে হাঁটতে যে আমি পারছি না গো? একটু আস্তে চল।

চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া সোমেশ্বর দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী শৈবলিনী তাঁহার পিছন পিছন আসিতেছেন। তিনি স্তম্ভিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, তুমি কোথায় যাবে?

শৈবলিনী প্রশ্ন করিলেন, আমি কোথায় থাকব?

কেন, ঘরে মায়ের কাছে!

তার পর যখন সাহেবরা আসবে, তোমায় জব্দ করতে আমায় ধরে নিয়ে যাবে?

হুঁ। কথাটা সোমেশ্বরের মনে হয় নাই। সম্মুখেই গ্রামের সিদ্ধপীঠ সর্বরক্ষার আশ্রম। সেই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সোমেশ্বর বলিলেন, দাঁড়াও, ভেবে দেখি। খোকাকে রেখে এলে! যেন সেটাও তাঁহার মনঃপূত হয় নাই।

শৈবলিনী বলিলেন, সে তো মায়ের কাছে। মাকে তো জাগাতে পারলাম না!

বহুক্ষণ পদচারণা করিয়া সোমেশ্বর বলিলেন, হয়েছে। মায়ের কাছ ছাড়া আর রক্ষা পাবার স্থান নাই। এইখানেই তুমি থাকবে।

বিস্মিত হইয়া শৈবলিনী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, এখানে লুকিয়ে থাকবার মত জায়গা আছে নাকি?

আছে। ভক্তিভরে মাকে প্রণাম কর, আশ্রয় ভিক্ষা কর। মাকে অবিশ্বাস ক'রো না।

হিন্দু মেয়ে—প্রায় একশত বৎসরের পূর্বের হিন্দুর মেয়ে এ-কথা মনেপ্রাণেই বিশ্বাস করিত! শৈবলিনী পরম ভক্তিভরে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণতা হইলেন।

পরমুহূর্তে রক্তাক্ত অসি উদ্যত করিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া অথবা কাঁদিয়া নীরব স্তব্ধ নৈশ আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া সোমেশ্বর শালজঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। শালজঙ্গল তখন মশালের আলোয় অদ্ভুত ভয়াল শ্রী ধারণ করিয়াছে, উপরে নৈশ অন্ধকার, আর অন্ধকারের মত গাঢ় জমাট অখণ্ড নিবিড় বনশ্রী—মধ্যস্থলে আলোকিত শালকাণ্ডের ঘন সন্নিবেশ ও মাটির উপর তাহাদের দীর্ঘ ছায়া, তাহারই মধ্যে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া সিন্দুরে চিত্রিত মুখ রক্তমুখ দানবের মত হাজার সাঁওতাল। একসঙ্গে প্রায় শতাধিক মাদল বাজিতেছে—ধিতাং ধিতাং, ধিতাং

ধিতাং। থাকিয়া থাকিয়া হাজার সাঁওতাল একসঙ্গে উল্লাস করিয়া কুক দিয়া উঠিতেছে—উ—র্‌—র্‌! উ—র্‌—র্‌!

সোমেশ্বর হাজার সাঁওতাল লইয়া অগ্রসর হইলেন; একটা থানা লুট করিয়া, গ্রাম পোড়াইয়া, মিশনারিদের একটা আশ্রম ধ্বংস করিয়া, কয়েকজন ইংরেজ নরনারীকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়া অগ্রসর হইলেন। পথে ময়ূরাক্ষী নদী। নদীর ও-পারে বন্দুকধারী ইংরেজের ফৌজ। সোমেশ্বর আদেশ করিলেন, আর এগোস না যেন, গাছের আড়ালে দাঁড়া।

ও-দিক হইতে ইতিমধ্যে ইংরেজের ফৌজ ভয় দেখাইবার জন্য ফাঁকা আওয়াজ আরম্ভ করিল। সাঁওতালরা সবিস্ময়ে দেখিল, তাহারা অক্ষতই আছে—কাহারও গায়ে একটি আঁচড় পর্যন্ত লাগে নাই। সেই হইল কাল। গুলি আমরা খেয়ে লিলম!—বলিয়া উন্মত্ত সাঁওতালদের দল ভরা ময়ূরাক্ষীর বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

মুহূর্তে ও-পারে আবার বন্দুক গর্জন করিয়া উঠিল, এবার ময়ূরাক্ষীর গৈরিক জলস্রোত রাঙা হইয়া গেল—মৃতদেহ ভাসিয়া গেল কুটার মত। সোমেশ্বর চিত্রার্পিতের মতই তটভূমির উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনিও এক সময় তটচ্যুত বৃক্ষের মত ময়ূরাক্ষীর জলে নিপাতিত হইলেন—বুকে বিঁধিয়া রাইফেলের গুলি পিঠ ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

অতঃপর সোমেশ্বরের মা পৌত্র রামেশ্বরকে লইয়া লড়াই করিতে বসিলেন—সরকার বাহাদুরের সঙ্গে। সরকার সোমেশ্বরের অপরাধে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে চাহিলেন। সোমেশ্বরের মা মকদ্দমা করিলেন—সম্পত্তি তাঁহার, সোমেশ্বরের নয়। আর সরকারবিরোধী সোমেশ্বরকে তিনি ঘরেও রাখেন নাই, সুতরাং সোমেশ্বরের অপরাধে তাঁহার দণ্ড হইতে পারে না।

সরকার হইতে তলব হইল রায়বাবুদের, তাহার মধ্যে তেজচন্দ্র প্রধান। তাঁহাদের কাছে জানিতে চাহিলেন, সোমেশ্বরের মায়ের কথা সত্য কি না। বিদ্রোহী সোমেশ্বরের সহিত সত্যই তিনি কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই কি না।

বাড়ি হইতে বাহির হইবার মুখে তেজচন্দ্রের মা বলিলেন, ও-বাড়ির ঠাকুরঝি রায়-বংশকে বাঁচাবার জন্য সোমেশ্বরের পায়ে ধরেছিলেন! আমাকেও কি—

তাড়াতাড়ি মায়ের পদধূলি লইয়া তেজচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, তোমার সঙ্গে তো তোমার ঠাকুরঝির পাতানো সম্বন্ধ মা, আমার সঙ্গে যে ওঁর রক্তের সম্বন্ধ।

মা বলিলেন, আশীর্বাদ করি, সেই সুমতিই হোক তোমাদের। কিন্তু কি জান, রায়বাবুদের বোনকে ভালবাসা—কংসের ভালবাসা।

তেজচন্দ্র বলিলেন, চক্রবর্তী জয়দ্রথের গুষ্ঠী মা, শ্যালক-বংশ নাশ করতে ব্যূহমুখে সর্বাগ্রে থাকেন ওঁরা। যাক গে—ফিরে আসি, তার পর বিচার করে যা করতে হয় ক'রো, যা বলতে হয় ব'লো।

সেখানে রায়-বংশীয়েরা একবাক্যে রায়-বংশের কন্যাকে সমর্থন করিয়া আসিলেন। তেজচন্দ্রের জননীকে কিছু বলিতে বা করিতে হইল না—স্বয়ং সোমেশ্বরের জননীই পৌত্র

রামেশ্বরের হাত ধরিয়া রায়-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যারতির সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিতে তিনি কিছু পারিলেন না, কিন্তু প্রতিজনের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তেজচন্দ্র রামেশ্বরকে কোলে তুলিয়া লইলেন, তাঁহার মা ননদের হাত ধরিয়া বলিলেন, বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে হবে।

বাড়িতে ঢুকিয়া তেজচন্দ্রের মা বলিলেন, রাধি, আসন নিয়ে আয়।

রাধি—রাধারাণী—তেজচন্দ্রের সাত বৎসরের কন্যা। সে একটা কি করিতেছিল, সে জবাব দিল, আমি কি তোমার ঝি না কি? বল না ঝিকে।

কঠোর-স্বরে ঠাকুরমা বলিলেন, উঠে আয় বলছি হারামজাদী।

হাসিয়া সোমেশ্বরের মা বলিলেন, কেন ঘাঁটাচ্ছ ভাই বউ; আমাদের বংশের মেয়ের ধারাই ওই। আমারও তাই—রায়-বাড়ির মেয়ে চিরকেলে জাহাঁবাজ।

তেজচন্দ্রের মা বলিলেন, শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের যে কি হাল হবে, তাই আমি ভেবে মরি। ও মেয়ে স্বামীর নাকে দড়ি দিয়ে ওঠাবে বসাবে, আর নয় তো শ্বশুরবাড়ির অন্ন ওর কপালে নেই।

সোমেশ্বরের মা একবার রাধারাণীকে ডাকিলেন, ও নাতনী, এখানে একবার এস না, একবার তোমায় দেখি, আমিও তোমার ঠাকুমা হই।

সোমেশ্বরের মা রাধারাণীর অপরিচিতা নহেন। কিন্তু এ সংসারের ইষ্টের পরে শত্রুই নাকি মানুষের আরাধ্য বস্তু। সময় সময় ইষ্টকেও ছাপাইয়া শত্রু মানুষের মন অধিকার করিয়া থাকে। সেই হেতু সোমেশ্বরের মা, গ্রামের লোক এবং এই বংশের মেয়ে হইয়াও রায়-পরিবারের সকলেরই সম্ভ্রমের পাত্রী। তাঁহাকে দেখিয়া রাধারাণী নিতান্ত ভালমানুষের মত ঝির হাত হইতে আসনখানা টানিয়া লইয়া আগাইয়া আসিল এবং সম্ভ্রমভরেই আসনখানি পাতিয়া দিয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া নীরবে যেন আদেশের প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সোমেশ্বরের মা পরম স্নেহে আদর করিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, তোমরা মিথ্যে নিন্দে কর বউ; এমন সুন্দর আর এমন ভাল মেয়ে তো আমি দেখি নি। অ্যাঁ, এ যে বড় ভাল মেয়ে গো।

তেজচন্দ্রের মা সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন, রাধুকে তা হলে তোমারই পায়ে ঠাঁই দিতে হবে ভাই। আমরা আর কোথায় যাব? রামেশ্বরের সঙ্গে রাধির বিয়ে দেবে, তুমি বল!

সোমেশ্বরের মা এমনটা ঘটিবে প্রত্যাশা করেন নাই, তিনি বিব্রত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এই সময়েই রামেশ্বরের হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিলেন তেজচন্দ্র। তাঁহার মা বলিলেন, তেজু ধর, পিসীমার পায়ে ধর। ধর বলছি, ধর। খবরদার, 'হ্যাঁ' যতক্ষণ না বলবেন, ছাড়বি না। আমি ধরেছি, রামেশ্বরের সঙ্গে রাধুর বিয়ের জন্য।

তেজচন্দ্র পিসীমার পাদস্পর্শ করিয়াই বসিয়া ছিলেন। এ কথাটা শুনিয়া তাঁহারও মন পুলকিত হইয়া উঠিল। রামেশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তাহাকে তাঁহার বড় ভাল

লাগিয়াছে। তাহার উপর আজিকার এই প্রণাম-আশীর্বাদের বিনিময়ের ফলে মন হইয়াছিল মিলনাকাঙ্ক্ষী; কথাটা শুনিবামাত্র তেজচন্দ্র সত্যই সোমেশ্বরের মায়ের পা জড়াইয়া ধরিলেন।

তেজচন্দ্রের মা বলিলেন, আমি তোমায় মিনতি করছি ঠাকুরঝি, 'না' তুমি ব'লো না। এ সর্বনেশে ঝগড়ার শেষ হোক, সেতু একটা বাঁধ।

সোমেশ্বরের মায়ের চোখে জল আসিল। তিনি নিজে রায়-বংশের কন্যা, আপনার পিতৃকুলের সহিত এই আক্রোশভরা দ্বন্দ্ব তাঁহারও ভাল লাগে না। চক্রবর্তীদের দ্বন্দ্বে রায়েদের পরাজয় ঘটিলে, অন্তরালে লোকে তাঁহাকে বংশনাশিনী কন্যা বলিয়া অভিহিত করে, সে সংবাদও তাঁহার অজানা নয়। আর, রামেশ্বর সবেমাত্র দশ বৎসরের বালক, এদিকে তাঁহার জীবন-প্রদীপেও তৈল নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে; তাঁহার অন্তে রামেশ্বরকে এই রায়-জনাকী রায়হাটে দেখিবে কে, এ-ভাবনাও তাঁহার কম নয়। তিনি আর দ্বিধা করিলেন না, সজল চক্ষে বলিলেন, তাই হোক বউ, রামেশ্বরকে তেজচন্দ্রের হাতেই দিলাম।—বলিয়া তিনি রাধারাণীকে কোলে তুলিয়া লইলেন, তাহার কানে কানে বলিলেন, কি ভাই বর পছন্দ তো?

রাধারাণী রামেশ্বরের দিকে চাহিয়া দেখিয়া আবার সোমেশ্বরের মায়ের কাঁধে মুখ লুকাইয়া বলিল, বাবা, কি কটা চোখ!

সোমেশ্বরের মা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, রায়-বংশের মেয়ে জব্দ করতে চক্রবর্তী-বংশ সিদ্ধহস্ত। তখন তেজচন্দ্রের বাড়িখানা শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেতুবন্ধ রচিত হইল।

তেজচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সেতুর উপর লোকচলাচলের বিরাম ছিল না। রাধারাণী এ-বাড়ি হইতে ও-বাড়ি যাইত আসিত, রামেশ্বর আসিতেন, যাইতেন, তেজচন্দ্র স্বয়ং একবেলা রামেশ্বরের কাছারিতে বসিয়া হিসাব-নিকাশ কাগজ-পত্র দেখিতেন, অন্দরে রাধারাণীর মা করিতেন গৃহস্থালির তদারক।

সেকালে উচ্চশিক্ষার সুযোগ তেমন ছিল না, কিন্তু তেজচন্দ্র পুত্র ও জামাতার শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য করিয়াছিলেন। পুঁথি বই সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিত মৌলবী দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ইন্দ্রচন্দ্র ফারসীতে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন, আইনের বইয়ে তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। রামেশ্বর পড়িতেন কাব্য।

ইন্দ্রচন্দ্র হাসিয়া বলিতেন, কাব্য আর প'ড়ো না; জান তো, রসাধিক্য হলে বিকার হয়।

রামেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন, আহা বন্ধু, তোমার বাক্য সফল হোক, হোক আমার রসবিকার। রায়-বংশের 'তন্বীশ্যামা শিখরদর্শনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি'রা ঘিরে বসুক আমাকে, পদ্মপত্র দিয়ে বীজন করুক, চন্দনরসে অভিষিক্ত করে দিক আমার অঙ্গ—

বাধা দিয়া ইন্দ্রচন্দ্র বলিতেন, থাম, ফক্কড় কোথাকার! রামেশ্বর আপন মনেই আওড়াইতেন, 'শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং।' ইহার ফলে সত্যসত্যই রামেশ্বর

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। বাড়ির মধ্যে রাধারাণী, রায়-বাড়ির স্বভাব-মুখরা মেয়ে, কঠোর কলহ-পরায়ণা হইয়া উঠিল। তেজচন্দ্রের পরলোকগমনের পর রায়-বংশের মেয়ে ও চক্রবর্তী-বংশের ছেলের কলহ আবার ঘটনাচক্রে উভয় বংশে সংক্রামিত হইয়া পড়িল।

সেদিন রাধারাণী স্বামীর সহিত কলহ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যায় রামেশ্বর একগাছি বেলফুলের মালা গলায় দিয়া চারিদিকে আতরের সৌরভ ছড়াইতে ছড়াইতে শ্বশুরালয়ে আসিয়া উঠিলেন। ইন্দ্রচন্দ্র তাঁহার সম্ভাষণও করিলেন না, রামেশ্বর নিজেই আসন পরিগ্রহণ করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, নমস্তভ্যং শ্যালকপ্রবরং কঠোরং কুম্ভবদনং—

বাধা দিয়া ইন্দ্রচন্দ্র বলিলেন, তুমি অতি ইতর!

রামেশ্বর বলিলেন, শ্রেষ্ঠ রস যেহেতু মিষ্ট এবং মিষ্টান্নে যেহেতু ইতরেরই একচেটিয়া অধিকার, সেই হেতু ইতর আখ্যায় ধন্যোঽহং। তা হলে মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করে ফেল।

আদরের ভগ্নী রাধারাণীর মনোবেদনার হেতু রামেশ্বরকে ইন্দ্র রায় ইহাতেও মার্জনা করিতে পারিলেন না, তিনি আর কথা না বাড়াইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। রামেশ্বর আর অপেক্ষা করিলেন না, তিনি উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, নাঃ, অরসিকেষু রস নিবেদনটা নিতান্ত মূর্খতা। চললাম অন্দরে।

বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া তিনি ডাকিলেন, কই, সখী মদলেখা কই?

শ্যালক ইন্দ্রচন্দ্রের পত্নী হেমাঙ্গিনীকে তিনি বলিতেন—সখী মদলেখা। তাঁহাদের কথোপকথন হইত মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বরীর ভাষায়। স্বয়ং রামেশ্বর তাঁহাদিগকে কাদম্বরী পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।

হেমাঙ্গিনী আদর করিয়া রাধারাণীর নামকরণ করিয়াছিলেন, কাদম্বরী। রামেশ্বর উত্তর দিয়াছিলেন, তা হ'লে রায়-গিন্নীকে যে নর্মসহচরী 'মদলেখা' হতে হয়।

হেমাঙ্গিনী বলিয়াছিলেন, তা হ'লে আপনি আমাদের 'চন্দ্রাপীড়' হলেন তো?

কাদম্বরীর সম্বন্ধনির্ণয়-সূত্রানুসারে অবশ্যই হতে হয়; না হয়ে উপায় কি? আর আমার জন্মকুণ্ডলীতেও নাকি লগ্নে আছেন চন্দ্রদেবতা, সুতরাং মিলেও নাকি যাচ্ছে খানিকটা!

খানিকটা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া হেমাঙ্গিনী বলিয়াছিলেন, খানিকটা! বিনয় প্রকাশ করছেন যে! রূপে গুণে ষোল-আনা মিল যে। রূপের কথা দর্পণেই দেখতে পাবেন। আর গুণেও কম যান না। দিবসে সমস্ত দিনটিই নিদ্রা, উদয় হয় সন্ধ্যার সময়; আর চন্দ্র-দেবতার তো সাতাশটি প্রেয়সী, আপনার কথা আপনি জানেন; তবে হার মানবেন না, এটা হলফ করেই বলতে পারি।

সেদিন অর্থাৎ এই নামকরণের দিন, রাধারাণীর অভিমান রামেশ্বর সন্ধ্যাতেই ভাঙাইয়াছিলেন, কাজেই রাধারাণী এ কথায় উগ্র না হইয়া শ্লেষভরে বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশে কুলীনদের ছেলেরা সবাই চন্দ্রলগ্নপুরুষ, কারু এক শ বিয়ে, কারু এক শ ষাট। কপালে আগুন কুলীনের!

জোড়হাত করিয়া রামেশ্বর বলিয়াছিলেন, দেবী, সে অপরাধে তো অপরাধী নয় এ দাস।

আর আজ থেকে, এই নবচন্দ্রাপীড়জন্মে চন্দ্রাপীড় দাসখত লিখে দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, রাধারাণী-কাদম্বরী ছাড়া সে আর কাউকে জানবে না।

রাধারাণী তর্জনী তুলিয়া শাসন করিয়া বলিয়াছিল, দেখো মনে থাকবে তো !

আজ রামেশ্বরের আহ্বান শুনিয়া হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, আসুন দেবতা, আসুন।

চাপা-গলায় সশঙ্ক ভঙ্গীতে রামেশ্বর বলিলেন, আপনার দেবী কাদম্বরী কই ?

আসন পাতিয়া দিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বসুন। তার পর গভীরভাবে বলিলেন, না চক্রবর্তীমশায়, এবার আপনার নিজেকে শোধরানো উচিত হয়েছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রামেশ্বর বলিলেন, চেষ্টা আমি করি রায়গিন্নী, কিন্তু পারি না।

'পারি না' বললে চলবে কেন ? আপনার ব্যবহারে বিতৃষ্ণায় রাধুর চিত্তেই যদি বিকার উপস্থিত হয়, তখন কি করবেন বলুন তো ?

রামেশ্বর একদৃষ্টে শ্যালক-পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, হুঁ, কেমন মনে হচ্ছে ? তার চেয়ে সাবধান হোন এখন থেকে। রাধুর মন আজ যা দেখলাম, তাতে আত্মহত্যা করা কিছুই আশ্চর্য নয়। সময় থাকতে সাবধান হোন।

রামেশ্বর নিজে উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র; তিনি হেমাঙ্গিনীর 'বিকার' শব্দের নূতন বিশ্লেষণ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। বিকার শব্দের যে অর্থ তিনি গ্রহণ করিলেন, শাস্ত্র সেই অর্থই অনুমোদন করে, এবং বর্তমান ক্ষেত্রে সেই বিকার হওয়াই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু তিনি রাগ করিতে পারিলেন না, শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত, মনে মনে তিনি অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলেন, রায়-গিন্নী, হয় নিজেকে সংশোধন করব, নয় ব্রাহ্মণের উপবীত পরিত্যাগ করব।

হেমাঙ্গিনী আশ্বস্ত হইয়া এইবার হাসিমুখে বলিলেন, তবে চলুন চন্দ্রাপীড়, দেবী কাদম্বরী মান-ও বিরহতাপিতা হয়ে হিমগৃহে অবস্থান করছেন। আসুন, অধীনী মদলেখা এখনই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবে।

দোতলার লম্বা দরদালানে প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই মায়ের ঘরে রাধারাণী শুইয়া ছিল। মায়ের মৃত্যুর পর ঘরখানি বন্ধই থাকে, রাধারাণী আসিলে সে-ই ব্যবহার করে। দরদালানে প্রবেশ করিয়াই রামেশ্বর থমকিয়া দাঁড়াইলেন। রাধারাণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া একটি তরুণ-কান্তি যুবক কি একখানা বই পড়িয়া রাধারাণীকে শুনাইতেছে।

ওটি কে, রায়-গিন্নী ?

রামেশ্বরের সচকিত ভাব দেখিয়া হেমাঙ্গিনী কৌতুকপ্রবণা হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, দেব, উপেক্ষিতা কাদম্বরী দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য সম্প্রতি এই তরুণকান্তি কেয়ূরককে আমরা নিযুক্ত করেছি।

ছেলেটি রাধারাণীর পিসতুতো ভাই ! পিতৃমাতৃহীন হইয়া সে মামার বাড়িতে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে আজই !

ইহার পর সমস্ত ঘটনা রহস্যের আবরণে আবৃত, সেইজন্যই সংক্ষিপ্ত। জানেন একমাত্র রামেশ্বর আর রাধারাণী। তবে ইহার পরদিন হইতে সেতুতে ফাটল ধরিল। রাধারাণীর পিত্রালয়ে আসা বন্ধ হইয়া গেল। রামেশ্বর নিজে হইয়া উঠিলেন কঠোর নিষ্ঠাপরায়ণ ব্রাহ্মণ, অন্য দিক দিয়া একাগ্রচিত্তে বিষয়-অনুরাগী। বাল্যকালে রামেশ্বরের যে পিঙ্গল চোখ দেখিয়া রাধারাণী ভয় পাইয়াছিল, সে চোখ কৌতুক-সরসতা হারাইয়া এমন তীব্র হইয়া উঠিল যে রাধারাণী ভয় না করিয়া পারিল না। ওদিকে রায়-বংশের সহিত আবার খুঁটিনাটি আরম্ভ হইয়া গেল। পরস্পরের যাওয়া-আসা সংক্ষিপ্ত হইয়া অবশিষ্ট রহিল কেবল লৌকিকতাটুকু। ইহার বৎসরখানেক পরে রাধারাণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। কিন্তু মাসখানেক পর অকস্মাৎ সন্তানটি মারা গেল; কয়েকদিন পরই একদিন রাত্রে রাধারাণীও হইল নিরুদ্দিষ্ট! প্রথমে সকলে ভাবিয়াছিল রাধারাণী বোধ হয় আত্মহত্যা করিয়াছে। ইন্দ্র রায় সন্দেহ করিয়াছিলেন, রাধুকে হত্যা করিয়াছে রামেশ্বর। কিন্তু রাধারাণীর সন্ধান পাওয়া গেল দশ মাইল দূরবর্তী রেল-স্টেশনের পথে। একজন চাষী বলিল, রায়বাড়ির মেয়ে রাধু দিদিঠাকরুণকে রেল-স্টেশনের পথে দেখিয়াছে। তিনি তাহাকে স্টেশন কতদূর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সে কথাটা কাহাকেও সাহস করিয়া বলে নাই। ইহার পর রাধারাণীর গৃহত্যাগে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না।

লজ্জায় রায়-বংশের মাথা কাটা গেল। রামেশ্বর আবার বিবাহ করিলেন পশ্চিম-প্রবাসী এক শিক্ষক-কন্যা সুনীতিকে। মহীন্দ্র এবং অহীন্দ্র দুইটি সন্তান সুনীতির। তারপর রামেশ্বর এই কয়েক বৎসর পূর্বে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। আজ দুই বৎসর একরূপ শয্যাশায়ী হইয়া একেবারে ঘরে ঢুকিয়া বসিয়াছেন। আপনার মনে মৃদুস্বরে কথা বলেন আর চুপ করিয়া বিছানায় বসিয়া থাকেন।

এই হইল রায়-বংশ এবং চক্রবর্তী-বংশের ইতিহাস। এই সম্বন্ধেই সুনীতি ইন্দ্র রায়কে বলেন, ও-বাড়ির দাদা।

* * * *

সুনীতি সেদিন অপরাহ্ণে অহীন্দ্রকে বলিলেন, তুই যাবি একবার ও-বাড়ির দাদার কাছে?

অহি বলিল, কি বলব?

বলবি—, সুনীতি খানিকটা চিন্তা করিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন, নাঃ, থাক অহি, মজুমদার-ঠাকুরপো আর মহী ফিরেই আসুক। আবার কি বলবেন রায়-বাবুরা, তার চেয়ে থাক।

অহি বলিল, ঐ তোমাদের এক ভয়। মানুষকে বিনা কারণে অপমান করা কি এতই সোজা মা? মহাত্মা গান্ধী সাউথ আফ্রিকায় কি করেছিলেন জান? সেখানে ইংরেজরা রাস্তায় যে-ধারে যেত, রাস্তার সে-ধারে কালা আদমীকে যেতে দিত না। গেলে অপমান করত, জেল পর্যন্ত হত। মহাত্মাজী সমস্ত অপমান নির্যাতন সহ্য করে সেই রাস্তাতেই যেতে আরম্ভ করলেন। অপমানের ভয়ে বসে থাকলে কি কখনও সেই অধিকার পেত কালা আদমী?

বল, কি বলতে হবে ?

সুনীতি দেবী শিক্ষকের কন্যা, তাঁহার বড় ভাল লাগে এই ধারার আদর্শনিষ্ঠার কথা। তিনি ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বেশ, তবে যা, গিয়ে বলবি, এই যে এত বড় গ্রাম জুড়ে বিবাদ—এটা কি ভাল ? আপনি এখন গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, আপনিই এটা মিটিয়ে দেন। তবে গরীব প্রজা যেন কোনমতেই মারা না পড়ে, সেইটে দেখবেন, এই কথাটা মা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।

ইন্দ্র রায় কাছারী-ঘরে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন একজন মহাজনের সঙ্গে। ঐ চর লইয়াই কথা। মহাজনের বক্তব্য, পাঁচশত টাকা নজরস্বরূপ গ্রহণ করিয়া রায় মহাশয় তাহার দাবি স্বীকার করুন।

ইন্দ্র রায় হাসিয়া বলিলেন, চরটা অন্ততঃ পাঁচ শ বিঘে, দশ টাকা বিঘে সেলামী নিয়ে বন্দোবস্ত করলেও যে পাঁচ হাজার টাকা হবে দত্ত, আর এক টাকা বিঘে খাজনা হলেও বছরে পাঁচ শ টাকা খাজনা।

কিন্তু সে তো মামলা-মকদ্দমার কথা হুজুর।

ডিক্রী তো আমি পাবই, আর ডিক্রী হলে খরচাও পাব। সুতরাং লোকসান করতে যাবার কোন কারণ নেই আমার।

মহাজন চিন্তা করিয়া বলিল, আমি আপনাকে হাজার টাকা দেব, আর খাজনা ওই পাঁচ শ টাকা। অগ্রিম বরং আমি পাঁচ শ টাকা দিচ্ছি। চারদিন পর আসব আমি।

নিস্পৃহতার সহিত রায় বাঁ হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে বলিলেন, ভাল, এস।

লোকটা চলিয়া যাইতেই রায় বাহিরে আসিলেন। অহীন্দ্র তাঁহার অপেক্ষাতে বাহিরেই বসিয়া ছিল। অহীন্দ্রকে দেখিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। অহি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, আমার মা আপনার কাছে পাঠালেন।

তুমি রামেশ্বর চক্রবর্তীর ছেলে না ? রায়েরা চক্রবর্তীদের কখনও বাবু বলেন না।

হ্যাঁ।

হুঁ, চোখ আর চুল দেখেই চেনা যায়। রামেশ্বরের কোন্ ছেলে তুমি ? রায়ের সকল কথার মধ্যে তাচ্ছিল্যের একটি সুর তীক্ষ্ণ সূচিকার মত মানুষকে যেন বিদ্ধ করে। কিন্তু সমস্ত উপেক্ষা করিয়া হাসিয়া স্বচ্ছন্দে সরল ভঙ্গীতে অহি উত্তর দিল, আমি তাঁর ছোট ছেলে।

কি কর তুমি ? পড়, না পড়া ছেড়ে দিয়েছ ?

না, আমি ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি—শহরের স্কুলে।

রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ফার্স্ট ক্লাসে পড় তুমি ? কিন্তু বয়স যে তোমার অত্যন্ত কম ! বাঃ, বড় ভাল ছেলে তুমি ! তা তোমার বাপও যে খুব বুদ্ধিমান লোক ছিল। কিন্তু তোমার বড় ভাই, কি নাম তার ? সে তো শুনেছি পড়াশুনা কিছু করে নি। স্কুলে তো তার খারাপ ছেলে বলে অখ্যাতিই ছিল, মাস্টার বলেছিলেন আমাকে।

অহি স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আমার কথাগুলো একবার শুনে নিন।

হাসিয়া রায় বলিলেন, তুমি তো বলবে ঐ চরটার কথা ?

হ্যাঁ।

দেখ, ও-চরটা আমার। অবশ্য আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত। এই কথাই বলবে তোমার মাকে।

বেশ, তাই বলব। তবে মায়ের অনুরোধ ছিল, যেন প্রজাদের ওপর কোন অবিচার না হয়, সেইটে আপনি দেখবেন।

রায় এ কথার কোন জবাব দিলেন না। অহীন্দ্র আর অপেক্ষা না করিয়া গমনোদ্যত হইয়া বলিল, তা হলে আমি আসি।

সে কি ? একটু জল খেয়ে যাও।

না, জল খেয়েই বেরিয়েছি, চরের দিকটায় একটু বেড়াতে যাব।

রায় বলিলেন, শোন। তখন অহীন্দ্র কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। অহীন্দ্র দাঁড়াইল, রায় বলিলেন, চরের ওপারটায় শুনেছি বড় সাপের উপদ্রব। তোমার না যাওয়াই ভাল।

অহীন্দ্র সবিনয়ে বলিল, আচ্ছা, আমি ভেতরে যাব না।

৩

ইন্দ্র রায় সত্যই বলিয়াছিলেন, চরটা কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপে পরিপূর্ণ।

গ্রামের কোলেই কালিন্দী নদীর অগভীর জলস্রোত পার হইয়া খানিকটা বালি ও পলি-মাটিতে মিশানো তৃণহীন স্থান, পরেই আরম্ভ হইয়াছে চর। সমগ্র চরটা বেনাঘাস আর কাশের ঘন জঙ্গলে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহারই মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে—অসংখ্য প্রকারের কীট-পতঙ্গ আর সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মত ভয়ঙ্কর নানা ধরনের বিষধর সাপ।

প্রৌঢ় রংলাল মণ্ডল বলিল, এই তো ক বছর হল গো বাবু মশায়, একটা বাছুর কি রকম ছটকিয়ে গিয়ে পড়েছিল চরের উপর। বাস্, আর যায় কোথা, ইয়া এক পাহাড়ে চিতি—ধরলে পিছনের ঠ্যাঙে। আঃ, সে কি বাছুরটার চেঁচানি ! ব্যস্, বার কতক চেঁচানির পরই ধরলে পাক দিয়ে জড়িয়ে। দেখতে দেখতে বাছুরটা হয়ে গেল ময়দার নেচির মত লম্বা। কিন্তু কারু সাহস হল না যে এগিয়ে যাই।

অহীন্দ্র প্রশ্ন করিল, আচ্ছা আগে নাকি ওই চরের ওপরেই ছিল কালী নদী ?

হ্যাঁ গো। ঠিক ওই চরের মাঝখানে। নদীর ঘাট থেকে গেরাম ছিল একপো রাস্তার ওপর। বোশেখ মাসে দুপুরবেলায় নদীর ঘাটে আসতে পায়ে ফোস্কা পড়ে যেত।

তুমি দেখেছ ?

অহীন্দ্রের ছেলেমানুষিতে কৌতুক অনুভব করিয়াই যেন রংলাল বলিল, আই দেখেন, দাদাবাবু আবার বলেন কি দেখ। কালী নদীর ধারেই—ওই দেখেন, চরের পরই যেখানে চোরাবালি—ওইখানেই আমাদের পঁচিশ কাঠা আওয়াল জমি ছিল, তারপর ওই চর যেখানে

আরম্ভ হয়েছে—ওইইখানে ছিল গো-চর নদীর ওলা। ছেলেবেলায় আমি ওইখানে গরু চরিয়েছি। ওই জমিতে আমি নিজে লাঙল চষেছি। তখন আমাদের গরু ছিল কি মাশায়—এই হাতীর মত বলদ। আর রতন কামারের গড়া ফাল—একহাত মাটি একেবারে দু ফাঁক হয়ে যেত! আঃ! মাটিরই বা কি রঙ—একেবারে লাল—সেরাক!

বৃদ্ধ চাষী মনের আবেগে পুরাতন স্মৃতিকথা বলিয়া যায়, অহীন্দ্র কালী নদীর তটভূমিতে চরের প্রান্তভাগে বসিয়া চরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শুনিয়া যায়। বৃদ্ধ বলে, কালী নদীর একেবারে তটভূমিতে সে কি নধর কচি ঘাস গালিচার মত পুরু হইয়া থাকিত, সারা গ্রামের গরু খাইয়া শেষ করিতে পারিত না। তাহার পর ছিল তরির জমি। সে আমলে তুঁতপাতার চাষ ছিল একটা প্রধান চাষ। জবগাছের পাতার মত তুঁতের পাতা। চাষীরা বাড়িতে গুটিপোকা পালন করিত,—গুটিপোকার খাদ্য এই তুঁতপাতা। যে চাষী গুটিপোকা পালন করিত না, তুঁতগাছের চাষ করিত, তুঁতপাতা বিক্রয় করিয়া সেও দশ টাকা রোজগার করিত। তখন গ্রামেরই বা শোভা কি! বাবুরাই বা কি সব, এক-একজন দিকপাল যেন। ছাতি কি বুকের! রংলাল বলিল, আপনকার কত্তাবাবা, বাপ রে, বাপ রে, 'রংলাল' বলে হেঁকেছেন তো জান একেবারে খাঁচাছাড়া হয়ে যেত।

অহীন্দ্র চরের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, কোন্ বছর কালী প্রথম এ-কূল ভাঙল, তোমার মনে আছে!

পিতামহ-প্রপিতামহের ইতিহাস সে বহুবার শুনিয়াছে, আর ওই চরটাই তাহার মন অধিকার করিয়া আছে। নদীর বুকে নাকি ব-দ্বীপগুলি এবং নদী-সাগর-সঙ্গমের মুখে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া পলি জমিয়া জমিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, উঠিতেছে এবং উঠিবে। বাংলার নিম্নাংশটা গোটাই নাকি এমনই করিয়া জলতল হইতে উঠিয়াছে। কত প্রবালকীট, কত শুক্তি-শামুকের দেহ পলির স্তরে স্তরে চাপা পড়িয়া আছে! ভূগোলের মাস্টার কৃষ্ণবাবু কি চমৎকারই না কথাগুলি বলেন!

রংলাল বলিল, কালী তো আমাদের সামান্য নদী নয় দাদাবাবু, উনি হলেন সাক্ষাৎ যমের ভগ্নী। কবে থেকে যে উনি রায়হাটের কূল তলে তলে খেতে আরম্ভ করেছেন, তা কে বলবে বলেন! তবে উনি যে কালে হাত বাড়িয়েছেন, তখন আপনার রায়হাট উনি আর রাখবেন না। বললাম যে, যমের ভগ্নী উনি। বুঝলেন কালী যাকে নিলে, কার সাধ্য তাকে বাঁচায়! কত গেরাম যে উনি খেয়েছেন, তার আর ঠিক-ঠিকেনা নাই। ফি বছর দেখবে, কত চাল, কত কাঠ, কত গরু, কত মানুষ কালীর বানে ভেসে চলেছে যমের বাড়ি। একবার সাক্ষাৎ পেত্যক্ষ করেছি আমি। তখন আমার জোয়ান বয়েস; দেখলাম, একখানা ঘরের চালের ওপর বসে ভেসে যাচ্ছে একটি মেয়ে, কোলে তার কচি ছেলে। উঃ, কি তার কান্না, সে কান্নায় গাছপাথর কাঁদে দাদাবাবু! আমি মশাই ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমাদের সরু লোকো নিয়ে, সঙ্গে নিলাম কাছি। একে সোতের মুখে, তার ওপর কষে ঠেল মারলাম দাঁড়ের। সোঁ সোঁ করে গিয়ে পড়লায় চালের কাছে। আঃ, তখন মেয়েটির কি মুখের হাসি! সে বুঝল আমি বাঁচলাম।

মশায়, বলব কি, ঠিক সেই সময়েই উঠল একটি ঘুরনচাকি, আর বাস্, বোঁ ক'রে ঘুরপাক মেরে নিলে একবারে চালসুদ্ধ পেটের ভেতর ভরে। কলকল করে জল যেন ডেকে উঠল, বলব কি দাদাবাবু, ঠিক যেন খলখল করে হেসে উঠলেন কালী। সে হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া উদ্দেশে কালীকে প্রণাম করিল। অ্যাই, সেই বছরেই দেখলাম, কালী-মা এই কূল দিয়ে চলেছেন।

সে বলিল, সেই বৎসরেই শীতকালে দেখা গেল, কালীর অগভীর জলস্রোত ওপারের দিকে বালি ঠেলিয়া দিয়া রায়হাটের কোল ঘেঁষিয়া আসিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তার পর বৎসরের পর বৎসর ও-পাশে জমিতে আরম্ভ করিল বালি পড়িতে আর এদিক হইল গভীর। বর্ষায় যখন কালী হইত দুকূলপ্লাবী, তখন কিন্তু এপার হইতে ওপার পর্যন্ত জল ছাড়া কিছুই দেখা যাইত না। তখন ওপারটা ছিল ছয় মাস জল আর ছয় মাস বালির স্তূপ। তারপর প্রথমেই গ্রাস করিল এপারের গো-চারণের জন্য নির্দিষ্ট তৃণশ্যামল তটভূমিটুকু। ওপারে তখন হইতে বর্ষার শেষে বালির উপর পাতলা পলির স্তর জমিতে আরম্ভ করিল।

রংলাল বলিল, বুঝলেন দাদাবাবু, শুধু কি পলি ; রাজ্যের জিনিস—এই আপনার খড়কুটো ঘাসপাতা আর মরা মানুষ, গরু, ছাগল, তার উপর সাপ-ব্যাঙের তো সংখ্যা হয় না। এই, ওপারে যা খেতেন কালী, এসে উগরে দিতেন এই চরের ওপর। আর তার ওপর দিতেন মাটি আর বালি চাপা।

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ চাষীর মনে যেন দার্শনিকতার উচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিল, সে বলিল, কাল ঠিক যেন বালিকার মত খেলাঘর পাতিয়াছিল ওইখানে। বালিকার মত যেখানে যাহা পাইত, আনিয়া ওইখানে জড় করিয়া রাখিত। আর তার উপর চাপা দিত বালি আর পলি।

এই আমাদের মেয়েগুলো খেলে দেখেন না, ভিজে বালির ভেতর পা পুরে তার ওপর বালি চাপিয়ে চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে পা-টি বার করে নেয়, কেমন ঘর হয়! আবার মনে হয় লাথি মেরে—ভাঙে আর বলে, হাতের সুখে গড়লাম, আর পায়ের সুখে ভাঙলাম। কালীও আমাদের তাই—ভাঙতে যেমন, আর গড়তেও তেমন। উঃ, কত কী যে এসে জমা হত দাদাবাবু, শামুক-গুগলি-ঝিনুক সে-সব কত রকমের, বাহারে কি সব! খরার সময় সব সেঁতানি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত, তখন ছেলেমেয়েরা চরের ধারে ধারে সে-সব ঝিনুক কুড়োতে যেত। ছোট ছোট ঝিনুকে ঘামাচি মারিত সব পুটপাট করে। কেউ কেউ লক্ষ্মীবেদীতে বসিয়ে বসিয়ে আলপনার মত লতাপাতা তৈরি করত। তখন আপনার জলথল পড়লে খুদি খুদি ঘাস হত এই আপনার গরুর রোঁয়ার মত।

অহীন্দ্র আবার প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, তোমরা সব তখন এই চর কার তা মীমাংসা করে নাও নি কেন?

রংলাল অহীন্দ্রের নির্বুদ্ধিতায় হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, অ্যাই দেখেন, দাদাবাবু কি বলেন দেখেন। তখন উ চর নিয়ে লোকে করবে কি? এই এখানে খানিক খাল, চোরা-বালি, ওখানে খানিক বালির ঢিপি ; আর যে পোকার ধুম। ছোটলোকের মেয়েরা পর্যন্ত কাঠ-

কুটো কুড়োতে চরের ভেতর যেত না। বুঝলেন, খুদি খুদি পোকায় একেবারে অষ্টাঙ্গ ছেঁকে ধরত। তার আবার জ্বালা কি, ফুলে উঠত শরীর।

চৈত্র মাসের অপরাহ্ণ; সূর্য পশ্চিমাকাশে রক্তাভ হইয়া অস্তাচলের সমীপবর্তী হইতে চলিয়াছে। কালীর ওপারে রায়হাটে তটভূমিতে বড় বড় গাছ। শিমূলগাছই বেশী, শিমূলের নিঃশেষে পত্রহীন শাখা-প্রশাখার সর্বাঙ্গ ভরিয়া রক্ত-রাঙা ফুলের সমারোহ। পালদে গাছগুলিও তাই, পত্ররিক্ত এবং শিমূলের চেয়েও গাঢ় রক্তবর্ণের পুষ্পসম্ভারে সমৃদ্ধ। বসন্তের বাতাসে কোথা হইতে একটি অতি মধুর গন্ধ আসিয়া শ্বাসযন্ত্র ভরিয়া দিল।

অহীন্দ্র বার বার গন্ধটি গ্রহণ করিয়া বলিল, কি ফুলের গন্ধ বল তো ?

নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত রংলাল বলিল, উ ওই চরের মধ্যে কোন ফুল-টুল ফুটে থাকবে। ওর কি কেউ নাম জানে। কোথা থেকে কি এনে কালী যে লাগান ওখানে, ও এক ওই কালীই জানেন। বুঝলেন, এই প্রথম বার যে-বার ঘাস বেশ ভাল রকমের হল, আমরা গরু চরাব বলে দেখতে এসেছিলাম।

বলিতে বলিতে রংলালের মুখে সেই দিনের সেই বিস্ময় ফুটিয়া উঠে, সে বলিয়া যায়, কত রকমের নাম-না-জানা চোখে-না-দেখা ছোট ছোট লতা-গাছ-ঘাস ওই চরের উপর তখন যে জন্মিয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আর ঘাসে পা দিলেই লাফাইয়া উঠিত ফড়িং-জাতীয় শত শত কীট, উপরে উড়িয়া বেড়াইত হাজারো রকমের প্রজাপতি-ফড়িং। তার পর জন্মিয়াছে ওই বেনাঘাস আর কাশগুল্ম। কিন্তু উহার ভিতরে ভিতরে কত যে গাছ, কত যে লতা আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহার সংখ্যা কি কেহ জানে ? আর ওই সব মধুগন্ধী গাছের গোড়ায় বাসা বাঁধিয়াছে কত বিষধর—! বলিতে বলিতে রংলাল শিহরিয়া উঠিল, বলিল, খবরদার দাদাবাবু, কখনও যেন গন্ধের লোভে ভেতরে ঢুকবেন না। বরং ও সাঁওতাল বেটাদের বলবেন, ওরা ঠিক জানে সব, কোথা কি আছে। ফুলের ওপর ওদের খুব ঝোঁক তো।

অকস্মাৎ বৃদ্ধ রংলাল মহা উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বলিল, যাবেন দাদাবাবু সাঁওতাল-পাড়ায় ? আঁ-হা-হা, কি ফসলই সব লাগিয়েছে, অঃ, আলু হয়েছে কি, ইয়া মোটা মোটা! বরবটি শুঁটি আপনার আধ হাত করে লম্বা! সাধে কি আর গাঁসুদ্ধ নোক হঠাৎ ক্ষেপে উঠল দাদাবাবু!

অহি আশ্চর্য হইয়া বলিল, সাঁওতাল কোথায় ? ওরা তো থাকে অনেক দূরে পাহাড়ের ওপর।

ঘাড় নাড়িয়া রংলাল বলিল, অ্যাই দেখেন, আপনি কিছুই জানেন না। চরে যে সাঁওতাল বসেছে গো ? উই দেখেন, ধোঁয়া উঠছে না! বেটারা সব রান্না চড়িয়েছে। ওরাই তো চোখ ফুটিয়ে দিলে গো। আমাদের বাঙালী জাতের সাধ্যি কি, এই বন কেটে আর ওই সব জন্তু-জানোয়ার মেরে এখানে চাষ করে! ওরা কিন্তু ঠিক বেছে বেছে আসল জায়গাটি এসে ধরেছে। কোথা থেকে এল আর কবে এল—কেউ জানে না, ওরা আপনিই এসেছে, আপন মগজেই

খানিকটা জায়গা-জমি সাফ করে বসেছে, চাষ করছে, এইবার সব ঘর তুলেছে। গাঁয়ের লোক তো জানলে, ওখানে মাঝি বসেছে, চাষ হচ্ছে। সেই দেখেই তো চোখ ফুটলো সব। বাস, আর যায় কোথা, লেগে গেল ফাটাফাটি! জমিদার বলছে চর আমাদের; আমরা চাষীরা বলছি, ইপারে আমাদের জমি গিয়ে ওপারে চর উঠেছে, চর আমাদের। আসল ব্যাপার হল—ওই সাঁওতালরা ওখানে সোনা ফলাচ্ছে বুঝলেন?

অহীন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিল, চল, যাব। কোন্ দিকে?

ওই দেখেন, বেনার ঝোপ থেকে মাঝিনদের দল বেরিয়েছে নদীতে জল আনতে।

অহীন্দ্র দেখিল, গাঢ় সবুজ বেনাবনের মধ্য হইতে বাহির হইতেছে আট-দশটি কালো মেয়ের সারি, মাথায় কলসী লইয়া একটানা সুরে গান গাহিতে গাহিতে তাহারা নদীর দিকে চলিয়াছে।

দুই পাশে এক বুক উঁচু ঘন কাশ ও বেনাঘাসের জঙ্গল। তাহারই মধ্য দিয়া স্বল্পপরিসর পরিচ্ছন্ন একটি পথ সর্পিল ভঙ্গিতে চরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। ঘাসের বনের মধ্যে নানা ধরনের অসংখ্য লতা ও গাছ জন্মিয়াছে; গুচ্ছ গুচ্ছ বেনাঘাস অবলম্বন করিয়া লতাগুলি লতাইয়া লতাইয়া ঘাসের মাথায় যেন আচ্ছাদনী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে! সাপের ফণার মত উদ্যত বঙ্কিম ডগাগুলি স্থানে স্থানে একেবারে পথের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, মানুষের গায়ে ঠেকিয়া সেগুলি দোল খায়। মাঝে মাঝে চৈত্রের উতলা বাতাস আসিয়া ঘাসের জঙ্গলের এক প্রান্ত পর্যন্ত অবনত করিয়া দিয়া যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র সরসর সনসন শব্দ।

রংলাল একটা লতার ডাঁটা টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া বলিল, অঃ, অনন্তমূল হয়েছে দেখ দেখি! কত যে লতা আছে!

অহীন্দ্র এই পথটির পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া সাঁওতালদের কথা ভাবিতেছিল—এমন কালো জাতি, অথচ কি মসৃণ পরিচ্ছন্নতা ইহাদের জীবনে! কোথায় যেন বনান্তরালে কোলাহল শুনা যাইতেছে! চারিদিকে চাহিয়া অহীন্দ্র দেখিল, একেবারে ডানদিকে কতকগুলি কুঁড়ে-ঘরের মাথা জাগিয়া আছে। পথে একটা বাঁক পার হইয়াই সহসা যেন তাহারা পল্লীর মধ্যে আসিয়া পড়িল।

ঘাসের জঙ্গল অতি নিপুণভাবে পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া তাহারই মধ্যে দশ-বারো ঘর আদিম অর্ধ-উলঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ মানুষ বসতি বাঁধিয়াছে। ঘর এখনও গড়িয়া উঠে নাই, সাময়িকভাবে চালা বাঁধিয়া, চারিদিকে বেড়া দিয়া তাহার উপর মাটির প্রলেপ লাগাইয়া তাহারই মধ্যে এখন তাহারা বাস করিতেছে। আশেপাশে মাটির দেওয়াল দিয়া স্থায়ী ঘরের পত্তনও শুরু হইয়াছে। প্রত্যেক ঘরের সম্মুখে গোবর ও মাটি দিয়া নিকানো পরিচ্ছন্ন উঠান। উঠানের পাশে পৃথক্ পৃথক্ আঁটিতে বাঁধা নানা প্রকার শস্যের বোঝা। বরবটির লতা, আলুগুলি ছাড়াইয়া লইয়া সেই গাছগুলি, মুসুরির ঝাড়, ছোলার ঝাড় সবই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রক্ষিত; দেখিয়া অহীন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেল।

রংলাল ডাকিয়া বলিল, কই, মোড়ল মাঝি কই রে? কে এসেছে দেখ!

কে বেটে?—তু কে বেটিস?—বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিল এক কৃষ্ণকায় সচল প্রস্তরখণ্ড। আকৃতির চেয়ে আকারটাই তাহার বড় এবং সেইটাই চোখে পড়িয়া মানুষকে বিস্মিত করিয়া দেয়। পেশীর পুষ্টিতে এবং দৃঢ়তা ও বিপুলতায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেন খর্ব হইয়া গিয়াছে; লোকটি সবিস্ময়ে উগ্র-গৌরবর্ণের কৃশকায় দীর্ঘতনু বালকটিকে দেখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রংলাল বলিল, তোর তো অনেক বয়স হল, তোদের রাঙাঠাকুরের নাম জানিস্? তোদের সাঁওতালী হাঙ্গামাব সময়—

রংলালকে আর বলিতে হইল না, বিশাল বিন্ধ্যপর্বত যেন অগস্ত্যের চরণে সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

রংলাল বলিল, ইনি তাঁর নাতি—ছেলের ছেলে, বেটাব বেটা।

মাঝি আপন ভাষায় ব্যস্তভাবে আদেশ করিল, চৌপায়া নিয়ে আয়, শিগ্‌গির!

ছোট্ট টুলের আকাবে দড়ি দিয়া বোনা বসিবার আসনে অহীন্দ্রকে বসাইয়া মাঝি তাহার সম্মুখে মাটির উপর উবু হইয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া বসিয়া অহীন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে বলিল, হুঁ ঠিক সেই পারা, তেমুনি মুখ, তেমুনি আগুনের পারা রঙ, তেমুনি চোখ! হুঁ, ঠিক বেটে, ঠিক বলেছিস তু মোড়ল।

রংলাল হাসিয়া বলিল, তুই তাকে দেখেছিস মাঝি?

হুঁ, দেখলাম বৈকি গো। শাল-জঙ্গলে মাদল বাজছিলো, হাঁড়িয়া খাইছিলো সব বড় বড় মাঝিরা, আমরা তখন সব ছোট বেটে; দেখলাম সি, সেই আগুনের আলোতে রাঙাঠাকুর এল।

অহীন্দ্র আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, তোমার কত বয়েস হবে মাঝি?

অনেক চিন্তা করিয়া মাঝি বলিল, সি অনেক হল বৈকি গো, তা তুর দুকুড়ি হবে।

রংলাল হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, ওদের হিসেব অমনই বটে। তা ওর বয়েস পঁচাত্তর আশি হবে দাদাবাবু।

পঁচাত্তর-আশি! অহীন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল, এখনও এই বজ্রের মত শক্তিশালী দেহ! ইতিমধ্যে পাড়ার যত সাঁওতাল এবং ছেলেমেয়ে অহীন্দ্রের চারিপাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিল। পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, রাঙাঠাকুরের বেটার বেটা আসিয়াছেন, আর তিনি নাকি ঠিক রাঙাঠাকুরেরই মত দেখিতে—আগুনের মত গায়ের রঙ! ভিড়ের সম্মুখেই ছিল মেয়েদের দল। কষ্টিপাথরের খোদাই-করা মূর্তির মত দেহ, তেমনই নিটোল এবং দৃঢ় তৈলমসৃণ কষ্টির মত উজ্জ্বল কালো। পরনে মোটা খাটো কাপড়, মাথার চুলে তেল দিয়া পরিপাটী করিয়া আঁচড়াইয়া এলোখোঁপা বাঁধিয়াছে, সিঁথি উহারা কাটে না, কানে খোঁপায় নানা ধরনের পাতা-সমেত সদ্যফোটা বনফুলের স্তবক। অহীন্দ্র অনুভব করিল, সেই গন্ধ এখানে যেন বেশ নিবিড় হইয়া উঠিতেছে।

সে প্রশ্ন করিল, এ কোন্ ফুলের গন্ধ মাঝি ?

মাঝি মেয়েদের মুখের দিকে চাহিল। চার-পাঁচজনে কলরব করিয়া কি বলিয়া উঠিয়া আপন আপন খোঁপা হইতে ফুলের স্তবক খুলিয়া ফেলিল। অহীন্দ্র দেখিল, লবঙ্গের মত ক্ষুদ্র আকারের ফুল, একটি স্তবকে কদম্বকেশরের মত গোল হইয়া অসংখ্য ফুটিয়া আছে। কিন্তু মোড়ল মাঝি গম্ভীর ভাবে কি বলিল। মেয়েগুলি ফুলের স্তবক আবার খোঁপায় গুঁজিয়া সারি বাঁধিয়া ওই দমকা বাতাসের মত বেনাবন ঠেলিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

রংলাল বলিল, কি হ'ল ? কোথা গেল সব ?

ফুল আনতে, রাঙাবাবুর লেগে।

কেনে, ওই ফুল দিলেই তো হ'ত।

ধ্যেৎ, রাঙাঠাকুরের লাতিকে ওই ফুল দিতে আছে ? তুরা দিস ?

অহীন্দ্র বলিল, না গেলেই হ'ত মাঝি, কত সাপ আছে চরে। নাই ?

তাচ্ছিল্যের সহিত মাঝি বলিল, উ সব সরে যাবে, কুন্ দিকে পালাবে তার ঠিক নাই।

অহীন্দ্র বলিল, এখানে নাকি খুব বড় বড় সাপ আছে ?

অহীন্দ্রের কথাকে ঢাকিয়া দিয়া মেয়ের ও ছেলের দল কলরব করিয়া উঠিল। মাঝি হাসিয়া বলিল, আজই একটা মেরেছি আমরা, দেখবি বাবু ? ইয়া চিতি।

সোৎসাহে আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়া অহীন্দ্র বলিল, কোথায় ? কই ? সঙ্গে সঙ্গে পরমোৎসাহে মাঝির দল আগাইয়া চলিল, সর্বাগ্রে ছেলেমেয়েরা যেন নাচিয়া চলিয়াছে। পল্লীর এক প্রান্তে এক বিশাল অজগর ক্ষতবিক্ষত দেহে মরিয়া তাল পাকাইয়া পড়িয়া আছে চিত্রিত মাংসস্তূপের মত। অহীন্দ্র ও রংলাল উভয়েই শিহরিয়া উঠিল। অহীন্দ্র প্রশ্ন করিল, কোথায় ছিল ?

মাঝি পরম উৎসাহভরে বিকৃত ভাষায় বকিয়া গেল অনেক, সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা নাড়িবার কি তাহার বিচিত্র ভঙ্গী! মোটমাট ঘটনাটা ঘটিয়াছিল এই—একটা নিতান্ত কচি ছাগলের ছানা, আপনার মনেই নাকি লাফাইয়া বেনাবনের কোল ঘেঁষিয়া নাচিয়া ফিরিতেছিল। নিকটেই একজন মাঝি বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল, আর কাছে ছিল তাহার কুকুর। কুকুরটা সহসা সভয়ে গর্জন করিয়া উঠিতেই মাঝি তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল, সর্বনাশ, সাপ বেনাবন হইতে হাতখানেক মুখ বাহির করিয়া নিমেষহীন লোলুপ দৃষ্টিতে দেখিতেছে ওই নর্তনরত ছাগশিশুটিকে। সাঁওতালের ছেলে বাঁশীটি রাখিয়া দিয়া তুলিয়া লইল ধনুক আর কাঁড় তীর। তারপর অব্যর্থ লক্ষ্যে সাপের মাথাটাই বিঁধিয়া দিল একেবারে মাটির সঙ্গে; তারপর চীৎকার করিয়া ডাকিল পাড়ার লোককে। তখন বিদ্ধমস্তক অজগর দীর্ঘ নমনীয় দেহ আছড়াইয়া ঘাসের বনে যেন তুফান তুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু পাঁচ-সাতটা ধনুক হইতে সুতীক্ষ্ণ শরবর্ষণের মুখে সে বীর্য কতক্ষণ!

সাপ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিতেই একটি প্রৌঢ় সাঁওতাল-রমণী একটি বাটিতে সদ্যদোহা দুধ আনিয়া নামাইয়া দিল, দুধের উপর ফেনা তখনও ভাঙে নাই। মেয়েটি সম্ভ্রম করিয়া বলিল, বাবু তুমি খান।

অহীন্দ্র হাসিয়া ফেলিল। মাঝি বলিল, ই আমার মাঝিন বেটে বাবু! লে, গড় কর্ রাঙাবাবুকে—আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতি।

রংলাল গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছিল, অকস্মাৎ আক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, অ্যাঁ, একেই বলে ইঁদুরে গর্ত করে, সাপে ভোগ করে।

দুধের বাটিটা নামাইয়া দিয়া অহীন্দ্র বলিল, কেন?

ম্লান হাসি হাসিয়া রংলাল বলিল, কেন আবার, চর উঠল নদীতে, সাপখোপের ভয়ে কেউ ই-দিক আসত না। মাঝিরা এল, সাফ করছে, চাষ করছে; উ-দিকে জমিদার সাজছে লাঠি নিয়ে।—কি? না, চর আমাদের। আমরা যত সব চাষী-প্রজা বলছি, চর আমাদের। এর পর মাঝিদিগে তাড়িয়ে দিয়ে সবাই বসবে জেঁকে।

মাঝি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কেনে, আমরাও খাজনা দিব। তাড়াবে কেনে আমাদিগে?

রংলাল বলিল, তাই শুধো গা গিয়ে বাবুদিগে। আর খাজনা দিবি কাকে? সবাই বলবে, আমাকে দে ষোল-আনা খাজনা।

কেনে, আমরা খাজনা দিব আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতিকে—এই রাঙাবাবুকে।

অহীন্দ্র বলিল, না না মাঝি, চর যদি আমাদের না হয় তো আমাকে খাজনা দিলে হবে কেন? যার চর হবে, তাকেই খাজনা দেবে তোমরা।

তবে আমরা তুকেই খাজনা দিব, যাকে দিতে হয় তু দিস।

রংলাল হুঁশিয়ার লোক, প্রবীণ চাষী, ভূমিসংক্রান্ত আইন-কানুন সে অনেকটাই বোঝে, আর এও সে বোঝে যে, চরের উপর চক্রবর্তী-বাড়ির স্বত্ব যদি কোনরূপে সাব্যস্ত হয়, তবে অন্য বাড়ির মত অন্যায়-অবিচার হইবে না, তাহাদেরও অনেক আশা থাকিবে। অন্তত মায়ের কথার কখনও খেলাপ হয় না। সে অহীন্দ্রের গা টিপিয়া বলিল, বাবু ছেলেমানুষ, উনি জানেন না মাঝি। চর ওঁদেরই বটে।

মাঝি বলিল, আমরা সোবাই বলব, আমাদের রাঙাবাবুর চর।

কথাটা কিন্তু চাপা পড়িয়া গেল, সেই মেয়ে কয়টি যেমন ছুটিতে ছুটিতে গিয়াছিল, তেমনি ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিয়া রাঙাবাবুর সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের সকলেরই কোঁচড়ভরা ওই ফুলের স্তবক। একে একে তাহারা আঁচল উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল ফুলের রাশি। অতি সুমধুর গন্ধে স্থানটার বায়ুস্তর পর্যন্ত আমোদিত হইয়া উঠিল।

মাঝি একটি দীর্ঘাঙ্গী কিশোরীকে দেখাইয়া বলিল, এই দেখ রাঙাবাবু, ই আমার লাতিন বেটে! ওই যি আজ সাপ মেরেছে, উয়ার সাথে ইয়ার বিয়া হবে।

লজ্জাকুণ্ঠাহীন অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে মেয়েটি তাহারই দিকে চাহিয়া ছিল, চাহিয়াই রহিল। অহীন্দ্র বলিল, আজ যাই মাঝি।

মেয়েরা সকলে মিলিয়া কলরব করিয়া কি বলিয়া উঠিল। মাঝি হাসিয়া বলিল, মেয়েগুলা বুলছে, উয়ারা নাচবে সব, তুকে দেখতে হবে।

কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেল যে মাঝি।

মাঝি বলিল, মশাল জেলে আমি তুকে কাঁধে করে রেখে আসব।

অহীন্দ্র আর 'না' বলিতে পারিল না। এমন সুন্দর ইহাদের নাচ, আর এত সুন্দর ইহাদের একটানা সুরের সুকণ্ঠের গান যে তাহা দেখিবার ও শুনিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। সে বলিল, তবে একটু শিগ্‌গির মাঝি।

মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে কলরব করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল, সিরিং সিরিং অর্থাৎ গান গান। মরং বাবু রাঙাবাবু, অর্থাৎ তাদের মালিক রাজা রাঙাবাবু দেখিবেন।

মাদল বাজিতে লাগিল—ধিতাং ধিতাং, বাঁশের বাঁশীতে গানের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। অর্ধচন্দ্রাকারে রাঙাবাবুকে বেষ্টন করিয়া বসন্ত বাতাসে দোলার মত হিল্লোলিত দেহে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল সাঁওতাল তরুণীরা, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীর সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান। বৃদ্ধ মাঝি বসিয়া ছিল অহীন্দ্রের পাশে, অহীন্দ্র তাহাকে প্রশ্ন করিল, গানে কি বলছে মাঝি?

বলছে উয়ারা, রাজার আমাদের বিয়া হবে; তাতেই রাণী সাজ ক'রে বসে আছে, রাজা তাকে লাল জবাফুল এনে দিবে।

পরক্ষণেই অশীতিপর বৃদ্ধ প্রায় লাফ দিয়া উঠিয়া একটা মাদল লইয়া বাদক পুরুষদের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল।

* * *

রাত্রি প্রায় আটটার সময়, রায়বাবুদের কাছারীর সম্মুখ দিয়া কাহারা যাইতেছিল মশালের আলো জ্বালাইয়া। মশাল একালে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। ইন্দ্র রায় গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কে যায়?

শুষ্ক বেনাঘাসের আঁটি বাঁধিয়া তাহাতে মহুয়ার তেল দিয়া জ্বালাইয়া বৃদ্ধ মাঝি তাহাদের রাঙাবাবুকে পৌঁছাইয়া দিতে চলিয়াছিল। সে উত্তর দিল, আমি বেটে, উ পারের চরের কমলা মাঝি।

বিস্মিত হইয়া রায় প্রশ্ন করিলেন, এত রাত্রে এমন আলো জেলে কোথায় যাবি তোরা?

আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতি মশায়, আমাদের রাঙাবাবুকে বাড়িতে দিতে যেছি গো!

রাঙাঠাকুর! সোমেশ্বর চক্রবর্তী! রায়ের মনে পড়িয়া গেল অতীত কাহিনী।

৪

সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া লক্ষ্মীর ঘরে গৃহলক্ষ্মীর সিংহাসনের সম্মুখে পিলসুজের উপর প্রদীপটি রাখিয়া সুনীতি গলায় আঁচল জড়াইয়া প্রণাম করিলেন। গনগনে আগুন ভরিয়া ঝি ধূপদানি হাতে ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। ধূপদানিটি তাহার হাত হইতে লইয়া সুনীতি আগুনের

উপর ধূপ ছিটাইয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ধূপগন্ধে ঘরখানি ভরিয়া উঠিল।

ঘরের দরজা বন্ধ করিতে করিতে সুনীতি বলিলেন, তুলসীমন্দিরে আর ঠাকুরবাড়িতে প্রদীপ আজ বামুনঠাকরুনকে দিতে বল্ মানদা। আমার বড্ড দেরি হয়ে গেল, বাবু হয়ত এখুনি রেগে উঠবেন।

তাড়াতাড়ি তিলের তেলের বোতলটি লইয়া তিনি উপরে রামেশ্বরের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। রামেশ্বরের দরজা জানালা অহরহ বন্ধ থাকে, দিনরাত্রিই ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলে, সে প্রদীপে পোড়ে তিলের তেল। উজ্জ্বল আলো তাঁহার চোখে একেবারে সহ্য হয় না। আলোর মধ্যে তিনি নাকি একেবারে দেখিতে পান না। অন্ধকারে বরং পান। তেলের বোতল হাতে সুনীতি সন্তর্পণে দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রকাণ্ড বড় ঘরখানির মধ্যে ক্ষীণ শিখায় একটি মাত্র প্রদীপের আলো জ্বলিতেছে। এত বড় ঘরের সর্বাংশে তাহার জ্যোতি প্রসারিত হইতে পারে নাই, চারি কোণের অন্ধকার অসীমের মত সীমাবদ্ধ জ্যোতির্মণ্ডলকে যেন ঘিরিয়া রহিয়াছে। আলো-অন্ধকারে সে যেন এক রহস্যলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারই মধ্যে ঘরের মধ্যস্থলে সে-আমলের প্রকাণ্ড পালঙ্কের উপর নিস্তব্ধ হইয়া রামেশ্বর বসিয়া আছেন।

ঘরের দরজা খুলিতেই রামেশ্বর অতি ধীরে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন, সুনীতি ?

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিতে দিতে সুনীতি বলিলেন, হ্যাঁ আমি। তেল দিয়ে দিই প্রদীপে। জানালাগুলো খুলে দিই, সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

দাও।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে ঘরের জানালা খোলা হয়। কখনও কখনও রামেশ্বর তখন খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বহির্জগতের সহিত পরিচয় করেন। জানালা খুলিয়া দিতেই বন্ধ ঘরে বাহিরের বাতাস অপেক্ষাকৃত জোরেই প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপটি নিভিয়া গেল। রামেশ্বর বাহিরের নির্মল শীতল বাতাসে বুক ভরিয়া নিঃশ্বাস লইয়া বলিলেন, আঃ!

সুনীতি বলিলেন, আলোটা নিবে গেল যে।

রামেশ্বর বলিলেন, বাতাসে চমৎকার ফুলের গন্ধ আসছে। এটা কি মাস বল তো ?

চৈত্র মাস। তারপর চিন্তিতভাবে সুনীতি আবার বলিলেন, প্রদীপ তো এ বাতাসে থাকবে না।

রামেশ্বর বলিতেছেন, 'ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।'

বাতি দিয়ে একটা শেজ জ্বেলে দেব ?

শেজ ?

হ্যাঁ, বাতির আলোও তো ঠাণ্ডা। এ বাতাসে প্রদীপ থাকবে না।

তাই দাও।—বলিয়া আবার আপন মনে আবৃত্তি করিলেন, 'মধুকরনিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে।'

ঘরে শেজ ও বাতি ঠিক করাই থাকে, মধ্যে মধ্যে জ্বালিতেও হয়। বাতাসের জন্যও হয়, আবার মধ্যে মধ্যে রামেশ্বরবাবুর ইচ্ছাও হয়। সুনীতি বাতি জ্বালিয়া, শেজের মধ্যে বসাইয়া দিলেন, তারপর কতকগুলি ধূপশলাকা জ্বালিয়া দিয়া বলিলেন, কাপড় ছাড়, সন্ধ্যের জায়গা ক'রে দিই।

হুঁ। করতে হবে বৈকি। না করলেই পাপ। করলে কিছুই না—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না।

সুনীতি বাধা দিয়া বলিলেন, ও কি বলছ? রামেশ্বর মধ্যে মধ্যে এমনই করিয়া বকিতে আরম্ভ করেন, তখন বাধা দিতে হয়। অন্যথায় সেই একটা কথাই তিনি কিছুক্ষণ ধরিয়া এমনই করিয়া বকিয়া যান।

বাধা পাইয়া রামেশ্বর চুপ করিলেন। সুনীতি আবার বলিলেন, কাপড় ছাড়, সন্ধ্যে কর। আর অমন করে বকছ কেন?

না না না, আমি বকি নি তো। বকব কেন? কই, কাপড় দাও। রামেশ্বর অতি সন্তর্পণে বিছানা হইতে নামিয়া আসিলেন। স্বামীকে সন্ধ্যা করিতে বসাইয়া দিয়া সুনীতি বলিলেন, সন্ধ্যে করে ফেল আমি দুধ গরম করে নিয়ে আসি।

সুনীতি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, রামেশ্বর সন্ধ্যা শেষ করিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছেন। সুনীতিকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন, কি বাজছে বল তো?

দূরে ওই চরটার উপরে তখন অহীন্দ্রকে ঘিরিয়া সাঁওতালেরা মাদল ও বাঁশী বাজাইতেছিল, মেয়েরা নাচিতেছিল—তাহারই শব্দ। সুনীতি বলিলেন, সাঁওতালরা মাদল বাজাচ্ছে।

বাঁশী শুনছ, বাঁশী?

হ্যাঁ। সন্ধ্যের সময় তো। মাঝিরা মাদল বাজাচ্ছে, বাঁশী বাজাচ্ছে, মেয়েরা নাচছে। ওদের ওই আনন্দ।

তুমি কবিরাজগোস্বামী শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ পড়েছ?—

"করতলতালতরলবলয়াবলি-কলিত কলস্বন বংশে।
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশংসে।"

যমুনাপুলিনে বংশীধ্বনির সঙ্গে তাল দিয়ে গোপবালারাও একদিন নাচত। গীতগোবিন্দ তুমি পড় নি?

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সুনীতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুমি কখনও পড়ে শোনাও নি, আমি তো সংস্কৃত জানি না।

আজ তোমাকে শোনাব, আমার মুখস্থ আছে।

বেশ, এখন দুধটা খেয়ে নাও দেখি। বলিয়া সম্মুখে দুধের বাটি আগাইয়া দিলেন। পান করিয়া বাটি সুনীতির হাতে দিতেই সুনীতি জলের গ্লাস ও গামছা স্বামীর সম্মুখে ধরিলেন। হাতমুখ ধুইয়া রামেশ্বর আবার বলিলেন, কবিরাজগোস্বামী বলেছেন কি জান?—

"যদি হরি স্মরণে সরসং মনো যদি বিলাস কলাসু কুতূহলং।

মধুর কোমল কান্ত পদবলীং শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্ ॥"

শোনাব, তোমাকে আজ শোনাব।

আনন্দে সুনীতির বুকখানি যেন ভরিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, তাহ'লে তাড়াতাড়ি আমি কাজগুলো সেরে আসি। পরমুহূর্তেই আবার যেন স্তিমিত হইয়া গেলেন—কতক্ষণ, এ রূপ কতক্ষণের জন্য?

হ্যাঁ, এস। বাতাস আজ বড মিষ্টি বইছে। বসন্তকাল কিনা। আচ্ছা সুনীতি, দোল-পূর্ণিমা চলে গেছে?

হ্যাঁ। আজ কৃষ্ণপক্ষেব সপ্তমী।

কই, আমাকে তো আবীর দিলে না?

সুনীতি অপরাধিনীর মত নীরবে দাঁডাইয়া রহিলেন।

এনো, এনো, আবীর থাকে তো নিয়ে এস এক মুঠো আজ।

সুনীতি এ কথারও উত্তর দিলেন না, শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

আর শোন। জয়দেব সরস্বতীর পদাবলী যদি শুনবে, তবে অতি সুন্দর একখানি কাপড় পরবে। সুন্দর করে বেণী রচনা করবে। তার পর রসরাজের মূর্তি হৃদয়ে স্মরণ করে লীলা-বিভোর মন নিয়ে শুনতে হবে।

সুনীতি ভাল করিয়াই জানেন যে, ফিরিয়া আসিতে আসিতে স্বামীর এ রূপ আর থাকিবে না। কিন্তু তিনি কখনও স্বামীব কথার প্রতিবাদ করেন না, ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, তাই আসব।

চুলটা যেন বেঁধে ফেলো।

বাঁধব।

হ্যাঁ। ঘরে আতর নেই—আতর?

আছে, তাও আনব।

আমায় এখুনি একটু দিতে পার?

দিচ্ছি। সুনীতি সঙ্গে সঙ্গে বাক্স খুলিয়া একটি সুদৃশ্য আতরদান বাহির করিলেন। তুলায় আতর মাখাইয়া স্বামীর হাতে দিয়া ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য ফিরিলেন। কিন্তু রামেশ্বর ডাকিলেন, শোন।

সুনীতি বলিলেন, বল।

ওই আলোর সম্মুখে তুমি একবার দাঁড়াও তো। অন্ধকারের মধ্যে আমার বাস, অনেক দিন তোমাকে যেন আমি ভাল করে দেখি নি।

সুনীতি স্থিরভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইলেন। রামেশ্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দৃষ্টি যাওয়ার চেয়ে মানুষের বড দুঃখ আর নেই। ভীষণ পাপে, অভিসম্পাত না হ'লে মানুষের চোখ যায় না।

সুনীতি ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, কিন্তু চোখ তো তোমার খারাপ হয় নি, তিন-চার বার

ডাক্তার দেখানো হ'ল, তাঁরা তো তা বলেন না।

তারস্বরে প্রতিবাদ করিয়া রামেশ্বর বলিলেন, জানে না, তারা কিছুই জানে না, তুমিও জান না। দিনের আলোর মধ্যে চোখ আমার আপনি বন্ধ হয়ে যায়, কে যেন ধরে চোখে ছুঁচ ফুটিয়ে দেয়। নিবিয়ে দাও সুনীতি, ও আলোটা নিবিয়ে দাও, নয় আড়ালে সরিয়ে দাও। আঃ!

আলোটা অন্তরালে সরাইয়া দিয়া সুনীতি নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সে আমলের চকমিলানো বাড়ি, নীচের তলায় চারিদিকেই ঘর, একেবারে অবরুদ্ধ বলিলেই হয়। বাহিরে এমন মিষ্ট বাতাস, অথচ এ-বাড়ির নীচের তলায় বেশ গরম পড়িয়া গিয়াছে। স্বামীর জন্য খাবার সুনীতি নিজের হাতেই প্রস্তুত করেন, খাবার প্রস্তুত করিতে করিতে তিনি ঘামিয়া যেন স্নান করিয়া উঠিলেন।

পাচিকা বলিল, ওরে বাপ রে, মা যেন ঘেমে নেয়ে উঠলেন একেবারে! আমি যে এতক্ষণ আগুনের আঁচে রয়েছি, আমি তো এত ঘামি নি!

মানদা ঝি বলিল, পাখাটা নিয়ে আসি আমি।

অত্যন্ত লজ্জিত এবং কুণ্ঠিতভাবে সুনীতি বলিলেন, না রে, না, থাক। এই তো হয়ে গেছে আমার। এমন ভাবে ঘামিয়া ওঠাটা তাদের কাছেও অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছিল। তাঁহার খাবার তৈয়ারিও শেষ হইয়াছিল, তিনি খাবারগুলি গুছাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। খাবার রাখিয়া দিয়া বলিলেন, দু-বালতি জল তুলে দে তো মানদা, গা ধুয়ে ফেলি একটু।

মানদা পুরানো ঝি, সে বলিল, এই যে সন্ধ্যায় গা ধুলেন মা। আবার গা ধোবেন কি গো, এই দো-রসার সময়? ভিজে গামছা দিয়ে গা মুছে ফেলুন বরং।

না রে, সমস্ত শরীর যেন ঘিনঘিন করছে আমার। তার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আমার কি কখনও মরণ হয় রে মানী, তাহ'লে সংসারে ভুগবে কে?

মানদা আর কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি জল তুলিয়া গামছা আনিয়া সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিল। আপনার হাত দুইখানি নাকের কাছে আনিয়া শুঁকিয়া সুনীতি বলিলেন, নাঃ, ধোঁয়ার গন্ধ, সাবান না দিলে যাবে না। তুই কার কাছে ঘুঁটে নিস মানদা? ঘুঁটে ভিজে থাকে।

বলিতে বলিতে তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সাবান বাহির করিয়া লইয়াও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তোলা কাপড় একখানা বাহির করিলে হয়, কিন্তু—। আবার তিনি এক গা ঘামিয়া উঠিলেন। মনের মধ্যে একটা দারুণ সঙ্কোচ তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল।

মানদা ডাকিল, মা, আসুন।

সুনীতি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, বাক্স খুলে দেখলাম, কাপড়গুলো সব পুরনো হয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম, কি হবে রেখে, পরে ফেলি। কিন্তু তোরা হাসবি ব'লে আর পারলাম না।

মানদা ও পাচিকা একসঙ্গে দুইজনেই হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল, না মা, না, আপনি পরুন, একটু ভাল কাপড় পরলে আপনাকে যা সুন্দর লাগে দেখতে! পরুন মা, পরুন।

পরব?

হ্যাঁ মা পরুন, পরবেন বৈকি।

বুড়ো মেয়ের শখ দেখে তোরা হাসবি তো?

হেই মা, তাই হাসতে পারি? আর আপনি বুড়ো হলেন কি করে মা? বড় দাদাবাবু এই আঠারোতে পড়লেন; আমি তো জানি, আপনার পনেরো বছরে দাদাবাবু কোলে আসে। তা হ'লে কত হয়—এই তো মোটে তেত্রিশ বছর বয়েস আপনার।

সুনীতির সকল সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। তিনি আবার বাক্স খুলিয়া বাছিয়া একখানি ঢাকাই শাড়ি বাহির করিয়া আনিলেন। গা ধুইতে ধুইতে বলিলেন, গরমের দিন এল, আর আমার এই চুলের বোঝা নিয়ে হ'ল মরণ।

মানদা বলিল, উঠুন আপনি গা ধুয়ে আপনার চুলটা বেঁধে দেব আজ। চুল বাঁধতে বললেই আপনি বলেন, ছেলে বড় হয়েছে, বুড়ো হয়েছি, কত কি। দেখুন গিয়ে ছোট তরফের রায়গিন্নীকে, আপনার চেয়ে কত বড়, চুলে পাক ধরেছে, তবু রোজ চুল বাঁধবেন।

হাতে মুখে সাবান দিয়ে গা ধোয়া শেষ করিয়া সুনীতি বলিলেন, দে তাই, চুলগুলো বিনুনি ক'রে দে তো। এলোচুল খুলে পিঠে পড়ে এমন সুড়সুড় করে পিঠ!

সুনীতির চুলগুলো ভ্রমরের মত কালো আর কোঁকড়ানো। হাতের মুঠিতে চুলগুলি ধরিয়া মানদা বলিল, বাহারের চুল বটে মা। আ-হা-হা, কি নরম! ছোট দাদাবাবু ঠিক তোমার মত দেখতে, কিন্তু চুলগুলিনও পায় নাই, এমন বাহারের চোখও পায় নাই।

সুনীতি চমকিয়া উঠিলেন, কই, অহীন্দ্র তো এখনও ফিরল না? তিনি উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, তাই তো রে, অহি তো এখনও ফিরল না? বেরিয়েছে, সেই কখন?

মানদা বলিল, বেশ, দেখুন গিয়ে তিনি বসে বসে রংলাল মোড়লের সঙ্গে গল্প করছেন। আমি দেখে এসেছি তাঁদের দুজনকে জল আনতে গিয়ে নদীর ধারে। মোড়ল একবার এই হাত ছুঁড়ছে, একবার ওই হাত ছুঁড়ছে যেন বক্তৃতে করছে।

সুনীতি বলিলেন, ওই ওর এক নেশা। যত চাষীভূষির সঙ্গে ব'সে গল্প করবে। রায়েরা নিন্দে করে, মহী তো আমার ওপরেই তাল ঝাড়বে। তবু তো বাবুর কানে ওঠে না।

মানদা বলিল, রায়দের কথা ছাড়ান দেন মা, ওরা এ-বাড়ির নিন্দে পেলে আর কিছু চায় না। আর ছোট দাদাবাবুর মত ছেলে তোমার হাজারে একটা নাই। আমি তো দেখি নাই! দেখে এস গিয়ে রায়বাড়ির ছেলেদিগে, কথা কি সব, যেন ছুঁচ বিঁধছে। তুই-তোকারি, চোপরাও, হারামজাদা-হারামজাদী তো ঠোঁটে লেগে আছে।—নেন মা, এইবার সিঁথিতে সিঁদুর নেন। কপালেও নেবেন; নিতে হয়।

সুনীতি স্থিরদৃষ্টিতে পশ্চিম দিকে একতলার ছাদের উপর দিয়া ওপারের শূন্যমণ্ডলের দিকে চাহিয়া ছিলেন। ওপাশে কাছারি-বাড়ির প্রাঙ্গণে এত আলো কিসের? শূন্যমণ্ডলটা পর্যন্ত

আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, দেখ্ তো বেরিয়ে মানদা, বাইরে এত আলো কিসের ?

মানদা সশঙ্কচিত্তে সন্তর্পণে বাহিরে গিয়া কিছুক্ষণ পরেই ছুটিয়া ফিরিয়া আসিল।—ওগো মা, একদল সাঁওতাল, এ-ই সব মশাল জ্বেলে দাদাবাবুকে পৌঁছে দিতে এসেছে। এ-ই সব ঠকাঠক পেনাম করছে। দাদাবাবুকে বলছে 'রাঙাবাবু'।

রাঙাবাবু! সুনীতি শিহরিয়া উঠিলেন। সাঁওতালদের রাঙাঠাকুর—তাঁহার শ্বশুরের কাহিনী তিনি বহুবার শুনিয়াছেন। পরক্ষণেই আবার তাঁহার মন তাঁহার শ্বশুরকুলের গৌরবে ভরিয়া উঠিল। আর ওই আদিম বর্বর মানুষদের সকৃতজ্ঞ আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের প্রতিও মমতার সীমা রহিল না। এ-বাড়িকে সাঁওতালরা কোনদিন ভোলে নাই, সরকারের সহিত মকদ্দমার পর হইতে এই বাড়িই সযত্নে সাঁওতালদের সহিত সংস্রব পরিহার করিয়া চলিয়াছে। বহু দিন ধরিয়া সরকার-পক্ষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন তাঁহার স্বামীর উপর।

হাসিতে হাসিতে বাড়িতে প্রবেশ করিল অহীন্দ্র, তাহার পিছনে পিছনে রংলাল আসিয়া বাড়ির দরজায় দাঁড়াইল।

আজ ওই চরটা দেখে এলাম মা। সাঁওতালেরা যা খাতির করলে। আমার নাম দিয়েছে রাঙাবাবু। একটা যা অজগর চিতি ওরা মেরেছে—প্রকাণ্ড বড়। অহীন্দ্রের ইচ্ছা হইতেছিল, একেবারে সকল কথা এক মুহূর্তে সব জানাইয়া দেয়।

মা বলিলেন, ওই সাপখোপ-ভরা চর, ওখানে তুমি কেন গিয়েছিলে ?

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি'। গেলাম তো হ'ল কি ? ভয় কিসের ?

বাহির-দরজায় রংলাল দাঁড়াইয়া ছিল, সে ডাকিল, দাদাবাবু! তাহার গামছায় ছিল সেই ফুলগুলি।

সুনীতি চকিত হইয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া বলিলেন, মাঝিরা চলে গেল নাকি ? মানদা, দাঁড়াতে বল্ তো মাঝিদের। মুড়কি আর নাড়ু দিতে হবে ওদের।

রংলাল বলিল, ওগো মানদা, এইগুলো বরং নাও তুমি, আমি যাই মাঝিদের আটক করি। যে বোঙা জাত, হয়ত তোমার কথা বুঝবেই না।

মানদা ফুলগুলি আনিয়া ঢালিয়া দিয়া বলিল, তাই বলি, দাদাবাবু এলেন আর এমন গন্ধ কোথা থেকে উঠল! আহা-হা, এ কি ফুল গো ? কি ফুল দাদাবাবু ?

ফুলের গন্ধে ও কদম্বফুলের মত পুষ্পগুচ্ছগুলির গঠন-ভঙ্গি দেখিয়া সুনীতিও আকৃষ্ট হইলেন, তিনিও কয়েকটি পুষ্পগুচ্ছ তুলিয়া লইয়া বলিলেন, ভারী সুন্দর ফুল তো ?

উচ্ছ্বসিত হইয়া অহীন্দ্র বলিল, ওই ফুলের গন্ধেই তো চরের ভেতরে গেলাম। রংলাল বললে, মাঝিরা ঠিক সন্ধান জানে। গেলাম যদি তো, আমাকে দেখেই কমল মাঝি, ওদের মোড়ল—উঃ, কি চেহারা তার মা, ঠিক যেন একটা পাহাড়ের মত—আমাকে দেখেই ঠিক চিনে ফেললে,

বললে, হুঁ, ঠিক তেমনি পারা, তেমনি আগুনের মত রঙ, তেমনি চোখ, তেমনি চুল ; ঠিক আমাদের রাঙাঠাকুরের নাতি ! সেখানে মেয়েরা সব গোছায় গোছায় এই ফুল খোঁপায় পরে আছে। সেই মেয়েরা এনে দিলে এত ফুল। সবাই নিয়ে এল এক এক আঁচল ভরে। যার না নিই, সেই রাগ করে। রংলাল বললে, সবারই নোব দাদাবাবু, চলুন আমি নিয়ে যাচ্ছি।

সুনীতি বলিলেন, যা, তুই কতকগুলো নিয়ে বাবুর ঘরে দিয়ে আয়। ভারী খুশী হবেন উনি। শুনেছিস তো উনি নাকি সেকালে রোজ সন্ধ্যেতে ফুলের মালা পরতেন। যা নিয়ে যা।

অহীন্দ্র বলিল, না তুমি গিয়ে দিয়ে এস।

সে কি ? এবার এসে একবারও তো তুই বাবুর সঙ্গে দেখা করিস নি। না না, এ তো ভাল নয় অহি।

আমার বড় কষ্ট হয় মা। তিনি কেমন হয়ে গেছেন। অথচ এত বড় পণ্ডিত, কি সুন্দর সংস্কৃত বলেন ! আমার কান্না পায়।

সুনীতির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজেই ফুল লইয়া উঠিলেন। বলিলেন, কি করব বল্, তোদের অদৃষ্ট আর আমার পোড়া কপাল ! আচ্ছা, আমিই দিয়ে আসছি। যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, ওগো বামুন-মেয়ে, মাঝিদের মুড়কি আর নাড়ু দিও সকলকে।

এতক্ষণে অহীন্দ্র মাকে দেখিয়া বলিল, বাঃ, বড় সুন্দর লাগছে মা তোমাকে আজ ! অথচ কেন তুমি চব্বিশ ঘণ্টা এমন গরিব-গরিব সেজে থাক ?

সুনীতি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিলেন, তবু চট করিয়া আপন লজ্জা ঢাকিয়া বলিলেন, আজ আমি রাঙাবাবুর মা হয়েছি কিনা, তাই। আর বেয়াই আসবে বলে সেজেছি এমন, তোর সাঁওতালদের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব।

ছেলে লজ্জিত হইয়া পড়িল, মাও দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেলেন। অতি অল্পক্ষণ পরেই মাঝিদের লইয়া রংলাল আসিয়া অন্দরের বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল, দাদাবাবু !

মানদা বলিল, এস মোড়ল, ভেতরে নিয়ে এস ওদের, মা ওপরে আছেন।

* * *

সুনীতি দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঘর অন্ধকার, বাতিটা বোধ হয় নিভিয়া গিয়াছে। তিনি দরজাটা আবার খুলিয়া অহিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, একটা প্রদীপ নিয়ে আয় তো অহি।

অন্ধকার কক্ষের মধ্য হইতে রামেশ্বর বলিলেন, কে, সুনীতি ? তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উত্তেজিত এবং মৃদু চাপা ভঙ্গির মধ্যে আশঙ্কার আভাস সুপরিস্ফুট।

সুনীতি বুঝিলেন, আলো নিভিয়া যাওয়ায় রামেশ্বর উত্তেজিত হইয়াছেন। চোখে তাঁহার আলো সহ্য হয় না, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একা থাকিতেও তিনি আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। সুনীতি বলিলেন, এই এক্ষুণি আলো নিয়ে আসছে। কিন্তু আমি কি এনেছি বল তো ? খুব একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছ ?

সুনীতির কথার উত্তর তিনি দিলেন না, উত্তেজিতভাবেই তেমনি চাপা গলায় বলিলেন, এত আলো কেন কাছারি-বাড়িতে সুনীতি? এত লোক? আমাকে কি ওরা ধরে নিয়ে যাবে? তাই আলোটা নিবিয়ে দিয়েছি।

সুনীতির সকল আনন্দ ম্লান হইয়া গেল, তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, না না। ওরা সব সাঁওতাল, অহিকে পৌঁছে দিতে এসেছিল।

অহিকে পৌঁছে দিতে এসেছিল? সাঁওতাল?

হ্যাঁ, কালীর ওপারে যে চরটা উঠেচে, অহি আজ সেই চরে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে সাঁওতালেরা এসে বাস করছে; রাত্রি হ'তে তারা সব মশাল জ্বেলে অহিকে পৌঁছে দিয়ে গেল। অহি তোমার জন্যে খুব চমৎকার ফুল এনেছে, গন্ধ পাচ্ছ না?

ফুল? তাই তো, চমৎকার গন্ধ উঠেছে তো! অহি এনেছে? আমার জন্যে?

হ্যাঁ।

অহি আলো লইয়া দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সুনীতি আলোর ছটায় ফুলের স্তবকটি রামেশ্বরের সম্মুখে ধরিলেন। রামেশ্বর মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বলিলেন, কুটজ কুসুম। বনবালারা, পর্বতদুহিতারা সেকালে কানে চুলে আভরণস্বরূপ ব্যবহার করতেন। আমরা বলি কুর্চি ফুল।

অহি বলিয়া উঠিল, সাঁওতালদের মেয়েরা দেখলাম থরে থরে সাজিয়ে খোঁপায় পরেছে।

সুনীতি বলিলেন, অহিকে নাকি সাঁওতালরা দেবতার মত খাতির করেছে, শ্বশুরের নাম ক'রে বলেছে, তুই বাবু আমাদের রাঙাঠাকুরের নাতি, দেখতেও ঠিক তেমনি। এক বুড়ো সাঁওতাল তাঁকে দেখেছিল, সে বলেছে, অহি নাকি ঠিক আমার শ্বশুরের মত দেখতে। ওর নাম দিয়েছে রাঙাবাবু।

রামেশ্বর স্তব্ধ হইয়া অহির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোল তো, আলোটা তোল তো সুনীতি, দেখি।

সুনীতি আলো তুলিয়া অহীন্দ্রের মুখের পাশে ধরিলেন। দেখিতে দেখিতে সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে তিনি বলিলেন, হুঁ। কণ্ঠস্বরে একটি সকরুণ বিষণ্ণ সুর সুনীতি ও অহীন্দ্র দুইজনকেই স্পর্শ করিল। হয়ত কোনও অবান্তর অসম্ভব কথা এইবার তিনি বলিয়া উঠিবেন আশঙ্কা করিয়া সুনীতি বলিলেন, অহি, যা বাবা, তুই খেয়ে নিগে। আমি আলোটা জ্বেলে দিয়ে আসছি।

অহি চলিয়া গেল। সুনীতি আলোটা জ্বালিয়া দিয়া একটি শ্বেতপাথরের গ্লাসে ফুলগুলি সাজাইয়া দিয়া বলিলেন, এই দেখ, খুব সুন্দর কাপড় পরেছি আজ, চুলও বেঁধেছি; গীত-গোবিন্দ শোনাবে তো?

রামেশ্বরের কানে সে কথা প্রবেশই করিল না, তিনি যেন কোন গভীর চিন্তার মধ্যে আত্ম-হারার মত মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। সুনীতি তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, কি ভাবছ?

ভাবছি, অহি যদি সাঁওতালদের নিয়ে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা করে!

না না না, অহি সে-রকম ছেলে নয়; খুব ভাল ছেলে, প্রত্যেক বার স্কুলে ফার্স্ট হয়। তুমি তো ডেকে কথাবার্তা বল না; কথা বলে দেখো, ভাল সংস্কৃত শিখেছে, কত দেশ-বিদেশের গল্প বলে!

রামেশ্বরের দুর্ভাবনা ইহাতেও গেল না, তিনি বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, সাঁও-তালেরা চিনেছে যে! আবার নাম দিয়েছে বলছ—রাঙাবাবু, আর ঠিক সেই রকম দেখতে!

সুনীতির এক এক সময় ইচ্ছা হয়, কঠিন একটা পাথরের নিষ্ঠুর আঘাতে আপনার কপাল-খানাকে ভাঙিয়া ললাটলিপিকে ধুলার মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দেন। তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া আসিলেন। নীচে মানদা ও বামুন-ঠাকুরুন বসিয়া সাঁওতালদের কথা আলোচনা করিতেছিল, মানদা বলিতেছিল, আমার সবচেয়ে ভাল লাগে ওদের বাঁশী। শুনছ, বাড়ি ফিরতে ফিরতে বাঁশী বাজাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ?

সুনীতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, এখনও তোমাদের গল্প হচ্ছে মা? ছি!

৫

অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করা ইন্দ্র রায়ের চিরদিনের অভ্যাস। এককালে ভোরে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া নিয়মিত ব্যায়াম করিতেন। বয়সের সঙ্গে ব্যায়ামের অভ্যাস আর নাই, কিন্তু এখনও তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া নিয়মিত খানিকটা হাঁটিয়া আসেন। একলাই যাইতেন। গ্রামের উত্তরে লাল মাটির পাথুরে টিলা, অবাধ প্রান্তর। ক্রোশ কয়েক দূরে একটা শাল-জঙ্গল, শাল-জঙ্গলের গায়েই একটা পাহাড়, সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ের একটা প্রান্ত আসিয়া এ-অঞ্চলেই শেষ হইয়াছে। ওই টিলাটাই ছিল তাঁহার প্রাতর্ভ্রমণের নির্দিষ্ট স্থান, পৃথিবীর কক্ষপথের মত প্রাতর্ভ্রমণের নির্দিষ্ট কক্ষপথ। সম্প্রতি তাঁহার একজন সঙ্গী জুটিয়াছে। তাঁহারই সমবয়সী এক বিদেশী ভদ্রলোক, ডিস্‌পেপসিয়ায় মৃতপ্রায় হইয়া স্বাস্থ্যকর স্থানের সন্ধানে এখানেই আসিয়া পড়েন, ইন্দ্র রায়েরই আশ্রয়ে। ইন্দ্র রায় বর্তমানে বাড়ি-ঘর ও কিছু জমিজায়গা দিয়া তাঁহাকে এখানেই বাস করাইয়াছেন। প্রাতর্ভ্রমণের পথে ইন্দ্র রায়ের সঙ্গী হন এই ভদ্রলোক।

আজ ইন্দ্র রায় বাহিরে আসিয়া বাড়ির ফটক খুলিয়া বাহির হইতে গিয়া আবার ফিরিলেন। হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ মুচকুন্দ সিং কাছারির বারান্দায় চিত হইয়া পড়িয়া অভ্যাসমত নাক ডাকাইতেছিল, রায় তাহার স্থূল উদরের উপর হাতের ছড়িটার প্রান্ত দিয়া ঠেলিয়া ডাকিলেন, এই, উঠো, জলদি উঠো।

সিং নড়িল না, নিদ্রারক্ত চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া দেখিল, লোকটা কে? রায়কে

দেখিয়া তাহার সমস্ত দেহটা নড়িয়া উঠিল চমকানোর ভঙ্গিতে, পরমুহূর্তেই সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, হুজুর!

এস আমার সঙ্গে, লাঠি নাও।

চাপরাস, আওর পাগড়ি?

ধমক দিয়া রায় বলিলেন, না, এমনি লাঠি নিয়ে এস, তা হ'লেই হবে।

লাঠি লইয়া সিং খুঁজিতেছিল, আঃ, তেরি আঙ্গোছা কাঁহা গইল বা? অন্তত গামছাটা কাঁধে না ফেলিয়া যাইতে কোনমতেই তাহার মন উঠিতেছিল না। গামছাটা কোনমতে বাহির করিয়া সেখানাই মাথায় জড়াইয়া লইয়া মুচকুন্দ বাহির হইল।

রায়ের সঙ্গী অচিন্ত্যবাবু ততক্ষণে উঠিয়া আপনার মেটে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিবিষ্ট মনে চোখের তারা দুইটি গোঁফের উপর আবদ্ধ করিয়া বোধ হয় কাঁচা চুল বাছিতেছিলেন।

রায় আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, কাঁচা গোঁফ আর নাই বললেই চলে রায় মশায়।

রায় হাসিয়া বলিলেন, সেটা তো আয়নাতেই দেখতে পান অচিন্ত্যবাবু।

অচিন্ত্যবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, উঁহু, আয়না আমি দেখি না।

রায় আশ্চর্য হইয়া গেলেন, আয়না দেখেন না? কেন?

ও দেখলেই আমার মনে হয়, শরীরটা ভয়ঙ্কর খারাপ হয়ে গেছে। মনে হয়, আর বেশী দিন বাঁচব না। কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে বাহন যে?

আজ একটু দিগন্তরে যাব; নদীর ও-পারে একটা চর উঠেছে সেই দিকে যাব।

অচিন্ত্যবাবু চমকিয়া উঠিলেন, ওরে বাপ রে! ওখানে শুনেছি ভীষণ সাপ মশায়। শেষকালে কি প্রাণ হারাবেন? না না, ও মতলব ছাড়ুন, চর-ফর দেখতে ওই বরকন্দাজ-ফরকন্দাজ কাউকে ভেজে দেন, না হয় নায়েব গোমস্তা।

আরে না না, ভয় নেই আপনার। ওখানে এখন সাঁওতাল এসে বসেছে, রীতিমত রাস্তা করেছে, চাষ করেছে, কুয়ো খুঁড়েছে, কুয়োর জল নাকি খুব উৎকৃষ্ট। নদীর জলটাই আবার ফিল্টার হয়ে যায় তো। চলুন, চাষের জায়গা কি রকম দেখবেন, আপনার তো অনেক রকম প্ল্যানট্যান আছে, চলুন কোনটা যদি কাজে লাগানো যায় তো দেখা যাক।

অচিন্ত্যবাবু আর আপত্তি করলেন না, কিন্তু গতি তাঁহার অতি মন্থর হইয়া পড়িল। ভদ্রলোকের বাপ ছিলেন দারোগা, নিজে এফ. এ. পাস করিয়া চাকরি পাইয়াছিলেন পোস্ট অফিসে। কিন্তু রোগের জন্য অকালে ইন্‌ভ্যালিড পেন্‌শন লইয়াছেন। সামান্য পেন্‌শনে সংসার চলিয়া যায়; পিতার ও নিজের চাকরি-জীবনের সঞ্চয় লইয়া নানা ব্যবসায়ের কথা ভাবেন, সে সম্বন্ধে খোঁজখবর লইয়া কাগজে-কলমে লাভ-লোকসান করিয়া ফেলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ কর্মের সময় হাত-পা গুটাইয়া বসেন। পুনরায় অন্য ব্যবসায়ের কথা চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন।

কালিন্দীর কূলে আসিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, বিউটিফুল সানরাইজ! আপনি বরং ঘুরে

আসুন রায় মশায়, আমি বসে বসে সূর্যোদয় দেখি।

রায় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, যাবেন না? কিন্তু ভয় কি মৃত্যুর গতি রোধ করতে পারে অচিন্ত্যবাবু?

অচিন্ত্যবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তবু যথাসাধ্য সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, তা বলে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার নাম বাহাদুরি নয়! ধরুন, পাঁচ হাজার টাকার তোড়ার পাশে একটা ভীষণ সাপ রেখে দিয়ে যদি কেউ বলে, নিয়ে যেতে পারলে টাকাটা তোমার; যাবেন আপনি নিতে?

রায় এবার হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, নিশ্চয়। সাপটাকে মেরে টাকাটা নিয়ে নেব।

অচিন্ত্যবাবু সবিস্ময়ে রায়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, তা আপনি নিন গিয়ে মশাই, ও আমি নিতেও চাই না, যেতেও চাই না। কথা শেষ করিয়াই তিনি নদীর ঘাটে শ্যামল ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, এই হ'ল ঠিক আলট্রাভায়োলেট রে—জবাকুসুমসঙ্কাশ।

ইন্দ্র রায় হাসিয়া জুতা খুলিয়া নদীর জলে নামিলেন।

আসল কথা, ইন্দ্র রায় বিগত সন্ধ্যার সেই মশালের আলো জ্বালিয়া সাঁওতালবেষ্টিত রাঙাঠাকুরের পৌত্রের ওই শোভাযাত্রা নিতান্ত সাধারণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রাঙাঠাকুরের নাতি—আমাদের রাঙাবাবু, কথাটার মধ্যে একটা বিশেষ অর্থের সন্ধান যেন তিনি পাইয়াছিলেন। রাত্রির শেষ প্রহর পর্যন্ত তিনি বসিয়া বসিয়া এই কথাটাই শুধু চিন্তা করিয়াছিলেন। একটা দুগ্ধপোষ্য বালক এক মুহূর্তে হিমালয়ের মত অলঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল যে! সাঁওতাল জাতের প্রকৃতি তো তাঁহার অজানা নয়! আদিম বর্বর জাতি যাহাকে দেবতা বলিল, তাহাকে কখনও পাথর বলিবে না। বলুক, রামেশ্বরের ওই সুকুমার ছেলেটিকে দেবতা তাহারা বলুক, কিন্তু দেবতাটি ওই চার প্রসঙ্গে কোন দৈববাণী করিয়াছে কি না সেইটুকুই তাঁহার জানার প্রয়োজন। আসলে সেইটুকুই আশঙ্কার কথা। সেই কথাই জানিতে তিনি আজ দিক-পরিবর্ত্তন করিয়া চরের দিকে আসিয়াছেন।

চরের ভিতর সাঁওতাল-পল্লীর প্রবেশমুখেই দাঁড়াইয়া তিনি মুচকুন্দ সিংকে বলিলেন, ডাক তো মাঝিদের।

মুচকুন্দ সিং পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার মোটা গলায় হাঁকে-ডাকে সোরগোল বাধাইয়া তুলিল। তাহার নিজের প্রয়োজন ছিল একটু চুন ও খানিক তামাক-পাতার। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিবার সময় ওটা ভুল হইয়া গিয়াছে। পল্লীর মধ্যে পুরুষেরা কেহ নাই, তারা সকলেই আপন আপন গরু মহিষ ছাগল এই বন জঙ্গলের মধ্যেই কোথাও চরাইতে লইয়া গিয়াছে। মেয়েরা আপন আপন গৃহকর্মে ব্যস্ত, তাহারা কেহই মুচকুন্দের উত্তর দিল না। দুই-একজন মাটি কোপাইয়া মাটির বড় বড় চাঙড় তুলিতেছে, পরে জল দিয়া ভিজাইয়া ঘরের দেওয়াল দেওয়া হইবে। মাত্র একজন আধাবয়সী সাঁওতাল এক জায়গায় বসিয়া একটি কাঠের

পুতুল লইয়া কি করিতেছিল। পুতুলটার কোমর হইতে বেশ এক ফালি কাপড় ঘাঘরার মত পরানো। এই ঘাঘরার মধ্যে হাত পুরিয়া ভিতরে সে পুতুলটাকে ধরিয়া আছে। হাঁক-ডাক করিতে করিতে মুচকুন্দ সেখানে আসিয়া তাহাকে বলিল, আরে চল্ উধার, বাবু আসিয়েছেন তুদের পাড়া দেখতে।

মাঝি নিবিষ্টমনে আপন কাজ করিতে করিতে বলিল, সি—তু বল্‌গা যেয়ে মোড়ল মাঝিকে। আমি এখন যেতে লারব।

কৌতূহলপরবশ হইয়া মুচকুন্দ প্রশ্ন করিল, উটা কি আসে রে? কেয়া করেগা উ লেকে?

মাঝি হাতটা বাড়াইয়া পুতুলটা মুচকুন্দের মুখের কাছেই ধরিল, পুতুলটা সঙ্গে সঙ্গে দুইটি হাতে তালি দিয়া মাথা নাড়িতে আরম্ভ করিল। মুচকুন্দ আপনার মুখ খানিকটা সরাইয়া লইয়া মুগ্ধভাবেই বলিল, আ—হা।

কয়টি তরুণী মেয়ে আঙিনা পরিষ্কার করিতেছিল, তাহারা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কখন একটা ছেলে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছিল মোড়ল মাঝির নিকট, সংবাদ পাইয়া কমল মাঝি ঠিক এই সময়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। মুচকুন্দের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে বেশ বিনয়সহকারেই বলিল, কার সিপাই বটিস গো তু? বুলছিস কি?

মুচকুন্দ বলিল, ইন্দর রায়, ছোট তরফ। চল্, বাহারমে হুজুর দাঁড়াইয়ে আসেন।

মাঝি ব্যস্ত হইয়া আদেশ করিল, চৌপায়া নিয়ে আয়।

রায় এতক্ষণ চারিদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। পূর্বপশ্চিমে লম্বা চরটা পাঁচ শ বিঘা হইবে না, তবে তিন শ বিঘা খুব। হাতে খানিকটা মাটি তুলিয়া তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। মাটির ঢেলাটা আয়তনের অনুপাতে লঘু। সূক্ষ্ম বালুকণাগুলি সূর্যকিরণে ঝিকমিক করিতেছে। বুঝিলেন, উর্বরতায় যাহাকে বলে স্বর্ণপ্রসবিনী ভূমি—এ তাই। আবার একবার চারিদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া তিনি চরটার সংলগ্ন এ-পারে গ্রামখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। এ-গ্রামখানা চক-আফজলপুর, চক্রবর্তীদের সম্পত্তি। এটার সম্মুখীন হইলে তো চরটা হইবে চক্রবর্তীদের। কিন্তু ঠিক কি চক-আফজলপুরের সম্মুখেই পড়িতেছে? আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি তরুণ সূর্য এবং আপনার ছায়াকে এক রেখায় রাখিয়া দাঁড়াইলেন। চৈত্র মাস—আজ পনরোই চৈত্র; সূর্য প্রায় বিষুবরেখায় অবস্থান করিতেছেন। তাহা হইলে চক-আফজলপুর একেবারে উত্তরে। অন্তত বারো আনা চর আফজলপুরের সীমানাতেই পড়িবে। একেবারে পশ্চিম-প্রান্তের এক-চতুর্থাংশ—চার আনা রায়বংশের সীমানায় পড়িতে পারে। রায় হাসিলেন, মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের। ইহারও প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু রাধারাণীর সন্তানের ভোগ্যবস্তু তাহার সপত্নীপুত্র ভোগ করিবে—এইটাই তাঁহার কাছে মর্মান্তিক।

মাঝি আসিয়া ঈষৎ নত হইয়া রায়কে প্রণাম করিল; একটা ছেলে চৌপায়াটা আনিয়া দিল। রায় হাতের ছড়িটাকে চৌপায়ার উপর রাখিয়া ছড়িটার উপর ঈষৎ ভর দিয়া দাঁড়াইলেন, বসিলেন না। তার পর প্রশ্ন করিলেন, তুই এখানকার মোড়ল মাঝি?

হাতজোড় করিয়া মাঝি উত্তর দিল, হ্যাঁ বাবুমশায়।

হুঁ। কতদিন এসেছিস এখানে ?

তা আজ্ঞা, এক দুই তিন মাস হবে গো ; সেই কার্তিক মাসে এসেই তো এখানে আলু লাগালাম গো।

হাসিয়া রায় বলিলেন, বুঝলাম, ছ মাস হ'ল এসেছিস। কিন্তু কাকে বলে বসলি এখানে তোরা ?

কাকে বুলব ? দেখলম জঙ্গল জমি, পড়ে রয়েছে, বসে গেলম।

সুগভীর গাম্ভীর্যের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রায় বলিলেন—এ চর আমার।

মাঝি বলিল, সি আমরা জানি না।

আমাকে কবুলতি দিতে হবে, এখানে বাস করতে হ'লে কবুলতি লিখে দিতে হবে।

মাঝি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, সিটো আবার কি বেটে গো ?

কাগজে লিখে দিতে হবে যে, আপনি আমাদের জমিদার, আপনাকে আমরা এই চরের খাজনা কিস্তি-কিস্তি মিটিয়ে দেব। তার পর সেই কাগজে তোরা আঙুলের টিপছাপ দিবি।

মাঝি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল, যেন কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতেছে। রায় বলিলেন, কথাটা বুঝলি তো ? কবুলতি লিখে দিতে হবে।

ইহারই মধ্যে সাঁওতালদের মেয়েগুলি আসিয়া এক পাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া খুব গম্ভীরভাবে সমস্ত কথা শুনিতেছিল, মৃদুস্বরে আপনাদের ভাষায় পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিতেছিল। মাঝির নাতনীটি এবার বলিয়া উঠিল, কেনে, তা লিখে দিবে কেনে ? টিপ-ছাপটি দিবে কেনে ?

নইলে এখানে থাকতে পাবি না।

মেয়েটিই বলিল, কেনে, পাব না কেনে ?

না, চর আমার। থাকতে হলে কবুলতি দিতে হবে।

এতক্ষণে মাঝি ঘাড় নাড়িয়া প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানাইয়া বলিল, উঁহু।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া রায় বলিলেন, 'উঁহু' বললে তো চলবে না মাঝি। প্রজা বন্দোবস্তির এই নিয়ম, কবুলতি না দিলে চলবে না।

সেই মেয়েটি বলিয়া উঠিল, তুরা যদি খত লিখে লিস—এক শ, দু শ টাকা পাবি লিখিস ?

রায় হাসিয়া ফেলিলেন, না না, সে ভয় নেই, তা লিখে নেব না। জমিদার কি তাই কখনও করে ?

মেয়েটা বলিল, করে না কেন ? ঐ—উ গাঁয়ে, সি গাঁয়ে লিখে লিলে যি !

মাঝি এবার বলিল, তবে সিটো আমরা শুধাবো আমাদের রাঙাবাবুকে, সি যদি বলে তো, দিবো টিপছাপ।

রায়ের মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে লাল হইয়া উঠিল, তিনি গম্ভীরভাবে শুধু বলিলেন, হুঁ। তারপর পল্লীর দিকে পিছন ফিরিয়া ডাকিলেন, মুচকুন্দ সিং !

মুচকুন্দ তখন সেই পুতুল-নাচের ওস্তাদ সাঁওতালটির সহিত জমাইয়া বসিয়াছিল। সে চুন

ও তামাকের পাতা সংযোগে খৈনি প্রস্তুত করিতেছিল ; আর ওস্তাদ নানা ভঙ্গিতে নাচিতে নাচিতে বোল বলিতেছিল—চিল্‌ক, চিলক্‌, চিল্‌ক। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাঠের পুতুলটাও ঘাড় ও মাথা নাড়িয়া তালে তালে তালি দিতেছিল, খটাস, খটাস, খটাস।

মুচকুন্দ বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া বসিয়া বসিয়া তারিফ করিতেছিল। প্রভুর ডাক শুনিয়া সে বলিল, গাঁওমে যাস্‌ মাঝি, রোজকার হোবে তোর।

রায়-বংশ শাখাপ্রশাখায় বহুধাবিভক্ত। আয়ের দিক দিয়া বাৎসরিক পঁচ শত টাকার আয় বড় কাহারও নাই। কেবল ছোট বাড়ি আজ তিন পুরুষ ধরিয়া এক সন্তানের বিশেষত্বের কল্যাণে এখনও উহারই মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন। ইন্দ্রচন্দ্র রায়ের বাৎসরিক আয় দেড় হাজার হইতে দুই হাজার হইবে। আর ও-দিকে মাঝের বাড়ি অর্থাৎ রামেশ্বর চক্রবর্তী রায়েদের সম্পত্তির তিন আনা চার গণ্ডা বা এক-পঞ্চমাংশের অধিকারী। তাঁহার অংশের আয় ওই হাজার দুইয়েক টাকা। আয় অল্প হইলেও ইন্দ্র রায়ের প্রতাপ এ অঞ্চলে যথেষ্ট। রামেশ্বর চক্রবর্তীর মস্তিক-বিকৃতির পর ইন্দ্র রায়ের এখন অপ্রতিহত প্রতাপ। বাড়ি ফিরিয়া তিনি সাঁওতাল-পল্লীতে দশজন লাঠিয়াল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন ; আদেশ দিলেন, ঠিক বেলা তিনটার সময় মাঝিদের ধরিয়া আনিয়া কাছারিতে বসাইয়া রাখিবে। সেইটাই তাহাদের খাইবার সময়। সাধারণতঃ সাঁওতালেরা অত্যন্ত শান্ত নিরীহ প্রকৃতির জাতি—মাটির মত ; উত্তপ্ত সহজে হয় না, কখনও কখনও ভিতর হইতে প্রলয়াগ্নিশিখা বুক ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু সেও শতাব্দীতে একবার হয় কি না সন্দেহ।

অপরাহ্নের দিকে লাঠিয়ালরা গিয়া তাহাদের আনিয়া ছোট বাড়ির কাছারিতে আটক করিল। ইন্দ্র রায় বাড়িতে তখনও দিবানিদ্রায় মগ্ন। মোড়ল মাঝি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, কই গো, বাবুমশায় কই গো? একসঙ্গে সাত-আটজন লাঠিয়াল সমস্বরে গর্জন করিয়া উঠিল, চো—প!

কাছারি-বাড়ির সাজসজ্জা আজ একটু বিশিষ্ট রকমের, সাধারণ অবস্থার চেয়ে জাঁকজমক অনেক বেশি। কাছারি-ঘরে প্রবেশের দরজার দুই পাশে বারান্দায় দেওয়ালের গায়ে গুণ-চিহ্নের ভঙ্গীতে আড়াআড়িভাবে দুইখানা করিয়া চারিখানা তলোয়ার ঝুলিতেছে, দুইদিকেই মাথার উপরে এক-একখানা ঢাল। ইন্দ্র রায়ের বসিবার আসন ছোট তক্তপোশটার উপর একটা বাঘের চামড়া বিছানো। মুচকুন্দ সিং প্রকাণ্ড পাগড়ি বাঁধিয়া উর্দি ও তকমা আঁটিয়া ছোট একটা টুলের উপর বসিয়া আছে। সাঁওতালেরা অবাক হইয়া সমস্ত দেখিতেছিল। ইন্দ্র রায় কূটকৌশলী ব্যক্তি, তিনি জানেন চোখে ধাঁধা লাগাইতে না পারিলে সম্ভ্রমের জাদুতে মানুষকে অভিভূত করিতে পারা যায় না। চাপরাসী নায়েব সকলেই ফিসফাস করিয়া কথা কহিতেছিল, এতটুকু জোরে শব্দ হইলেই নায়েব ভ্রূকুটি করিয়া বলিতেছিলেন, উঃ!

অচিন্ত্যবাবু প্রত্যহ অপরাহ্ণে এই সময়ে ইন্দ্র রায়ের নিকট আসেন। তিনি আসিয়া

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যেন একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। নায়েবের নিকট আসিয়া চুপিচুপি প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপার কি মিত্তির মশায়? এত লোকজন, ঢাল-তরোয়াল? কোন দাঙ্গা-টাঙ্গা নাকি?

মিত্তির হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—বাবুর হঠাৎ খেয়াল আর কি!

অচিন্ত্যবাবুর দৃষ্টি ততক্ষণে কমল মাঝির উপর পড়িয়াছিল, তিনি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, সর্বনাশ! সাক্ষাৎ যমদূত! আচ্ছা, আমি চললাম এখন, অন্য সময় আসব।

বসবেন না?

উঁহু। একটু ব্যস্ত আছি এখন। মানে ওই চরটায় শুনছি অনেক রকম ওষুধের গাছ আছে। তাই ভাবছি, কলকাতায় গাছগাছড়া চালানের একটা ব্যবসা করব। তারই প্ল্যান—হিসেব-নিকেশ করতে হবে। তিনি চলিয়া গেলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ইন্দ্র রায় কাছারিতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখাদেখি সাঁওতালরাও উঠিয়া দাঁড়াইল। ইন্দ্র রায় আসন গ্রহণ করিয়া কর্মান্তরে মনোনিবেশ করিলেন, অস্নাত অভুক্ত সাঁওতাল দল নীরবে জোড়হাত করিয়া বসিয়া রহিল। কাছারি-বাড়ির দরজায় কয়টি সাঁওতালের মেয়ে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া আপন আপন বাপ-ভাই-স্বামীর সন্ধানে আসিয়াছে। আপনাদের ভাষায় তাহারা কথা বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল।

ইন্দ্র রায় লাঠিয়ালদিগকে কি ইঙ্গিত করিলেন, একজন লাঠিয়াল অগ্রসর হইয়া গিয়া মেয়েদের বাধা দিয়া বলিল, কি দরকার তোদের এখানে? যা, এখানে গোলমাল করিস নি।

কমলের নাতনী—দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি বলিল, কেনে তোরা আমাদের লোককে ধরে এনেছিস?

বৃদ্ধ কমল মাঝি আপন ভাষায় তাহাদের বলিল, যাও যাও, তোমরা বাড়ি যাও। বাবু রাগ করবেন। সে বড় খারাপ হবে।

মেয়েগুলি সভয়ে ক্ষুণ্ণ মনেই চলিয়া গেল।

এতক্ষণে বৃদ্ধ মাঝি করজোড়ে বলিল, আমরা এখুনও খাই নাই বাবু, ছেড়ে দে আমাদিগে।

ইন্দ্র রায় বলিলেন, কবুলতিতে টিপছাপ দিয়ে বাড়ি চলে যা।

মাঝি বলিল, হাঁ বাবু, সিটি কি করে দিবো? আমাদের রাঙাবাবুকে আমরা গিয়ে শুধাই, তবে তো দিবো।

নায়েব ধমক দিয়া উঠিলেন, রাঙাবাবু কে রে? তাকে কি জিজ্ঞেস করবি? টিপছাপ দিতে হবে।

অদ্ভুত জাত, বিদ্রোহও করে না, আবার ভয়ও করে না, কমল মাঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, —উঁ—হু।

আবার সাঁওতালদের মেয়েগুলির কলরব বাহিরে ফটক্‌-দুয়ারের সম্মুখে ধ্বনিত হইয়া

উঠিল। আবার উহারা ফিরিয়া আসিয়াছে। রায়ের মনে এবার করুণার উদ্রেক হইল, আহা! কোনোমতেই ইহাদের এখানে রাখিয়া যাইতে বেচারাদের মন উঠিতেছিল না। যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি একজন লাঠিয়ালকে বলিলেন, দরজা খুলে ওদের আসতে বল। তিনি স্থির করিলেন, সকলকেই এখানে আহার করাইয়া আজিকার মত অব্যাহতি দিবেন। টিপসই উহারা স্বেচ্ছায় দিয়া যাইবে।

লাঠিয়াল অগ্রসর হইবার পূর্বেই কিন্তু ফটকের দরজা খুলিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল অহীন্দ্র। তাহার পিছনে পিছনে ওই মেয়েগুলি। রায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সুকঠিন ক্রোধে বজ্রের মত তিনি উত্তপ্ত এবং উদ্যত হইয়া উঠিলেন।

অহীন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, এদের ছেলেমেয়েরা কাঁদছে মামাবাবু। ভয়ে আপনার সামনে আসতে পারছে না। এ বেচারারা এখনও স্নান করে নি খায় নি, এখন কি এমনি করে বসিয়ে রাখতে আছে? এদের ছেড়ে দিন।

অহীন্দ্র এতগুলি কথা বলিয়া গেল, বজ্রগর্ভ অন্তরেই রায় বসিয়া রহিলেন, কিন্তু ফাটিয়া পড়িবার তাঁহার অবসর হইল না। মুহূর্তে মুহূর্তে অন্তর্লোকেই সে বিদ্যুৎ-শিখা এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত দগ্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাকে বর্ষণোন্মুখ করিয়া তুলিল। সহসা তাঁহার মনে হইল, রাধারাণীর ছেলেই যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে, মামাবাবু!

অহীন্দ্র এবার সাঁওতালদের বলিল, যা, তোরা বাড়ি যা এখন, আবার ডাকতে গেলেই আসবি, বুঝলি?

সাঁওতালেরা হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু একজন লাঠিয়াল বলিয়া উঠিল, খবরদার বলছি, ব'স সব, ব'স।

এতক্ষণে বজ্রপাত হইয়া গেল, দারুণ ক্রোধে ইন্দ্র রায় গর্জন করিয়া উঠিলেন, চোপরাও হারামজাদা! তারপর সাঁওতালদের বলিলেন, যা, তোরা বাড়ি যা।

৬

সমস্ত গ্রামে রটিয়া গেল, রামেশ্বর চক্রবর্তীর ছোট ছেলে অহীন্দ্র ইন্দ্র রায়ের নাক কাটিয়া ঝামা ঘষিয়া দিয়াছে, ইন্দ্র রায় সাঁওতালদের আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন, অহীন্দ্র জোর করিয়া তাহাদের উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছে। রটনার মূলে ওই অচিন্ত্যবাবুটি। তিনি একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া দূর হইতে যতটা দেখা ও শোনা যায়, দেখিয়া শুনিয়া গল্পটি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রচণ্ড একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামার কল্পনা করিয়া সভয়ে স্থানত্যাগ করিয়াও নিরাপদ দূরত্বের আড়ালে থাকিয়া ব্যাপারটা দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই।

সাময়িক দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়া ইন্দ্র রায়ও লজ্জিত হইয়াছিলেন। মুহূর্তের দুর্বলতার জন্য সকলে তাঁহার মাথায় যে অপমানের অপবাদ চাপাইয়া দিল, সে অপবাদ সংশোধন করা এখন

কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। চক্রবর্তী-বাড়ির বড়ছেলে মহীন্দ্র এবং বিচক্ষণ নায়েব যোগেশ মজুমদার আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছে। কাল রাত্রেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আজ প্রাতঃকালে তাঁহার লোক সাঁওতাল-পাড়ায় গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ চক্রবর্তী-বাড়ির নায়েব সাঁওতাল-পাড়ায় বসে রয়েছেন, লোকজনও অনেকগুলি রয়েছে। আমরা সাঁওতালদের ডাকলাম, তাতে ওঁদের নায়েব বললেন, আমি ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি, বলগে বাবুকে।

ইন্দ্র রায় গম্ভীর মুখে মাথা নত করিয়া পদচারণা আরম্ভ করিলেন, মনে মনে নিজেকেই বার বার ধিক্কার দিতেছিলেন। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন, ও-পারের চর ও তাঁহার মধ্যে প্রবহমাণা কালিন্দী অকস্মাৎ অকূল পাথার হইয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই মজুমদার আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার পিছন পিছন সাঁওতালরাও আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। মজুমদার রায়কে প্রণাম করিয়া বলিল, ভাল আছেন?

রায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ। তারপর বলিলেন, কি রকম? আবার নাকি চক্রবর্তীরা সাঁওতালদের নিয়ে দেশ জয় করবে শুনছি?

তাঁহারই কথার কৌতুকে হাসিতেছে, এমনি ভঙ্গিতে হাসিয়া মজুমদার বলিল, এসে শুনলাম সব। তা আমাদের ছোটবাবু অনেকটাই ওঁর পিতামহের মত দেখতে, এটা সত্যি কথা।

রায় ঠোঁট দুইটি ঈষৎ বাঁকাইয়া বলিলেন, তা সাঁওতালবাহিনী নিয়ে লড়াইটা প্রথম আমার সঙ্গেই করবে নাকি তোমরা?

লজ্জায় জিভ কাটিয়া মজুমদার বলিয়া উঠিল, রাম রাম রাম, এই কথা কি হয়, না হ'তে পারে? তা ছাড়া আপনার অসম্মান কি কেউ এ-অঞ্চলে করতে পারে বাবু?

রায় চুপ করিয়া রহিলেন, মজুমদার আবার বলিল, সেই কথাই হচ্ছিল কাল ওবাড়ির গিন্নী-ঠাকরুনের সঙ্গে। তিনি বলিলেন, এ-বিবাদ গ্রাম জুড়ে বিবাদ। এখনও কেউ এগোয় নি বটে, কিন্তু বিবাদ আরম্ভ হ'লে কেউ পেছিয়ে থাকবে না। আমি সেইজন্যে অহিকে ও-বাড়ির দাদার কাছে পাঠিয়েছিলাম। কাল তুমি একবার যাবে মজুমদার ঠাকুরপো, বলবে, তাঁর মত লোক বর্তমান থাকতে যদি এমন গ্রামনাশা বিবাদ বেধে ওঠে, তবে তার চেয়ে আর আক্ষেপের বিষয় কিছু হ'তে পারে না।

রায় শুধু বলিলেন, হুঁ।

মজুমদার আবার বলিল, আমাদের বড়বাবু—মহীন্দ্রবাবু একটু তেজীয়ান; অল্প বয়স তো! তিনি অবশ্য বলছিলেন, মামলা-মকদ্দমাই হোক; যার ন্যায্য হবে, সেই পাবে চর। আমাকেও বললেন, সাঁওতালদের কারও ডাকে যেতে নিষেধ করতে। কিন্তু গিন্নী-ঠাকরুন বললেন, তাই কখনও হতে পারে? আর আমাদের অহীন্দ্রবাবু তো অন্য প্রকৃতির ছেলে, তিনি বললেন, তা হ'তে পারে না দাদা, আমি মামাকে বলে তাদের ছুটি করিয়ে দিয়েছি। কড়ার করে ছুটি করিয়ে দিয়েছি, তিনি ডাকলেই ওদের যেতে হবে। আমি নিজে ওদের ওখানে হাজির করে দেব। তিনি নিজেই আসতেন, তা আজ স্কুল খুলবে, ভোরেই চলে গেলেন শহরে।

রায় একটু অন্যমনস্ক হইয়া উঠিলেন, এই ছেলেটি তাঁহার কাছে যেন একটা জটিল রহস্যের মত হইয়া উঠিয়াছে। আজ সমস্ত সকালটাই তিনি ওই ছেলেটির সম্পর্কে ভাবিয়াছেন, অদ্ভুত কূটবুদ্ধি ছেলেটির। সেদিন মশালের আলো জ্বালাইয়া সে যখন যায়, তখনও তিনি সেই কথাই ভাবিতেছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক বারই ছেলেটি তাঁহাকে লজ্জিত করিয়া সহাস্যমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে।

মজুমদার বলিল, আপনার মত ব্যক্তিকে আমার বেশী বলাটা তো ধৃষ্টতা। গ্রাম জুড়ে বিবাদ হ'লে তো মঙ্গল কারু হবে না। এদিকে কাগজপত্র, কার কি স্বত্ব, এখানকার সমস্ত হাল হদিস আপনার নখদর্পণে, আপনিই এর বিচার করে দিন।

রায় বলিলেন, রামেশ্বরের ছোট ছেলেটি সত্যিই বড় ভাল ছেলে। ক্ষুরের ধারের মত স্বচ্ছন্দে কেটে চলে, কোথাও ঠেকে যায় না। ছেলেটি ওদের বংশের মতও নয় ঠিক, চক্রবর্তী-বংশের চুল কটা, চোখ কটা, কিন্তু গায়ের রংটা তামাটে। এ ছেলেটি বোধ হয় মায়ের রং পেয়েছে, না হে ?

মজুমদার বলিল, হ্যাঁ, গিন্নী-ঠাকরুন আমাদের রূপবতী ছিলেন এক কালে, আর প্রকৃতিতেও বড় মধুর। ছেলেটি মায়ের মতই বটে, তবে আমাদের কর্তাবাবুর বাপের রং ছিল এমনি গৌরবর্ণ!

হ্যাঁ, সাঁওতালেরা সেইজন্যেই তাঁর নাম দিয়েছিল—রাঙাঠাকুর। একেও নাকি সাঁওতালেরা নাম দিয়েছে—রাঙাবাবু ?

মাঝির দল এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এবার সর্দার কমল মাঝি বলিল, হুঁ, আমি দিলাম সি নামটি। রাঙাঠাকুরের লাতি, তেমুনি আগুনের পারা গায়ের রং—তাথেই আমি বললম, রাঙাবাবু।

রায় গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া রহিলেন, সাঁওতালের কথার উত্তর তিনি দিলেন না। সুযোগ পাইয়া মজুমদার আবার বর্তমান প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিল, তা হ'লে সেই কথাই হ'ল। গ্রামের সকল শরিককে ডেকে চণ্ডীমণ্ডপে বসে এর মীমাংসা হয়ে যাক। চর যাঁর হবে তিনিই খাজনা নেবেন ওদের কাছে। ওরা এখন যাক্। গরীব দুঃখী লোক, যতক্ষণ খাটবে ততক্ষণ ওদের অন্ন।—বলিয়া রায় কোন কথা বলিবার পূর্বেই মজুমদার মাঝিদের বলিয়া দিল, যা, তাই তোরা এখন বাড়ি গিয়ে আপন আপন কাজকর্ম করগে। আমরা সব নিজেরা ঠিক করি কে খাজনা পাবে, তাকেই তোরা কবুলতি দিবি, খাজনা দিবি।

মাঝির দল প্রণাম করিয়া তাহাদের নিজস্ব ভাষায় বোধ করি এই প্রসঙ্গ লইয়াই কলকল করিতে করিতে চলিয়া গেল। রায় গম্ভীর মুখে একই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেমন বসিয়া ছিলেন বসিয়া রহিলেন। সাঁওতালের দল বাহির হইয়া গেলে তিনি বলিলেন, সেই ভাল মজুমদার, ও বেচারাদের কষ্ট দিয়ে লাভ কি, যাক ওরা। আগে এই বিবাদের মীমাংসাই হয়ে যাক—

আজ্ঞে হ্যাঁ, একদিন গ্রামের সমস্ত শরিককে ডেকে—

বাধা দিয়া রায় বলিলেন, শরিকরা তো তৃতীয় পক্ষ, সর্বাগ্রে হোক ছোট তরফ আর চক্রবর্তীদের মধ্যে।

বেশ, তাই হোক। একদিন প্রমাণ-প্রয়োগ দেখুন, তাতে যা বলে দেবেন, তাই হবে।

না। একদিন প্রমাণী লাঠি প্রয়োগ করে, তাতে শক্তিতে যার হবে, সেই নেবে চর। তারপর মামলা-মকদ্দমা পরের কথা।

হাতজোড় করিয়া মজুমদার বলিল, না না বাবু, এ কথা কি আপনার মুখে সাজে? আপনি হলেন ও-বাড়ির মুরব্বী; ছেলেদের—

বাধা দিয়া রায় বলিলেন, ও কথা ব'লো না মজুমদার। বার বার আমার অপমান তুমি ক'রো না। ওকথা মনে পড়লে আমার বুকের ভেতর আগুন জ্বলে ওঠে।

মজুমদার স্তব্ধ হইয়া গেল; কিছুক্ষণ পর আবার সবিনয়ে বলিল, আপনি বিজ্ঞ বিবেচক ব্যক্তি, বড়লোক; আপনাদের চাকর বলেই সাহস করে বলছি, এ আগুন কি জেলে রাখা ভাল বাবু?

অস্থির হইয়া বার বার ঘাড় নাড়িয়া রায় বলিলেন, রাবণের চিতা মজুমদার ও নিববে না, নেববার নয়।

মজুমদার আর কথা বাড়াইল না, তাহার চিত্তও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আপন প্রভুবংশের মানমর্যাদা আর সে খাটো করিতে পারিল না, সবিনয়ে হেঁট হইয়া রায়কে প্রণাম করিয়া এবার বলিল, আজ্ঞে, বেশ। আপনি যেমন আদেশ করলেন, তেমনি হবে।

রায় বলিলেন, ব'সো। বেলা অনেক হয়েছে, একটু শরবৎ খেয়ে যাও। না খেলে আমি দুঃখ পাব মজুমদার।

মজুমদার আবার আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, আজ্ঞে, এ তো আমার চেয়ে খাবার ঘর।

মজুমদার চলিয়া গেল। রায় গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেলেন। কুক্ষণে অহীন্দ্র তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাধারাণীর সুপ্ত স্মৃতি সুপ্তি ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চক্রবর্তীদের উপর দারুণ আক্রোশে ও ক্রোধে তিনি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছেন। রামেশ্বরের মস্তিষ্কবিকৃতি এবং দৃষ্টি রুগ্‌ণ হওয়ার পর তিনি শান্ত হইয়াছিলেন। আবার এই চর উপলক্ষ্য করিয়া অহীন্দ্র তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে আক্রোশ আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। রাধারাণীর সপত্নীপুত্রের জন্য তিনি পথ ছাড়িয়া দিবেন? আজ এই ছেলেটি যদি রাধারাণীর হইত, তবে অমনি দ্বন্দ্বের অভিনয় করিয়া তিনি গোপনে হাসিতে হাসিতে পরাজয় স্বীকার করিয়া ঘরে ঢুকিতেন। লোকে বলিত ইন্দ্র রায় ভাগিনেয়ের কাছে পরাজিত হইল। এ ক্ষেত্রে, পরাজয়ে রাধারাণীর গৃহত্যাগের লজ্জা দ্বিগুণিত হইয়া লোকসমাজে তাঁহার মাথাটা ধুলায় লুটাইয়া দিবে। আর তাঁহার সরিয়া দাঁড়ানোর অর্থই হইল রাধারাণীর সপত্নীপুত্রের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দেওয়া।

অচিন্ত্যবাবু রায়বাড়ির ভিতর হইতেই বাহির হইয়া আসিলেন। রায়ের দশ বৎসরের কন্যা উমাকে তিনি পড়াইয়া থাকেন। উমাকে পড়াইয়া কাছারিতে আসিয়া রায়ের সম্মুখে তক্তপোশটার উপর বসিয়া বলিলেন, চমৎকার একটা প্ল্যান করে ফেলেছি রায় মশায়। দেশী গাছগাছড়া সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। চরটার ওপর নাকি হরেক রকমের গাছগাছড়া আছে। যা

শুনলাম, তাতে শতকরা দু'শ লাভ। দেখবেন নাকি হিসেবটা?

থাক এখন।

আচ্ছা, থাক। আর ভাবছি, পাঁচ রকম মিশিয়ে অম্বলের ওষুধ একটা বের করব। বাংলাদেশে এখন অম্বলটাই, মানে ডিস্‌পেপ্‌সিয়াটাই হ'ল প্রধান রোগ।

রায় ওকথা গ্রাহ্যই করিলেন না, তিনি ডাকিলেন নায়েবকে, মিত্তির! একবার ননীচোরা পালকে তলব দাও তো, বল জরুরী দরকার। আর—আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি ভেতরে। রায় উঠিয়া কাছারি-ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। নায়েবকে বলিলেন, দুখানা ডেমিতে একটা বন্দোবস্তির পাট্টাকবুলতি করে ফেল। আমরা ননী পালকে কুড়ি বিঘে চর বন্দোবস্ত করছি। ননী আমাদের বরাবর কবুলতি দিচ্ছে।

নায়েব বলিল, যে আজ্ঞে।

ননী পাল একজন সর্বস্বান্ত চাষী। দাঙ্গা-হাঙ্গামায়, ফৌজদারি মকদ্দমায় তাহার যথাসর্বস্ব গিয়াছে, জেলও সে কয়েকবার খাটিয়াছে। এখন করে পানবিড়ি-মুড়ি-মুড়কির দোকান। লোকে বলে, চোরাই মালও নাকি সে সামলাইয়া থাকে, বিশেষ করিয়া চোরাই ধান। একবার দারোগার নাকে কিল মারিয়া সে তাহার নাকটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, একবার দুই আনা ধারের জন্য রায়েদেরই ফুলবাড়ির একটি ছেলের সহিত বচসা করিয়া তাহার কান দুইটা মলিয়া দিয়া বলিয়াছিল, এতেই আমার দুআনা শোধ হ'ল। এমনি প্রকৃতির লোক ননীচোরা পাল। রায় কণ্টক দিয়া কণ্টক তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন; বিশ বিঘা জমির জন্য তাঁহাকে জমিদার স্বীকার করিয়া চক্রবর্তীদের সহিত বিবাদ করিতে ননী বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবে না।

এই লইয়া আরও দুই-চারিটা কথা বলিয়া রায় বাহিরে আসিলেন। অচিন্ত্যবাবু তখন কাছারি-বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, রায় বলিলেন, চললেন যে?

অচিন্ত্যবাবু সংক্ষেপে বলিলেন, হ্যাঁ।

রায় হাসিয়া বলিলেন, বসুন বসুন, আপনার প্ল্যানটা শোনা যাক।

আজ্ঞে না, দুর্জন আসবার আগেই স্থান ত্যাগ করা ভাল। ননী পালটা বড় সাংঘাতিক লোক। ব্যাটা মেরে বসে।

পাগল নাকি আপনি? দেখছেন, দেওয়ালে কখানা তলোয়ার ঝুলছে?

শিহরিয়া উঠিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, খুলে ফেলুন, খুলে ফেলুন, ওগুলো বড় সাংঘাতিক জিনিস। বাঙালীর হাতে অস্ত্র, গভর্মেণ্ট অনেক বুঝেই আইন ক'রে কেড়ে নিয়েছে। ওগুলোর লাইসেন্স আছে তো আপনার?

বলিতে বলিতেই তিনি বাহির হইয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই কন্যা উমা আপন মনেই হারাধনের দশটি ছেলের ছড়া বলিতে বলিতে আসিয়া ওই ছড়ার সুরেই বলিল, বাবা, আপনাকে মা ডাকছেন, বেলা অনেক হয়েছে স্নান করুন।—বলিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আবার হাসি থামাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, কানে কানে একটা কথা বলি বাবা।

উমা মেয়েটি একটু তরঙ্গময়ী। রায় তাহার মুখের কাছে কান পাতিয়া দিলেন। সে

ফিসফিস করিয়া বলিল, প—অন্তস্থ য়—দন্ত্য সয়ে আকার।

হাসিয়া রায় বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা হচ্ছে! তুমি বাড়ির মধ্যে চল, আমার যেতে একটু দেরি হবে, তোমার মাকে বল গিয়ে।

উমা প্রশ্ন করিল, কয়ে একার দন্ত্য ন?

কাজ আছে মা। -

না, চলুন আপনি।

ছি! ও রকম করে না, কাজ আছে শুনছ না? ওই দেখ লোক এসেছে কাজের জন্যে।

ননী পাল আসিয়া একটি সংক্ষিপ্ত প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। বেঁটেখাটো লোকটি, লোহার মত শক্ত শরীর, চওড়া কপালের নীচেই নাকের উপর একটি খাঁজ; ওই খাঁজটা একটা নিষ্ঠুর হিংস্র মনোভাব তাহার মুখের উপর ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

গ্রামে কিন্তু ততক্ষণে ননী পালকে জমি-বন্দোবস্তের সংবাদ রটিয়া গিয়াছে। অচিন্ত্যবাবু গাছগাছড়ার ব্যবসার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া ফেলিয়াছেন।—সর্বনাশ, চরের উপর ব্যাটা কোন্ দিন খুন ক'রেই দেবে আমাকে!

* * *

হেমাঙ্গিনী স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলেন। কাজ শেষ করিয়া স্নান সারিয়া রায় যখন ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন প্রায় দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে। স্বামীর পূজা-আহ্নিকের আসনের পাশে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া হেমাঙ্গিনী কি যেন ভাবিতেছিলেন। রায়কে দেখিয়া বলিলেন, এত বেলা কি করে! খাবে কখন আর?

রায় পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্যই অকারণে একটু হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, দেরি একটু হয়ে গেল। জরুরী কাজ ছিল একটা।

বেশ, স্নান-আহ্নিক সেরে নাও দেখি আগে। এখন পর্যন্ত বাড়ির কারও খাওয়া হয় নি। উমাই কেবল খেয়েছে।

স্নান সারিয়া রায় আহ্নিকে বসিলেন। তারা, তারা মা!

আহারাদির পর শয্যায় শুইয়া গড়গড়ায় মৃদু মৃদু টান দিতেছিলেন। সমস্ত বাড়িটা একরূপ নিস্তব্ধ হইয়াছে। বাহিরে চৈত্রের রৌদ্র তরল বহ্নুত্তাপের মত অসহ্য না হইলেও প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, পাখিরা এখন হইতেই এ সময়ে ঘনপল্লব গাছের মধ্যে বিশ্রাম শুরু করিয়া দিয়াছে। বাড়ির বারান্দার মাথায় ঘুলঘুলিতে বসিয়া পায়রাগুলি গুঞ্জন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে রুদ্ধদ্বার জানলার খড়খড়ি দিয়া উত্তপ্ত একা একা দমকা বাতাস আসিতেছে, উত্তপ্ত বাতাসের মধ্যে বয়ড়া ও মহুয়া ফুলের উগ্র মাদক গন্ধ। বাহিরে ঝরঝর সরসর শব্দে বাতাসে ঝরা পাতা উড়িয়া চলিয়াছে। সূর্য আর পবন দেবতার খেলা চলিতেছে বাহিরে। দুইটি কিশোরের মিতালির লীলা।

হেমাঙ্গিনী ভাঁড়ারে ও লক্ষ্মীর ঘরে চাবি দিয়া আসিয়া স্বামীর শয্যার পার্শ্বে বসিলেন। রায় প্রশ্ন করিলেন, সারা হ'ল সব?

হ'ল।

খুব ক্ষিদে পেয়েছিল তোমার, না ?

হ্যাঁ, খুব। মনে হচ্ছিল, বাড়ির ইট-কাঠ ছাড়িয়ে খাই—হ'ল তো ?

রায় হাসিয়া বলিলেন, রাগটুকু আছে খুব !

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, দেখ, একটা কথা বলছিলাম।

বল।

বলছিলাম, আর কেন ?

রায় ওইটুকুতেই সব বুঝিলেন, তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। রামেশ্বরের প্রতি হেমাঙ্গিনীর স্নেহের কথা তিনি জানেন। সে স্নেহ হেমাঙ্গিনী আজও ভুলিতে পারেন নাই।

হেমাঙ্গিনী একটু অপ্রতিভের মতই বলিলেন, মুখ ফিরিয়ে শুলে যে ? ভাল, ও কথা আর বলব না ! এখন আর একটা কথা বলি, শোন। এটা আমার না বললেই নয়।

না ফিরিয়াই রায় বলিলেন, বল।

দৃঢ়তার সহিত হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বিবাদ করবে, কর, কিন্তু অন্যায় অধর্ম তুমি করতে পাবে না। আমার অনেকগুলি সন্তান গিয়ে অবশিষ্ট অমল আর উমা ; ওদের অমঙ্গল আমি হ'তে দিতে পারব না।

রায় এবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কয়েকটি সন্তানই শৈশব অতিক্রম করিয়া বালক হইয়া মারা গিয়াছে। তাহাদের অকাল-মৃত্যুর হেতু বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া হেমাঙ্গিনী যখন তাঁহার পাপপুণ্যের হিসাব করিতে বসেন, তখন তাঁহার মাথাটা যেন মাটিতে ঠেকিয়া যায়।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, আমাকে ছুঁয়ে তুমি শপথ কর, কোন অন্যায় অধর্ম তুমি করবে না ?

রায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কেন তুমি প্রতি কাজে ওই কথা স্মরণ করিয়ে দাও, বল তো ?

রুদ্ধকণ্ঠে হেমাঙ্গিনী বলিলেন, এতগুলো সন্তান যাওয়ার দুঃখ যে রাবণের চিতার মত আমার বুকে জ্বলছে। তুমি ভুলেছ, কিন্তু আমি তো ভুলতে পারি না। তাই তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হয়।

রায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, জানালাটা খুলে দাও দেখি। বেলা বোধ হয় পড়ে এল।

হেমাঙ্গিনী জানালা খুলিয়া দিলেন, রোদ অনেকটা পড়িয়া আসিয়াছে, পাখিরা থাকিয়া থাকিয়া সমবেত স্বরে ডাকিয়া উঠিতেছে, বিশ্রাম তাহাদের শেষ হইয়া গেল—এ ইঙ্গিত তাহারই। রায় জানালা দিয়া নদীর ও-পারে ওই চরটার দিকে চাহিয়া ভাবিতে ছিলেন ওই কথাই। অমল-উমা, রাধারাণী-রামেশ্বর, রায়-বাড়ি। এ কি দ্বিধার মধ্যে তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া নিক্ষেপ করিল হেমাঙ্গিনী !

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বল।

রায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই হবে। তিনি স্থির করিলেন, অপরাহ্ণেই ননীকে

ডাকাইয়া পাট্টা কবুলতি স্বহস্তে নাকচ করিয়া দিবেন।

হেমাঙ্গিনী চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেলেন, বোধ করি আবেগ তাঁর ধৈর্যের কূল ছাপাইয়া উঠিতে চাহিতেছিল। রায় নীরবে ওই চরের দিকে চাহিয়াই বসিয়া রহিলেন। মনটা কেমন উদাস হইয়া গিয়াছে। দীপ্ত সূর্যালোকে কালীর বালি ঝিকমিক করিতেছে। চরের উপরে বেনাঘাস দমকা বাতাসে হাজার হাজার সাপের ফণার মত নাচিতেছে। আকাশ ধূসর। এত বড় প্রান্তরের মধ্যে কোথাও একটা মানুষ দেখা যায় না। অথচ মাটি লইয়া মানুষের কাড়াকাড়ি সেই সৃষ্টির আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কোন কালেও বোধ করি এ কাড়াকাড়ির শেষ হইবে না। নাঃ, ভাল বলিয়াছে হেমাঙ্গিনী—কাজ নাই; রায়-হাটের সঙ্গে রায়-বাড়ি না হয় কালীর গর্ভেই যাইবে। ক্ষতি কি!

হেমাঙ্গিনী ফিরিয়া আসিলেন, অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিকভাবে বলিলেন, অমলকে টাকা পাঠিয়েছ?

অমল মামার বাড়িতে থাকিয়া পড়ে। রায় অন্যমনস্কভাবেই বলিলেন, পাঠিয়েছি।

দেখ।

বল।

এ দিকে ফিরেই চাও। দোষ তো কিছু করি নি আমি।

অল্প একটু হাস্যের সহিত মুখ ফিরাইয়া রায় বলিলেন, না, তুমি ভালই বলেছ। আর কি হুকুম, বল?

উমাকে আমি দাদার ওখানে পাঠিয়ে দেব। শহরে থেকে একটু লেখাপড়া শিখবে, একটু সহবৎ শিখবে। জামাই আমি ভাল করব। এখানে থাকলে গেঁয়ো মেয়ের মত ঝগড়া শিখবে, আর যত রাজ্যের পাকামো।

রায় বলিলেন, হ্যাঁ, রায়-বাড়ির মেয়ের অখ্যাতিটা আছে বটে। তাঁহার মুখে এক বিচিত্র করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। মনে পড়িয়া গেল সেদিনের কথা, রামেশ্বরের পিতামহী বলিয়া-ছিলেন রাধারাণীর প্রসঙ্গে, রায়-বাড়ির মেয়ের ধারাই ওই, চিরকেলে জাঁহাবাজ!

হেমাঙ্গিনী স্বামীর মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, স্বামী কথাটায় আহত হইয়াছেন, তিনি অপ্রতিভ হইয়া স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য ব্যাকুল হইয়া দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, রাগ করলে?

পত্নীর কণ্ঠে সাদরে একখানি হাত ন্যস্ত করিয়া রায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, না না, তুমি সত্যি কথা বলেছ।

প্রৌঢ়-দম্পতির উভয়ের চোখে অনুরাগভরা দৃষ্টি। কিন্তু সহসা চমকাইয়া উঠিয়া দুইজনেই পরস্পরকে ছাড়িয়া দিলেন। এ কি, এত গোলমাল কিসের? গ্রামের মধ্যে কোথাও একটা প্রচণ্ড কলরব উঠিতেছে! কোথাও আগুন লাগিল নাকি? রায় বিছানা ছাড়িয়া নামিয়া ব্যস্ত হইয়া কাপড় ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কর্তাবাবু!—নীচে কে ডাকিল, নায়েব মিত্র বলিয়াই মনে হইতেছে।

কে? মিত্তির?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

গোলমাল কিসের মিত্তির?

আজ্ঞে, রামেশ্বরবাবুর বড় ছেলে মহীন্দ্রবাবু ননী পালকে গুলি ক'রে মেরে ফেলেছেন।

রায় কাপড় পরিতেছিলেন, সহসা তাঁহার হাত স্তব্ধ হইয়া গেল, তিনি অদ্ভুত দৃষ্টিতে হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিলেন। হেমাঙ্গিনীর চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল, তিনি বলিলেন, তুমি করলে কি? ছি ছি!

রায় দ্রুতপদে নামিয়া গেলেন।

৭

মহীন্দ্র যোগেশ মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া পূর্বদিন রাত্রেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বার্তা নাকি বায়ুর আগে পৌঁছিয়া থাকে—এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও মিথ্যা বলিয়া একেবারেই অস্বীকার করা চলে না। পঞ্চাশ মাইল দূরে বহির্জগতের সহিত ঘনিষ্ঠসম্পর্কহীন একখানি পল্লীগ্রামেও কেমন করিয়া কথাটা গিয়া পৌঁছিল, তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। সুনীতির পত্রও তখন গিয়া পৌঁছে নাই। সরীসৃপ-সঙ্কুল জঙ্গলে পরিপূর্ণ চরটায় নাকি সাঁওতালরা আসিয়া সব সাফ করিয়া ফেলিয়াছে, আশেপাশের চাষীরা নাকি চরের মাটি দেখিয়া বন্দোবস্ত লইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে; এমন কি শহর-বাজার হইতে সঙ্গতিপন্ন লোকেও চরের জমি বন্দোবস্ত পাইবার জন্য প্রচুর সেলাম দিতে চাহিতেছে—এমনিধারা স্ফীত-কলেবর অনেক সংবাদ। শেষ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুতর সংবাদ—চর দখল করিবার জন্য রায়-বংশীয়েরা কৌরবের মত একাদশ অক্ষৌহিণী সমাবেশের আয়োজন করিতেছে; চক্রবর্তী-বাড়ির কাহাকেও নাকি ও-চরের মাটিতে পদার্পণ করিবার পর্যন্ত অধিকার দেওয়া হইবে না।

উত্তেজনায় মহীন্দ্র উৎসাহিত হইয়া উঠিল। এই ধরনের উত্তেজনায় মহীন্দ্রের যেন একটা অধীরতা জাগিয়া উঠে। সে মজুমদারকে বলিল, থাক এখানকার কাজ এখন। চলুন আজই বাড়ি যাব।

মজুমদার বলিল, সেখান থেকে একটা সংবাদই আসুক, সেখানে যখন মা রয়েছেন—

মহীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, মা কখনও সংবাদ দেবেন না, তিনি এসব বোঝেনই না, তা ছাড়া তাঁর একটা ভয়ঙ্কর ভয়—বিবাদ হবে। চরে একবার খানকয়েক লাঙল ফেরাতে পারলেই আমাদের কঠিন মামলায় পড়তে হবে। তখন সেই টাইটেল সুটে যেতে হবে।

মজুমদার আর আপত্তি করিতে পারিল না, সেই দিনই তাহারা রওনা হইয়া প্রায় শেষ-রাত্রে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। অহীন্দ্র এবং সুনীতির কাছে চরের বৃত্তান্ত শুনিয়া মহীন্দ্র খুশী হইয়া উঠিল। মজুমদার হাসিয়া বলিল, তবে তো ও আমাদের হয়েই গিয়েছে; সাঁওতালরা

যখন রাঙাবাবুকে ছাড়া খাজনা দেবে না বলেছে, তখন তো দখল হয়েই গেল। চরটার নাম দিতে হবে কিন্তু রাঙাবাবুর চর, সেরেস্তাতে আমরা ওই বলেই পত্তন করব।

মহীন্দ্র বলিল, না, ঠাকুরদাদার নামেই হোক—রাঙাঠাকুরের চর। আর কাল সকালেই চাপরাসী নিয়ে যান ওখানে, বলে দিন সাঁওতালদের, কেউ যেন রায়েদের ডাকে না যায়। যে যাবে তার জরিমানা হবে, তাতে রায়েরা জোর করে, আমরা তার প্রতিকার করব।

অহীন্দ্র এবার বলিল, না, সে হবে না দাদা। মহীন্দ্রকে সে ভয় করে, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না।

মহীন্দ্র রুক্ষদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, কেন ?

আমি ও-বাড়ির মামার কাছে কথা দিয়েছি···

ও-বাড়ির মামা ? কে ও-বাড়ির মামা ? ইন্দ্র রায় বুঝি ? সম্বন্ধটা পাতিয়ে দিয়েছেন বুঝি মা ? বাঃ চমৎকার !

সুনীতি অহীন্দ্র দুজনেই নীরব হইয়া এ তিরস্কার সহ্য করিলেন। মহীন্দ্র আবার বলিল, তারপর—কথাই বা কিসের ? আমাদের ন্যায্য সম্পত্তি, তিনি আমার অনুপস্থিতিতে সাঁওতালদের হুমকি দিয়ে দখল ক'রে নেবেন, আর তুমি একটা দুগ্ধপোষ্য বালক, তুমি না জেনে কথা দিয়েছ, সে কথা আমায় মানতে হবে ?

অহীন্দ্র আবার সবিনয়ে বলিল, ওঁরাও তো বলেছেন, চর আমাদের।

ওঁরা যদি কাল এসে বলেন, ওই বাড়িখানা আমাদের—

অহীন্দ্র এ কথার জবাব দিতে পারিল না। সুনীতি অন্তরে অন্তরে অহীন্দ্রকে সমর্থন করিলেও মুখ ফুটিয়া মহীন্দ্রের কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। মজুমদার কৌশলী ব্যক্তি, সে অহীন্দ্রের মুখ দেখিয়া সুকৌশলে একটা মীমাংসা করিয়া দিল, বলিল, বেশ তো গো, অহিবাবু যখন কথাই দিয়েছেন, তখন কথা আমরা রাখব। ছোট রায় মশায় তলব পাঠালে আমি নিজে সাঁওতালদের নিয়ে যাব। দেখিই না, তিনি কি করতে পারেন।

মহীন্দ্র চুপ করিয়া রহিল ; কথাটা সুসংগত এবং যুক্তির দিক দিয়াও সুযুক্তিপূর্ণ, তবু তাহার মন ইহাতে ভাল করিয়া সায় দিল না।

মজুমদার বলিল, তা ছাড়া মুখোমুখি কথা ক'য়েই দেখি না, কোন্ মুখে চরটা তিনি আপনার ব'লে 'কেলেম' (claim) করেন।

সুনীতি বলিলেন, এটা খুবই ভাল কথা মহীন, এতে আর তুমি আপত্তি ক'রো না।

মহীন্দ্র এবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলিল, তাই হবে। কিন্তু অহি কালই চ'লে যাক স্কুলে, ওর এ-ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। আর একটা কথা, ওরকম-ধারার সম্বন্ধ পাতাবার চেষ্টা যেন আর করা না হয় ; তিন পুরুষ ধ'রে ওঁরা আমাদের শত্রুতা ক'রে আসছেন।

তাহাই হইল, অহীন্দ্র ভোরে উঠিয়া স্কুলে চলিয়া গেল। সকালেই মজুমদার সাঁওতালদের সঙ্গে লইয়া ইন্দ্র রায়ের কাছারিতে উপস্থিত হইল ; এবং শেষ পর্যন্ত ইন্দ্র রায়ের দ্বন্দ্বঘোষণা মর্যাদার সহিত গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মজুমদারের মুখে সমস্ত শুনিয়া মহীন্দ্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, খুব ভাল ব'লে এসেছেন। মায়ের যেমন, তিনি ভাবেন, দুনিয়াভোর মানুষের অন্তর বুঝি তাঁর মতন। ব'লে আসুন তাঁকে, তাঁর ও-বাড়ির দাদার কথাটা ব'লে আসুন।

মজুমদার বলিল, না না মহীবাবু, ও-কথা মাকে ব'লো না ; তিনি আপনাদের ভালর জন্যই বলেন, আর ঝগড়া-বিবাদে তাঁর ভয়ও হয় তো।

মহীন্দ্র বলিল, সেটা ঠিক কথা। ভয়টা তাঁর খুবই বেশী, জমিদারি ব্যাপারটাই হ'ল ওঁর ভয়ের কথা, ওঁর বাপেদের তিন পুরুষ হ'ল চাকরে।

মজুমদার এ-প্রসঙ্গে আর কথা বাড়াইল না। মহীন্দ্রকে সে ভাল করিয়াই জানে। প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করিয়া সে বলিল, বাবুর সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার।

এবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মহীন্দ্র বলিল, আজ সকালে আমি তাঁর ঘরে গিয়েছিলাম, তাঁকে দেখে আমার বুক ফেটে গেল মজুমদার-কাকা, তিনি বোধ হয় সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছেন।

মজুমদার স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, মহীন্দ্রও নীরব। এই স্তব্ধ অবসরের মধ্যে কলরব করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল একদল সাঁওতালদের ছেলেমেয়ে। হাতে তীর ও ধনুক, একজনের ধনুকের প্রান্তে দুইটা সদ্যনিহত ছোট জন্তু ঝুলিতেছিল। এখনও জন্তু দুইটার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ঝরিতেছে। ছেলেদের পিছনে কয়টি তরুণী মেয়ে ; মেয়েদের মধ্যে কমল মাঝির নাতনী, সেই দীর্ঘাঙ্গী তরুণীটি ছিল সকলের আগে। সমগ্র দলটি মহীন্দ্র ও মজুমদারকে দেখিয়া অকস্মাৎ যেন স্তব্ধ হইয়া গেল।

মজুমদার ও মহীন্দ্র একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিল, ইহাদের আকস্মিক আগমনে তাহাদের মনে হইল, ইন্দ্র রায় আবার কোনও গোলমাল বাধাইয়া তুলিয়াছেন। মহীন্দ্র মজুমদারকেই প্রশ্ন করিল, আবার কি হ'ল ? রায়েরা আবার কোনও গোলমাল বাধিয়েছে নিশ্চয়।

মজুমদার প্রশ্ন করিল সমগ্র দলটিকে লক্ষ্য করিয়া, কি রে, কি বলছিস তোরা ?

সমগ্র দলটি আপনাদের ভাষায় আপনাদেরই মধ্যে কি বলিয়া উঠিল। মজুমদার আবার বলিল, কি বলছিস, বাঙালী কথায় বল কেনে ?

দীর্ঘাঙ্গী তরুণীটি বলিল, বুলছি, আমাদের বাবুটি কুথা গো ?

হাসিয়া মজুমদার বলিল, এই যে বড়বাবু রয়েছেন। বল্ না, কি বল্ছিলি ?

উ কেনে হবে গো ? সি আমাদের রাঙাবাবু, সি বাবুটি কুথা গো ?

তিনি পড়তে চ'লে গেছেন ইস্কুলে, সেই শহরে। ইনি হলেন বড়বাবু, ইনি হলেন মালিক —মরংবাবু।

কেনে, তা কেনে হবে ?

মজুমদার হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা একগুঁয়ে বোকা জাত! যা ধরবে, তা আর ছাড়বে না। তা কেনে হবে ? তাই হয় রে, তাই হয়। ইনি বড় ভাই, তিনি ছোট ভাই। বুঝলি ?

হুঁ, সিটি তো আমরা দেখছি। ইটিও সেই তেমুনি, সিটির পারা বটে। তা সিটিই তো আমাদের রাঙাবাবু। উয়ার লেগে আমরা সুস্মুরে মেরে এনেছি।

মহীন্দ্র উৎসাহিত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, সুস্মুরে—খরগোশ! কই, দেখি দেখি!

তাহারা এবার খরগোশ দুইটা আনিয়া কাছারির বারান্দায় নামাইয়া দিল। ধূসর রঙের বন্য খরগোশ—সাধারণ পোষা খরগোশ হইতে আকারে অনেকটা বড়। মহীন্দ্র বলিল, বাঃ, এ যে অনেক বড়, এদের রঙটাও মাটির মত। এ পেলি কোথায় তোরা? সেই মেয়েটি বলিল, কেনে, আমাদের ওই নদীর চরে, মেলাই আছে। শিয়াল আছে, খটাস খেঁকশিয়াল আছে, সুস্মুরে আছে, তিতির আছে, আমরা মারি, পুড়িয়ে খাই।

মহীন্দ্র আরও বেশী উৎসাহিত হইয়া উঠিল, শিকারে তাহার প্রবল আসক্তি, নেশা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে বলিল, তা হ'লে চলুন মজুমদার-কাকা, আজ বিকেলে যাব শিকার করতে; চরটাও দেখা হবে, শিকারও হবে, কি বলেন?

বেশ তো।

মেয়েটি বলিল, তু যাবি? বন্দুক নিয়ে যাবি? মারতে পারবি? খুঁজে বার করতে পারবি?

হাসিয়া মহীন্দ্র বলিল, আচ্ছা, সে তখন দেখবি তোরা। যা তোরা, সর্দার-মাঝিকে বলবি, আমরা বিকেলে যাব।

সে আমাদের রাঙাবাবুটি? তাকে নিয়ে যাবি না?

সে যে নেই এখানে।

কেনে, সে আসবে না কেনে? তুরা তাকে নিয়ে যাবি না কেনে?

মজুমদার হাসিয়া ফেলিলেন, কি আপদ!

কেনে, কি করলাম আমরা? উ কেনে বলছিস তু?

আচ্ছা, বাবু এলে তাকে নিয়ে যাব। তোরা যা এখন।

এবার তাহারা আশ্বাস পাইয়া সোৎসাহে আপন ভাষায় কলরব করিয়া উঠিল। মেয়েটিই দলের নেত্রী, সে বলিয়া উঠিল, দেলা—দেলা বোঁ! অর্থাৎ—চল্ চল্ চল্।

মহীন্দ্র কাছারি-ঘরে ঢুকিয়া বন্দুকটা বাহির করিয়া আনিল। নলের মুখটা ভাঁজিয়া ভিতর দেখিয়া বলিল, বড্ড অপরিষ্কার হয়ে আছে। সে বন্দুকের বাক্সটা বাহির করিয়া আনিয়া বন্দুকের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইল।

ইন্দ্র রায়ের এই কাজটি অচিন্ত্যবাবুর মনঃপূত হয় নাই; তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই প্রাতঃকাল পর্যন্ত তিনি গাছ-গাছড়া চালানের লাভক্ষতি কষিয়া রায়কে বুঝাইয়াছেন, রায়ও আপত্তি করেন নাই, বরং উৎসাহই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সেই লাভকে উপেক্ষা করিয়া অকস্মাৎ তিনি কেন যে চর বন্দোবস্ত করিলেন, তাহার কারণ তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

আর ননী পালের মত দুর্দান্ত ব্যক্তিকে বিনা পণে চর বন্দোবস্ত করিয়া প্রশ্রয় দেওয়ার হেতুও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ওই লোকটার জন্য সমগ্র চরটা দুর্গম হইয়া উঠিল, কে উহার সহিত ঝগড়া করিতে যাইবে? তাহার সীমানা বাদ দিয়া চরে পদার্পণ করিলেও ননী বিবাদ করিবেই। সেই বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে করিতেই তিনি পথ দিয়া চলিয়াছেন।

হ'ল, বেশই হ'ল, উত্তম হ'ল, খুবই ভাল করলেন। ওখানে আর কেউ যাবে? থাকল ওই সমস্ত জায়গা প'ড়ে। গেলেই, ও গোঁয়ার চপেটাঘাত না ক'রে ছাড়বে না। বাব্বাঃ, আমি আর যাই! সর্বনাশ! কোন্‌দিন পাষণ্ড আমাকে একেবারে এক চড়ে খুনই ক'রে ফেলবে। এক মনেই বকিতে বকিতে তিনি চলিয়াছেন। চক্রবর্তীবাবুদের কাছারির বারান্দায় মজুমদার হাসিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, কি হ'ল অচিন্ত্যবাবু, হঠাৎ চটে উঠলেন কেন মশায়?

হঠাৎ? অচিন্ত্যবাবু যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, হঠাৎ? বলেন কি মশায়, আজ তিন দিন তিন রাত্রি ধরে, হিসেব ক'ষে লাভ-লোকসান দেখলাম, টু হাণ্ড্রেড পারসেন্ট লাভ। কলকাতার সাত-আটটা ফার্মকে চিঠি লিখলাম সাত-আট আনা খরচ ক'রে; আর আপনি বলেন হঠাৎ?

মজুমদার বলিলেন, সে-সব আমরা কেমন ক'রে—

বাধা দিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, ঠিক কথা, আমারই ভুল, কেমন ক'রে জানবেন আপনারা। তবে শুনুন, আপনাদের এই ইন্দ্র রায় মশায় একটা 'ডেঞ্জারাস গেমে' হাত দিয়েছেন। বাঘ নিয়ে খেলা, ননী পাল সাক্ষাৎ একটি ব্যাঘ্র।—বলিয়া সবিস্তারে সমস্ত ঘটনাটা বর্ণনা করিয়া পরিশেষে ক্ষোভে দুঃখে ভদ্রলোক প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন—মশায়, তিনটি রাত্রি আমি ঘুমই নি। দশ রকম ক'রে দশবার আমি লাভ-লোকসান ক'ষে দেখেছি। বেশ ছিলাম, বদহজম অনেকটা ক'মে এসেছিল, এই তিন রাত্রি জেগে আমার বদহজম আবার বেড়ে গেল।—কথা বলিতে বলিতেই যেন রোগটা তাঁহার বাড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে গোটা কয়েক ঢেকুর তুলিয়া তিনি বলিলেন, ভাস্কর লবণ খানিক না খেলে এইবার গ্যাস হবে। যাই, তাই খানিকটা খাইগে। গ্যাসে হার্টফেল হওয়া বিচিত্র নয়। ভদ্রলোক উঠিয়া পড়িলেন এবং ক্রমাগত উদগার তুলিতে তুলিতে চলিয়া গেলেন।

মহীন্দ্র বন্দুক ফেলিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, চাপরাসীদের ব'লে দিন—ননী পাল রায়েদের কাছারি থেকে বেরুলেই যেন তাকে ধ'রে নিয়ে আসে।

* * *

মজুমদার খুব ভাল করিয়াই বলিলেন—আদেশের সুরে নয়, অনুরোধ জানাইয়াই বলিলেন, দেখ ননী, এ-কাজটা করা তোমার উচিত হবে না। এ আমাদের শরিকে শরিকে বিরোধ, এর মধ্যে তোমার যোগ দেওয়া কি ভাল?

ননী নখ দিয়া নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, তা মশায়, ইয়ের ভালমন্দ কি? সম্পত্তি রাখতে গেলেও ঝগড়া, সম্পত্তি করতে গেলেও ঝগড়া। সে ভেবে সম্পত্তি কে আর ছেড়ে দেয় বলুন?

মহীন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলিল, দেখ ননী, ও সম্পত্তি হ'ল আমার, ওটা ইন্দ্র রায়ের নয়। তোমাকে আমি বারণ করছি, তুমি এর মধ্যে এসো না।

মহীন্দ্রের স্বরগাম্ভীর্যে ননী রুক্ষ হইয়া উঠিল, সে বলিল, সম্পত্তি আপনার, তারই বা ঠিক কি ?

আমি বলছি।

সে তো রায় মশায়ও বলেছেন, সম্পত্তি তেনার।

তিনি মিথ্যা কথা বলছেন।

আর আপনি সত্যি বলছেন !—ব্যঙ্গভরে ননী বলিয়া উঠিল।

মহীন্দ্র বলিল, চক্রবর্তী-বংশ তেমন নীচ নয়, তারা মিথ্যে কথা বলে না, বুঝলে ?

ননী পাল প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল, ইন্দ্র রায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মহীন্দ্রকে অপমান করিবার সঙ্কল্প লইয়াই ডাকিবামাত্র সে এখানে প্রবেশ করিয়াছিল। সে এবার বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে সব আমরা খুব জানি, চাকলাটার লোকই জানে ; চক্রবর্তী-গুষ্টির কথা আবার জানে না কে ?

মহীন্দ্র রাগে আরক্তিম হইয়া বলিল, কি ? কি বলছিস তুই ?

মুখভঙ্গী করিয়া ননী বলিল, বলছি তোমার সৎমায়ের কথা হে বাপু, বলি, যার মা চ'লে যায়—

মুহূর্তে একটা প্রলয় ঘটিয়া গেল। অসহনীয় ক্রোধে মহীন্দ্র আত্মহারা হইয়া অভ্যস্ত হাতে ক্ষিপ্রতার সহিত বন্দুকটা লইয়া টোটা পুরিয়া ঘোড়াটা টানিয়া দিল। ননী পালের মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল, রক্তাপ্লুত দেহে মুখ গুঁজিয়া সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। বন্দুকের শব্দে, বারুদের গন্ধে, ধোঁয়ায়, রক্তে, সমস্ত কিছু লইয়া সে এক ভীষণ দৃশ্য। মজুমদার যেন নির্বাক মূক হইয়া গেল, থরথর করিয়া সে কাঁপিতেছিল। মহীন্দ্রও নীরব, কিন্তু সেই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বন্দুকটা হাতে লইয়াই উঠিয়া বলিল, আমি চললাম কাকা, থানায় সারেণ্ডার করতে।

মজুমদার একটা কিছু বলিবার চেষ্টায় বার কয়েক হাত তুলিল, কিন্তু মুখে ভাষা বাহির হইল না। মহীন্দ্র মায়ের সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করিল না ; চৈত্রের উত্তপ্ত অপরাহ্ণে সে দৃঢ় পদক্ষেপেই ছয় মাইল দূরবর্তী থানায় আসিয়া বলিল, আমি ননী পাল ব'লে একটা লোককে গুলি করে মেরেছি।

৮

বজ্রের আঘাতের মত আকস্মিক নির্মম আঘাতে সুনীতির বুকখানা ভাঙিয়া গেলেও তাঁহার কাঁদিবার উপায় ছিল না। সন্তানের বেদনায় আত্মহারা হইয়া লুটাইয়া পড়িবার শ্রেষ্ঠ স্থান

হইল স্বামীর আশ্রয়। কিন্তু সেইখানেই সুনীতিকে জীবনের এই কঠিনতম দুঃখকে কঠোর সংযমে নিরুচ্ছ্বসিত স্তব্ধ করিয়া রাখিতে হইল। অপরাহ্নে কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল, সুনীতি সমস্ত অপরাহ্নটাই মাটির উপর মুখ গুঁজিয়া মাটির প্রতিমার মত পড়িয়া রহিলেন, সন্ধ্যাতে তিনি গৃহলক্ষ্মীর সিংহাসনের সম্মুখে ধূপপ্রদীপ দিতে পর্যন্ত উঠিলেন না। সন্ধ্যার পরই কিন্তু তাঁহাকে উঠিয়া বসিতে হইল। মনে পড়িয়া গেল—তাঁহারই উপর একান্ত-নির্ভরশীল স্বামীর কথা। এখনও তিনি অন্ধকারে আছেন, দুপুরের পর হইতে এখনও পর্যন্ত তিনি অভুক্ত। যথাসম্ভব আপনাকে সংযত করিয়া সুনীতি রামেশ্বরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। বন্ধ ঘরে গুমোট গরম উঠিতেছিল, প্রদীপ জ্বালিয়া সুনীতি ঘরের জানালা খুলিয়া দিলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিতে পারেন নাই, স্বামীর মুখ কল্পনামাত্রেই তাঁহার হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল। এবার কঠিনভাবে মনকে বাঁধিয়া তিনি স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন,—দেখিলেন গভীর আতঙ্কে রামেশ্বরের চোখ দুইটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে, নিস্পন্দ মাটির পুতুলের মত বসিয়া আছেন। সুনীতির চোখে চোখ পড়িতেই তিনি আতঙ্কিত চাপা কণ্ঠস্বরে বলিলেন, মহীনকে লুকিয়ে রেখেছ ?

সুনীতি আর যেন আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। দাঁতের উপর দাঁতের পাটি সজোরে টিপিয়া ধরিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রামেশ্বর আবার বলিলেন, খুব অন্ধকার ঘরে, কেউ যেন দেখতে না পায় !

আবেগের উচ্ছ্বাসটা কোনমতে সম্বরণ করিয়া এবার সুনীতি বলিলেন, কেন, মহী তো আমার অন্যায় কাজ কিছু করে নি, কেন সে লুকিয়ে থাকবে ?

তুমি জান না, মহী খুন করেছে—খুন !

জানি।

তবে ! পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে যে !

সুনীতির বুকে ধীরে ধীরে বল ফিরিয়া আসিতেছিল, তিনি বলিলেন, মহী নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। সে তো আমার কোন অন্যায় কাজ করে নি, কেন সে চোরের মত আত্মগোপন ক'রে ফিরবে ? সে তার মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে, সন্তানের যোগ্য কাজ করেছে।

অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে সুনীতির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া রামেশ্বর বলিলেন, তুমি ঠিক বলেছ। মণিপুর-রাজনন্দিনীর অপমানে তার পুত্র বভ্রুবাহন পিতৃবধেও কুণ্ঠিত হয় নি। ঠিক বলেছ তুমি !

গাঢ়স্বরে সুনীতি বলিলেন, এই বিপদের মধ্যে তুমি একটু খাড়া হয়ে ওঠ, তুমি না দাঁড়ালে আমি কাকে আশ্রয় ক'রে চলাফেরা করব ? মহীর বিচারের মকদ্দমায় কে লড়বে ? ওগো, মনকে একটু শক্ত কর, মনে ক'রো কিছুই তো হয় নি তোমার।

রামেশ্বর ধীরে ধীরে খাট হইতে নামিয়া খোলা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুনীতি বলিলেন, আমার কথা শুনলে ?

সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে বার বার ঘাড় নাড়িয়া রামেশ্বর বলিলেন, হুঁ।

সুনীতি বলিলেন, হ্যাঁ, তুমি শক্ত হয়ে দাঁড়ালে মহীর কিছু হবে না। মজুমদার ঠাকুরপো আমায় বলেছেন, এরকম উত্তেজনায় খুন করলে ফাঁসি তো হয়ই না, অনেক সময় বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।

বলিতে বলিতে তাঁহার ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—ননী পালের রক্তাক্ত নিস্পন্দ দেহ। উঃ, সে কি রক্ত! কাছারি-বাড়ির বারান্দাটায় রক্ত জমিয়া একটা স্তর পড়িয়া গিয়াছিল। সুনীতির মন হতভাগ্য ননী পালের জন্য হাহাকার করিয়া উঠিল। মহীন অন্যায় করিয়াছে, অপরাধ করিয়াছে। দণ্ড দিতে গিয়া মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে। সেইটুকুর জন্য শাস্তি তাহার প্রাপ্য, এইটুকু শাস্তিই যেন সে পায়। আত্মহারা নির্বাক হইয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পর মানদা ঘরের বাহির হইতে তাঁহাকে ডাকিল, মা!

সুনীতির চমক ভাঙিল, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, যাই।

উনোনের আঁচ ব'য়ে যাচ্ছে মা।

আত্মসম্বরণ করিয়া সুনীতি স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

রামেশ্বর একদৃষ্টিতে বাহিরে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার জন্য সন্ধ্যাকৃত্যের জায়গা করিয়া দিয়া সুনীতি বলিলেন, কাপড় ছেড়ে নাও, সন্ধ্যে ক'রে ফেল। আমি দুধ গরম ক'রে নিয়ে আসি।

রামেশ্বর বলিলেন, একটা কথা ব'লে দিই তোমাকে। তুমি—

সুনীতি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, বল, কি বলছ?

তুমি একমনে তোমার দিদিকে ডাক—মানে রাধারাণী, রাধারাণী। সে বেঁচে নেই, ওপার থেকে সে তোমার ডাক শুনতে পাবে। বল—তোমার মান রাখতেই মহীর আমার এই অবস্থা, তুমি তাকে আশীর্বাদ করো, বাঁচাও।

সুনীতি বলিলেন, ডাকব, তাঁকে ডাকব বইকি।

• * * *

সুনীতি নীচে আসিয়া দেখিলেন, মজুমদার তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে। সে মহীন্দ্রের খবর জানিবার জন্য থানায় গিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াই সুনীতির ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার চোখের সম্মুখে শৃঙ্খলবদ্ধ মহীর বিষণ্ণ মূর্তি ভাসিয়া উঠিল। মুখে তিনি কোন প্রশ্ন করিতে পারিলেন না, কিন্তু মজুমদার দেখিল, উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন মূর্তিমতী হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

সে নিতান্ত মূর্খের মত খানিকটা হাসিয়া বলিল, দেখে এলাম মহীকে।

তবু সুনীতি নীরব প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। মজুমদার অকারণে কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া আবার বলিল, এতটুকু ভেঙে পড়ে নি, দেখলাম। আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়াও সুনীতির নিকট হইতে সরব কোন প্রশ্ন আসিল না দেখিয়া বলিল, থানার দারোগাও

কোন খারাপ ব্যবহার করে নি। আবার সে বলিল, আমি সব জেনে এলাম, থানায় কি এজাহার দিয়েছেন, তাও দেখলাম। একটাও মিথ্যে বলেন নি।

সুনীতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, আর কোন জীবন-স্পন্দন স্ফুরিত হইল না।

মজুমদার বলিল, দারোগা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন বরং, লোকটা কি বলেছিল বলুন তো? মহীবাবু সে কথা বলেন নি। দারোগা কথাটা জানতে চেয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছেন, সে কথা আমি যদি উচ্চারণই করব, তবে তাকে গুলি করে মেরেছি কেন? আমি বললাম সব।

সুনীতি এতক্ষণে কথা কহিলেন, ছি!

মাথা হেঁট করিয়া মজুমদার বলিল, না বলে যে উপায় নেই বউ-ঠাকরুন, মহীকে বাঁচানো চাই তো!

দরদর করিয়া এবার সুনীতির চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, মজুমদার প্রাণপণে তাঁহাকে উৎফুল্ল করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ভাববেন না আপনি, ও-মামলায় কিছু হবে না মহীর। দারোগাও আমাকে সেই কথা বললেন।

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে সুনীতি প্রশ্ন করিলেন, মহী কিছু বলে নি?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মজুমদার বলিলেন, বললেন—মাকে বলবেন, তিনি যেন না কাঁদেন। আমি অন্যায় কিছু করি নি। বড়মাকে দেখি নি, মা বললেই মাকে মনে পড়ে। সে শয়তান যখন মায়ের নাম মুখে আনলে, তখন মাকেই আমার মনে প'ড়ে গেল, আমি তাকে গুলি করলাম। আমার তাতে একবিন্দু দুঃখ নেই, ভয়ও করি না আমি। তবে মা কাঁদলে আমি দুঃখ পাব।

সুনীতি বলিলেন, কাল যখন যাবে ঠাকুরপো, তখন তাকে ব'লো, যেন মনে মনে তার বড়মাকে ডাকে, প্রণাম করে। বলবে, তার বাপ এই কথা ব'লে দিয়েছেন, আমিও বলছি।

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া মজুমদার বলিল, অনেকগুলি কথা আছে আপনার সঙ্গে। স্থির হয়ে ধৈর্য ধরে আপনাকে শুনতে হবে।

সুনীতি বলিলেন, আমি কি ধৈর্য হারিয়েছি ঠাকুরপো?

অপ্রস্তুত হইয়া মজুমদার বলিল, না—মানে, মামলা-সংক্রান্ত পরামর্শ তো। মাথা ঠিক রেখে করতে হবে, এই আর কি!

আচ্ছা, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ওঁকে দুধটা গরম ক'রে খাইয়ে আসি। যাইতে যাইতে সুনীতি দাঁড়াইলেন, ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে মানদাকে ডাকিলেন, মানদা, বামুন-ঠাকরুনকে বল্ তো মা, মজুমদার-ঠাকুরপোকে একটু জল খেতে দিক। আর তুই হাত-পা ধোবার জল দে।

মজুমদার বলিল, শুধু এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল।

তৃষ্ণায় তাহার ভিতরটা যেন শুকাইয়া গিয়াছে।

স্বামীকে খাওয়াইয়া সুনীতি নীচে আসিয়া মজুমদারের অল্প দূরে বসিলেন। যোগেশ মাথায় হাত দিয়া গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতেছিল। সুনীতি বলিলেন, কি বলছিলে, বল ঠাকুরপো?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মজুমদার বলিল, মামলার কথাই বলছিলাম। আমার খুব ভরসা বউঠাকরুন, মহীর এতে কিছু হবে না। দারোগাও আমাকে ভরসা দিলেন।

সে তো তুমি বললে ঠাকুরপো।

হ্যাঁ। কিন্তু এখন দু'টি ভাবনার কথা, সে কথাই বলছিলাম।

কি কথা বল ?

মামলায় টাকা খরচ করতে হবে, ভাল উকিল দিতে হবে। আর ধরুন, দারোগা-টারোগাকেও কিছু দিলে ভাল হয়।

সুনীতি প্রশ্ন করিলেন, ঘুষ ?

হ্যাঁ, ঘুষই বৈকি। কাল যে কলি বউঠাকরুন। তবে আমরা তো আর ঘুষ দিয়ে মিথ্যা করাতে চাই না।

কত টাকা চাই ?

তা হাজার দুয়েক তো বটেই, মামলা-খরচ নিয়ে।

আমার গহনা আমি দেব ঠাকুরপো, তাই দিয়ে এখন তুমি খরচ চালাও।

ইতস্তত করিয়া মজুমদার বলিল, আমি বলছিলাম চরটা বিক্রি ক'রে দিতে। অপয়া জিনিস, আর খদ্দেরও রয়েছে। আজই থানার ওখানে একজন মারোয়াড়ী মহাজন আমাকে বলছিল কথাটা।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সুনীতি বলিলেন, ওটা এখন থাক ঠাকুরপো, এখন তুমি গহনা নিয়েই কাজ কর। পরে যা হয় হবে। আর কি বলছিলে, বল ?

আর একটা কথা বউঠাকরুন, এইটেই হ'ল ভয়ের কথা! ছোট রায় মশায় যদি বেঁকে দাঁড়ান!

সুনীতি নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন, এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না।

মজুমদার বলিল, আপনি একবার ওঁদের বাড়ি যান।

সুনীতি নীরব।

মজুমদার বলিল, মহীর বড়মা ধরুন মা-ই ; কিন্তু তিনি তো রায় মহাশয়ের সহোদরা। ননী পাল তাঁর আশ্রিত, কিন্তু সে কি তাঁর সহোদরার চেয়েও বড় ?

সুনীতি ধীরে ধীরে বলিলেন, কিন্তু মহী তো তাঁর সহোদরার অপমানের শোধ নিতে এ কাজ করে নি ঠাকুরপো!

কিন্তু কথা তো সেই একই !

ম্লান হাসি হাসিয়া সুনীতি বলিলেন, একই যদি হয় তবে কৈফিয়ৎ দেবার জন্য কি আমার যাবার প্রয়োজন আছে ঠাকুরপো ? তাঁর মত লোক এ কথা কি নিজেই বুঝতে পারবেন না ?

মজুমদার চুপ করিয়া গেল, আর সে বলিবার কথা খুঁজিয়া পাইল না। সুনীতি আবার বলিলেন, যে কাজ মহী করলে ঠাকুরপো, বিনা কারণে সে কাজ করলে ভগবানও তাকে ক্ষমা

করেন না। কিন্তু যে কারণে সে করেছে, সেই কারণটা আজ বড় হয়ে কর্মের পাপ হাল্‌কা ক'রে দিয়েছে। এ কারণ যে না বুঝবে, তাকে কি ব'লে বোঝাতে যাব আমি? আবার কিছুক্ষণ পর বলিলেন, আর মহীর কাছে মহীর মা বড়। রায় মশায়ের কাছে তাঁর ভগ্নী বড়। মহী মায়ের অপমানে যা করবার করেছে; এখন রায় মশায় তাঁর ভগ্নীর জন্যে যা করা ভাল মনে করেন, করবেন। এতে আর আমি গিয়ে কি করব, বল?

*   *   *

গভীর রাত্রি; গ্রামখানা সুষুপ্ত। রামেশ্বর বিছানায় শুইয়া জাগিয়াই ছিলেন। অদূরে স্বতন্ত্র বিছানায় সুনীতি অসাড় হইয়া আছেন, তিনিও জাগিয়া মহীন্দ্রের কথাই ভাবিতেছিলেন। মায়ের অপমানের শোধ লইতে মহা বীরের কাজ করিয়াছে, এ যুক্তিতে মনকে বাঁধিলেও প্রাণ সে বাঁধন ছিঁড়িয়া উন্মত্তের মত হাহাকার করিতে চাহিতেছে; বুকের মধ্যে অসহ্য বেদনার বিক্ষোভ চাপিয়া তিনি অসাড় হইয়া পড়িয়া ছিলেন। শয়নগৃহে স্বামীর বুকের কাছে থাকিয়াও প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া সে বিক্ষোভ লঘু করিবার উপায় নাই। রামেশ্বর জাগিয়া উঠিলে বিপদ হইবে, তিনি অধীর হইয়া পড়িবেন, বিপদের উপর বিপদ ঘটিয়া যাইবে।

পূর্বাকাশের দিক্‌চক্রবালে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠিতেছিল। খোলা জানালা দিয়া আলোর আভাস আসিয়া ঘরে ঢুকিতেছে। রামেশ্বর অতি সন্তর্পণে খাট হইতে নামিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন, ঘুমন্ত সুনীতির বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটাইবার জন্যই তাঁহার এ সতর্কতা। জানালা দিয়া নীচে মাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি কয়েক পা পিছাইয়া আসিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, উঃ, ভয়ানক উঁচু!

সুনীতি শিহরিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া তাঁহাকে ধরিলেন, বলিলেন, কি করছ?

রামেশ্বর ভীষণ আতঙ্কে চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, কে?

সুনীতি তাড়াতাড়ি বলিলেন, আমি, আমি, ভয় নেই, আমি!

কে? রাধারাণী?

না, আমি সুনীতি।

আশ্বস্ত হইয়া রামেশ্বর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ও, এখনও ঘুমোও নি তুমি? রাত্রি যে অনেক হ'ল সুনীতি!

সুনীতি বিচিত্র হাসি হাসিলেন। বলিলেন, তুমি ঘুমোও নি যে? এস, শোবে এস।

আমার ঘুম আসছে না সুনীতি। শুয়ে হঠাৎ রামায়ণ মনে প'ড়ে গেল।

রামায়ণ আমি পড়ব, তুমি শুনবে?

না। মেঘনাদকে যখন অধর্ম-যুদ্ধে লক্ষ্মণ বধ করলে, তখন রাবণের কথা মনে আছে তোমার? শক্তিশেল, শক্তিশেল! আমার মনে হচ্ছে—তেমনি শেল যদি পেতাম, তবে রায়-বংশ, রায়-হাট সব আজ ধ্বংস ক'রে দিতাম আমি। রামেশ্বর থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। সুনীতি বিব্রত হইয়া স্বামীকে মৃদু আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, এস, বিছানায় বসবে এস, আমি বাতাস করি।

রামেশ্বর আপত্তি করিলেন না, আসিয়া বিছানায় বসিলেন। একদৃষ্টে জানালা দিয়া চন্দ্রালোকিত গ্রামখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুনীতি বলিলেন, তুমি ভেবো না. মহী আমার অন্যায় কিছু করে নি। ভগবান তাকে রক্ষা করবেন।

রামেশ্বর ও-কথার কোন জবাব দিলেন না। নীরবে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা পরম ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, অ্যাঃ, বিষে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

সুনীতি কাতর স্বরে মিনতি করিয়া বলিলেন, ওগো, কি বলছ তুমি? আমার ভয় করছে যে!

ভয় হবারই কথা। দেখ, চেয়ে দেখ—গ্রামখানা বিষে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। কতকাল ধ'রে মানুষের গায়ের বিষ জমা হয়ে আসছে, রোগ শোক, কত কি! মনের বিষ, হিংসা-দ্বেষ মারামারি কাটাকাটি খুন! আঃ!

চন্দ্রালোকিত গ্রামখানার দিকে চাহিয়া সুনীতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন; সত্যই গ্রামখানাকে অদ্ভুত মনে হইতেছিল। জমাট অন্ধকারের মত বড় বড় গাছ, বহুকালের জীর্ণ বাড়ি ঘর,—ভাঙা দালান, ভগ্নচূড়া দেউলের সারি, এদিকে গ্রামের কোল ঘেঁষিয়া কালিন্দীর সুদীর্ঘ সু-উচ্চ ভাঙন, সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, বিকৃতমস্তিষ্ক রামেশ্বরের মত বিষ-জর্জরিত মনে না হইলেও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ইচ্ছা হয়।

সহসা রামেশ্বর আবার বলিলেন, দেখ।

কি?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রামেশ্বর বলিলেন, আমার আঙুলগুলো বড় টাটাচ্ছে।

কেন? কোথাও আঘাত লাগল নাকি?

বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িয়া রামেশ্বর বলিলেন, উঁহু।

তবে? কই, দেখি!—বলিয়া অন্তরালে রক্ষিত প্রদীপটি উস্কাইয়া আনিয়া দেখিয়া বলিলেন, কই, কিছুই তো হয় নি।

তুমি বুঝতে পারছ না। হয়েছে—হয়েছে। দেখছ না, আঙুলগুলো ফুলো-ফুলো আর লাল টকটক করছে?

হাত তো তোমাদের বংশের এমনই লাল।

না, তোমায় এতদিন বলি নি আমি। ভেবেছিলাম, কিছু না, মনের ভ্রম। কিন্তু—। তিনি আর বলিলেন না, চুপ করিয়া গেলেন।

সুনীতি বলিলেন, তুমি একটু শোও দেখি, মাথায় একটু জল দিয়ে তোমায় আমি বাতাস করি।

রামেশ্বর আপত্তি করিলেন না, সুনীতির নির্দেশমত চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। সুনীতি শিয়রে বসিয়া বাতাস দিতে আরম্ভ করিলেন। চাঁদের আলোয় কালীর গর্ভের বালির রাশি দেখিয়া মনে কেমন একটা উদাস ভাব জাগিয়া উঠে। একপাশে কালীর ক্ষীণ কলস্রোত

চাঁদের প্রতিবিম্ব, সুনীতির মনে ওই উদাসীনতার মধ্যে একটু রূপের আনন্দ ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াও পারিল না। তাহার ও-পারে সেই কাশে ও বেনাঘাসে ঢাকা চরটা, জ্যোৎস্নার আলোয় কোমল কালো রঙের সুবিস্তীর্ণ একখানি গালিচার মত বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সর্বনাশা চর! বাতাস করিতে করিতে সুনীতিও ধীরে ধীরে ঢলিয়া বিছানার উপর পড়িয়া গেলেন। পড়িয়াই আবার চেতনা আসিল, কিন্তু দারুণ শ্রান্তিতে উঠিতে আর মন চাহিল না, দেহ পারিল না।

ঘুম যখন ভাঙিল, তখন প্রভাত হইয়াছে। রামেশ্বর উঠিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। সুনীতিকে উঠিতে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, কবরেজ মশায়কে একবার ডাকতে পাঠাও তো।

কেন? শরীর কি খারাপ করছে কিছু?

এই আঙুলগুলো একবার দেখাব।

ও কিছু হয় নি, তবে বল তো ডাকতে পাঠাচ্ছি।

না, অনেক দিন উপেক্ষা করেছি, ভেবেছি, ও কিছু নয়। কিন্তু এইবার বেশ বুঝতে পারছি, হয়েছে—হয়েছে।

রাত্রেও ঠিক এই কথা বলিয়াছিলেন। এ আর সুনীতি কত সহ্য করিবেন! বিরক্ত হইতে পারেন না, দুর্ভাগ্যের জন্য কাঁদিবার পর্যন্ত অবসর নাই, এ এক অদ্ভুত অবস্থা। তিনি বলিলেন, আঙুলে আবার কি হবে বল? আঙুল তো—

কুষ্ঠ—কুষ্ঠ।—সুনীতির কথার উপরেই চাপা গলায় রামেশ্বর বলিয়া উঠিলেন, অনেক দিন আগে থেকে সূত্রপাত, তোমায় বিয়ে করবার আগে থেকে। লুকিয়ে তোমায় বিয়ে করেছি।

সুনীতি বজ্রাহতার মত নিস্পন্দ নিথর হইয়া গেলেন।

৯

এক বৎসরের মধ্যেই চক্রবর্তী-বাড়ির অবস্থা হইয়া গেল বজ্রাহত তালগাছের মত। তালগাছের মাথায় বজ্রাঘাত হইলে সঙ্গে সঙ্গেই সে জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায় না। দিন কয়েকের মধ্যেই পাতাগুলি শুকাইয়া যায়, তারপর শুষ্ক পাতাগুলি গোড়া হইতে ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়ে, ক্রমে সেগুলি খসিয়া যায়, অক্ষত-বহিরঙ্গ সুদীর্ঘ কাণ্ডটা ছিন্নকণ্ঠ হইয়া পুরাকীর্তির স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া থাকে। চক্রবর্তী-বাড়ির অবস্থাও হইল সেইরূপ। মহীন্দ্রের মামলাতেই চক্রবর্তী-বাড়ির বিষয়-সম্পত্তি প্রায় শেষ হইয়া গেল। থাকিবার মধ্যে থাকিল বজ্রাহত তালকাণ্ডের মত প্রকাণ্ড বাড়িখানা, সেও সংস্কার-অভাবে জীর্ণ, শ্রীহীনতায় রুক্ষ কালো। ইহারই মধ্যে বাড়িটার অনেক জায়গায় পলেস্তারা খসিয়া গিয়াছে, চুনকামের অভাবে শেওলায় ছাইয়া কালো হইয়া উঠিয়াছে। মহীন্দ্রের মামলায় দুই হাজারের স্থলে খরচ হইয়া গেল পাঁচ হাজার টাকা। মজুমদারের বন্দোবস্তে টাকার অভাব হয় নাই, হ্যাণ্ডনোটেই টাকা পাওয়া গিয়াছিল।

কিন্তু টাকা থাকিতেও বাকি রাজস্বের দায়ে একদিন সম্পত্তিও নিলাম হইয়া গেল। ভাগ্যের এমনি বন্দোবস্ত যে নীলামটা হইল যেদিন মহীন্দ্রের মামলার রায় বাহির হইল সেই দিনই। মামলার এই চরম উত্তেজনাময় সঙ্কটের দিনেই ছিল নীলামের দিন, মজুমদারের মত লোকও একথা বিস্মৃত হইয়া গেল। যখন খেয়ালে আসিল, তখন যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে। রায়-বাড়ির অনেকে মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিলেও চক্রবর্তী-বাড়িতে এজন্য আক্ষেপ উঠিল না। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের তো বজ্রনাদে শিহরিয়া উঠিবার অবকাশ হয় না। মামলায় মহীন্দ্রের দশ বৎসর দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়া গিয়াছে, সেই আঘাতে চক্রবর্তী-বাড়ি তখন নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছে।

সকলেই আশা করিয়াছিল, মহীন্দ্রের গুরুতর শাস্তি কিছু হইবে না। সমাজের নিকট মহীন্দ্রের অপরাধ, ননী পালের অন্যায়ের হেতুতে, মার্জনার অতীত বলিয়া বোধ হয় নাই; কিন্তু বিচারালয়ে সরকারী উকিলের নিপুণ পরিচালনায় সে অপরাধ অমার্জনীয় বলিয়াই প্রমাণিত হইয়া গেল। মায়ের অপমানে সন্তানের আত্মহারা অবস্থার অন্তরালে তিনি বিচারক ও জুরীগণকে দেখাইয়া দিলেন, জমিদার ও প্রজায় চিরকালের বিরোধ। সওয়ালের সময় তিনি ঈশপের নেকড়ে ও মেষশাবকের গল্পটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এ অপরাধ যদি ওই অপমানসূচক কয়টি কথার ভারে লঘু হইয়া যায়, তবে ঈশপের নেকড়েরও মেষশাবক-হত্যার জন্য বিন্দুমাত্র অপরাধ হয় নাই। নেকড়েরও অভিযোগ ছিল যে, মেষশাবক নেকড়ের বাপকে গালিগালাজ করিয়াছিল। ওই অপমানের কথাটা ঈশপের গল্পের মত দুরাত্মার একটা ছল মাত্র; আসল সত্য হইল, উদ্ধত জমিদারপুত্র এই হতভাগ্য তেজস্বী প্রজাটিকে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসাবে হত্যা করিয়াছে এবং সে-কথা আমি যথাযথরূপে প্রমাণ করিয়াছি বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর যে কথা কয়টিকে মর্মান্তিক অপমানসূচক বলিয়া চরম উত্তেজনার কারণ-স্বরূপ ধরা হইতেছে, সে কথাও মিথ্যা কথা নয়, সে-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আসামীর—

কেন আপনি মিথ্যে বকছেন?—উকিলের সওয়ালে বাধা দিয়া মহীন্দ্র বলিয়া উঠিল। সে কাঠগড়ায় রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। উকিলের বক্তব্যের প্রারম্ভ শুনিয়াই সে তৈলহীন রুক্ষ পিঙ্গল-কেশ আসামী পিঙ্গল চোখে তীব্র দৃষ্টি লইয়া মূর্তিমান উগ্রতার মত বলিয়া উঠিল, কেন আপনি মিথ্যে বকছেন? হ্যাঁ, উদ্ধত প্রজা হিসেবেই তাকে আমি গুলি ক'রে মেরেছি।

সরকারী উকিল বলিলেন, দেখুন দেখুন, আসামীর মূর্তির দিকে চেয়ে দেখুন। প্রাচীন আমলের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের জ্বলন্ত নিদর্শন।

ইহার পর চরম শাস্তি হওয়াই ছিল আইনসঙ্গত বিধান। কিন্তু বিচারক ওই অপমানের কথাটাকে আশ্রয় করিয়া এবং অল্প বয়সের কথাটা বিবেচনা করিয়া সে শাস্তি বিধানের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। ওদিকে সম্পত্তি তখন নিলামে বসিয়াছে; ডাকিয়াছেন চক্রবর্তী-বাড়ির মহাজন—মজুমদার মশায়েরই শ্যালক। লোকে কিন্তু বলিল, শ্যালক মজুমদারের বেনামদার।

মহীন্দ্র অবিচলিতভাবেই দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিল। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল। রায় দিয়া এজলাস ভাঙিয়া বিচারক বলিলেন, I admire his boldness! সাহসের প্রশংসা করতে হয়।

সরকারী উকিল হাসিয়া বলিলেন, Yes sir! এর পিতামহ সাঁওতাল-হাঙ্গামার সময় সাঁওতালদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লড়াই ক'রে মরেছিল। সামন্তবংশের খাঁটি রক্ত ওদের শরীরে—true blood!

মহীন্দ্র সম্পত্তি নিলামের কথা শোনে নাই। সে শুধু আপন দণ্ডাজ্ঞাটাকেই তাহাদের সংসারের একমাত্র দুর্ভাগ্য বিবেচনা করিয়া মজুমদারকে ডাকিয়া বলিল, দুঃখ করবেন না। আপীল করবার প্রয়োজন নেই। আমি নিজে যেখানে স্বীকার করেছি, তখন আপীলে ফল হবে না। আর সর্বস্বান্ত হয়ে মুক্তি পেয়ে কি হবে? শেষে কি রায় বাড়িতে ভিক্ষে ক'রে খেতে হবে?

কোর্টের জনতার মধ্যে একখানা চেয়ারে স্তম্ভিতের মত বসিয়া ছিলেন ইন্দ্র রায়। মহীন্দ্র শেষ কথাটা তাঁহারই দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল। কথাটা রায়ের কানেও গেল, কিন্তু কোন-মতেই মাথা তুলিয়া তিনি চাহিতে পারিলেন না।

মহীন্দ্র আবার বলিল, পারেন তো বাবার কাছে খবরটা চেপে রাখবেন। মাকে কাঁদতে বারণ করবেন। বাবার ভার এখন সম্পূর্ণ তাঁর ওপর। আর অহিকে যেন পড়ানো হয়, যতদূর সে পড়তে চাইবে।

মাথা উঁচু করিয়াই হাতকড়ি পরিয়া সে কন্‌স্টেব্‌লের সঙ্গে চলিয়া গেল। সকলের শেষে ইন্দ্র রায় মাথা হেঁট করিয়া কোর্ট হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বাড়ি ফিরিয়া একেবারে অন্দরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া হেমাঙ্গিনী শিহরিয়া উঠিলেন, অত্যন্ত কুণ্ঠিত এবং শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, কি হ'ল?

ইন্দ্র রায় কথার উত্তর দিলেন না।

* * *

সুনীতি সব সংবাদই শুনিলেন। মহীন্দ্রের সংবাদ শুনিলেন সেই দিনই তবে এ-সংবাদটা শুনিলেন দিন দুই পর—অপরের নিকট; গ্রামে তখন গুজব রটিয়া গিয়াছিল। সুনীতি এই দুঃসহ দুঃখের মধ্যেও উদাসীন হইয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি মজুমদারকে ডাকিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, এ কি সত্যি?

মজুমদার নিরুত্তর হইয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

সুনীতি বলিলেন, বল ঠাকুরপো বল। ভিক্ষে করতেই যদি হয় তবে বুক আগে থেকেই বেঁধে রাখি, আর গোপন ক'রে রেখো না, বল।

মজুমদার এবার বলিল, কি বলব বউঠাকরুন, আমি তখন মহীর মামলার রায় শুনে—

সুনীতি অসহিষ্ণু হইয়া কথার মাঝখানেই প্রশ্ন করিলেন, সব গেছে?

চোখ মুছিয়া মজুমদার বলিল, আজ্ঞে না, দেবোত্তর সম্পত্তি, আমাদের লাখেরাজ, এই গ্রাম, তারপর চক আফজলপুর, তারপর জমিজেরাত—এসব রইল।

সুনীতি চুপ করিয়া রহিলেন, আর তাঁহার জানিবার কিছু ছিল না। মজুমদার একটু নীরব থাকিয়া বলিল, একটা কাজ করলে একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যায়। বিষয় হয়তো ফিরতেও পারে। ওই চরটার জন্যে অনেক দিন থেকে একজন ধরাধরি করছে, ওটা বিক্রি ক'রে মামলা ক'রে দেখতে হয়, বিষয়টা যদি ফেরে।

সুনীতি বলিলেন, না ঠাকুরপো, ও চরটা থাক। ওই চরের জন্যেই মহী আমার দ্বীপান্তর গেল, ও চর মহী না-ফেরা পর্যন্ত প'ড়েই থাক।

মজুমদার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তবে থাক। তা হ'লেও আমি ছাড়ব না, যাব একবার আমি রবি ঘোষালের কাছে। টাকা নিয়ে সে সম্পত্তি ফিরে দিক।

সুনীতি হাসিলেন, বলিলেন, তিনিও তো অনেক টাকা পাবেন; সে টাকাই বা কোথা থেকে দেব বল? তুমি তো সবই জান।

মজুমদার আর কিছু বলিল না। যাইবার জন্যই উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সুনীতি বাধা দিয়া বলিলেন, আর একটু দাঁড়াও ঠাকুরপো। কথাটা কিছুদিন থেকেই বলব ভাবছি, কিন্তু পারছি না। বলছিলাম, তুমি তো সবই বুঝছ; যে অবস্থায় ভগবান ফেললেন, তাতে ঝি চাকর, রাঁধুনী সবাইকে জবাব দিতে হবে। তোমার সম্মানই বা মাসে মাসে কি দিয়ে করব ঠাকুরপো?

মজুমদার তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তা বেশ তো বউঠাকরুন, আর কাজই বা এমন কি রইল এখন? লোকের দরকারই বা কি? তবে যখন যা দরকার পড়বে, আমি ক'রে দিয়ে যাব। যে আদায়টুকু আছে, সেও আমি না হয় গোমস্তা হিসেবে ক'রে দেব। সরঞ্জামি কেবল নগ্‌দীর মাইনেটাই দেবেন।

সুনীতি আর কোন কথাই বলিলেন না, মজুমদার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সেই দিনই সুনীতি মানদা, বামুনঠাকরুন, এমন কি চাকরটিকে পর্যন্ত জবাব দিলেন। কিন্তু জবাব দেওয়া সত্ত্বেও গেল না শুধু মানদা। সে বলিল, আমি যাব না। আজ পঁচিশ বছর এখানে রয়েছি, চোখও বুজব এই বাড়িতে। বাড়ি নাই, ঘর নাই, আমি কোথায় যাব? তা ঝাঁটাই মার আর জুতোই মার! হ্যাঁ!

ইন্দ্র রায় সেই যে কোর্ট হইতে আসিয়া বাড়ি ঢুকিয়াছিলেন, দুই তিন দিন ধরিয়া আর তিনি বাহির হন নাই। অত্যন্ত গম্ভীর মুখে ঘরের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ান, কাহাকেও কোন কথা বলেন না, এমন কি দিনের মধ্যে তামাক দিতেও কাহাকে ডাকেন না। তাঁহার সে মুখ দেখিয়া চাকরবাকর দূরের কথা আদরিণী মেয়ে উমা পর্যন্ত সম্মুখে আসে না। সেদিন হেমাঙ্গিনী আসিয়া কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইলেন। রায় তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া চিন্তাকুল গম্ভীর মুখেই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, অ্যাঁ?

হেমাঙ্গিনী কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে বলিলেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

রায়ের মাথাটা আরও একটু ঝুঁকিয়া পড়িল।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, শরীর কি তোমার—

কথার মাঝখানেই রায় মাথা তুলিয়া উদ্‌ভ্রান্তস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন, তারা—তারা মা!

হেমাঙ্গিনী দেখিলেন, রায়ের চোখ দুইটায় জল টলমল করিতেছে। হেমাঙ্গিনী মাথা নীচু করিলেন। রায় বলিলেন, লজ্জার বোঝা—শুধু লজ্জার বোঝা নয় হেম, এ আমার অপরাধের বোঝা—মাথায় নিয়ে মাথা আমি তুলতে পারছি না। রামেশ্বরের বড় ছেলে আমার মাথাটা ধুলোয় নামিয়ে দিয়ে গেল। তারা—তারা মা! আবার বার কয়েক অস্থিরভাবে ঘুরিয়া রায় বলিলেন, হেমাঙ্গিনী, আমি নিযুক্ত করেছিলাম ননী পালকে। শুধু চর দখল করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ননীকে আমি বলেছিলাম, চক্রবর্তীদের যদি প্রকাশ্যভাবে অপমান করতে পারিস, তবে আমি তোকে বকশিশ দেব। ননী অপমান করলে রাধারাণীর—আমার সহোদরার।

হেমাঙ্গিনীর চোখ দিয়া অশ্রুর বন্যা নামিয়া আসিল।

রায় আবেগভরে বলিতে বলিতে শিহরিয়া উঠিলেন, উঃ, আদালতে মহীন কি বললে জান?, সরকারী উকিল বললেন, মৃত ননী পাল যার অপমান করেছিল, সে আসামীর সৎমা। মহীন তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ ক'রে উঠল, যার নয়—বলুন যাঁর,—সে নয়—বলুন তিনি, সৎমা নয়—মা, আমার বড় মা।

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হেমাঙ্গিনী উদাস কণ্ঠে বলিলেন, দ্বীপান্তর হয়ে গেল?

দশ বৎসর! বার কয়েক ঘুরিয়া রায় অকস্মাৎ হেমাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া বলিলেন, তুমি একবার মহীনের মায়ের কাছে যাবে হেম?

হেমাঙ্গিনী স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন।

রায় বলিলেন, আমার অনুরোধ! আমাকে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে হেম। রামেশ্বরের স্ত্রীপুত্রকে রক্ষা করতে হবে।

হেমাঙ্গিনী এবার কাতর স্বরে বলিলেন, ওগো, কোন্ মুখে আমি গিয়ে দাঁড়াব? কি বলব?

রায় আবার মাথা নীচু করিয়া পদচারণ আরম্ভ করিলেন। হেমাঙ্গিনীর কথার জবাব তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। কিছুক্ষণ পর হেমাঙ্গিনী আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন উমাকে সঙ্গে নিয়ে যাই।

রায় বলিলেন, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি হেমাঙ্গিনী, এ কথাটা গোপন ক'রো। তুমি যেন আপনি—আমাকে লুকিয়ে গেছ। মহীনের মা যদি ফিরিয়ে দেন! মাথা নত করিয়া আবার বলিলেন—বলবে, যোগেশ মজুমদারকে যেন জবাব দেন আর চরের খাজনা আদায় ক'রে নিন ওঁরা।

হেমাঙ্গিনী চলিয়া গেলেন। রায় এতক্ষণে অন্দর হইতে কাছারিতে আসিয়া একজন পাইককে বলিলেন, যোগেশ মজুমদারকে একবার ডাক্ দেখি। বলবি, জরুরী কাজ। সঙ্গে নিয়ে আসবি, বুঝলি?

মজুমদার তাঁহার কাছারির ফটকে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি সাগ্রহে সম্ভাষণ জানাইয়া বলিলেন, আরে, এস, এস, মজুমদার মশায়, এস!

মজুমদার প্রণাম করিয়া বলিল, আজ্ঞে বাবু, আশয়হীন লোককে মহাশয় বললে গাল দেওয়া হয়। আমি আপনাদের চাকর।

হাসিয়া রায় বলিলেন, বিষয় হ'লে আশয় হতে কতক্ষণ মজুমদার, এক দিনে এক মুহূর্তে জন্মে যায়।

মজুমদার চুপ করিয়া রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রায় বলিলেন, জান মজুমদার, আজকাল বড় বড় লোকের মাথা বিক্রি হয়, মৃত্যুর পর তাদের মাথা নিয়ে দেখে, সাধারণ লোকের সঙ্গে তাদের মস্তিষ্কের কি তফাৎ। তা আমি তোমার খান-দুয়েক হাড় কিনে রাখতে চাই, পাশা তৈরি করাব।

মজুমদারের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল কিন্তু মুখে কিছু বলিতে পারিল না। রায় আবার বলিলেন, রহস্য করলাম, রাগ ক'রো না। এখন একটা কাজ আমার ক'রে দাও। চরটা আমাকে ব'লে ক'য়ে বিক্রি করিয়ে দাও। ওটার জন্যে আমার মাথা আজও হেঁট হয়ে রয়েছে গ্রামে।

মজুমদার এবার গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, চরটা ওঁরা বিক্রি করবেন না রায় মশায়।

ওঁরা? ওঁরা কে হে? তুমিই তো এখন মালিক।

আমার জবাব হয়ে গেছে।

জবাব হয়ে গেছে! কে জবাব দিলে? রামেশ্বরের এখন এদিকে দৃষ্টি আছে নাকি?

আজ্ঞে না। তিনি একেবারেই কাজের বাইরে গিয়েছেন। জবাব দিলেন গিন্নীঠাকরুণ।

রায় অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, মেয়েটি শুনেছি বড় ভাল, সাবিত্রীর মত সেবা করেন রামেশ্বরের। এদিকে বুদ্ধিমতী ব'লেও তো বোধ হচ্ছে। না হ'লে তুমি তো বাকিটুকু অবশিষ্ট রাখতে না। বাঘে খানিকটা খেয়ে ইচ্ছে না হ'লে ফেলে যায়, কিন্তু সাপের তো উপায় নেই, গিলতে আরম্ভ করলে শেষ তাকে করতেই হয়। কিন্তু কাজটা তুমি ভাল করলে না মজুমদার।

এইবার মজুমদার বলিল, আজ্ঞে বাবু, টাকাও তো আমি পাঁচ হাজার দিয়েছি।

তা দিয়েছ; কিন্তু মামলা-খরচের অজুহাতে তার অর্ধেকই তো তোমার ঘরেই ঢুকেছে মজুমদার। আমি তো সবই জানি হে। আমার দুঃখটা থেকে গেল, চক্রবর্তীদের আমি ধ্বংস করতে পারলাম না।

মজুমদার জবাব দিল, আজ্ঞে, পনর আনা তিন পয়সাই আপনার করা বাবু, ননী পালকে তো আপনিই খাড়া করেছিলেন।

রায় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ও কাজটাতে আমি সুখী হ'তে পারি নি যোগেশ। এতখানি খাটো জীবনে হই নি। রামেশ্বরের বড়ছেলে আমার গালে চুনকালি মাখিয়ে দিয়ে গেছে। সেই কালি আমাকে মুছতে হবে। সেই কথাটা তোমাকে বলবার জন্যেই আমি তোমায় ডেকেছিলাম। আর লোভ তুমি ক'রো না। ওই চরের দিকে হাত

বাড়িও না, ওগুলো রামেশ্বরের ছেলেদের থাক। ওরা না জানুক, তুমি জেনে রাখ, রক্ষক হয়ে রইলাম আমি।

মজুমদারের বাক্যস্ফূর্তি হইল না; সে আপনার করতলের রেখাগুলির দিকে চাহিয়া বোধ করি আপনার ভাবী ভাগ্যলিপি অনুধাবনের চেষ্টা করিতে লাগিল। রায় সহসা বলিলেন, সাইকেলে ওটি—রামেশ্বরের ছোট ছেলে নয়?

সম্মুখে পথে কে একজন অতি দ্রুত সাইকেল চালাইয়া চলিয়াছিল, গতির দ্রুততা হেতু মানুষটিকে সঠিক চিনিতে না পারিলেও এ ক্ষেত্রে ভুল হইবার উপায় ছিল না। আরোহীর উগ্র-গৌর দেহবর্ণ, তাহার মাথার উপর পিঙ্গলবর্ণ দীর্ঘ চুলগুলি বাতাসে চঞ্চল হইয়া নাচিতেছে চক্রবর্তীদের বংশপতাকার মত। মজুমদার দেখিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের অহীন্দ্রই বটে।

রায় বলিলেন, ডাক তো, ডাক তো ওকে। এত ব্যস্তভাবে কোথা থেকে আসছে ও?

মজুমদারও চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে বার বার ডাকিল, অহি! অহি! শোন, শোন।

গতিশীল গাড়ির উপর হইতেই সে মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া একটা হাত তুলিয়া বলিল, আসছি। পরমুহূর্তেই সে পথে মোড় ফিরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। মজুমদার ব্যস্ত হইয়া বলিল, আমি যাই তা হ'লে বাবু। দেখি, অহি অমন ক'রে কোথা থেকে এল, খবরটা কি আমি জেনে আসি।

রায় বলিলেন, আমায় খবরটা জানিও যেন মজুমদার।

* * *

দ্রুতবেগে গাড়িখানা চালাইয়া বাড়ির দুয়ারে আসিয়া অহীন্দ্র একরূপ লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল। গাড়ি হইতে নামিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্যও সে ছুটিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু স্তব্ধ বাড়িখানার ভিতর হইতে একটি অতি মৃদু ক্রন্দনের সুর তাহার কানে আসিতেই তাহার গতি মন্থর এবং সকল উত্তেজনা ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে বাড়িতে প্রবেশ করিয়া সে ডাকিল, মা!

দ্বিপ্রহরের নির্জন অবকাশে সুনীতি আপনার বেদনার লাঘব করিতেছিলেন, মৃদু মৃদু বিলাপ করিয়া কাঁদিতেছিলেন। অহির ডাক শুনিয়া তিনি চোখ মুছিয়া বাহিরে আসিলেন, বলিলেন, দেরি করলি যে অহি? কালই ফিরে আসবি ব'লে গেলি! কণ্ঠস্বরে তাঁহার শঙ্কার আভাস।

অহি বলিল, হেডমাস্টার মশায় কাল ফিরে আসেন নি মা, আজ সকাল নটায় এলেন ফিরে।

পরীক্ষার খবর বেরিয়েছে?

হ্যাঁ মা।

তোর খবর?

পাস হয়েছি মা।

তবে বলছিস না যে? সুনীতির ম্লান মুখ এবার ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বলতে ভাল লাগছে না মা। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অহি বলিল, দাদা আমায় বলেছিলেন, ভাল ক'রে পাস করলে একটা ঘড়ি কিনে দেবেন—একটা রিস্টওয়াচ।

সুনীতির চোখ দিয়া আবার জল ঝরিতে আরম্ভ করিল।

অহি বলিল, আমি বড় অকৃতজ্ঞ মা। মাস্টার মশায় বললেন, কম্পিট তুমি করতে পার নি, তবে ডিভিশনাল স্কলারশিপ তুমি পাবেই। যে কলেজেই যাবে, সুবিধে অনেক পাবে। কোথায় পড়বে ঠিক ক'রে ফেল। আমি শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে এলাম। সমস্ত পথটার মধ্যে দাদার কথা একবারও মনে পড়ে নি মা; বাড়িতে এসে ঢুকতেই তোমার কান্নার আওয়াজে আমার স্মরণ হল, দাদাকে মনে পড়ে গেল।

সুনীতি ছেলেকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, তুই ভাল করে প'ড়ে টপ-টপ ক'রে পাস ক'রে নে। তারপর তুই জজ হবি অহি। দেখবি, এমন ধারার অবিচার যেন কারও ওপর না হয়। ততদিনে মহী ফিরে আসবে। সে বাড়িতে বসে ঘর-সংসার দেখবে, তুই সেখান থেকে টাকা পাঠাবি।

অহি বলিল, একটা খবর নিলাম মা এবার। দশ বছর দাদাকে থাকতে হবে না। মাসে মাসে চার পাঁচ দিন ক'রে মাফ হয়। বছরে ছ মাস তিন মাসও হয় ভাল ব্যবহার করলে। তা হ'লে তিন দশে তিরিশ মাস আড়াই বছর বাদ যাবে, দশ বছর থেকে। সাড়ে সাত বছর থাকতে হবে। আর দ্বীপান্তর লিখলেও আজকাল সকলকে আন্দামানে পাঠায় না। দেশেই জেলে রেখে দেয়।

উপরে রামেশ্বর গলা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেন। শব্দ শুনিয়া সচকিত হইয়া সুনীতি বলিলেন, বাবুকে প্রণাম করবি আয় অহি। ওঁকে খবর দিয়ে আসি, ওঁর কথাই আমরা সবাই ভুলে যাই।

মাটির পুতুলের মত একইভাবে রামেশ্বর সেই খাটের উপর বসিয়া ছিলেন। সুনীতি সত্য সত্যই একটু আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিলেন, ওগো অহি তোমার পাস করেছে, স্কলারশিপ পেয়েছে।

অহি রামেশ্বরকে প্রণাম করিল। রামেশ্বর হাত বাড়াইয়া তাহাকে কাছে বসাইয়া বলিলেন, পাস করেছ, স্কলারশিপ পেয়েছ ?

হ্যাঁ, ওকে আশীর্বাদ কর।

হ্যাঁ হ্যাঁ।

ও এবার কলেজে পড়তে যাবে। যে কলেজেই যাবে সেখানে ওকে অনেক সুবিধে দেবে।

বাঃ বাঃ, রাজা দিলীপের পুত্র রঘু—সমস্ত বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন, তাঁরই নামে বংশের পর্যন্ত নাম হয়ে গেল রঘুবংশ। তুমি রঘুবংশ পড়েছ অহি, মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ ? "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে—জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।"

অহি এবার বলিল, স্কুলে তো এ-সব মহাকাব্য পড়ানো হয় না, এইবার কলেজে পড়ব।

ইংরেজদের এক মহাকবি আছেন, তাঁর নাম শেক্সপীয়ার। সে-সবও প'ড়ো।

হ্যাঁ, শেক্সপীয়ার পড়তে হবে বি. এ-তে।

এ-কথার উত্তরে আর রামেশ্বর কথা বলিলেন না। সহসা তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, যাও, তুমি এখন বেড়িয়ে এস।

সুনীতি বলিলেন, না না, ও এখনও খায় নি। তুই এখানেই ব'স্ অহি, আমি খাবার এইখানেই নিয়ে আসি।

রামেশ্বর তিক্তস্বরে বলিলেন, না না। যাও অহি, ভাল ক'রে সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফেল, স্নানই বরং কর। তারপর খাবে।

পিতার অনিচ্ছা অহীন্দ্র বুঝিল, সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সুনীতি জলভরা চোখে বলিলেন, কেন তুমি ওকে এমন করে তাড়িয়ে দিলে? এর জন্যেই—

বাধা দিয়া রামেশ্বর আপনার দুই হাত মেলিয়া বলিলেন, ছোঁয়াচে, ছোঁয়াচে কুষ্ঠরোগ—

সুনীতি আজ তারস্বরে প্রতিবাদ করিলেন, না না। কবরেজ বলেছেন, ডাক্তার বলেছেন, রক্তপরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, ও-রোগ তোমার নয়।

জানে না, ওরা কিছুই জানে না। বাইরের সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া রামেশ্বর নীরব হইলেন। দরজায় মৃদু আঘাত করিয়া অহীন্দ্র ডাকিল, মা!

যাই আমি অহি।—সুনীতি অভিমানভরেই চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু অহীন্দ্রই দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার পিছনে রায়গিন্নী হেমাঙ্গিনী—ইন্দ্র রায়ের স্ত্রী।

১০

দীর্ঘকাল পরে হেমাঙ্গিনী রামেশ্বরকে দেখিলেন। রামেশ্বরের কথা মনে হইলেই তাঁহার স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠিত রামেশ্বরের সেকালের ছবি। পিঙ্গল চোখ, পিঙ্গল চুল, তাম্রাভ গৌর বর্ণ, বিলাসী, কৌতুকহাস্যে সমুজ্জ্বল একটি যুবকের মূর্তি। আর আজ এই রুদ্ধদ্বার অন্ধকার-প্রায় ঘরের মধ্যে বিষণ্ণ স্তব্ধ শঙ্কাতুর এক জীর্ণ প্রৌঢ়কে দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। চোখে তাঁহার জল আসিল। সুনীতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলেও পরস্পর পরস্পরকে সামাজিক ক্ষেত্রে দেখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে চিনিতে সুনীতির বিলম্ব হইল না। তিনি অতি ধীরভাবে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, আসুন আসুন, দিদি আসুন। তাড়াতাড়ি তিনি একখানা আসন পাতিয়া দিলেন।

হেমাঙ্গিনী কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, এত খাতির করলে যে আমি লজ্জা পাব বোন, এ তো আমার খাতিরের বাড়ি নয়। তুমি তো আমার পর নও। তবে তুমি 'দিদি' বলে সম্মান ক'রে দিলে, আমি বসছি।—বলিয়া আসনে বসিয়া সর্বাগ্রে তিনি চোখ মুছিলেন। তারপর মৃদুস্বরে সুনীতিকে প্রশ্ন করিলেন, পুরনো কথা বোধ হয় ওঁর ভুল হয়ে যায়, না?

না না। আপনি রায়-গিন্নী, রায়-গিন্নী।—মৃদুস্বরে বলিলেও হেমাঙ্গিনীর কথাটা রামেশ্বরের কানে গিয়াছিল, তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অতি সকরুণ ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া কথা কয়টি বলিলেন।

হেমাঙ্গিনীর চোখ আবার জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, না, চিনতে পারেন নি। কই, আমাকে আদর ক'রে সম্মান ক'রে যে নাম দিয়েছিলেন, সে নামে তো ডাকলেন না?

রামেশ্বর বলিলেন, ভুলে যান রায়-গিন্নী, ও কথা ভুলে যান! দুঃখই যেখানে প্রধান রায়-গিন্নী, সেখানে সুখের স্মৃতিতেই বা লাভ কি? ভগবান হলেন রসস্বরূপ, তিনি যাকে পরিত্যাগ করেছেন, সে ব্যক্তি পরিবেশন করবার মত রস পাবে কোথায় বলুন?

হেমাঙ্গিনী গভীর স্নেহ-অভিষিক্ত কণ্ঠস্বরে বলিলেন, না না, এ কি বলছেন আপনি? ভগবান পরিত্যাগ করলে কি সুনীতি আপনার ঘরে আসে? অহিকে দেখাইয়া বলিলেন, এমন চাঁদের মত ছেলে ঘর আলো করে?

রামেশ্বর হাসিলেন—অদ্ভুত হাসি। সে হাসি না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। বলিলেন, সূর্যে গ্রহণ লেগেছে রায়-গিন্নী, ভরসা এখন চাঁদেরই বটে। দেখি, আপনাদের আশীর্বাদ!

প্রসাধন যতই সযত্ন এবং সুনিপুণ হোক, দিনের আলোকে প্রসাধনের অন্তরালে স্বরূপ যেমন প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনই ভাবেই রামেশ্বরের রূপক-উক্তির ভিতর হইতে সদ্য সংঘটিত মর্মান্তিক আঘাতের বেদনা আত্মপ্রকাশ করিল। একই সঙ্গে সুনীতি ও রায়-গিন্নীর চোখ হইতে টপটপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, অহি আর সহ্য করিতে পারিল না, সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

রামেশ্বর সুনীতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অহিকে খেতে দেবে না সুনীতি? ও তো এখনও খায় নি।

হেমাঙ্গিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, সে কি! আমি তোমাকে বসিয়ে রেখেছি বোন? আর ছেলে এখনও পর্যন্ত খায় নি? ম'রে যাই!

এতক্ষণে সুনীতি প্রথম কথা বলিলেন, শহর থেকে এই মাত্র ফিরল। তাই দেরি হয়ে গেল। পরীক্ষার খবর বেরিয়েছে, তাই এই দুপুরেই না খেয়ে ছুটে এসেছে।

সস্নেহ হাসি হাসিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বাছা আমার পাস করেছে নিশ্চয়? ও তো খুব ভাল ছেলে।

মুখ উজ্জ্বল করিয়া সুনীতি বলিলেন, হ্যাঁ দিদি, আপনার আশীর্বাদে খুব ভাল ক'রে পাস করেছি অহি; ডিভিশনের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে, স্কলারশিপ পাবে।

আকস্মিক প্রসঙ্গান্তরের মধ্য দিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে, পঙ্ক হইতে পঙ্কজের উদ্ভবের মত, দুঃখের স্তরকে নীচে রাখিয়া আনন্দের আবির্ভাবে সকলেই একটি স্নিগ্ধ দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, শিবের ললাটে চাঁদের ক্ষয় নেই চক্রবর্তী মশায়, এ-চাঁদ আপনার অক্ষয় চাঁদ।

রামেশ্বর বলিলেন, মঙ্গল হোক আপনার, অমোঘ হোক আপনার আশীর্বাদ।

সুনীতি হেমাঙ্গিনীর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিলেন; হেমাঙ্গিনী বলিলেন, যাও ভাই, তুমি ছেলেকে খেতে দিয়ে এস। আমি বসছি চক্রবর্তী মশায়ের কাছে।

সুনীতি চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় হেমাঙ্গিনীকে সাবধান করিয়া চুপি চুপি বলিয়া গেলেন, মাঝে মাঝে দু-একটা ভুল বলেন, দেখবেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কত দিন ভেবেছি, আসব, আপনাকে দেখে যাব, কিন্তু পারি নি। আবার ভেবেছি, যাক, মুছেই যখন গেছে সব, তখন মুছেই যাক। কিন্তু সেও হ'ল না, মুছে গেল না। পাথরে দাগ ক্ষয় হয় মুছে যায় কিন্তু মনের দাগ কখনও মোছে না। আজ আর থাকতে পারলাম না। অপরাধ যে আমাদেরই। এর জন্যে দায়ী যে উনি।

কে? ইন্দ্র? না না রায়-গিন্নী, দায়ী আমি। হেতু ইন্দ্র। সব আমি খতিয়ে দেখেছি। চিত্রগুপ্তের হিসাবের খাতায় মাঝে মাঝে আমি উঁকি মেরে দেখি কিনা।

হেমাঙ্গিনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, কিন্তু এমন ভাবে ভেঙে লুটিয়ে পড়লে তো চলবে না আপনার চক্রবর্তী মশায়। সুনীতির দিকে, ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন তো তাদের মুখ।

বুক ফেটে যায় রায়-গিন্নী, বুক ফেটে যায়। কিন্তু কি করব বলুন, আমার উপায় নেই।

উপায় আপনাকে করতে হবে, উঠে দাঁড়াতে হবে।

কি ক'রে উঠে দাঁড়াব? দিনের আলোতে আমার চোখে অসহ্য যন্ত্রণা, তার ওপর,—আপনার কাছে গোপন করব না, রায়-গিন্নী, হাতে আমার কুষ্ঠ হয়েছে।

হেমাঙ্গিনী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

রামেশ্বর বলিলেন, এরা কেউ বিশ্বাস করে না; কবরেজ বলেন, না, ডাক্তার বলেন, না; রক্তপরীক্ষা ক'রে তারা বলে, না; সুনীতি বলে, না। মূর্খ সব। রায়-গিন্নী, ভগবানের বিধানের দুর্জ্ঞেয় রহস্য এরা বোঝে না। আয়ুর্বেদে আছে কি জানেন? যেখানে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, রোগ যেখানে কর্মফল, সেখানে চিকিৎসকের ভুল হবে। একবার নয়, শতবার দেখলে শতবার ভুল হবে।

হেমাঙ্গিনী সতর্ক তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে রামেশ্বরের সর্বাঙ্গ দেখিতেছিলেন, কোথাও এক বিন্দু বিকৃতি তিনি দেখিতে পাইলেন না। তিনি শুনিয়াছিলেন, আজ প্রত্যক্ষ বুঝিলেন, রোগের ধারণাই মস্তিষ্কবিকৃতির উপসর্গ। বলিলেন, না চক্রবর্তী মশায়, এ আপনার মনের ভুল। কই কোথাও তো এক বিন্দু কিছু নেই!

হাতের দশটা আঙুল প্রসারিত করিয়া দিয়া রামেশ্বর বলিলেন, এই আঙুলে আঙুলে।

অহীন্দ্রের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সুনীতি একটা পাখা লইয়া বাতাস করিতেছিলেন। হেমাঙ্গিনী উপর হইতে নামিয়া আসিলেন, বলিলেন, আজ তা হ'লে আসি ভাই।

সুনীতি বলিলেন, সারাক্ষণ নন্দাইয়ের সঙ্গেই ব'সে গল্প করলেন, আমার কাছে একটু

বসবেন না দিদি ?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, তোমার সঙ্গে কত যে গল্প করতে সাধ, সে কথা আর একদিন বলব সুনীতি। চক্রবর্তী মশায় যখন তোমায় বিয়ে ক'রে আনলেন, তখন তোমার ওপরই রাগ হয়েছিল। অকারণ রাগ। তারপর যত দেখলাম, ততই তোমার সঙ্গে কথা ব'লে তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে সাধ হয়েছে। সে অনেক কথা, পরে একদিন বলব। আজ যাই, বুঝতেই তো পারছ, লুকিয়ে এসেছি। তবে একটা কথা ব'লে যাই, যেটা বলতে আমার আসা। তুমি ভাই মজুমদারকে সরাও। ওঁর কাছে আমি শুনেছি, সম্পত্তি ও-ই নিজে বেনাম ক'রে ডেকেছে।

সুনীতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জানি দিদি। আমি ওঁকে জবাবও দিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা কি জানেন, তবুও উনি আসছেন, না বললেও কাজকর্ম ক'রে দিয়ে যাচ্ছেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, সেও বন্ধ করা দরকার বোন, যে এমন বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে, তাকে বিশ্বাস কি ?

এখন বার বার বলছেন, চরটা বেচে ফেলুন, অনেক টাকা হবে।

না না, এমন কাজও ক'রো না ভাই। আমি ওঁর কাছে শুনেছি, চরটায় তোমাদের অনেক লাভ হবে, আয় বাড়বে।

কিন্তু চর নিয়ে যে গ্রাম জুড়ে বিবাদ দিদি, আমি কেমন ক'রে সে সব সামলাব ? আর বিবাদ না মিটলেই বা বন্দোবস্ত করব কি ক'রে বলুন ?

সাঁওতালদের ডেকে তোমরা খাজনা আদায় ক'রে নাও সুনীতি। আমি এইটুকু ব'লে গেলাম যে, তোমার দাদা আর কোন আপত্তি তুলবেন না। আর কেউ যদি তোলে, তবে তাতেও তিনি তোমাকেই সাহায্য করবেন।

সুনীতি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে হেমাঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, তাঁকে আমার প্রণাম দেবেন দিদি, বলবেন—

বাধা দিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন, পারব না ভাই। বললাম তো লুকিয়ে এসেছি।

* * *

মানদা ঝি যায় নাই, বাড়িঘর নাই বলিয়া এখানেই এখনও রহিয়াছে। আপনার কাজগুলি সে নিয়মিতই করে। সুনীতি আপত্তি করিলেও শোনে না। বরং কাজ তাহার এখন বাড়িয়া গিয়াছে, বাড়াইয়াছে সে নিজেই। সদর কাছারি-বাড়ির চাকর চলিয়া গিয়াছে, নায়েবও নাই, কিন্তু তবুও অনেক পরিষ্কারের প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন সে নিজেই আবিষ্কার করিয়া কাজটি আপনার ঘাড়ে লইয়াছে। তাহার উপর সকালে সন্ধ্যায় দুয়ারে জল, প্রদীপের আলো, ধূপের ধোঁয়া এগুলি তো না দিলেই নয়। হিন্দুর বাড়ি, মা লক্ষ্মী রুষ্ট হইবেন যে!

সুনীতি আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু মানদা বলিয়াছিল, যতদিন আছি আমি করি তারপর আপনার যা খুশি হয় করবেন। আপনি যদি তখন নিজে হাতে গোবর মেখে ঘুঁটে দেন

পয়সা বাঁচাবার জন্যে—দেবেন, আমি তো আর দেখতে আসব না।

কাছারি-বাড়ি সে পরিষ্কার করে দিনে দ্বিপ্রহরে; খাওয়া-দাওয়ার পর মানুষের একটা বিশ্রামের সময় আছে, এই সময়টায় বাহিরে লোকজন থাকে না, সেই অবসরে নিত্য কাজটা সারিয়া লয়। লজ্জাটা তাহার নিজের জন্য নয়, চাকরের বদলে ঝি কাছারি সাফ করিলে অন্য কেহ কিছু না বলুক, ওই রায়-বাড়ির ছেলেগুলি হয়তো ছড়া বাঁধিয়া বসিবে। সেদিন সে তক্তাপোশের উপর পাতা ফরাশ হইতে আরম্ভ করিয়া মেঝে পর্যন্ত সমস্ত পরিপাটি করিয়া ঝাঁট দিতেছিল, আর গুনগুন করিয়া গান গাহিতেছিল। এতবড় নির্জন ঘরগুলোর মধ্যে একা কাজ করিতে করিতে কেমন গান পাইয়া বসে। দুই-একবার বড় আয়নাটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিভ ও ঠোঁট বাহির করিয়া দেখে, পানের রসটা কেমন ঘোরালো হইয়াছে। স্নানের পর হইতেই চুল খোলা থাকে, খোলা চুলও এই সময়ে বাঁধিয়া লয়। আজ সহসা তাহার গান থামিয়া গেল, অনেক লোক যেন কাছারির বাহিরের প্রাঙ্গণে কথা বলিতেছে। ঝাঁট দেওয়া বন্ধ রাখিয়া উঠিয়া খড়খড়ি-দেওয়া দরজাটার খড়খড়ি তুলিয়া সে দেখিল, সাঁওতালরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জনহীন রুদ্ধদ্বার কাছারির দিকে চাহিয়া তাহারা চিন্তিত হইয়া কি বলাবলি করিতেছে। মানদা ঘরের ভিতরে ভিতরেই অন্দরে চলিয়া গিয়া সুনীতিকে বলিল, সাঁওতালরা সব দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়ে আছে মা, কি সব বলাবলি করছে! আমি এই গলি গলি গিয়ে ডাকব নায়েবকে?

সুনীতি বলিলেন, না। অহিকে ডাক্ তুই, ওপরে নিজের ঘরেই আছে সে।

অহীন্দ্র আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতেই মাঝির দল কলরব করিয়া উঠিল, রাঙাবাবু! অহীন্দ্র সাধারণতঃ এখানে থাকে না, তাহারা প্রত্যাশা করিয়াছিল মজুমদারকে। অপ্রত্যাশিত-ভাবে তাহাদের রাঙাবাবুকে পাইয়া তাহারা খুব খুশি হইয়া উঠিল। অহীন্দ্র বলিল, কি রে, তোরা সব কেমন আছিস?

ঠকাঠক তখন প্রণাম হইয়া গিয়াছে। কমল মাঝি জোড়হাত করিয়া বলিল, ভাল আছি আজ্ঞা। আপুনি কেমন ক'রে এলি বাবু? আমরা সব কত বুলি, কত খুঁজি তুকে! বুলি, আমাদের রাঙাবাবু আসে না কেনে? মেয়েগুলা সব শুধায়।

হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, আমি যে পড়তে গিয়েছিলাম মাঝি।

ক খ অ আ সেই সব! রিংজী ফার্সী, না কি বাবু?

হ্যাঁ, অনেক পড়তে হয়। তার পর তোরা কোথায় এসেছিস?

আপনার কাছে তো এলম গো। বুলছি আমাদের জমি কটির খাজনা তুরা লে, আমাদিগকে চেক-রসিদ দে। তা নইলে কি ক'রে থাকবো গো?

খাজনা কে পাবেন, এখনও যে তার ঠিক হয় নি মাঝি। সে ঠিক—

বাধা দিয়া কমল বলিল, না গো, সে সব ঠিক হয়ে গেল। দিলে সব ঠিক ক'রে উই সেই রায়-হুজুর, আমাদিকে বুললে, চরটি তুদের রাঙাবাবুদেরই ঠিক হ'ল মাঝি। খাজনা তুরা সেই কাছারিতে দিবি। তাথেই তো আজ ছুটে এলম গো।

দ্বিপ্রহরে হেমাঙ্গিনীর কথা অহীন্দ্রের মনে পড়িয়া গেল। সে এবার দ্বিধা না করিয়া বলিল, দে, তবে দিয়ে যা।

কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া মাঝি বিনয় করিয়া হাসিয়া বলিল, হা বাবু, ইটি আপনি কি বুলছিস? জমি কটি মাপতে হবে, তা বাদে হিসাব করতে হবে, তুদের খাতিতে নাম লিখতে হবে, সি সব কর্ আগে! লইলে কি ক'রে দিব?

অহীন্দ্র বিব্রত হইয়া বলিল, সে তো আমি পারব না মাঝি, আমি তো জানি না ওসব। তবে আমি তার ব্যবস্থা করছি, বুঝলি?

মাঝি বিস্মিত হইয়া গেল, তবে আপুনি কি বিদ্যে শিখলি গা?

হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, সে সব অনেক বই মাঝি, নানা দেশের কথা, কত বড় বীরের কথা, কত যুদ্ধের কথা।

হঁ্যা, তা সি কোন্ গাঁয়ের কথা বটে গো?—বীর বুললি—কারা বটে সি সব?

সে সব পৃথিবী জুড়ে নানা দেশ আছে, সেই সব দেশ, আর সেই সব দেশের বড় বড় বীর—তাদের কথা মাঝি। আরও সব কত কথা—ওই আকাশে সুয্যি উঠছে, চাঁদ উঠছে, সেই সব কথা।

হঁ্যা! মাঝির মুখ-চোখ বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল, সে মুখ ফিরাইয়া দলের সকলকে আপন ভাষায় বলিল, রাঙাবাবু কত জানে দেখ্।

সঙ্গীর দল আপন ভাষায় রাঙাবাবুর তারিফ করিয়া মৃদু কলরব আরম্ভ করিয়া দিল, কমল বলিল, হঁ্যা বাবু, এই যি পিথিমীটি, এই যি ধরতি-মায়ী—ইকে কে গড়লে? কি লেখা আছে পুঁথিতে তুদের?

অহীন্দ্র বলিল, পৃথিবী হ'ল গ্রহ, বুঝলি? আকাশে রাত্রে সব তারা ওঠে না? এও তেমনি একটা তারা। আগে পৃথিবী দাউ দাউ ক'রে জ্বলত। যেমন কড়াইয়ে গুড় কি রস টগবগ ক'রে ফোটে তেমনি ক'রে ফুটত।

মাঝি বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু, তুকে এখনও অনেক পড়তে হবে! পিথিমীতে আগে ছিল জল। কিছুই ছিল না, শুধুই জল ছিল। তার পরে হ'ল কি জানিস? বলি শোন্। বলিয়া সে মোটা গলায় আরম্ভ করিল—

অথ জনম্ কু ধরতি লেণ্ডং
অথ জনম্ কু মানোয়া হড়
মান মান কু মানোয়া হড়
ধরতি কু ডাবাও আ-কাদা,
ধরতি সানাম্ কু ডাবাও কিদা।

গান শেষ করিয়া মাঝি বলিল, পেথমে ছিল জল—কেবল জল। তার পর হ'ল—'অথ জনম্ কু ধরতি লেণ্ডং; বুল্ছে, লেণ্ডং গায়ে থেকে মাটি বার ক'রে ধরতিকে বানালে—মাটি করলে। লেণ্ডং হ'ল—ওই যে মাছ ধরিস তুরা, কেঁচো গো, কেঁচো। দেখিস কেনে—আজও

উহার গায়ে থেকে মাটি বার করে। তারপর হল—'অথ জনম্ কু মানোয়া হড়'। বুলছে, মাটিতে হ'ল মানুষ। 'মান মান কু মাতোয়া হড়', কিনা মানুষ মানুষ—কেবলই মানুষ। তখন তুর 'ধরতি কু ডাবাও আ-কাদা' কিনা—মানুষ করলে ধরতি—মাটি খুঁড়ে চাষ;—ফসল হ'ল। 'ধরতি সানাম্ কু ডাবাও কিদা'—একেবারে তামাম ধরতিতে চাষ হয়ে অ্যানেক ফসল হ'ল।

অহীন্দ্র হাসিল, কিন্তু বড় ভাল লাগিল এই গান ও গল্প। মাঝি আবার বলিল, ধরতি-মাটি বানালে তুর 'লেণ্ডং—কেঁচোতে, পোকাতে।

অহীন্দ্র তাহাকে উৎসাহিত করিয়া বলিল, এ সব কথা তো আমি জানি মাঝি।

উৎসাহ পাইয়া মাঝি জাঁকিয়া বসিয়া বলিল, তবে শুনো আপুনি, বুলি আপনাকে। ঠাকুর বুঝো তো বাবু, ঠাকুর—ভগোমান? সি পেথমে জল করলে—সব জল হয়ে গেল। তখুন ঠাকুর ছুটি "হাঁস-হাসিল" বানালে। হাঁস-হাসিল হ'ল পাখী, বুঝলিন বাবু? তা সি পাখী ছুটি ঠাকুরকে বুললে, হাঁ ঠাকুর, আমাদিকে তো বানালি তা আমরা থাকব কুথা, খাব কি? ঠাকুর বললে, হেঁ, তা তো বেটে! তখন ঠাকুর ডাকলে তুর কুমীরকে। বললে, তুমি মাটি তুলতে পারিস? কুমীর বুললে, হেঁ আপুনি বুললে পারি। কুমীর মাটি তুললে, সি-সব মাটি জলে গ'লে ফুরিয়ে গেল। তখন ঠাকুর ডাকলে—ইচা হাকোকে—বোয়াল মাছকে, তা, উয়ার মাটিও গ'লে গেল। তার বাদে এল কাটকম। কি বুলিস তুরা উয়াকে? আ-হা! ...কাটকমের বাংলা ভাবিয়া না পাইয়া মাঝি চিন্তিত হইয়া পড়িল।

কাঠের পুতুলের ওস্তাদ কথাটা যোগাইয়া দিল, কাঁকড়ি। কাঁকড়া বলে বাবুরা। সেই যি লম্বা পা—

হেঁ। কমল মাঝি বলিল, হেঁ। কাঁকুড়িকে ডাকলে তখুন। বুললে মাটি তুলো তুমি! উ মাটি তুললে, তা, সিটোও গ'লে গেল। তখুন ঠাকুর ডাকলে লেণ্ডংকে—কেঁচোকে। শুধালে, তুমি মাটি তুলতে পারিস? উ বুললে, পারি; তা ঠাকুর, হারোকে সমেত ডাক আপুনি। হারো হ'ল তুমার 'কচ্ছপ গো। কচ্ছপ এল। কেঁচো করলে কি—উয়াকে জলের উপরে দাঁড় করালে, লিয়ে উয়ার পা কটা শিকল দিয়ে বেঁধে দিলে। তা বাদে, কেঁচো আপন লেজটি রাখলে উয়ার পিঠের উপর, আর মুখটি ডুবায়ে দিলে জলের ভিতর। মুখে মাটি খেলে আর লেজ দিয়ে বার ক'রে কচ্ছপের পিঠের ওপর রাখলে। তখুন আর গ'লে গেল না। এমুনি ক'রে মাটি তুলতে তুলতে পিথিমী ভ'রে গেল।

সমস্ত কাহিনীটি বলিয়া কমল বিজ্ঞভাবে হাসিয়া বলিল, বুঝলি বাবু? ই সব তুকে শিখতে হবে।

সাঁওতালদের এই পুরাণকথা শুনিয়া অহীন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল। ইহাদের এমন পুরাণ-কথা আছে, সে তাহা জানিত না। সে মুগ্ধ বিস্ময়ে নীরবে গল্পটি মনে মনে স্মরণ করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইতে আরম্ভ করিল।

কমল মাঝিও নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল তাহার তারিফ শুনিবার প্রত্যাশায়।

পিছন হইতে কাঠের পুতুলের ওস্তাদ বলিল, বাঃ, তুমি যে গল্পে মজিয়া গেলে গো সর্দার! জমির কথাটা বলিয়া কথাটা পাকা করিয়া লও! এই লোকটি জ্ঞানে গরিমায় কমলের প্রতিদ্বন্দ্বী। সর্দারের এই 'বিদ্যা জাহির' করাটা তাহার সহ্য হয় না, তা ছাড়াও লোকটি খাঁটি সংসারী মানুষ, বিষয়বুদ্ধিতে পাকা। অন্য মাঝিরাও কাঠের পুতুলের ওস্তাদের কথায় সায় দিয়া উঠিল।

কমল একটু রুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু সকলের সমর্থন দেখিয়া সে কোন প্রতিবাদ করিল না। অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বাবুমশয়!

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল,—তোমার একথা খুব ভাল কথা মাঝি। ভারী সুন্দর।

হুঁ গো, খুব ভাল বটে। তা—হাঁ বাবু, আমাদের তবে কি করবি?

বললাম তো লোক পাঠিয়ে দেব।

উ-হুঁ। তুকে নিজে যেতে হবে! উয়ারা সব চোর বটে।

কমলের চোখ দুইটি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, শুন রাঙাবাবু ইয়ার লেগ্যে একবার আমরা খেপলম। এই বড় বড় হাঁড়িতে ঘি নিয়ে যেতম, দোকানীরা ঘি লিথো, তা এক সেরের বেশী কখুনও হ'ত না। মহাজনেরা কাই হড় বটে, পাপী মানুষ, মাঝিদের হাড্ডি চিবায়ে খেলে। গোমস্তাতে টাকা লিলে, রসিদ দিলে না। খাজনা লিলে আবার জমি লিলেম করালে। জমা বাড়ালে। বললম, জমি বাড়ুক, তবে জমা বাড়বে, লইলে কেনে বাড়বে? বাবা দাদা বন কেটে জমি করলে, আমরা খাজনা দিলম, তবে লিলেম হবে কেনে জমি? তা শুনলে না। তখন আমরা খেপলম। সিধু, কানু সুভাঠাকুর (সুবাদার) হ'ল—এক রাতে হ'ল। জানিস বাবু, রাতেই লোক বড় হয়, আবার রাতেই লোক ছোট হয়। সুভা, সিধু, কানু হুকুম দিলে, আমরা খেপব। তুর দাদা—বাবার বাবা—রাঙাঠাকুর বললে, খেপ তুরা, খেপ। এই টাঙ্গি লিয়ে রাঙাঠাকুর খেপল, আমাদের বাবাদের সাথে। তখুন ধরলম মহাজনদিকে, একটি ক'রে আঙুল কাটলম, আর বললম, বাজা, টাকা বাজা! দাড়িওলা মহাজনকে জমিদারকে ধরলম, ভাল পাঁঠা বলে বোঙার কাছে কাটলম। একটো গোমস্তা জলে নামল, তীর দিয়ে তাকে বিঁধলম। তারপরে টেনে তুলে—পেরথম কাটলম পা। বললম, এই লে চার আনা সুদ। তার পর কাটলম কোমর থেকে, বললম, এই লে আট আনা, সুদ আর খাজনা। কাটলম হাত দুটা, বললম, এই বারো আনা, সুদ, খাজনা, তোর তহুরী। তারপর কাটলম মাথা, বললম, এই লে ষোল আনা, লিব্যাধি! ফারখত!

কমল চুপ করিল। সমস্ত বাড়িটা যেন স্তব্ধ হইয়া গেল; যেন সব উদাস হইয়া গিয়াছে। অহীন্দ্র নীরব বিস্ময়ে চাহিয়া ছিল স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির মত ওই কমলের দিকে। সাঁওতালরাও নীরব। তাহাদের উপরেও যেন কেমন নীরব বিষণ্ণতা নামিয়া আসিয়াছে।

কমলই আবার বলিল—এবার তাহার মুখও বিষণ্ণ, কণ্ঠস্বরে মিনতির অনুনয়—বলিল, তাথেই বুলছি বাবু।

অহীন্দ্র এতক্ষণে বলিল, আবার তোমাদের ঠকালে তোমরা খেপবে?

খেপব ? কমল বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

কেন ?

রাঙাঠাকুর ম'ল, সিধু সুভাঠাকুর ম'ল, রাঁচিতে বিসরা মহারাজ ম'ল আর কে খেপাবে বল্‌ ? কে হুকুম দিবে ? আর বাবু—

কমল আপনাদের সঙ্গীদের দেখাইয়া বলিল, ইয়ারা সব আর সি সাঁওতাল নাই। ইয়ারা মিছা কথা বলে, কাজ করতে গিয়ে গেরস্তকে ঠকায়, খাটে না, ইয়ারা লোভী হইছে। পাপ হইছে উয়াদের। উয়ারা খেপতে পারবে না। উয়ারা ধরম নষ্ট করলে।

শেষের দিকে কমলের কণ্ঠস্বর সকরুণ হইয়া উঠিল। কথা শেষ করিয়া সে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পিছনে মাঝির দল মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের সর্দারের অভিযোগ তাহাদের লজ্জা দিয়াছে।

কথা বলিল সেই চুড়া মাঝি—পুতুল নাচের ওস্তাদ, সে লোকটা অনেকটা বাস্তবপন্থী, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, টাকা লইলে কিছু হয় না বাবু, টাকা নাই, খেপে কি করব ? আর বাবু খেপে ম'রেই যদি যাব তো খেপলম কেনে বল্‌ ? বুদ্ধি করলম ইবার আমরা।

কমল তাহার দিকে একটা ঘৃণার দৃষ্টি হানিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, তারপর অহীন্দ্রকে বলিল, আজই চ কেনে বাবু।

এবার পিছন হইতে সঙ্গীরা কথা বলিয়া উঠিল। শুনিয়া কমল বলিল, আর উয়ারা খেপবে না বাবু। খেপলম, তারপরে হাজারে হাজারে সাঁওতাল ম'ল গুলিতে। যারা বাঁচল, তারা ভাত পেলে না। সাঁয়ো ঘাস খেলে। বাবু, আমি তখন গিধরা—ছেলেমানুষ—তবু মনে লাগছে (পড়ছে), ইঁদুরের দড় (গর্ত) থেকে ধান বার করলম—গুণে চারটি ধান, জলে সিজলম (সিদ্ধ করলাম), সেই জল খেলম, ফেন ব'লে। আর উয়ারা খেপবে না। তাথেই সাহস হচ্ছে না। বুলছে চেক রসিদটি না হ'লে উয়াদের চাষে মন লাগছে না। তা বাদে আমাদের বিয়া আছে। ওই যে আমার লাতিনটি—সেই লম্বা পারা, তারই বিয়া হবে। তাথেই সব মাতন আছে আমাদের, হাঁড়িয়া খাবে সব, নাচবে, গান করবে। তাথেই সব তাড়াতাড়ি করছে।

অহীন্দ্র বলিল, বেশ, তাড়াতাড়িই ক'রে নেব—কাল কি পরশু। কিন্তু তোর নাতনীর বিয়েতে আমাদের নেমন্তন্ন করবি না ?

মাঝি শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, বাবা রে, আমাদের রাজা তুমি, রাঙাঠাকুরের লাতি, তেমুনি আগুনের পারা রঙ, তেমুনি চোখ, তেমুনি চুল। আপোনাকে তাই বুলতে পারি ? আমরা সব কত কি খাই—মুরগী শুয়োর—ছি !

সাঁওতালরা চলিয়া গেল। অহীন্দ্র মুগ্ধ হইয়া তখনও ওই বুড়া মাঝির কাহিনীর কথা ভাবিতেছিল। সে নিজে বিজ্ঞান ভালবাসে। বুড়োর কাহিনীর মধ্যে আদিম বর্বর জাতির বৈজ্ঞানিক মনকে সে আবিষ্কার করিল। সৃষ্টিরহস্যভেদে অনুসন্ধিৎসু মন কল্পনার সাহায্যে কাহিনী রচনা করিয়া রহস্যভেদ করিয়াছে।

তাহার চিন্তার সূত্র ছিন্ন করিয়া দিয়া রংলাল ও নবীন আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।—দাদাবাবু।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে অহীন্দ্র চাহিল, কোন কথা বলিল না।

একগাল হাসিয়া রংলাল বলিল, এই দেখেন, চর আপনাদেরই হ'ল তো? আমি মাশায়, বলেছিলাম কিনা? ছোট রায়-হুজুর সাঁওতালদের ব'লে দিয়েছেন তো, এই কাছারিতে খাজনা দিতে?

অহীন্দ্রের একটা কথা মনে হইল, সে নবীনকে বলিল, নবীন তুমি তো পুরনো লোক। সাঁওতালদের জমিটা মাপ করে দিতে পারবে?

সবিনয়ে নবীন বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। মাপ-জোক সব ক'রে দেব আমি।

সোৎসাহে রংলাল বলিল, আপনি চলুন, গিয়ে দাঁড়াবেন শুধু, বাস। আমরা সব ঠিক ক'রে দেব।

অহীন্দ্র বলল, কাল ভোরে তা হ'লে এস তোমরা।

১১

ভোরবেলাতেই রংলাল সদলে আসিয়া ডাকাডাকি শুরু করিল। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া কাজ করার অভ্যাস মানদার চিরদিনের; সে কাজ করিতে করিতেই বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, কে গো তুমি? তুমি তো আচ্ছা নোক! এই ভোরবেলাতে কি ভদ্দর নোকে ওঠে নাকি? এ কি চাষার ঘর পেয়েছ নাকি?

রংলাল বিরক্ত হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বরের মধ্যে যথাসাধ্য গাম্ভীর্যের সঞ্চার করিয়া সে বলিল, ডেকে দাও, ছোটদাদাবাবুকে ডেকে দাও। জরুরী কাজ আছে।

কি, কাজ কি?

তুমি মেয়েছেলে নোক, তুমি সে বুঝবে না। জরুরী কাজ।

মানদার স্বর এবার রুক্ষ হইয়া উঠিল, সে বলিল, জরুরী কাজ আছে, তোমার আছে। আমার কি দায় পড়েছে যে, এই ভোরবেলাতে ঘুম ভাঙাতে গিয়ে বকুনি খাব? আর তুমি এমনি ক'রে চেঁচিও না রলছি, ঘুম ভেঙে গেলে আমাকে বকুনি খেতে হবে।

রংলাল বুঝিল, মানদা মিথ্যা কথা বলিতেছে, একটু মাতব্বরি করিবার চেষ্টা করিতেছে। অহীন্দ্রকে সে ভাল করিয়াই জানে, তিনি নিজেই তাহাকে ভোরবেলা ডাকিবার জন্য বলিয়া রাখিয়াছেন। মনে মনে একটু হাসিয়া সে কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া ডাকিল, ছোটদাদাবাবু! ছোটদাদাবাবু! ছোটবাবু!

দোতলার উপর হইতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং রুক্ষ স্বরে কে উত্তর দিল, কে? কে তুমি?

সে কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যে ও রুক্ষতায় রংলাল চমকিয়া উঠিল, বুঝিল, কর্তা রামেশ্বর অকস্মাৎ

জাগিয়া উঠিয়াছেন ; ভয়ে সে শুকাইয়া গেল। তাহার সঙ্গে আরও যে কয়েকজন আসিয়াছিল, তাহারাও সভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাড়ির ভিতরে উঠান হইতে উত্তর দিল মানদা, বলিল, আমি বার বার বারণ করলাম দাদাবাবু, তা কিছুতেই শুনলে না। বলে, তুমি মেয়েছেলে নোক, বুঝবে না, জরুরী কাজ।

এবার অহীন্দ্রের কণ্ঠস্বর বেশ বোঝা গেল, সে কণ্ঠস্বরে এখনও ঈষৎ অপ্রসন্নতার আভাস ছিল, অহীন্দ্র বলিল, ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। রংলাল বুঝি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই তো আসতে বলেছিলাম।

রংলাল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল, সে তখনও ভাবিতেছিল, সে কণ্ঠস্বর ছোটদাদাবাবুর? অহীন্দ্রের এই পরিবর্তিত স্বাভাবিক কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না।

অহীন্দ্র আবার বলিল, এই আমি এলাম ব'লে রংলাল। একটু অপেক্ষা কর।

কিছুক্ষণ পরেই হাসিমুখে সে ভিতর হইতে কাছারির দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। বারান্দায় একা রংলাল নয়, তাহাদের পুরানো নগদী নবীন লোহার এবং আরও দুই-তিনজন রংলালের অন্তরঙ্গ চাষী অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নবীনের হাতে হাত-চারেক লম্বা খান-চারেক বাখারি, রংলালের হাতে এক আঁটি বাবুইদড়ি, অন্য একজনের হাতে গোটাচারেক লাল কাপড়ের পতাকা।

অহীন্দ্র দলটিকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল, ওঃ, তোমরা তো খুব ভোরে এসেছ রংলাল? আমি আবার ভোরে উঠতে পারি না। কিন্তু, ও লাল পতাকা কি হবে নবীন?

রংলাল একটু আহত হইয়াছিল, সে কোন উত্তর দিল না। উত্তর দিল নবীন লোহার, তাহাদের পুরোনা নগদী ; আজ্ঞে, আজ আমাদের কায়েমী দখল হবে কিনা, তাই চার কোণে পুঁতে দিতে হবে।

কল্পনাটা অহীন্দ্রের খুব ভাল লাগিল, সে বলিল, বাঃ, সে বেশ হবে। চল এখন, বেলা হয়ে যাচ্ছে।

রংলাল ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, ঘুমটা আপনার এই সকালে ভাঙিয়ে দিলাম দাদাবাবু! ভারী ভুল হয়ে গেল মাশাই, টুক্‌চে পরে ডাকলেই হ'ত।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, না না, সে ভালই হয়েছে রংলাল। হঠাৎ ঘুম ভাঙলেই আমার মেজাজ বড় খারাপ হয়ে যায়। তোমাদের কিছু বলি নি তো রংলাল?

রংলাল এইটুকুতেই যেন জল হইয়া গেল, বলিল, আজ্ঞে না। সে আমরা কিছু মনে করি নাই। এখন চলুন, রোদ উঠলে তখন আবার ভারী কষ্ট হবে আপনার।

ক্ষুদ্র বাহিনীটি বাহির হইয়া পড়িল। রংলাল কিন্তু উসখুস করিতেছিল, তাহার কয়েকটা কথা এখনও বলা হয় নাই। কাল হইতেই কথাটা বলিবার সঙ্কল্প তাহার ছিল, কিন্তু অহীন্দ্রের কণ্ঠস্বর এবং রুক্ষতার আঘাতে সমস্তই কেমন উল্টাইয়া গেল। পথে চলিতে চলিতে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া কথাটার ভূমিকারূপেই সে হাসিয়া বলিল, বুঝলে নবীন এই যে কথায় বলে, বাঘের প্যাটে বাঘ হয়, সিংগীর প্যাটে সিংগী হয়, এ কিন্তু মিথ্যে লয়।

নবীন অর্থও বুঝিল না, উদ্দেশ্যও বুঝিল না, কিন্তু গম্ভীরভাবে কথাটাকে সমর্থন করিয়া বলিল, নিচ্চয়।

অহীন্দ্র কৌতুকে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রংলাল বলিল, হাসবেন না দাদাবাবু, হাসির কথা লয়। আমার পিলুই বলে চমকে উঠেছিল! বুঝলে লবীন, দাদাবাবু হাঁকলেন, কে, কে তুমি? বললে না পেত্যয় যাবে ভাই, আমার ঠিক মনে হ'ল কর্তাবাবু উঠে পড়েছেন—একেবারে অবিকল।

নবীন বলিল, ইটি তুমি ঠিক বলেছ গোড়ল, অবিকল। আমিও ভেবেছিলাম ঠিক তাই।

রংলাল উৎসাহিত হইয়া বলিল, তাই তো বলছি হে, বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়। আমি এক-এক সময় ভাবতাম, আঃ, দাদাবাবু কি ক'রে আমাদের জমিদার সেজে বসবে? তা সে ভাবনা আজ আমার গেল।

অহীন্দ্র গম্ভীরভাবে মাথাটি অল্প নীচু করিয়া নীরবে চলিতেছিল, মনে মনে লজ্জা অনুভব না করিয়া সে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল দেশ-বিদেশের কত মহাপুরুষের কথা। তাঁহাদের আদর্শের তুলনায় জমিদার! ছিঃ!

রংলাল আবার বলিল, সাঁওতালদের জমি আমি দেখেছি, মোটমাট তা তোমার বিঘে পঞ্চাশেক; তার বেশি হবে না। আর ধর আমাদের পাঁচজনের দশ বিঘে ক'রে পঞ্চাশ বিঘে, এই পঞ্চাশ বিঘে মাপতে আর কতক্ষণ লাগিবে? পহরখানেক বেলা না হ'তেই হয়ে যাবে। অ্যাঁ, ও লবীন?

নবীন বলিল, তা বইকি। আমি তোমার চারখানা দাঁড়া নিয়ে এসেছি। চারজনাতে মাপলে কতক্ষণ?

রংলাল বলিল, বুঝলেন দাদাবাবু, আমরা পাঁচজনায় জমি নেবার খবর একবার ছড়ালে হয়; দেখবেন, গাঁয়ের যত চাষী সব একেবারে হত্যে দিয়ে পড়বে।

অহীন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, তোমরাও জমি নেবে নাকি? কই, সে কথা তো বল নি?

রংলাল বলিল, এই দেখেন, ইয়ের মধ্যেই ভুলে গিয়েছেন দাদাবাবু? সেই দেখেন, পেথম দিনেই কাছারিতে আপনার সঙ্গে দেখা, আপুনি নিয়ে গেলেন বাড়িতে, গিন্নীমায়ের কাছে। আমাদের চাষীরা সব রব তুলেছিল, জমি আমাদের, জমি আমাদের। আমিই তো আজ্ঞে ব'লে দিলাম, চক আফজলপুরের সঙ্গে লাগাড় হয়ে যখন চর উঠেছে, তখন আজ্ঞে, ও চর আপনাদের। ই আইন আমার বেশ ভাল ক'রে জানা আছে। তবে হ্যাঁ, ধর্ম যদি ধরেন, ধরে না তো কেউ আজকাল, তা হ'লে অবশ্যি আমরাও পাই। গিন্নীমাও কথা দিয়েছিলেন, মনে ক'রে দেখেন।

অহীন্দ্র অনেক কিছু ভাবিতেছিল। ইহারা যাহা বলিতেছে তাহা সত্য, এ সত্য সে অস্বীকার করিতেও চাহে নাই। সে বলিতে চাহিতেছিল, আজই যে সেই কথা অনুযায়ী বিলি-বন্দোবস্ত

করা হইবে, এ কথা তো হয় নাই। ইহার মধ্যে অনেক কথা আছে যে—সেলামী, খাজনা, পাট্টা, কবুলতি, অনেক কথা। সাঁওতালদের কথা স্বতন্ত্র। আজ তাহারা বসিয়াছে, দশ বৎসর, পনেরা বৎসর বা বিশ বৎসর পরে হয়তো তাহারা চলিয়া যাইবে। তাহাদের জমি জমিদারদের খাসে আসিবে। আর ইহাদের স্বত্ব, বংশানুক্রমে দান বিক্রয় সকল রকমের অধিকার ইহারা কায়েমী করিয়া লইবে। তা ছাড়া, সাঁওতালরাই ওই চরকে পরিষ্কার করিয়া ফলপ্রসবিনী করিয়াছে। তাহাদের দাবির সহিত কাহারও দাবি সমান হইতে পারে না।

রংলাল বলিল, জুতো খুলতে হবে না দাদাবাবু, আসুন, কাঁধে ক'রে আমি পার ক'রে দিই।

কালিন্দীর ঘাটে সকলে আসিয়া পড়িয়াছিল। অহীন্দ্র রংলালকে নিরস্ত করিয়া বলিল, থাক।—বলিয়া জুতা জোড়াটি খুলিয়া নিজেই তুলিয়া লইতেছিল।

কিন্তু তাহার পূর্বেই রংলাল খপ করিয়া তুলিয়া লইয়া একরূপ মাথার উপর ধরিয়া বলিল, বাবা রে, আমরা থাকতে আপনি জুতো ব'য়ে নিয়ে যাবেন! সর্বনাশ!

নদীর ওপারে চরের প্রবেশ-পথে সাঁওতালেরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারাও সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। কিশোরবয়স্ক ছেলেগুলি পর্যন্ত আজ গরু-মহিষ-ছাগল-ভেড়া চরাইতে যায় নাই।

রংলাল বলিল, ওঃ, ই যি ছা-ছামুড়ি পর্যন্ত হাজির রে সব! আজ তোদের ভারী ধুম, না কি রে মাঝি?

কমল মাঝি গম্ভীরভাবে বলিল, তা বেটে বৈকি গো। জমিগুলা আজ সব আমাদের হবে। রাজাকে সব খাজনা দিব, বোঙাকে পূজা দিব।

নবীন রংলালের দিকে চাহিয়া বলিল, দেখ, আমরা বলি সব বুনো বোঙার জাত। তা দেখ, বুদ্ধি দেখ। লক্ষণ-কল্যেণগুলি তো সব বোঝে ওরা!

মোড়ল মাঝি আবার বলিল, হুঁ, বুদ্ধি আছে বৈকি গো। লইলে ধরমটি আমাদের থাকবে কেনে? পাপ হবে যি।

নদীর জলে মুখ ধুইবার জন্য অহীন্দ্র একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিল, সে আসিয়া উপস্থিত হইতেই আলোচনাটা বন্ধ হইয়া গেল, অহীন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিল, তা হ'লে তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ কর, নইলে রোদ্দুর হবে।

মোড়ল মাঝি আপন ভাষায় কি বলিল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই একটা ছেলে প্রকাণ্ড একটা ছাতা আনিয়া হাজির করিল। বাঁশের বাখারি ও শলা দিয়া তৈয়ারী কাঠামোর উপরে নিপুণ করিয়া গাঁথা শালপাতার ছাউনি; ছাউনির উপরে কোন গাছের বল্কলের সুতায় আল-পনার মত কারুকার্য; অহীন্দ্র ছাতাটি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

বলিল, বাঃ, ভারী সুন্দর ছাতা তো মাঝি! তোমরা তৈরী করেছ?

হুঁ গো। আমরা সব করতে পারি গো বাবু। অ্যানে—ক পারি। ই ছাতাটি

তুর করলে যেঁয়ে আমার মাঝিন। আমি খুব বড়মানুষ কিনা, তাথেই ইটিও করলে এ—ত ব—ড়!

*　　　*　　　*

প্রথমেই নবীন চরের চারিটি কোণ বাছিয়া চার কোণে লাল পতাকা চারিটা পুঁতিয়া দিয়া আসিল। তারপরেই আরম্ভ হইল জরিপ। দেশীয় মতে চার হাত লম্বা বাঁশের দাঁড়া দিয়া মাপ আরম্ভ হইল।

রংলাল বলিল, মাঝি, তু নাম বলে যা; দাদাবাবু আপুনি নিখে নিয়ে যান। শেষকালে যার যত হবে হিসাব ক'রে জমিজমা ঠিক করা যাবে।

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সি কেনে গো, ইয়ার নাম উয়ার নাম, সি তুরা লিখে কি করবি? একেবারে লিখে লে কেনে।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, তা হ'লে কাকে কত খাজনা লাগবে, কার কত জমি, সে সব কেমন ক'রে ঠিক হবে মাঝি?

কমল বলিল, সি সব আবার আমরা ঠিক ক'রে লিব গো। আপন আপন মেপে ঠিক ক'রে লিব। তুদের হিসাবে আমরা সি বুঝতে লারব।

রংলাল, নবীন ও তাহাদের সঙ্গীরা উৎসাহিত হইয়া উঠিল, কাজ তাহাদের অনেক সহজ হইয়া যাইবে, টুকরো টুকরো জমি মাপিবার প্রয়োজন হইবে না, একেবারে সাঁওতালদের অধিকৃত জায়গাটা মাপিয়া লইলেই খালাস। সে মাপ শেষ হইলেই তখন তাহারা আপন আপন জমি মাপিয়া ঠিক করিয়া লইতে পারিবে। এইটুকুর জন্য অকারণে তাহাদের মনে যেন উদ্বেগ জমিয়া রহিয়াছে। রংলাল বলিল, সেই ভাল দাদাবাবু, ওদের ভাগ ওরা আপনারা আপনারা ক'রে লেবে। আপনার ইস্টেটে থাকুক এক নামে একটা জমা হয়ে। সি আপনার ভাল হবে।

কাঠের পুতুল-নাচের ওস্তাদ আসিয়া মোড়ল মাঝিকে কি বলিতেছিল। তাহার বক্তব্য শেষ হইতে না হইতেই কমল মাঝি যেন ফুলিয়া আয়তনে বড় হইয়া উঠিল, দেহচর্মে বার্ধক্য-জনিত যে ঈষৎ কুঞ্চন দেখা দিয়াছিল, দেহ-স্ফীতির আকর্ষণে সে কুঞ্চন যেন মিলাইয়া গেল। ওস্তাদের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কমল তাহার গালে প্রচণ্ড জোরে একটা চড় বসাইয়া দিল। মুখে বলিল, সামান্য দুইটি কথা, সে কথা দুইটার মধ্যেও দুর্দান্ত ক্রোধের সুর রনরন করিতেছিল। লোকটা চড় খাইয়া বসিয়া পড়িল, সমবেত সাঁওতালদের মুখ দেখিয়া মনে হইল, ভীষণ ভয়ে তাহারা সঙ্কুচিত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কমল মাঝি তখনও ক্রোধে ফুলিতে-ছিল। আকস্মিক এমন পরিণতিতে স্তম্ভিত হইয়া অহীন্দ্র নীরবেই কারণ অনুসন্ধানের জন্য চারিদিক একবার চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কমল মাঝির ভয়ঙ্কর রূপ আর চারিদিকে সকলের মুখে ভয়ের সুস্পষ্ট ছাপ ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাইল না। রংলাল, নবীন ও তাহাদের সঙ্গের লোক-গুলি পর্যন্ত ভয় পাইয়াছে। অহীন্দ্র কমল মাঝির দিকেই চাহিয়া প্রশ্ন করিল, কি কমল, হ'ল কি? ওকে মারলে কেন?

এই মূর্তিতেও কমল যথাসাধ্য বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, আজ্ঞে রাজাবাবু, মানুষটা দুষ্টু করছে। বুললে, আমি মোড়ল-টোড়ল মানি না।

সবিস্ময়ে অহীন্দ্র বলিল, কেন ?

এবার প্রহৃত ওস্তাদ হাতজোড় করিয়া করুণ কণ্ঠে সভয়ে বলিল, আজ্ঞে রাজাবাবু, দোষ আমার হইছে, দোষটি আমার হইছে। আমি বুললাম, জমি সব আলাদা আলাদা ক'রে দিতে। আমরা সব চ্যাকলিব্ব্যাধি আলাদা আলাদা ক'রে লিব বুললাম। তাথেই আমি মোড়লের মানটি খারাপ করলাম। দোষটি আমার হ'ল।

কমল আপন ভাষায় গজগজ করিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল, সুরে বোঝা গেল সে ঐ ওস্তাদকে তিরস্কার করিতেছে। কিন্তু তবুও সে দুর্দান্ত কমল আর নাই। কমলের কথা শেষ হইতেই চারিপাশের মেয়ের দল কলকল করিয়া বকিতে আরম্ভ করিল, সেও ঐ লোকটিকে তিরস্কার করিয়া, মোড়লকে সমর্থন করিয়া।

অহীন্দ্র বলিল, তা হ'লে তোমাদের সমস্ত জমি একসঙ্গে জরিপ হবে তো ?

হুঁ, আমার নামে লিখে লে কাগজে, টিপছাপ লিয়ে লে আগে। বুলে দে, খাজনা কত হবে, আমরা সব মিটায়ে দিব। তবে ঐ যি আপনার কি বুলিস গো, সালামী না কি উ আমরা লারব দিতে। আমি সব ইয়াদের কাছে আদায় ক'রে খাজনা আপোনার কাছারিতে দিয়ে আসব।

নবীন এতক্ষণে সাহস পাইয়া হাসিয়া বলিল, তু তা হ'লে এদের জমিদার হলি, তোর আবার জমিদার হ'ল আমাদের দাদাবাবু—না কি ?

উঁ—হুঁ। আমি মোড়ল হলাম, রাজা বেটে—জমিদার বেটে আমাদের রাঙাবাবু।

মাপ আরম্ভ হইল, রাম দুই তিন চার···আড়ে হ'ল গা এক শ' চল্লিশ দাঁড়া।

নবীন ও রংলাল দুইজনে মিলিয়া জমিটার কালি করিয়া পরিমাণ খাড়া করিল, চল্লিশ বিঘা কয়েক কাঠা হইল। অহীন্দ্র বিশেষ মনোযোগ দিয়া হিসাবের পদ্ধতিটা দেখিতেছিল। ছেলে-বেলায় পাঠশালায় পড়া বিঘাকালি আর্যার সুরটাই যেন অস্পষ্টভাবে কানে বাজিয়া উঠিল, 'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্যে, কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্যে।'

রংলাল বলিল, তা হ'লে তোদের এখন এই জমি হ'ল মাঝি, চল্লিশ বিঘে, ক কাঠা না হয় ছেড়েই দিলাম। লে, এখন দাদাবাবুর, সঙ্গে খাজনা ঠিক ক'রে লে।

কমল অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, হাঁ রাঙাবাবু, আপুনি এবার হিসাব জুড়ে দেখ্।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, ঠিক আছে মাঝি।

না, আপুনি একবার দেখ্।

দেখেছি।

না, আপনি একবার লিজে দেখ্।

অগত্যা অহীন্দ্রকে কাগজ কলম লইয়া বসিতে হইল। তাহার চারিপাশে সাঁওতালরা

গম্ভীর হইয়া বসিল, সকলের উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি অহীন্দ্রের উপর। ছেলেমেয়েরা কথা বলিতেছিল, মোড়ল মাঝি গম্ভীরভাবে আপন ভাষায় আদেশ করিল, চুপ, চুপ সব, চুপ। রাঙাবাবু হিসাব করিতেছেন, মাটির হিসাব, জরিপের হিসাব।

পাড়ার মধ্যে কয়েকটি তরুণী আঙিনায় বসিয়া মৃদুস্বরে গুনগুন করিয়া গান করিতেছিল—

চেতান দিশ্‌ মরণে্‌ অ্যামিন্‌ বাবু,
লাতার দিশম্‌রে আড়গুএনা,
জমি-কিন্‌ সংইদা—
জমা কিন্‌ চ্যাপাওইদা
গরিব হড় ও কারে অ্যাম—আঃ।

অর্থাৎ পাহাড়ের উপর হইতে আমিনবাবু আসিয়াছেন, জমি মাপ করিতেছেন, জমা বাড়াইয়া দিতেছেন, কিন্তু আমরা গরিব লোক, আমরা কোথায় পাইব ?

একটি মেয়ে বলিল, ই গান বুলতে হবে রাঙাবাবুকে।

কমলের নাতনী বলিল, হুঁ বুলব। বেশী ক'রে খাজনা লিবে কেনে রাঙাবাবু? যাব আমরা উয়ার কাছে।

এখুনি ?

উঁ-হুঁ মোড়ল মাঝি ক্ষেপে যাবে। বাবা রে!

তবে ?

বিকালে আমরা ডাকব বাবুকে। হাঁড়িয়া জম করব, লাচব। উয়াকে ডেকে আনব।

নিতান্ত আকস্মিকভাবেই একটি মেয়ে বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, কেমন বরন বল্‌ দেখি রাঙাবাবুর ? রাঙা লাল ঝক ঝক করছে!

কমলের নাতনী বলিল, আগুনে—র পারা! রাঙাঠাকুরের লাতি, উ ঠাকুর বেটে।

একটি মেয়ে কি উত্তর দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু আবার মোড়ল মাঝির ক্রুদ্ধ চীৎকারে তাহারা চমকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজনের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

এবার বচসা হইতেছিল কমল মাঝির সহিত রংলাল এবং নবীনের দলের। সাঁওতালদের জমির পরই পূর্ব দিকে প্রায় বিঘা পঞ্চাশেক চর পড়িয়া আছে, সেই জমিটা পছন্দ করিয়া রংলাল এবং নবীন মাপিতে উদ্যত হইল। কমল মাঝি বলিল, উ জমি তুরা লিবি না মোড়ল, উ আমি দিব না।

রংলাল বিরক্তির সহিত বলিল, দিবি না? কেন?

আমরা তবে আর জমি কুথাকে পাব ? আমাদের ছেলেগুলা কি করবে ?

তাদের আবার ছেলে হবে, তাদের ছেলে হবে, তাই ব'লে গোটা চরটাই তোরা আগলে থাকবি নাকি ? মাপ হে, মাপ নবীন, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন ?

নবীন মাপিতে উদ্যত হইবামাত্র কমল তাহার হাতের দাঁড়া চাপিয়া ধরিয়া ক্রুদ্ধ উচ্চ চীৎকারে বলিয়া উঠিল, না, দিব না।

রংলালও এবার যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। এই পূর্ব দিকের চরের মাটি সকল দিকের মাটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ভাঙিলে ভুরার মত গুঁড়া হইয়া যায়, ভিতরের বালির ভাগ ময়দার মত মিহি, আলু ও আখের উপযোগী এমন মাটি আর বুঝি হয় না। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, এই দেখ্ মাঝি, কাটাকাটি হয়ে যাবে বলছি! খবরদার, তুই দাঁড়া ধরিস না, বললাম।

একটা ভয়াল হিংস্র হাসি হাসিয়া কমল বলিল, তুকে ধ'রে আমি মাটিতে পুঁতে দিব।

বার বার এমন অবাঞ্ছনীয় ঘটনার উদ্ভব হওয়ার জন্য অহীন্দ্রের মনে আর বিরক্তির সীমা রহিল না। সে তাহার কিশোর কণ্ঠের তীক্ষ্ণ কঠিন স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, ছাড়, ছাড় বলছি, ছাড়।

কমল এবং রংলাল দুইজনেই এবার সরিয়া দাঁড়াইল।

অহীন্দ্র বলিল, অন্যদিকে জমি পছন্দ ক'রে মেপে নাও নবীন। এ জমি তোমরাও পাবে না, সাঁওতালরাও পাবে না। এদিকটা আমাদের খাসে থাকবে। খাসে চাষ হবে আমার।

জমির মাপ-জোক শেষ করিয়া অহীন্দ্র ফিরিবার সময় বলিল, দেখো, আর যেন ঝগড়া ক'রো না।

একজন মাঝি ছাতাটা লইয়া তাহার সঙ্গে গেল, জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে তখন আগুন ঝরিতে শুরু করিয়াছে। সেই রৌদ্রের মধ্যেই রংলাল, নবীন এবং তাহার সঙ্গী কয়েকজন আপন আপন সীমানা চিহ্নিত করিয়া চারি কোণে চারিটা মাটির ঢিপি বাঁধিতে শুরু করিয়া দিল। সাঁওতালেরা আবার দল বাঁধিয়া আপনাদের হিসাবমত জমি ভাগ করিতে আরম্ভ করিল।

প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করিয়া জলহীন কঠিন মাটিতে কোপ মারিতে মারিতে রংলাল বলিল, থাক শালারা, ক'দিন তোরা এখানে থাকিস, সেও তো আমি দেখছি!

১২

সেই দিনই অপরাহ্ণে সাঁওতালেরা খাজনার টাকা পাই পয়সা হিসাব করিয়া মিটাইয়া দিল। কিন্তু গোল বাধাইল রংলাল-নবীনের দল। তাহারাও ধরিয়া বসিল, খাজনা ছাড়া সেলামি তাহারা দিতে পারিবে না। সাঁওতালরা যখন সেলামি দিতে রেহাই পাইয়াছে, তখন তাহারাই বা পাইবে না কেন? সাঁওতালদের চেয়েও কি তাহারা চক্রবর্তী-বাড়ির পর? অহীন্দ্র চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না। রংলাল-নবীনের যুক্তি খণ্ডন করিবার মত বিপরীত যুক্তি খুঁজিয়া সে সারা হইয়া গেল। অনেকক্ষণ নীরবে উত্তরের অপেক্ষা করিয়া রংলাল বলিল, দাদাবাবু, তাহ'লে হুকুমটা ক'রে দিন আজ্ঞে।

অহীন্দ্র কিন্তু সে হুকুমও দিতে পারিল না। বিঘা পিছু পাঁচ টাকা সেলামি আদায় হইলেও পঞ্চাশ বিঘায় আড়াই শত টাকা আদায় হইবে। তাহাদের সংসারের বর্তমান অবস্থা সে শুধু চোখেই দেখিতেছে না, মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে। তাহার মা যখন রান্নাশালে

বসিয়া আগুনের উত্তাপ ভোগ করেন, তখন সেও গিয়া উনানের কাছে বসিয়া উনানে কাঠ ঠেলিয়া দেয়। সে যে কি উত্তাপ, সে তো তাহার অজানা নয়। উত্তাপ ও কষ্টের কথা ছাড়িয়া দিয়াও তাহার মাকে নিজে-হাতে রান্না করিতে হয়—ইহারই মধ্যে কোথাও আছে অসহনীয় অপরিসীম লজ্জা, যাহার ভারে তাহার মাথা হেঁট হইয়া পড়ে, তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসে। তাহার মা অবশ্য বলেন, যখন যেমন তখন তেমন। না পারলে হবে কেন? অম্লান হাসিমুখেই তিনি বলেন। কিন্তু তাহার মনে পড়ে কালিন্দী নদীর বানের জল আটক দিবার জন্য ঘাসের চাপড়া-বাঁধা বাঁধটার কথা; বাঁধটার ও-পারে থাকে অথই জল, আর এ-পারে বাঁধের গায়ে সবুজ ঘাস যেমন হাসিতে থাকে, তেমনই তাহার মায়ের মুখে সুশ্যাম হাসির ও-পারে আছে অথই দুঃখের বন্যা; কালিন্দীর বন্যায় ভাটা পড়ে; বর্ষার শেষে সে শুকাইয়া যায়, কিন্তু মায়ের বুকের দুঃখের বন্যা শুকায় না, ও যেন শুকাইবার নয়! এ-ক্ষেত্রে কেমন করিয়া সে এতগুলি টাকা ছাড়িয়া দিবে?

নবীন বলিল, তা পাঁচ টাকা ক'রে জনাহি লজর কিন্তুক দিতে হবে মোড়ল। তা লইলে সেটা ধর আমাদেরও অপমান। সাঁওতালরা না হয় দেয় নাই, ওরা ছোট জাত। আমাদিগে তো রাজার সম্মান একটা করতে হয়।

রংলাল বার বার ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বলিল, এ তুমি একটা কথার মত কথা বলেছ লবীন। লেন, লেন তাই হ'ল দাদাবাবু, পঞ্চাশ বিঘের খাজনা আপনার এক শ টাকা, আর পাঁচ টাকা ক'রে পাঁচজনের লজর পঁচিশ টাকা, এক শ পঁচিশই আমরা দিচ্ছি। সেও আপনার এক খাবল টাকা গো।

অহীন্দ্রের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, ইহাদের কথার ভঙ্গীতে সে যেন একটি ধারাবাহিক গোপন ষড়যন্ত্রের সূত্র দেখিতে পাইল, ইহারা তাহাকে ঠকাইবার জন্যই আসিয়াছে। তাহার উপর শেষের কয়টি কথা—'একখাবল টাকা' অর্থাৎ দুই হাতের মুঠিভরা টাকা—এই কথা কয়টির মধ্যে তাহাকে প্রলোভন দেখানোর সুর সুস্পষ্ট। তার ক্রোধ ও বিরক্তির আর সীমা রহিল না। সে দৃঢ় কঠোর স্বরে বলিল, জমি বন্দোবস্ত এখন হবে না, আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে কিছু করতে পারব না।

রংলাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বেশ, তা হ'লে আমরা এখন ভেঙেচুরে জমি তৈরি করি, তারপর লেবেন খাজনা আপনারা।

তার মানে?

কথাটার মানে অত্যন্ত স্পষ্ট, বন্দোবস্ত করা হউক বা না হউক, জমি তাহারা দখল করিবেই। অকারণে খানিকটা মাথা চুলকাইয়া লইয়া রংলাল বলিল, ওই যে বললাম গো, আমরা জমি-জেরাত হাসিল করি তারপর লেবেন খাজনা। আর এখন যদি লেবেন, তো তাও লেন, আমরা তো দিতেই রাজী রয়েছি।

অত্যন্ত ক্রোধে অহীন্দ্রের মাথাটা কেমন করিয়া উঠিল, কিন্তু প্রাণপণে সে-ক্রোধ মনের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া সে বসিয়া রহিল।

রংলাল একটি প্রণাম করিয়া বলিল, তা হ'লে আমরা চল্‌লাম দাদাবাবু। যখুনি ডাকবেন তখুনি আমরা খাজনার টাকা এনে হাজির ক'রে দেব। চল হে, চল সব। সন্ধ্যে হয়ে এল, চল।

অহীন্দ্র কথা বলিল না, হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতেই জানাইয়া দিল, যাও, তোমরা চলিয়া যাও। ইহাদের উপস্থিতিও সে যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। রংলাল ও নবীনের দল একে একে প্রণাম সারিয়া চলিয়া গেল অহীন্দ্র একাই নির্জন স্তব্ধ কাছারি-বাড়ির দাওয়ায় তক্তাপোশের উপর দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া রহিল। কার্নিশের মাথায় কড়িকাঠের উপরে বসিয়া সারি সারি পায়রার দল গুঞ্জন করিতেছে। সামনের খোলা মাঠটার উপর সারিবন্ধ নারিকেলের গাছ, তাহারই কোন একটার মাথায় আত্মগোপন করিয়া একটা পেঁচা আসন্ন সন্ধ্যার আনন্দে কুক কুক করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘরের ভিতর হইতে অন্ধকার নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিতেছে শোকাচ্ছন্ন বিধবার মত। এত বড় বাড়িটার কোথাও এক কণা আলোকের চিহ্ন নাই, কোথাও একটা মানুষের সাড়া নাই, শুধু সিঁড়ির পাশে দুই দিকে দুইটা সুদীর্ঘ-শীর্ষ ঝাউগাছ অবিরাম সন সন শব্দ করিতেছে। সে শব্দ শুনিয়া মনে হয়, যেন এই অনাথা বাড়িটাই বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। অথচ একদিন নাকি হাসিতে কোলাহলে আলোকে গাম্ভীর্যে বাড়িখানা অহরহ গমগম করিত। মাথা হেঁট করিয়া প্রজারা সভয়ে অপেক্ষা করিয়া থাকিত এ বাড়ির মালিকের মুখের একটি কথার জন্য। আর আজ একজন চাষী প্রজা বলিয়া গেল, সম্মতি দেওয়া হউক বা না হউক, জোর করিয়া তাহারা জমি দখল করিবেই। অহীন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তারপর তক্তাপোশটার উপরে নিতান্ত অবসন্নের মত শুইয়া পড়িল। তাহার মাথা ধরিয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পর মানদা এক হাতে ধুপদানি ও প্রদীপ, অন্য হাতে একটি জলের ঘটি লইয়া কাছারি-বাড়িতে প্রবেশ করিল। দুয়ারে চৌকাঠে চৌকাঠে জল ছিটাইয়া দিয়া ধুপ ও প্রদীপের আলো দেখাইতে দেখাইতে সে দেখিল, অহীন্দ্র ছেঁড়া শতরঞ্জি-ঢাকা তক্তাপোশটার উপর চোখ বুজিয়া নিস্তব্ধ হইয়া আছে। দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এমন নির্জন কাছারির বারান্দায়, ওই ময়লা ছেঁড়া শতরঞ্জির উপর, এই অসময়ে ছোটদাদাবাবু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন! সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাও হইল, কোন অসুখ-বিসুখ করে নাই তো? গায়ে হাত দিয়া দেখিতে সাহস হইল না। কি জানি, যদি ঘুম ভাঙিয়া যায় অনর্থ হইবে, হয়ত চীৎকার করিয়া উঠিবেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ত্রস্ত গতিতে বাড়িতে গিয়া ডাকিল, মা!

সুনীতি কাপড় কাচিয়া রামেশ্বরের ঘরে আলো জ্বালিয়া দিবার জন্য উপরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। মানদার ডাকে বাধা পাইয়া বিরক্তির সহিতই বলিলেন, যখন-তখন কেন পেছনে ডাকিস মানদা? জানিস, আমি এবার ওপরে আলো জ্বালতে যাব।

মানদা বলিল, ডাকি কি আর সাধ ক'রে মা? ছোটদাদাবাবু এই ভরসন্ধ্যেবেলা কাছারির বারান্দায় সেই ছেঁড়া শতরঞ্জির ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে, অসুখ করেছে।

অসুখ করেছে?

করবে না? ওই দুধের ছেলে, এই জষ্টি মাসের আগুনের হল্কা রোদ, এই রোদে চর মাপতে গেল। তার ওপর এই সাঁওতালরা আসছে, এই তোমার সদগোপরা আসছে, কিচির-মিচির চেঁচামেচি। যান বাবু, আপনি গিয়ে উঠিয়ে নিয়ে আসুন। আমি বাপু ডাকতে পারলাম না ভয়ে।

সুনীতি বলিলেন, তুই আমার সঙ্গে আয়। আমি একলা কেমন ক'রে কাছারি-বাড়িতে যাব?

তুলসীর মন্দিরের উপর প্রদীপ ও ধুপদানি রাখিয়া দিয়া মানদা বলিল, ঘরের ভিতর দিয়ে চলুন, বাইরের রাস্তায় কি জানি যদি কেউ থাকে!

অহীন্দ্রের কপালে হাত দিয়া আশ্বস্ত হইয়া সুনীতি বলিলেন, কই না জর তো হয় নি।

অহীন্দ্র স্পর্শেই বুঝিয়াছিল, এ তাহার মায়ের হাত। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, মা! কি মা?

কিছু নয় অহি। এ অসময়ে এখানে শুয়ে কেন বাবা?

এমনি মাথা একটু ধরেছে, কেমন মনটাও একটু খারাপ হয়ে গেল। তাই একটু শুয়েছিলাম।

সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে সুনীতি বলিলেন, মাথা কেন ধরল রে, মনই বা খারাপ কেন হ'ল?

সত্য গোপন করিয়া অহীন্দ্র বলিল, কি জানি! তারপর সে আবার বলিল, এই সন্ধ্যের অন্ধকার, কেউ কোথাও নেই, এত বড় বাড়ি—মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল মা। অথচ, গল্প শুনেছি, রাত্রি বারোটা পর্যন্ত এখানে লোক গিসগিস করত।

সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, নীরবে তিনিও একবার অন্ধকারাচ্ছন্ন বাড়িখানার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। মানদা তাড়াতাড়ি বলিল, আমি আলো আনছি দাদাবাবু, আপনি আলো নিয়ে কাছারিতে বসুন কেনে। দু'চারজনা বন্ধু-টন্ধু নিয়ে দিব্যি গল্প-গুজব করুন। তাস-টাস খেলুন।

অহীন্দ্র হাসিল, কিন্তু কথার কোন উত্তর দিল না। সুনীতি বলিলেন, এই বাড়ির মানমর্যাদা এখন সবই তোর উপর নির্ভর করছে বাবা। ভাল করে লেখাপড়া শিখে তুই মানুষ হ'লে তবে এই দুঃখ ঘুচবে অহি।

মানদা সেই ভোরবেলা হইতেই আজ রংলাল-নবীনের দলের উপর বিরক্ত হইয়াছিল। সে বলিল, হ্যাঁ বাপু। তখন সেই ভোর-বেলাতে কই সব চাষার দল এসে ডাকুক দেখি, দেখব। গরম কত সব! ডাকছ কেনে গো, না, সে তুমি বুঝবে না। আমি আজ বলে বিশ বছর জমিদারের ঘরে চাকরি করছি, আমি বুঝব না? ওই ভোরে উঠেই আপনার মাথা ধরেছে, তার ওপর এই রোদ আর ঝলা।

সুনীতি বলিলেন, একটুখানি নদীর ধারে বাতাসে বেড়িয়ে আয় বরং। আকাশে চাঁদ উঠেছে, মনটাও ভাল হবে, খোলা বাতাসে মাথাও অনেক হাল্‌কা হবে। আমি যাই, বাবুর

ঘরে আলো দেওয়া হয় নি। মানদা, উনোনে আগুন দিয়ে দে মা।

অহীন্দ্রের মনের ভার অনেকটা হাল্‌কা হইয়াছিল, মায়ের ওই কথা কয়টিতে সে মনের মধ্যে একটা উৎসাহ অনুভব করিল, সে মানুষ হইলে তবে এই দুঃখ ঘুচিবে। সেই কথা ভাবিতে ভাবিতেই সে পথে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার দাদার কথা মনে পড়িল, তাহাকে এম. এ. পর্যন্ত যেন পড়ানো হয়। যেমন-তেমন ভাবে এম. এ. পাস করিলে তো হইবে না, খুব ভালভাবে পাস করিতে হইবে। ফার্স্ট হইতে পারিলে কেমন হয়—ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট!

নদীর ধারে আসিয়া মাদলের শব্দে ও সাঁওতাল-মেয়েদের গানের সুরে তাহার চিন্তার একটানা ধারাটা ভাঙিয়া গেল। ও-পারের চরে আজ প্রবল সমারোহে উৎসব চলিয়াছে। আজ তাহারা জমিদারকে খাজনা দিয়া রসিদ পাইয়াছে, জমি তাহাদের নিজের হইয়াছে, আজিকার দিন তাহাদের একটি পরমকাম্য শুভদিন, তাহাদের দেবতাকে তাহারা পূজা দিয়াছে। পাঁচটি লাল রঙের মুরগী, একটি লাল রঙের ছাগল বলি দিয়া নাকি পূজা হইয়াছে, তাহার পর আকণ্ঠ পচুই মদ খাইয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়াছে। অদ্ভুত জাত!

আকাশে শুক্লাসপ্তমীর আধখানা চাঁদ কালিন্দীর ক্ষীণ স্রোতের মধ্যে এক অপরূপ খেলা খেলিতেছে। দূরে কালিন্দীর ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় চাঁদ যেন জলে গলিয়া গিয়াছে, ঝিকমিক করিয়া নাচিতেছে চাঁদ-গলানো জলের ঢেউ। দূরে এ-পাশে কালিন্দীর জল, যেন একখানা অখণ্ড রূপার পাত। সম্মুখেই পায়ের কাছে চাঁদ কালিন্দীর স্রোতের তলে ছেঁড়া একগাছি চাঁদমালার মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া লম্বা হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। সাদা সাদা টিট্টিভ পাখীগুলি জলস্রোতের ও-পারে বালির উপর ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, কখনও কখনও একটা অন্যের তাড়ায় খানিকটা উড়িয়া আবার দূরে গিয়া বসিতেছে। দূর আকাশে একটা উড়িয়া চলিয়াছে আর ডাকিতেছে, হটি-টি—হটি-টি। নদীর বালুগর্ভের উপর অবাধ শূন্যতল স্বচ্ছ কুয়াশার ন্যায় জ্যোৎস্নায় মোহগ্রস্তের মত স্থির নিস্পন্দ। অহীন্দ্র নদীস্রোতের কিনারায় চুপ করিয়া বসিল। সহসা তাহার মনে হইল, কোথায় কাহারা যেন কথা কহিতেছে! স্বর ভাসিয়া আসিতেছে, ভাষার শব্দ ঠিক ধরা যায় না। সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বেশ সাড়া দিয়াই প্রশ্ন করিল, কে? উত্তর কেহ দিল না, উপরন্তু কথার শব্দও নিস্তব্ধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাহার নজরে পড়িল স্রোতের ও-পারে বালির উপর দুইটি মূর্তি। কিছুক্ষণ পরেই আবার কথার শব্দ আরম্ভ হইল।

অহীন্দ্র কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিল না, অগভীর জলস্রোত পার হইয়া এপারে বালির উপর আসিয়া উঠিল। বালিতে বালিতে খানিকটা আগাইয়া আসিয়া সে কথার ভাষা বুঝিতে পারিল, সাঁওতালদের ভাষা; এবং গলার স্বরে বুঝিল, তাহারা দুইজনেই স্ত্রীলোক; সুরে মনে হইল, কোন একটা বচসা চলিয়াছে। সে ডাকিল, কে?

যাহারা কথা কহিতেছিল, তাহারা দুইজনেই ঈষৎ চকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। একজন সবিস্ময়ে আপনাদের ভাষায় কি বলিয়া উঠিল, তাহার মধ্যে একটি কথা অহীন্দ্র বুঝিতে পারিল, রাঙাবাবু! তাহাকে চিনিতেও অহীন্দ্রের বিলম্ব হইল না, তাহার দীর্ঘ দেহখানিই তাহাকে

চিনাইয়া দিল। সে কমল মাঝির নাতিনী। অপর জন তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেই তাহাকেও অহীন্দ্র চিনিল, সে বৃদ্ধ সর্দার কমল মাঝির স্ত্রী। বৃদ্ধা অহীন্দ্রকে দেখিয়া যেন কতক আশ্বস্ত হইয়া ভাঙা বাংলায় একটানা সুরে বলিল, দেখ্ রাঙাবাবু দেখ্। মেয়েটা আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। আবার বলিতেছে, এ-ঠাঁই ছাড়িয়া ও চলিয়া যাইবে।

তরুণী নাতনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, কেনে ঝগড়া করবে না কেনে? চ'লে যাবে না কেনে? তু বাবু, বিচার ক'রে দে। বুড়া-বুড়ীর করণ দেখ্।

হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, কি, হ'ল কি তোদের? ছি, মাঝিন, বুড়ী দিদিমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আছে?

বুড়ী খুব খুশি হইয়া উঠিল, দেখ্ বাবু, আপুনি দেখ্।

অহীন্দ্র বলিল, যা মাঝিন, বাড়ি যা; নাচ হচ্ছে, গান হচ্ছে পাড়াতে, যা, নাচ-গান করগে।

কেনে গান করবে? কেনে নাচ করবে? উয়ারা বুড়া-বুড়ীতে নাচ গান করবে। উয়ারা জমি পেলে, উয়ারা নাচবে। আমাদিগে দিলে না কেনে?

অহীন্দ্র বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করিল, কি হ'ল কি মাঝিন, তুই বল্ তো শুনি?

বৃদ্ধা যাহা বলিল, তাহা এই।—মেয়েটির শীঘ্রই বিবাহ হইবে। সর্দার বলিতেছে, তোমরা আমাদের কাছে থাক, খাট, খাও, আমি তোমাদের ভরণপোষণ করিব। কিন্তু মেয়েটি সে-কথা কোনমতেই শুনিবে না। সে স্বতন্ত্র ঘর বাঁধিতে চায়, নিজস্ব জমি চায়। সেই জমি না পাইয়া সে এমন করিয়া রাগ করিয়াছে। ঝগড়া করিতেছে।

তরুণী নাতনীটি এইবার হাত নাড়িয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়া বলিয়া উঠিল, তুরা জমি লিবি, তুদের ধান হবে, কোলাই হবে, ভুট্টা হবে, তুরা সব ঘরে ভরবি। আমরা কি করব তবে? আমাদের ঘর হবে না, বেটা-বেটী হবে না? উয়ারা কি খাবে তবে? কেনে আমরা তুদের জমিতে খাটব?

অহীন্দ্রের হাসি পাইল, আবার বেশ ভালও লাগিল; এই তরুণী কিশোরী মেয়ে, এখনও বিবাহ হয় নাই, হইবে প্রত্যাশায় ঘর-দুয়ার সন্তান-সন্ততি সম্পত্তির আয়োজনে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। মৃদু হাসিয়া সে বলিল, ওঃ, মাঝিন আমাদের পাকা গিন্নী হবে দেখছি! এখন থেকেই ঘরকন্নার ভাবনায় পাগল হয়ে উঠেছিস্!

বৃদ্ধা অহীন্দ্রের সুরে সুর মিলাইয়া বলিল, হ্যাঁ, তাই দেখ্ কেনে আপুনি। উয়ার একেবারে শরম নাই।

তরুণী এবার আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, তড়বড় করিয়া এক রাশ কথা বলিয়া গেল। অহীন্দ্র অনেক কষ্টে তাহার মর্মার্থ বুঝিল; সে বলিতেছিল, শরম তোদের নাই বুড়া-বুড়ী, তোরা সকলকে জমি না দিয়া নিজেরা অধিক অংশ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিস! অহীন্দ্র একটু বিস্ময় অনুভব করিল, কমল মাঝির নিজের নামে জমি লওয়ার মধ্যে এমন মতলবের কথা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে বৃদ্ধের স্ত্রীকে বলিল, না, না। ছি ছি, এমন কেন করলি তোরা মাঝিন?

বৃদ্ধা সবিনয়ে বলিল, জমি সকল বয়স্ক মাঝিকেই দেওয়া হইয়াছে, শুধু এই কজন তরুণ-বয়স্কদের দেওয়া হয় নাই। উহারা এখন জমি লইয়া কি করিবে? উহাদের জোয়ান বয়স—এখন খাটিয়া পয়সা উপার্জনের সময়। পরে উহারা সেই পয়সায় জমি কিনিবে, বুড়ারা মরিয়া গেলে পাইবে, এই তো নিয়ম। তাহারা বুড়া-বুড়ী কিছু জমি বেশি লইয়াছে, ইহাও সত্য। কিন্তু রাঙাবাবু, তাহারা যে মোড়ল—সর্দার, সকলের অপেক্ষা বেশি না পাইলে চলিবে কেন তাহাদের? সম্মান থাকিবে কেন? আর রাঙাবাবু যে অনেকটা জমি নিজের জন্য রাখিয়া দিলেন, নহিলে সকলকেই তাহারা দিত। এই সামান্য জমির ভাগ কেমন করিয়া এতগুলি লোককে দেওয়া যায়?

ওই মেয়েটির এই গিন্নীপনার আগ্রহ অহীন্দ্রের বড় ভাল লাগিয়াছিল, সে একটু চিন্তা করিয়া বলিল, এক কাজ কর্ মাঝিন। তোর হবু বরকে পাঠিয়ে দিস, আমি যে-জমিটা নিজের জন্যে রেখেছি, তারই খানিকটা তাকে ভাগে বিলি ক'রে দেব। আরও যে যে চায়, দেব। তারপর হাসিয়া বলিল, কেমন, এইবার তোদের ঝগড়া মিটল তো?

বৃদ্ধা বলিল, হুঁ বাবু, মিটল। সব মাঝি ভারি খুশি হবে। কাল সব যাবে আপনার কাছে। উয়াদিগে আপুনি জমি ভাগে দিবি, নাম লিখে লিবি।

তরুণীটি বলিল, আমাদিগে ভাগীদারের সদ্দার ক'রে দিবি বাবু। উ মরদটা তুর সব দেখে দিবে, আমি তুদের ঘরে পাট-কাম ক'রে দিব। হোক!

মেয়েটির আনন্দের আগ্রহে অহীন্দ্র খুশি হইয়া উঠিল, বলিল, তাই ক'রে দেব।

আনন্দে কলরব করিয়া মেয়েটি এবার হাসিয়া উঠিল। অহীন্দ্র বলিল, যা, এইবার ঘরে যা, নাচ-গান কর্ গিয়ে।

আপুনি যাবিন না বাবু?

না, অনেকটা রাত্রি হয়ে গেল, আমি বাড়ি চললাম।

অহীন্দ্র জলের স্রোতটা পার হইয়া এ-পারে উঠিয়াছে, এমন সময় আবার পিছনে কে ডাকিল, বাবু! রাঙাবাবু! অহীন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল, দেখিল একটি মূর্তি ছুটিয়া তাহার দিকেই আসিতেছে। সে মেয়েটিই ছুটিয়া আসিতেছে।

ফুল লিয়ে যা বাবু, তুর লেগে ফুল আনলুম। এক আঁচল কুরচির ফুল লইয়া মেয়েটি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

সরল অশিক্ষিত জাতির তরুণীটির কৃতজ্ঞতায় অহীন্দ্রের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সে দুই হাত পাতিয়া বলিল, দে। মেয়েটি আঁচল উজাড় করিয়া ফুল ঢালিয়া দিল, অহীন্দ্রের হাতের অঞ্জলিতে এত ফুল ধরিবার স্থান ছিল না, অঞ্জলি উপচিয়া ফুল বালির উপর পড়িয়া গেল।

মেয়েটি বলিল, ইগুলা প'ড়ে গেল যি?

অহীন্দ্র বলিল, ওগুলো তুই নিয়ে যা। খোঁপায় পরবি!

মেয়েটি নিঃসঙ্কোচে মাথায় কয়েকটা গুচ্ছ গুঁজিয়া নাচিতে নাচিতে জ্যোৎস্নাস্নাত বালুচরের উপর দিয়া চলিয়া গেল। টিট্টিভ পাখীর দল মেয়েটির গতিচাঞ্চল্যের আভাস পাইয়া চীৎকার

করিয়া উড়িয়া খানিকটা দূরে গিয়া বসিল।

অহীন্দ্র সস্নেহে মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকেই চাহিয়া রহিল। এতক্ষণে তাহার মনের সকল গ্লানি কাটিয়া গিয়াছে। অপরাহ্নে ক্ষোভের বিমর্ষতায় তাহার অন্তর-বাহির ভাঁটা-পড়া নদীর মত শীর্ণ নিস্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল, অকস্মাৎ যেন সেই শীর্ণতা ও নিস্তরঙ্গতাকে প্লাবনে আবৃত করিয়া একটা আনন্দের ভাল-লাগার জোয়ার আসিয়া গেল।

মেয়েটা অদ্ভুত! সাঁওতালদেরই তাঁতে বোনা মোটা দুধের মত সাদা কাপড়ে কি চমৎকারই না মানাইয়াছে! লাল কস্তায় রেলিঙের মত নক্‌শাকাটা পাড়টিও সুন্দরভাবে কাপড়খানাতে খাপ খাইয়াছে, বেণী রচনা না করিয়া সাদাসাপ্‌টা এলো খোঁপাতেই উহাদের ভাল মানায়। সরল বর্বর জাতি, স্বার্থকে গোপন করিতে জানে না, স্বার্থহানিতে পরম আপন জনের সঙ্গেও কলহ করিতে দ্বিধা করে না। কুমারী মেয়েটির স্বামী-সন্তান-সম্পদের কামনা দ্বন্দ্ব করিয়া উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে একটুকু কুণ্ঠা নাই। অদ্ভুত!

বালুচরের উপরে দূরে, মেয়েটিকে ওই এখনও দেখা যাইতেছে; মানুষ বলিয়া চেনা যায় না, উহার দুধে-ধোয়া কাপড়খানা জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। শুধু অনাবৃত হাত, পিঠের খানিকটা, মাথার কালো চুল, পাতলা সাদা চাদরের মত জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়া খানিকটা কালো রঙের মত,—না, খানিকটা কালো রূপের মত ছুটিয়া চলিয়াছে।

১৩

জ্যৈষ্ঠের শেষে কয়েক পসলা বৃষ্টি হইয়া মাটি ভিজিয়া সরস হইয়া উঠিল। কয়েক দিনের মধ্যেই চরটা হইয়া উঠিল ঘন সবুজ।

চাষীর দল হাল-গরু লইয়া মাঠে গিয়া পড়িল। ধানচাষের সময় একেবারে মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কাজেই নবীন ও রংলাল ধানের জমি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল, চরটার দিকে আর মনোযোগ দিতে পারিল না। ধানের বীজ বুনিবার জন্য হাফরের জমিতে আগে হইতেই চাষ দেওয়া ছিল, এখন আবার তাহাতে দুই বার লাঙল দিয়া তাহার উপর মই চালাইয়া জমিগুলির মাটি ভুরার মত গুঁড়া করিয়া বীজ বুনিয়া দিল। অন্য জমি হইতে বীজের জমিগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করিয়া রাখিবার জন্য একখানা করিয়া তালপাতা কাটিয়া তাহাতে পুঁতিয়া রাখিল। ওই চিহ্ন দেখিয়াই রাখালেরা সাবধান হইবে, এই জমিগুলিতে গরু-বাছুর নামিতে দিবে না।

আষাঢ়ের মাঝামাঝি আবার এক পসলা জোর বৃষ্টি নামিল; ফলে মাটি অতিরিক্ত নরম হওয়ায় চাষ বন্ধ হইয়া গেল। নবীন আসিয়া বলিল, মোড়ল, এইবারে চরের ওপর একবার জোটপাট ক'রে চল। এখন একবার চ'ষে-খুঁড়ে না রাখতে পারলে আশ্বিন-কার্তিক মাসে কি আর ওখানে ঢোকা যাবে? একেই তো বেনার মুড়োতে আদাড় হয়ে আছে।

রংলাল বসিয়া তামাক খাইতেছিল, সে বলিল, এই ব'সে ব'সে আমিও ওই কথাই ভাবছিলাম লোহার। ওখানে তো একা একা কাজ সুবিধে হবে না, উ তোমার 'গাতো' ক'রে কাজ করতে হবে। একেবারে পাঁচজনার হাল—আমার দু'খানা, তোমার দু'খানা, আর উ তিনজনার তিনখানা—এই সাতখানা হাল নিয়ে একেবারে গিয়ে পড়তে হবে! ওদের জমিতে একদিন ক'রে, আর আমাদের দু'খানা ক'রে হাল আমরা দু'দিন ক'রে লোব।—বলিয়া সে হুঁকা হইতে কল্কে খসাইয়া নবীনকে দিয়া বলিল, লও, খাও!

কল্কেতে টান মারিয়াই নবীন কাশিয়া সারা হইয়া গেল, কাশিতে কাশিতে বলিল, বাবা রে, এ যে বিষ! বেজায় চড়া হয়ে গিয়েছে হে।

হাসিয়া রংলাল বলিল, হুঁ হুঁ, বর্ষার জন্যে তৈরী ক'রে রাখলাম। জল ভিজে হালুনি যখন লাগবে, তখন তোমার একটান টানলেই গরম হয়ে যাবে শরীর।

তা বটে। এখন কিন্তু এ তোমার বিষ হয়ে উঠেছে।—বলিয়া সে কল্কেটি আবার রংলালকে ফিরাইয়া দিল।

রংলাল বলিল, তা হ'লে কালই চল সব জোটপাট ক'রে। মাঠানে তো এখন তোমার চার-পাঁচ দিন হাল লাগবে না।

তাতেই তো এলাম গো তোমার কাছে। বলি, মোড়লের ঘুম ভাঙিয়ে আসি একবার। এই নরম মাটিতে বেনা কাশ বেবাক উঠে যাবে তোমার। কিন্তু একটা কথা ভাবছি হে,—ভাবছি, চক্রবর্ত্তি-বাড়ি থেকে যদি হাঙ্গামহুজ্জৎ করে তো কি হবে? জমি তো বন্দোবস্ত ক'রে দেয় নাই!

ক্ষেপেছ তুমি! হাঙ্গামা করবে কে হে বাপু? কত্তা তো ক্ষেপে গিয়েছে। আবার নাকি শুনছি, বড় রাগ হয়েছে হাতে। বড় ছেলে তো কালাপানি, ছোটজনা তো পড়তে গিয়েছে কদিন হ'ল। মজুমদারের জবাব হয়ে গিয়েছে। আর মজুমদারই তো তোমার হাঁ ক'রে আছে, আবার একবার বাগে পেলে হয়। থাকবার মধ্যে গিন্নীমা আর মানদা ঝি। হুকুম দেবে গিন্নীমা আর লড়বে তোমার মানদা ঝি, না কি?—বলিয়া রংলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া সারা হইল!

নবীন আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উহুঁ। ছোটজনা ভারি হুঁশিয়ার ছেলে হে, সে ভারী এক চাল চেলে গিয়েছে। সেই যি পঞ্চাশ বিঘে জমি, আমাদিগেও দিলে না, সাঁওতালদিগেও দিলে না, সেই জমিটা ভাগে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছে যত ছোকরা মাঝিদিগে! এখন যা হয়েছে, তাতে গিন্নীঠাকরুন হুকুম দিলে গোটা সাঁওতাল-পাড়া হয়তো ভেঙে আসবে।

এবার রংলাল বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল, নীরবে বসিয়া মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালাইয়া মুঠায় ধরিয়া চুল টানিতে আরম্ভ করিল। নবীন আপনার পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ টিপিতেছিল; কিছুক্ষণ পর সে ডাকিল, মোড়ল!

উঁ!

তা হ'লে ?

সেই ভাবছি।

আমি বলছিলাম কি, গিন্নীঠাকৃরুনের কাছে গিয়ে বন্দোবস্তের হাঙ্গামা মিটিয়ে ফেলাই ভাল; কাজ কি বাপু লোকের ন্যায্য পাওনা ফাঁকি দিয়ে? তার ওপর ধর, জমিদার—ব্রাহ্মণ।

উঁহু, সে হবে না। যখন বলেছি, সেলামি দেব না, তখন দেব না!

তা হ'লে?

তা হ'লে আর কি হবে; হাল-গরু নিয়ে চল তো কাল, তারপর যা হয় হবে।

উঠিয়ে দিলে তো মান থাকবে না, সে কথাটা ভাব।

রংলাল খানিকটা মুচকি হাসিল, তারপর বলিল, তখন মেজেস্টারিতে দরখাস্ত দেব যে, আমাদের জমি থেকে জোর ক'রে জমিদার তুলে দিয়েছে।

নবীন চক্রবর্তী-বাড়ির অনেক দিনের চাকর, উপস্থিত চাকরি না থাকিলেও এই পুরাতন মনিব-বাড়ির জন্য সে খানিকটা মমতা অনুভব করে। সেই প্রভুবংশের সহিত এই ধারায় বিরোধ করিতে তাহার মন সায় দিল না। সে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

রংলাল বলিল, কি হ'ল, চুপ ক'রে রইলে যে? চলই তো জোট-পাট ক'রে, দেখাই যাক না, কি হয়।

নবীন এবার বলিল, সে ভাই আমি পারব না। লোকে কি বলবে একবার ভাব দেখি।

রংলাল হাসিল, তারপর দুই হাতের বুড়া আঙুল দুইটি একত্র করিয়া নবীনের মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, কচু। লোকে বলবে কচু। তুমি ঘরে তুলবে আলু গম কলাই গুড়, আর লোকে বলবে কচু।

নবীন তবুও চুপ করিয়া রহিল। রংলাল এবার তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, চল, একবার ঘুরে ফিরে ভাবগতিকটা বুঝে আসি। সাঁওতাল বেটাদের কি রকম হুকুম-টুকুম দেওয়া আছে, গেলেই জানা যাবে। আর ধর গা জমিটার অবস্থাও দেখা হবে। চল, চল।

নবীন ইহাতে আপত্তি করিল না, উঠিল।

কালি নদীতে ইহারই মধ্যে জল খানিকটা বাড়িয়াছে, এখন হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়া যায়। কয়েকদিন আগে জল অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছিল, উপরের বালুচর পর্যন্ত ছিলছিলে রাঙা জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। জল এখন নামিয়া গিয়াছে। বালির উপরে পাতলা এক স্তর লাল মাটি জমিয়া আছে। রৌদ্রের উত্তাপে এখন সে স্তরটি ফাটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে, পা দিলেই মুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া বালির সহিত মিশিয়া যায়। তবুও এই লক্ষ টুকরায় বিভক্ত পাতলা মাটির স্তরের উপর এখনও কত বিচিত্র ছবি জাগিয়া আছে।—কাঁচা মাটির উপর পাখীর পায়ের দাগ রাখিয়া গিয়াছে, আঁকাবাঁকা সারিতে নকশা-আঁকা কাপড়ের চেয়েও বিচিত্র ছক সাজাইয়া তুলিয়াছে যেন। তাহারই মধ্যে প্রকাণ্ড চওড়া মানুষের দুইটি

পায়ের ছাপ চলিয়া গিয়াছে, এ বোধ করি ওই কমল মাঝির পায়ের দাগ! একটা প্রকাণ্ড সাপ চলিয়া যাওয়ার মসৃণ বঙ্কিম রেখা একেবারে চরের কোল পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। ভিতরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায়, অতি সূক্ষ্ম বিচিত্র রেখায় লক্ষ লক্ষ পতঙ্গের পদচিহ্ন।

বেনা ও কাশের গুল্মে ইহারই মধ্যে সতেজ সবুজ পাতা বাহির হইয়া বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে, বন্য লতাগুলিতে নূতন ডগা দেখা দিয়াছে, ভিতরে ভিতরে শিকড় হইতে কত নূতন গাছ গজাইয়া উঠিয়াছে, সাঁওতালদের পরিষ্কার করা পথের উপরেও ঘাস জন্মিয়াছে, কুশের অঙ্কুরে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে।

তীক্ষ্ণাগ্র কুশের উপর চলিতে চলিতে বিব্রত হইয়া রংলাল বলিল, ঐ বেটারাও বাবু হয়ে গিয়েছে নবীন, রাস্তাটা কি ক'রে রেখেছে দেখ দেখি।

নবীন বলিল, ওদের পা আমাদের চেয়ে শক্ত হে।

পল্লীর প্রান্তে সাঁওতালদের জমির কাছে আসিয়া তাহারা কিন্তু অবাক হইয়া গেল। ইহারই মধ্যে প্রায় সমস্ত জমি সবুজ ফসলে ভরিয়া উঠিয়াছে। চষিয়া খুঁড়িয়া নিড়ান দিয়া তাহারা ভুট্টা, শন, অড়হর বুনিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে; জমির ধারে সারিবন্দী চারা, তাহাতে শিম, বরবটি, খেঁড়ো, কাঁকুড়ের অঙ্কুর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ধানের জমিগুলি চাষ দিয়া সার ছড়াইয়া একেবারে প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে। বাড়িঘরের চালে নূতন খড় চাপানো হইয়া গিয়াছে, কাঁচা সোনার রঙের নূতন খড়ের বিছানি অপরাহ্ণের রৌদ্রে ঝকঝক করিতেছে। ইহাদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ সত্ত্বেও রংলাল এবং নবীন মুগ্ধ হইয়া গেল। রংলাল বলিল, বা বা বা! বেটারা এরই মধ্যে ক'রে ফেলেছে কি হে, অ্যাঁ! ঘাস-টাস ঘুচিয়ে বিশ বছরের চষা জমির মত সব তকতক করছে!

নবীন হেঁট হইয়া ফসলের অঙ্কুরগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল। সে বলিল, অড়লের কেমন জাত দেখ দেখি! একটি বীজও বাদ যায় নাই হে! তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর আমাদের জমিতে হয়তো ঢুকতেই পারা যাবে না। দেখলে তো, বেনা আর কাশ কি রকম বেড়ে উঠেছে।

আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া অহীন্দ্র যে জমিটা খাসে রাখিয়াছে, সেই অংশটার ভিতর তাহারা আসিয়া পড়িল। তখনও সেখানে কয়জন জোয়ান সাঁওতাল মাটি কোপাইয়া বেনা ও কাশের শিকড় তুলিয়া ফেলিতেছিল। এ অংশটারও অনেকটা তাহারা সাফ করিয়া ফেলিয়াছে, তবুও নতুন বলিয়া এখানে ওখানে দুই-চারিটা পরিত্যক্ত শিকড় হইতে ঘাস গজাইয়া উঠিতেছে, এখনও জমির আকারও ধরিয়া উঠে নাই, এখানে ওখানে উঁচু নীচু অসমতল ভাবও সমান হয় নাই। তবুও উহারই মধ্যে যে অংশটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হইয়াছে, তাহারই উপর ভুট্টা বুনিয়া ফেলিয়াছে। সে-জমিটা অতিক্রম করিয়া আপনাদের জমির কাছে আসিয়া তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। সত্যই বেনা ঘাসে কাশের গুল্মে নানা আগাছায় সে যেন দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে। বেনা ও কাশ ইহারই মধ্যে

এমন বাড়িয়া গিয়াছে যে, মানুষের বুক পর্যন্ত ডুবিয়া যায়। এই জঙ্গলের মধ্যে লাঙল চষিবে কেমন করিয়া?

নবীন বলিল, ঘাস কেটে না ফেললে আর উপায় নেই মোড়ল!

রংলাল চিন্তিত মুখেই বলিল, তাই দেখছি।

নবীন বলিল, এক কাজ করলে হয় না মোড়ল? সাঁওতালদিগেই এ বছরের মত ভাগে দিলে হয় না? এবার ওরা কেটে কুটে সাফ করুক, চ'ষে খুঁড়ে ঠিক করুক, তারপর আসছে বছর থেকে আমরা নিজেরা লাগব।

যুক্তিটা রংলালের মন্দ লাগিল না। সে বলিল, তাই চল, দেখি বেটাদের ব'লে।

সেই পরামর্শ করিয়া তাহারা আসিয়া সাঁওতালদের পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ঝকৃঝকে তকতকে পল্লী, পথে বা ঘরের আঙিনায় কোথাও এতটুকু আবর্জনা নাই। পল্লীর আশেপাশে তখনও গরু মহিষ ছাগল চরিয়া বেড়াইতেছে। সারের গাদার উপর মুরগীর দল খুঁটিয়া খুঁটিয়া আহার সংগ্রহে ব্যস্ত। আঙিনার পাশে পাশে মাচার উপর কাঠশিম, লাউ, কুমড়ার লতা বাসুকির মত সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে যেন। বাড়িগুলির বাহিরে চারিদিক ঘিরিয়া সরলরেখার মত সোজা লম্বা বাঁধ তৈয়ারী করিয়াছে, তাহারই উপর সারিবন্দী জাফরি বসানো। ভিতরে আম কাঁঠাল মহুয়ার গাছ পুঁতিয়া ফেলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে শজিনার ডাল এবং মূল সমেত বাঁশের কলম লাগাইয়া চারিপাশে কাঁটা দিয়া ঘিরিয়া দিয়াছে।

রংলাল বলিল, বাকি আর কিছু রাখে নাই বেটারা, ফল ফুল শজ্‌নে বাঁশ—একেবারে ইন্দ্র-ভুবন ক'রে ফেলেছে হে! জাত বটে বাবা!

প্রথমেই পুতুলনাচের ওস্তাদ চূড়া মাঝির ঘর; মাঝি ছুতারের যন্ত্রপাতি লইয়া উঠানে বসিয়া লাঙল তৈয়ারি করিতেছিল। একটি অল্পবয়সী ছেলে তাহার সাহায্য করিতেছে। একখানা প্রায়-সমাপ্ত লাঙলের উপর হাল্‌কাভাবে যন্ত্র চালাইতে চালাইতে মাঝি গুনগুন করিয়া গান করিতেছিল। নবীন লাঙলখানার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, দেখছ কেমন পাতলা আর কতটা লম্বা?

রংলাল দেখিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল, বাজে! এত সরুতে পাশের মাটি ধরবে কেন? ওর চেয়ে আমাদের ভাল। যাকৃগে। এখন তো আমাদের কাজের কথা। এই মাঝি, মোড়ল কোথা রে তোদের?

ওস্তাদ কথার কোন উত্তর দিল না, আপন মনেই কাজ করিতে লাগিল। রংলাল বিরক্ত হইয়া বলিল, এ-ই শুনছিস?

মুখ না তুলিয়াই এবার চূড়া বলিল, কি?

তোদের মোড়ল কোথা?

মোড়ল?

হ্যাঁ।

মোড়ল?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

চূড়া এবার হাতের যন্ত্রটা রাখিয়া দিয়া কোন কিছুর জন্য আপনার ট্যাঁক হইতে কাপড়ের খুঁট পর্যন্ত খুঁজিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে বস্তুটা না পাইয়া অত্যন্ত হতাশভাবে বলিল, পেলাম না গো।

রংলাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, ওই! বেটা বলছে কি হে!

চূড়া সকরুণ মুখে বলিল, রেখেছিলাম তো বেঁধে। প'ড়ে গেঁইছে কোথা।

রংলাল অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া বলিল, দেখ দেখি বেটার আস্পর্ধা, ঠাট্টা-মস্করা আরম্ভ করেছে।

চূড়া এবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মানুষ আপনার ঘরকে থাকে। তুরা তার ঘরকে যা। আমাকে শুধালি কেনে?

রংলাল কোন কথা বলিল না, নবীনের হাত ধরিয়া টানিয়া ক্রুদ্ধ পদক্ষেপেই অগ্রসর হইল; চূড়া পেছন হইতে অতি মিষ্টি স্বরে ডাকিল, মোড়ল! ও মোড়ল!

রংলাল বুঝিল, লোকটা অনুতপ্ত হইয়াছে, সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, কি?

চূড়া কোন কথা বলিল না, তাহার সমস্ত শরীরের কোন একটি পেশী নড়িল না, শুধু বড় বড় কাঁচা-পাকা গোঁফ জোড়াটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচিয়া উঠিল। গোঁফের সে নৃত্যভঙ্গিমা যেমন হাস্যকর, তেমনই অদ্ভুত। তাহা দেখিয়া রংলালও হাসিয়া ফেলিল, বেটা আমার রসিক রে!

চূড়া এবার বলিল, বুলছি, রাগ করিস না গো।

মোড়ল মাঝির উঠানে খাটিয়ার উপর একটি আধা-ভদ্রলোক বসিয়া ছিল। কমল মাটির উপর উবু হইয়া বসিয়া কথা বলিতেছিল। লোকটির গায়ে একখানি চাদর, পায়ে একজোড়া চটিজুতা, হাতে মোটা বাঁশের ছড়ি, চোখে পুরু একজোড়া চশমা—সূতা দিয়া মাথা বেড়িয়া বাঁধা। চশমাসুদ্ধ চোখ একরূপ আকাশে তুলিয়া রংলাল ও নবীনকে দেখিয়া লোকটি বলিল, ওই, পাল মশায় যে? লোহারও সঙ্গে? কি মনে ক'রে গো?

রংলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, বলি, আপুনি কি মনে ক'রে গো?

লোকটি বলিল, আর বল কেন ভাই, এরা ধরেছে বর্ষার সময় ধান দিতে হবে। তাই একবার দেখতে শুনতে এলাম। তা এরা করেছে বেশ, এরই মধ্যে গেরামখানিকে বে—শ ক'রে ফেলেছে হে! তারপর, শুনলাম, আপরারাও জমি নিয়েছেন? তা আমাদিগে বললে কি আর আপনাদের জমি আমরা কেড়ে নিতাম? আমরাও খানিক আধেক নিতাম আর কি!

নবীন বলিল, বেশ, পাল মশায় বলেন ভাল! আমাদিগেই কি আর দেয় জমি! কোন রকম ক'রে হাতে পায়ে ধরে তবে আমরা পেলাম। তার উপর কে চন্দ রাজা, কে চন্দ মন্ত্রী—কোন হদিসই নাই।

লোকটি হাসিয়া বলিল, তা দেখছি। চার কোণে চার কোপ দিয়ে গেলেই হ'ল। বাস্, জমি দখল হয়ে গেল। কই, এখনও তো কিছু করতে পারে নাই দেখলাম। এবার আর ওতে হাত দিতেও পারবেন না। এদিকে আবার ধানচাষ এসে পড়ল হু-হু ক'রে।

রংলাল বলিল, এবার ভাবছি সাঁওতালদিগেই ভাগে দিয়ে দেব, ওরাই চাষ-খোঁড় করুক, যা পারে লাগাক, যা খুশি হয় আমাদের দেবে, তাই এলাম একবার মোড়লের কাছে। শুনছিস মোড়ল ?

কমল মাঝি দুই হাতে মাথা ধরিয়া বসিয়া ছিল, সে বলিল, তা তো শুনলাম গো।

তা কি বলছিস ?

উঁ-হুঁ, সে আমরা লারব। তুরা তো আবার কেড়ে লিবি। আমরা তবে কেনে তুদের জমি ঠিক ক'রে দিব ? আমাদিগে পয়সা দিয়ে খাটায়ে লে কেনে।

কেন, গরজ বুঝছিস নাকি ?

তুরাই তো দেখাইছিস গো সিটি। আমরা খাটব, জমি করব, আর তুরা তখন জমিটি কেড়ে লিবি।

নূতন লোকটি এবার বলিল, আমি উঠছি মাঝি। তা হ'লে ওই কথাই ঠিক রইল।

মাঝি বলিল, হুঁ, সেই হ'ল। আপুনি আসবি তো ঠিক ?

ঠিক আসব আমি। তারপর রংলাল ও নবীনকে বলিল, বেশ, তা হ'লে কথাবার্তা বলুন আপনারা, আমি চললাম।

লোকটি চলিয়া গেলে রংলাল বলিল, হ্যাঁ মাঝি, তোরা ওর কাছে ধান লিবি ? তোদের গলা কেটে ফেলবে। খবরদার খবরদার। এক মণ ধানে শ্রীবাস আধ মণ সুদ লেয়, খবরদার।

মাঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহুঁ উ সুদ লিব না বুললে। উ আমাদের পাড়াতে দুকান করছে। একটি খামার করছে। আমাদিগে জমি দিলে ভাগে। আমরা উয়ার জমি কেটে চ'ষে ঠিক ক'রে দিব।

রংলাল বিস্মিত হইয়া বলিল, পাল এখানে জমি নিয়েছে নাকি ?

হুঁ গো। ওই তো, তুদের জমিটোই উ লিলে। বাবুদিগে টাকা দিলে, দলিল ক'রে লিলে, চেক লিলে। কাল সব আমরা পাড়াসুদ্ধ ওই জমিতে লাগব। উনি আসবে লোকজন লিয়ে।

রংলাল নবীন উভয়েই বিস্ময়ের আঘাতে স্তম্ভিত হইয়া মাটির পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কমল পাড়ার এক প্রান্তে প্রকাণ্ড একটা খড়ের চাল দেখাইয়া বলিল, উই দেখ কেনে—উ দুকান করেছে উইখানে। উয়ার কাছে যা কেনে তুরা।

রংলাল নবীন উভয়েই হতাশায় ক্রোধে অস্থির চিত্তে দোকানের দিকে অগ্রসর হইল। লোকটি সোজা লোক নয়। এখানে সদ্‌গোপদের মধ্যে শ্রীবাস পাল বর্ধিষ্ণু লোক। বিস্তৃত

চাষ তো আছেই, তাহার উপর নগদ টাকা এবং ধানের মহাজনিও করিয়া থাকে। বড় ছেলে একটা মনিহারীর দোকান খুলিয়াছে।

সাঁওতাল-পল্লীর এক প্রান্তে বেশ বড় একখানি চালা তুলিয়া তাহার চারিপাশে ঘিরিয়া ছিটা-বেড়ার দেওয়াল দিয়া কয় দিনের মধ্যেই শ্রীবাস দোকান খুলিয়া ফেলিয়াছে। এক পাশে নটকোনার দোকান, মধ্যে একটা তক্তাপোশের উপর দস্তার গহনা, কার, পুঁতির মালা, রঙিন নকল রেশমের গুছি, কাঠের চিরুনি, আয়না—এই সব লইয়া কিছু মনিহারীও সাজানো রহিয়াছে, এ-দিকের এক কোণে তেলে-ভাজা খাবার বিক্রয় হইতেছে। পল্লীর মেয়েরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া জিনিস কিনিতেছিল।

রংলাল আসিয়া ডাকিল, পাল মশায়!

পালের ছোট ছেলে মুখ তুলিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া বলিল, বাবা তো বাড়ি চ'লে গিয়েছেন।

রংলাল সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল, পথ বাছিল না, জঙ্গল ভাঙিয়াই গ্রামের মুখে ফিরিল। পালের ছেলে বলিল, এই রাস্তায় রাস্তায় যান গো, বরাবর নদীর ঘাট পর্যন্ত রাস্তা প'ড়ে গিয়েছে।

সত্যই সবুজ ঘাসের উপর একটি গাড়ির চাকার দাগ-চিহ্নিত পথের রেশ বেশ পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহারই মধ্যে, কিছু জঙ্গল কাটিয়াও ফেলা হইয়াছে। পথ বাছিয়া চলিবার মত মনের অবস্থা তখন রংলালের নয়, সে জঙ্গল ভাঙিয়াই গ্রামের দিকে অগ্রসর হইল।

১৪

রংলাল মনের ক্ষোভে রক্তচক্ষু হইয়াই শ্রীবাসের বাড়িতে হাজির হইল। শ্রীবাস তখন পাশের গ্রামের জন কয়েক মুসলমানের সঙ্গে কথা বলিতেছিল। ইহারা এ অঞ্চলের দুর্দান্ত লোক, কিন্তু শ্রীবাসের খাতক। বর্ষায় ধান, হঠাৎ প্রয়োজনে দুই-চারিটা টাকা শ্রীবাস ইহাদের ধার দেয়; সুদ অবশ্য লয় না, কারণ মুসলমানদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সুদ লওয়া মহাপাতক।

কেহ কেহ হাসিয়া শ্রীবাসকে বলে, ঘরে তো টিন দিয়েছেন পাল মশায়, আর ও বেটাদের সুদ ছাড়েন কেন?

শ্রীবাস উত্তর দেয়, কিন্তু দরজা যে কাঠের রে ভাই, রাত্রে ভেঙে ঢুকলে রক্ষা করবে কে? তা ছাড়া ও-রকম দু-দশটা লোক অনুগত থাকা ভাল। ডাকতে-হাঁকতে অনেক উপকায় মেলে হে।

রংলালের মূর্তি দেখিয়া শ্রীবাস হাসিল, কিন্তু এতটুকু অবজ্ঞা বা বিরক্তি প্রকাশ করিল না। মিষ্টি হাসিমুখে আহ্বান জান।ইয়া বলিল, আসুন আসুন। কই দরকার ছিল তো ওখানে কই কোন কথা বললেন না? ওরে তামাক সাজ, তামাক সাজ, দেখি।

বিনা ভনিতায় রংলাল কথা প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিল, এর মানে কি পাল মশায়?

শ্রীবাস একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, সে কি, ওই জমিটাই আপনারা নেবার জন্যে কোপ মেরে রেখেছেন নাকি? কিন্তু আমার বন্দোবস্ত যে আপনাদের অনেক আগে পাল মশায়! আপনারাই তা হ'লে আমার জমি নিতে গিয়েছিলেন বলুন?

রংলাল সবিস্ময়ে বলিল, মানে? আমরা ছোট দাদাবাবুর সামনে সেদিন—

বাধা দিয়া শ্রীবাস বলিল, আমার বন্দোবস্ত বড় দাদাবাবুর কাছে পাল মশায়। ননী যেদিন বিকেলে খুন হ'ল, সেই দিন সকালে আমি বন্দোবস্ত নিয়েছি। কেবল, বুঝলেন কিনা—এই ঝগড়া-মারামারির জন্যেই ওতে আমি হাত দিই নাই।

রংলাল উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এ কি ছেলে ভোলাচ্ছেন পাল, না পাগল বোঝাচ্ছেন? আমি ছেলেমানুষ, না পাগল? বড় দাদাবাবু আপনাকে জমি বন্দোবস্ত ক'রে গিয়েছেন?

শ্রীবাস শান্তভাবে বলিল, বসুন। বলি, পড়তে শুনতে তো জানেন আপনি। কই, দেখুন দেখি এই চেকরসিদখানা। তারিখ দেখুন, সন সাল দেখুন, তার উল্টো পিঠে জমির চৌহদ্দি দেখুন; সে সময়ের নায়েব আমাদের মজুমদার মশায়ের সই দেখুন। তারপরে, তিনিও আপনার বেঁচে রয়েছেন, তাঁর কাছে চলুন। তিনি কি বলেন, শুনুন—, বলিয়া শ্রীবাস একখানি জমিদারী সেরেস্তার রসিদ বাহির করিয়া রংলালের সম্মুখে ধরিল।

শ্রীবাসের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, অন্তত রসিদখানা সেই প্রমাণই দিল। কিন্তু রংলাল বলিল, আমরাও ধানচালের ভাত খাই পাল, এ আপনি মজুমদারের সঙ্গে ষড় ক'রে করেছেন। এ আপনার জাল রসিদ। আমরা ও-জমি ছাড়ব না, এ আমি আপনাকে ব'লে দিলাম।

শ্রীবাস হাসিয়া বলিল, বলে না দিলেও সে আমি জানি পাল মশায়। বেশ, তা হ'লে কালই যাবেন চরের ওপর, কাল ঘাস কেটে জমি সাফ করতে আমার লোক লাগবে, পারেন উঠিয়ে দেবেন! তারপর তাহার অনুগত মুসলমান কয়েকজনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, এই শুনলে তো মাসুদ, তা হ'লে খুব ভোরেই কিন্তু তোমরা এস। বুঝছ তো, তোমরাই আমার ভরসা।

মাসুদ শ্রীবাসকে কোন উত্তর না দিয়া রংলালকে বলিল, তা হ'লে তাই আসব পাল। ভয় নাই, পুরু ঘাসের ওপর পড়লে পরে দরদ লাগবে না গায়ে।—বলিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রংলাল নির্বাক হইয়া রহিল, কিন্তু নবীন এবার হাসিল।

* * *

নবীন সমস্তক্ষণ নির্বাক হইয়া রংলালের অনুসরণ করিতেছিল। শ্রীবাসের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া সে বলিল, পাল, আমি তোমার এই সবের মধ্যে নাই কিন্তু।

রংলালের বুকের ভিতরে অবরুদ্ধ ক্রোধ হুহু করিতেছিল, শ্রীবাস ও মজুমদারের প্রবঞ্চনার ক্ষোভ, সঙ্গে সঙ্গে চরের উর্বর মৃত্তিকার প্রতি অপরিমেয় লোভ, এই দুইয়ের তাড়নায় সে যেন দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে মুখ বিকৃত করিয়া ভেঙাইয়া বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে জানি। যা যা, বেটা বাগদী, ঘরে পরিবারের আঁচল ধ'রে ব'সে থাকগে যা।

নবীন জাতে বাগদী, আজ তিন পুরুষ তাহারা জমিদারের নগ্‌দীগিরিতে লাঠি হাতেই কাল কাটাইয়া আসিয়াছে, কথাটা তাহার গায়ে যেন তীরের মত গিয়া বিঁধিল। সে রূঢ় দৃষ্টিতে রংলালের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আমি পরিবারের আঁচল ধ'রে ব'সে থাকি আর যাই করি, তুমি যেন যেও। চরের ওপরেই আমার সঙ্গে দেখা হবে, বুঝলে? শুধু আমি লয়, গোটা বাগদীপাড়াকেই ওই চরের ওপর পাবে। বলিয়া সে হনহন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

কথাটা রংলাল রাগের মুখে বলিয়া ফেলিয়াই নিজেই অন্যায়টা বুঝিয়াছিল। এ-ক্ষেত্রে বাহুবলের একমাত্র ভরসাস্থল ওই নবীন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে বাগ্দীদের দলে না হইলে উপায়ান্তর নাই। নবীন সমস্ত বাগ্দীপাড়াটার মাথা। তাহার কথায় তাহারা সব করিতে পারে। মুহূর্তে রংলাল আপনা হইতেই যেন পাল্‌টাইয়া গেল, একেবারে সুর পাল্‌টাইয়া সে ডাকিল, নবীন! নবীন! ও নবীন! শোন হে, শোন।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নবীন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বল।

রসিকতা করিয়া অবস্থাটাকে সহজ করিয়া লইবার অভিপ্রায়েই রংলাল বলিল, ওই, রাগের চোটে যে পথই ভুলে গেলে হে! ও-দিকে কোথা যাবে?

যাব আমার মনিব-বাড়ি। অনেক নুন আমি খেয়েছি, তাদের অপমান লোকসান আমি দেখতে পারব না।. আমি হুকুম আনতে চললাম, তোমাদিগেও জমি চষতে দোব না, ও শ্রীবাসকেও না, গোটা বাগ্দীপাড়া আমরা কাল মনিবের হয়ে যাব। এ তোমরা জেনে রাখ।

রংলাল একটু চিন্তা করিয়া বলিল, চল, আমিও যাব। টাকা দিয়েই বন্দোবস্ত আমরা ক'রে নেব। তা হ'লে তো হবে?

নবীন খুশি হইয়া বলিল, সে আমি কতদিন থেকে বলছি বল দেখি?

নবীন চক্রবর্তী-বাড়ির পুরানো চাকর। শুধু সে নিজেই নয়, তাহার ঠাকুরদাদা হইতে তিন পুরুষ চক্রবর্তী-বাড়ির কাজ করিয়া আসিয়াছে। এই জমি-বন্দোবস্তের গোড়া হইতেই মনে মনে সে একটা দ্বিধা অনুভব করিয়া আসিতেছিল। সেলামী না দিয়া জমি বন্দোবস্ত পাইবার আবেদনের মধ্যে তাহার একটা দাবি ছিল, কিন্তু অহীন্দ্র তাহাতে অসম্মতি জানাইলে রংলাল যখন আইনের ফাঁকে ফাঁকি দিবার সঙ্কল্প করিল, তখন মনে মনে একটা অপরাধ সে অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু সে-কথাটা জোর করিয়া সে প্রকাশ করিতে পারে নাই দলের ভয়ে। রংলাল এবং অন্য চাষী কয়জন যখন এই সঙ্কল্পই করিয়া বসিল, তখন সে একা অন্য অভিমত প্রকাশ করিতে কেমন সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছিল খানিকটা লোভ। অন্যকে ফাঁকি দেওয়ার আনন্দ না হইলেও, তাহাদিগকে খাতির বা স্নেহ করিয়া এমনি দিয়াছেন, ইহার মধ্যে একটা আত্মপ্রসাদ আছে, তাহার প্রতি একটা আসক্তি তাহার অপরাধ-বোধকে আরও খানিকটা সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছিল। সর্বশেষ রংলাল যখন বলিল, ওই সাঁওতালদের চেয়েও কি আমরা চক্রবর্তী-বাড়ির পর?—তখন মনে মনে সে একটা ক্রুদ্ধ

অভিমান অনুভব করিল, যাহার চাপে ওই সঙ্কোচ বা দ্বিধাবোধ একেবারেই যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল। যাহার জন্য অসঙ্কোচে রংলালদের দলে মিশিয়া সে, উচ্চকণ্ঠে না হইলেও প্রকাশ্যভাবেই, বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া উঠিয়া আসিল। কিন্তু ধীরে ধীরে আবার সেই দ্বিধা তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য মামলা-মোকদ্দমায় সম্মতি সে দিতে পারে নাই। তারপর শ্রীবাসের এই ষড়যন্ত্রের কথা অকস্মাৎ প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, চারিদিক হইতে চক্রবর্তী-বাড়িকেই ফাঁকি দিবার আয়োজন চলিতেছে। তাহারা, শ্রীবাস, মজুমদার, সকলেই ফাঁকি দিতে চায় ঐ সহায়হীন চক্রবর্তী-বাড়িকে, তাহারই পুরানো মনিবকে। এক মুহূর্তে তাহার মনের দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়া গেল, তিন পুরুষের মনিবের পক্ষ হইয়া সমগ্র বাগদীবাহিনী লইয়া লড়াই দিবার জন্য তাহার লাঠিয়াল-জীবন মাথা চাড়া দিয়া উঠিল।

চক্রবর্তী-বাড়ির পুরাতন চাকর হিসাবে অন্দরে যাতায়াতের বাধা তাহার ছিল না, সে একেবারে সুনীতির কাছে আসিয়া অকপটেই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে তাহার ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। রংলাল দাঁড়াইয়া ছিল দরজার বাহিরে রান্নাঘরে।

সমস্ত শুনিয়া সুনীতি কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। কথা বলিল মানদা, সে তীক্ষ্ণস্বরে বলিয়া উঠিল, ছি লগ্দী, ছি! গলায় একগাছা দড়ি দাও গিয়ে।

সুনীতি এবার বলিল, না না, মানদা দোষ একা নবীনেব নয়, দোষ অহিরও। সাঁওতালদের যখন সে বিনা-সেলামীতে জমি দিয়েছে, তখন নবীনকেও দেওয়া উচিত ছিল। সত্যিই তো, নবীন কি আমাদের কাছে সাঁওতালদের চেয়েও পর?

নবীন এবার ছোট ছেলের মত কাঁদিয়া ফেলিল। দুয়ারের ওপাশ হইতে রংলাল বেশ আবেগভরেই বলিল, বলুন মা, আপনিই বলুন। আমাদের অভিমান হয় কি না হয়, আপনিই বলুন। মনে ক'রে দেখুন, আমিই বলেছিলাম সর্বপ্রথম যে, এ-চর আপনাদের ষোল-আনা। তবে ধর্ম্মের কথা যদি ধরেন, তবে আমরা পেতে পারি। আপুনি বলেছিলেন, ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে কি কিছু করা যায় বাবা, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। তাতেই মা, সেই দাবিতে আমরা আবদার ক'রে বলেছিলাম, আমরা দিতে পারব না সেলামী।

সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সবই বুঝলাম বাবা, কিন্তু এখন আমি কি করব, বল?

নবীন বলিল, আমাকে হুকুম দেন মা আমি কাউকেই জমি চষতে দেব না। গোটা বাগদীপাড়া লাঠি হাতে গিয়ে দাঁড়াব। থাকুক জমি এখন খাসদখলে।

রংলাল বাহির হইতে গভীর ব্যগ্রতা-ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল, এখুনি আমি আড়াই শ টাকা এনে হাজির করছি নবীন, জমি আমাদিগে বন্দোবস্ত ক'রে দেন রাণীমা।

নবীন বলিল, সেই ভাল মা, ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় আমরাই পোয়াব, আপনাদের কিছু ভাবতে হবে না।

সুনীতি অনেক কিছু ভাবিতেছিলেন। তাহার মধ্যে যে কথাটা তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা পীড়িত করিতেছিল, সেটা নবীন ও রংলালের কথা। নিজের স্বার্থের জন্য কেমন করিয়া এই গরীব চাষীদের এমন রক্তাক্ত বিরোধের মুখে ঠেলিয়া দিবেন? তাঁহার মনের বিচারে—স্বার্থটা ষোল-আনা যে একা তাঁহারই।

মানদা কিন্তু হাসিয়া বলিল, সস্তায় কিস্তি মেরে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে গায়ে লাগে না, না কি গো লগ্দী? আমিও কিন্তু বিঘে পাঁচেক জমি নেব মা। আমারও তো শেষকাল আছে। আমিও টাকা দেব। লগ্দী যা দেবে তাই দেব। লগ্দীর চেয়ে তো আমি পর নই মা।

মানদার কথার ধরনটা শুধু ধারালোই নয়, বাঁকাও খানিকটা বটে। নবীন অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল, দুয়ারের ও-পাশে রংলাল দাঁতে দাঁত টিপিয়া নিরালা অন্ধকারের মধ্যেই নীরব ভঙ্গিতে তাহাকে শাসাইয়া উঠিল। সুনীতি কি বলিতে গেলেন, কিন্তু তাহার পূর্বেই বাহির দরজার ওপাশে কে গলার সাড়া দিয়া আপনার আগমনবার্তা জানাইয়া দিল। গলার সাড়া সকলেরই অত্যন্ত পরিচিত। সুনীতি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, মানদা সবিস্ময়ে বলিল, ওমা লায়েববাবু যে।

পরমুহূর্তেই শান্ত বিনীত কণ্ঠস্বরে মজুমদার বাহির হইতে ডাকিলেন, বউঠাকরুন আছেন নাকি?

নবীন খানিকটা দুর্বলতা অনুভব করিয়া চঞ্চল হইয়া পড়িল, দরজার আড়ালে রংলালের মুখ শুকাইয়া গেল। মানদা মৃদুস্বরে সুনীতিকে প্রশ্ন করিল, মা?

সুনীতি মৃদুস্বরেই বলিলেন, আসতে বল।

মানদা ডাকিল, আসুন, ভেতরে আসুন।

সুনীতি বলিলেন, একখানা আসন পেতে দে মানদা।

প্রশান্ত হাসিমুখে যোগেশ মজুমদার ভিতরে আসিয়া সবিনয়ে বলিল, ভাল আছেন বউঠাকরুন? কর্তা ভাল আছেন?

অবগুণ্ঠন অল্প বাড়াইয়া দিয়া সুনীতি বলিলেন, উনি আছেন সেই রকমই। মাথার গোলমাল দিন দিন যেন বাড়ছে ঠাকুরপো।

মজুমদার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আহা-হা। কণ্ঠস্বরে, ভঙ্গিতে যতখানি সমবেদনার আভাস প্রকাশ পাইতে পারে, ততখানিই প্রকাশ পাইল। তারপর মজুমদার বলিল, একবার বৈদ্যপারুলিয়ার কবিরাজদের দেখালে হ'ত না? চর্মরোগে, 'বিশেষত কুষ্ঠ ইত্যাদিতে ওরা ধন্বন্তরি।

সুনীতির মুখ মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। সমস্ত শরীর যেন ঝিমঝিম করিয়া উঠিল, মজুমদারের কথায় তিনি মর্মান্তিক আঘাত অনুভব করিলেন। তিনি কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, না না ঠাকুরপো, সে তো সত্যি নয়। সে কেবল ওঁর মাথার ভুল।

উত্তরে মজুমদার কিছু বলিবার পূর্বেই মানদা ঠক করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, তবু ভাল, লায়েববাবুকে দেখতে পেলুম। আমি বলি—মথুরাতে রাজা হয়ে নন্দের বাদার কথা

বুঝি ভুলেই গেলেন। তা নয় বাপু, পুরনো মনিবের ওপর টান খুব।

মজুমদারের মুখ-চোখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে বার দুই অস্বাভাবিক গম্ভীরভাবে গলা ঝাড়িয়া লইল; মানদা বলিয়াই গেল, লায়েবাবু আমাদের ভোলেন নি বাপু। কত্তাবাবুর খবর-টবর রাখেন।

সুনীতি লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন, মুখরা মানদা এ বলিতেছে কি? কিন্তু তাহাকেই বা কেমন করিয়া তিনি নিরস্ত করিবেন? মুখের দিকেও একবার চাহে না যে, ইঙ্গিত করিয়া বারণ করেন। মজুমদার নিজেই ব্যাপারটাকে ঘুরাইয়া লইল, আরও একবার গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, বিশেষ একটা জরুরী কথা বলতে এসেছিলাম বউঠাকরুন!

সুনীতি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া হাসিমুখে বলিলেন, বলুন।

বলছিলাম ওই চরটার কথা। ওই চরের ওপর এক শ বিঘে জায়গা মহীবাবু শ্রীবাস পালকে বন্দোবস্ত করেছেন। আমিই চেক কেটে দিয়েছি মহীবাবুর হুকুমমত। টাকা অবিশ্যি তিনিই নিয়েছিলেন। ছ শ টাকা। পাঁচ শ টাকা সেলামী, এক শ টাকা খাজনা।

সুনীতি মৃদুস্বরে কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, আমি তো সে কথা জানি নে ঠাকুরপো।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মজুমদার বলিল, জানবেন কি ক'রে বলুন, এ কি আপনার জানবার কথা? তা ছাড়া, সেই দিনই বেলা তিনটের সময় ননী পাল খুন হয়ে গেল। বলবার আর অবসর হ'ল কই, বলুন? এখন শ্রীবাসের সেই জমি থেকে পঞ্চাশ বিঘে জমি রংলাল নবীন —এরা দখল করতে চাচ্ছে। ওদের অবিশ্যি জবরদস্তি। সেলামীর টাকা পর্যন্ত দেয় নি।

সুনীতি বলিলেন, না না ঠাকুরপো, ওদের আমি জমি দেব বলেছিলাম।

বেশ তো। চরে তো আরও জমি রয়েছে, তার থেকে ওরা নিতে পারে।

অকস্মাৎ মানদা আক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, আঃ হায় হায় গো! ছ-ছ শ টাকা চিলে ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল গো! আমার মনে পড়ছে লায়েববাবু, দাদাবাবুর হাতটা পর্যন্ত ছ'ড়ে গিয়েছিল নখে। সেই টাকাই তো?

মুহূর্তের জন্য মজুমদার স্তব্ধ হইয়া গেল, কিন্তু পরমুহূর্তেই হাসিয়া বলিল, টাকাটা আমাকেই দিয়েছিলেন মহী; সেটা মামলাতেই খরচ হয়েছে। বুঝলেন বউঠাকরুন, জমাখরচের খাতায় —খসড়া রোকড় খতিয়ান তিন জায়গাতেই তার জমা আছে। দেখলেই দেখতে পাবেন। তা ছাড়া চেক-রসিদও তাকে দেওয়া হয়েছে। আমি নিজে হাতে লিখে দিয়েছি। শ্রীবাস এসেছে, সেই চেক নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ-বছরের খাজনাও সে দিতে চায়।

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে শ্রীবাসের সাড়া পাওয়া গেল, খাজনার টাকা আমি নিয়ে এসেছি মজুমদার মশায়, এক শ টাকা আমি এক্ষুণি দিয়ে যাব।—বলিয়া সে ভিতর-দরজা পার হইয়া একেবারে অন্দরে আসিয়া দেখা দিয়া দাঁড়াইল।

মাথার ঘোমটা আরও খানিকটা বাড়াইয়া দিয়াও সুনীতি নিজেকে বিব্রত বোধ করিলেন; শুধু তাই নয়, হঠাৎ তাঁহার চোখে জল আসিয়া গেল। এমন ভাবে কেহ যে স্বেচ্ছায় আসিয়া এই অন্দরে প্রবেশ করিতে পারে, এ ধারণা মুহূর্ত-পূর্বেও তিনি কল্পনাতে আনিতে পারেন নাই।

শ্রীবাসের অন্দর-প্রবেশ যেমন অতর্কিত, তেমন ওই এক শ টাকার উষ্ণতায় উত্তপ্ত। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, একমাত্র আশ্রয়স্থলের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, অতি দ্রুতপদে উপরে স্বামীর ঘরের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণের জন্য সকলেই ঘটনাবর্তের এমন আকস্মিক জটিলতায় হতবাক্ হইয়া গেল। মানদা ফুলিয়া উঠিল ক্রুদ্ধ ক্রূর সাপিনীর মত। তাহার পূর্বেই মজুমদার নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, বউঠাকরুন চ'লে গেলেন যে!

মানদা দংশনের সুযোগ পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল, বলিল, আমি তো রয়েছি, বলুন না কি বলছেন?

হাসিয়া মজুমদার বলিল, তুমি আর শুনে কি করবে বল?

কেন যা হুকুম দেবার আমিই দেব। অন্দরই যখন কাছারি হয়ে উঠল, তখন আর আমার লায়েব ম্যানেজার হতে ক্ষেতিটা কি বলুন?

মজুমদারের মুখের হাসি তবু মিলাইয়া গেল না, সে বলিল, মানদার দাঁতগুলি যেমন চকচকে, তেমনি কি পাতলা ধারালো! তুমি শিলে শান দিয়ে দাঁত পরিষ্কার কর বুঝি?

মানদা হাসিয়া বলিল, এই দেখুন লায়েববাবু কি বলছেন দেখুন! বেঁজির দাঁতের কি শিল লাগে না শান লাগে? সাপ কাটবার মত ধার ভগবানই যে তার বজায় রাখেন গো। সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু ঠিক এই সময়েই উপরের বারান্দা হইতে সুনীতি ডাকিলেন, মানদা!

মানদার রূপ পাল্‌টাইয়া গেল, সম্ভ্রমভরা মমতাসিক্ত স্বরে বলিল, কি মা?

সুনীতি বলিলেন, মজুমদার-ঠাকুরপোকে কালকের দিনটা অপেক্ষা করতে বল। কাল ছোটবাড়ির দাদার কাছে এর বিচার হবে; যা হয় তিনিই ক'রে দেবেন।

মজুমদার উঠিয়া পড়িল। মানদা বলিল, শুনলেন তো? এখন কি বলছেন, বলুন?

মজুমদার বলিল, তোমাদের প্রজা শ্রীবাসকে বল মানদা। যা হয় সে-ই উত্তর দেবে।

মানদা বলিল, উকিলের বুদ্ধি নিয়েই তো মক্কেল উত্তর দেবে লায়েববাবু। তাতেই একেবারে খোদ উকিলকেই জিজ্ঞেসা করছি।

শ্রীবাস কিন্তু বিনা পরামর্শেই উত্তর দিল, বলিল, অপেক্ষা আমি করতে পারব না, সে তুমি গিন্নীমাকে বল। তাতে খুনখারাপি হয়, হবে।

বারান্দায় রেলিঙে মাথা রাখিয়া সুনীতি দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটা গভীর অবসন্নতা তিনি অনুভব করিতেছিলেন, আর যেন সহ্য করিতে পারিতেছেন না। আগামী প্রভাতের চরের ছবি তাঁহার চোখের উপরে যেন নাচিতেছে। চরটা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহারই উপর পড়িয়া আছে রংলাল, নবীন, শ্রীবাস আরও কত মানুষ। ঝরঝর করিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন; তাঁহার মনে হইল, সমস্ত কিছুর জন্য অদৃশ্য লোকের হিসাব-নিকাশ দায়িত্ব পড়িতেছে তাঁহারই স্বামীর উপর, সন্তানদের উপর। অস্থির হইয়া গিয়া তিনি স্বামীর ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

স্তব্ধ রামেশ্বর খাটের উপর বসিয়া আছেন পাথরের মূর্তির মত, খোলা জানালার মধ্য দিয়া রাত্রির আকাশের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সুনীতি কঠিন চেষ্টায় আত্মসম্বরণ করিয়া নিরুচ্ছ্বসিতভাবেই বলিলেন, দেখ, একটা কথা বলছিলাম, না ব'লে যে আমি আর পারছি না।

রামেশ্বর ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরাইয়া সুনীতির মুখের দিকে চাহিলেন, যেন কোন অজ্ঞাত-লোক হইতে তিনি এই বাস্তব পরিবেষ্টনীর মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর অতি মিষ্ট স্বরে বলিলেন, বল, কি বলছ, বল ?

খুব ভাল করিয়া গুছাইয়া, একটি একটি করিয়া সমস্ত কথা বলিয়া সুনীতি বলিলেন, তুমি একবার মজুমদারকে ডেকে একটু বল। তোমার অনুরোধ তিনি কখনই ঠেলতে পারবেন না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া রামেশ্বর ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিলেন, না।

সুনীতি আর অনুরোধ করিতে পারিলেন না, শুধু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। রামেশ্বর অভ্যাসমত মৃদুস্বরে বলিলেন, 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধি গুণে,—নাধমে লব্ধকামা।' সুনীতি, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা যদি ব্যর্থ হয় সেও ভাল, তবু অধমের কাছে ভিক্ষে ক'রে লব্ধকাম হওয়া উচিত নয়।

তিনি নীরব হইলেন ; প্রদীপের আলোকে মৃদু আলোকিত ঘরখানা অস্বাভাবিকরূপে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহারই মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী—মাটির পুতুলের মত একজন বসিয়া, অপর জন দাঁড়াইয়া রহিল। আবার কিছুক্ষণ পরে রামেশ্বর বলিলেন, সুনীতি, আমার মাথায় একটু বাতাস করবে ? আর একটু জল।

সুনীতি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি জল আনিয়া গ্লাসটি রামেশ্বরের হাতে দিয়া বলিলেন, শরীর কি কিছু খারাপ বোধ হচ্ছে ?

চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িয়া রামেশ্বর বলিলেন, মাথায় যেন আগুন জ্বলছে সুনীতি !

জল দিয়ে মাথা ধুয়ে দেব ?

দাও।

সুনীতি সযত্নে মাথায় জল দিয়া ধুইয়া আপনার আঁচল দিয়া মুছিয়া দিলেন, তারপর জোরে জোরে বাতাস দিতে আরম্ভ করিলেন। উৎকণ্ঠার আর তাঁহার সীমা ছিল না। উন্মাদ পাগল হইয়া গেলে তিনি কি করিবেন।

সহসা রামেশ্বর বলিয়া উঠিলেন, শ্রীবাস পাল অন্দরের মধ্যে চ'লে এল সুনীতি !

তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন।

না না, দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল।

দরজার মুখে ?

আবার কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন, সন্ধ্যের পর আমি একটু ক'রে বাইরে বেরুব। দিনে পারব না। আলো চোখে সহ্য করতে পারি না। তা ছাড়া হাতে এই কদর্য ব্যাধি, লোক

দেখবে। সন্ধ্যার পর আমি বরং একটু ক'রে কাজকর্ম দেখব—হ্যাঁ, দেখব।

সুনীতির চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, অতি সন্তর্পণে বাঁ হাতে আঁচল তুলিয়া সে জল তিনি মুছিয়া ফেলিলেন।

* * *

সমস্ত রাত্রি কিন্তু সুনীতির ঘুম হইল না। তাঁহার চিত্তলোকের কোমলতা অথবা দুর্বলতা এতই ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম যে, নিতান্ত নিঃসম্পর্কীয় দূরান্তরের বহু মানুষের দুঃখের তরঙ্গ আসিয়া তাহাতে কম্পন তোলে, তাহাদের জন্য উদ্বেগে তিনি আকুল হইয়া উঠেন। আপনার দুঃখে তিনি পাথরের মত নিস্পন্দ, কিন্তু পরের জন্য না কাঁদিয়া তিনি পারেন না। আজ আগামী কালের ভয়াবহ দাঙ্গার কথা ভাবিয়া তাঁহার উদ্বেগের আর অবধি ছিল না। ভোর হইতেই তিনি ছাদে গিয়া উঠিলেন। ছাদ হইতে চরটা বেশ দেখা যায়। তিনি চাহিয়া দেখিলেন; কিন্তু ঘন ঘাসের জঙ্গলের একটানা গাঢ় সবুজ বেশ, আর তাহারই মধ্যে সাঁওতালপল্লীর ঘরের ছাউনির নূতন খড়ের হলুদ রঙের চালাগুলি ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। উদ্বিগ্ন হৃদয়ে তিনি দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। পূর্বদিগন্ত হইতে সোনালী আলো ছড়াইয়া পড়িয়া চরখানাকে মুহূর্তে মুহূর্তে অপরূপ করিয়া তুলিতেছে। মৃদু বাতাসে ঘাসের মাথা নাচিয়া নাচিয়া দুলিতেছে।

সহসা মনে হইল, একটা ক্রুদ্ধ বাদানুবাদের উচ্চধ্বনি তিনি শুনিতে পাইতেছেন। সামান্য ক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড একটা কলরব ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, চোখে জল আসিল। চোখের জল মুছিয়া আবার তিনি চাহিলেন, এবার দেখিলেন, কাশের বন যেন একটা দুরন্ত ঘূর্ণিতে আলোড়িত হইতেছে। চরের ভিতর হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ত্রস্ত কলরব করিয়া আকাশে উড়িয়া গেল। কতকগুলি চতুষ্পদ···কয়েকটা শিয়াল, আরও কতকগুলো অজানা জানোয়ার ঘাসের বন হইতে বাহির হইয়া নদীর বালিতে ছুটিয়া পলাইতেছে। সুনীতি বাড়ির ভিতর দিকের আলিসার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মানদাকে ডাকিয়া বলিলেন, একটু খবর নে না মানদা, চরের ওপর বোধ হয় ভীষণ দাঙ্গা বেধেছে!

মানদাও ছুটিয়া বাহির হইল। কিন্তু সংবাদ কিছু পাইল না, লোকে ছুটিয়া চলিয়াছে নদীর দিকে, চরে দাঙ্গা বাধিয়াছে। তাহার অধিক কেহ কিছু জানে না। দুয়ারের উপর মানদা উৎকণ্ঠিত ঔৎসুক্য লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আরও কিছুক্ষণ পর একটি শীর্ণকায় মানুষকে তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মানদা আরও একটু আগাইয়া পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

লোকটি অচিন্ত্যবাবু। প্রাণপণে দ্রুত বেগে পলাইয়া বাড়ি চলিয়াছেন, শ্বাস-প্রশ্বাসে ভদ্রলোক ভীষণভাবেই হাঁপাইতেছেন, আর মুখে বলিতেছেন, উঃ! বাপ রে! বাপ রে! ভীষণ কাণ্ড!

মানদাকে দেখিয়া তাঁহার কথার মাত্রা বাড়িয়া গেল, তিনি এবার বলিলেন, ভীষণ কাণ্ড!

ভয়ঙ্কর দাঙ্গা! রক্তাক্ত ব্যাপার! খুন, খুন! একজন মুসলমান খুন হয়ে গেল। নবীন লোহার দুর্দান্ত লাঠিয়াল, মাথাটা দু টুকরো ক'রে দিয়েছে। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই তিনি মানদাকে পিছনে ফেলিয়া অনেকটা চলিয়া গেলেন।

উপর হইতে সুনীতি নিজেই সব শুনিলেন, হু হু করিয়া চোখের জল ঝরিয়া তাঁহার মুখ-বুক ভাসিয়া গেল। ওই অজানা হতভাগ্যের জন্য তাঁহার বেদনার আর সীমা ছিল না।

১৫

সর্বনাশা চর।

উহার বুকের মধ্যে কোথাও যেন লুকাইয়া আছে রক্তবিপ্লবের বীজ। দাঙ্গায় খুন হইয়া গেল একটা; তাহার উপর জখমের সংখ্যাও অনেক। চরের ঘাস বাহিয়া রক্তের ধারা মাটির বুকে গড়াইয়া পড়িল।

সুনীতি যেন দিশাহারার মত ভাঙিয়া পড়িলেন। রক্তাক্ত চরের কথা ভাবিতে গেলেই আরও খানিকটা রক্তাক্ত ভূমির কথা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে। চক্রবর্তী-বাড়ির কাছারির রক্তাক্ত প্রাঙ্গণ। হতভাগ্য ননী পাল। উঃ সে কি রক্ত! সেই রক্তের ধার কি ওপারের চরের দিকে গড়াইয়া চলিয়াছে? চরের রক্তের স্রোতের সঙ্গে কি ননীর রক্তের ধারা মিশিয়া গেল? নিরাশ্রয় দৃষ্টি মেলিয়া তিনি শূন্যলোকের নীলাভ মায়ার পরপারে আশ্রয় খুঁজিয়া ফেরেন।

ওদিকে ইহার পরে মামলা-মকদ্দমা আরম্ভ হইয়া গেল।

প্রথমে অবশ্য চালান গেল উভয় পক্ষই; শ্রীবাস ও তার পক্ষীয় কয়েকজন লাঠিয়াল এবং এ-পক্ষের রংলাল, নবীন ও আরও চার-পাঁচজন। কিন্তু মজুমদারের তদ্বিরে, শ্রীবাসের অর্থের প্রাচুর্যে, শ্রীবাসের পক্ষই আইনের চক্ষে নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। শ্রীবাসের ন্যায্য অধিকারের উপর চড়াও হইয়া নবীনের দল দাঙ্গা করিয়াছে, যাহার ফলে নরহত্যা পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে—এই অপরাধে তাহারা দায়রা-সোপর্দ হইয়া গেল। রংলাল অনেকদিন পর্যন্ত দৃঢ় ছিল, কিন্তু শেষের দিকে সে ভাঙিয়া পড়িল। রাজসাক্ষীরূপে শ্রীবাসের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিয়া সে নবীনের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল। তবু ঘরে মুখ লুকাইয়া সে কাঁদিত, বার বার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিত, ভগবান নবীনকে বাঁচাইয়া দাও। শ্রীবাসের অন্যায় তুমি প্রকাশ করিয়া দাও। কিন্তু ভগবান হয় বধির, নয় মূক।

সংবাদ শুনিয়া সুনীতি কাঁদিলেন। নবীনের জন্য তাঁহার মর্মান্তিক দুঃখ হইল। এই বাড়ির তিন পুরুষের চাকর এই নবীনের বংশ তাঁহাদের ছাড়ে নাই। নবীনই ছিল এ-বাড়ির শেষ বাহুবল। সেও চলিয়া যাইবে। নবীনকে যে যাইতে হইবে, তাহাতে তাঁহার সংশয় নাই। তাঁহার মন বার বার সেই কথা বলিতেছে। সর্বনাশা চর!

চরটার কথা ভাবিতে বসিয়া সুনীতি এক-এক সময় শিহরিয়া উঠেন। মনশ্চক্ষে তিনি যেন একটা নিষ্ঠুর চক্রান্তের ক্রূর চক্রবেগ চরখানাকে এই বাড়িটাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতে দেখিতে পান। এ আবর্ত হইতে সরিয়া যাইবার যেন পথ নাই। মহীকে বলি দিয়াও সরিয়া যাওয়া গেল না। প্রাণপণ শক্তিতে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেও সরিয়া যাওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে যেন চক্রান্তের চক্র-পরিধি বিস্তৃত হইয়া যায়, বাড়ির সংশ্লিষ্ট জনকে আবর্তে ফেলিয়া সেই নিমজ্জমান জনের সহিত বন্ধনসূত্রের আকর্ষণে আবার টানিয়া এ-বাড়িকে আবর্তের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। নবীনের মামলায় সেটা সুনীতি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন। দায়রার মামলায় তাঁহাকে পর্যন্ত টানিয়া প্রকাশ্য আদালতের সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইবে। অহীন্দ্রকেও সাক্ষ্য দিতে হইয়াছে। রামেশ্বরের অবস্থা সেই দিন হইতে অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, এখন তিনি প্রায় বদ্ধ পাগল। ভাবিতে ভাবিতে সুনীতি আর কূল-কিনারা দেখিতে পান না, তাঁহার অন্তরাত্মা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠে। ভবিষ্যতের একটা করাল ছায়া যেন ওই কল্পিত আবর্তের ভিতর হইতে সমুদ্রমন্থনের শেষ ফল গরল বাষ্পের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে থাকে। সে বিষবাষ্পের উগ্র তিক্ত গন্ধের আভাস যেন তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছেন।

জীবনে তাঁহার স্মৃতির ভাণ্ডার—অক্ষয় ভাণ্ডার, কোনটি ভুলিবার উপায় নাই।

আদালতের পিয়ন একেবারে অন্দরে দরজার মুখে আসিয়া সমন জারি করিয়া গেল। মানদা দারুণ ক্রোধে অগ্রসর হইয়া গিয়া সরকারী চাপরাসযুক্ত লোক দেখিয়া নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এত বড় মুখরার মুখেও কথা সরিল না। পিয়নটাই বলিল, দায়রা-মামলার সাক্ষী মানা হয়েছে সুনীতি দেবীকে। সাত দিন পরে আঠারই আষাঢ় দিন আছে। হাজির না হ'লে ওয়ারেণ্ট হবে।

লোকটা চলিয়া গেল। মানদা কয়েক মুহূর্ত পরেই আত্মসম্বরণ করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। তাহার অনুমান সত্য। বাড়ির ফটকের বাহিরে তখন লোকটি আরও দুইটি লোকের সহিত মিলিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের একজন যোগেশ মজুমদার, অপর জন শ্রীবাস। সে প্রতিহিংসাপরায়ণা সাপিনীর মতই প্রতিপক্ষকে দংশন করিবার জন্য অন্ধকার রাত্রের মত একটি সুযোগ কামনা করিতে করিতে ফিরিল।

সাক্ষীর সমন পাইয়া সুনীতি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা হইল দুর্যোগভরা অন্ধকার রাত্রে দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত। এ কি করিবেন তিনি? কেমন করিয়া প্রকাশ্য আদালতে শত চক্ষুর সম্মুখে তিনি দাঁড়াইবেন? আপন অদৃষ্টের উপরে তাঁহার ধিক্কার জন্মিয়া গেল। এ যে লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। দায়রা-আদালতের সমন অগ্রাহ্য করিলে ওয়ারেণ্ট হইবে; গ্রেপ্তার করিয়া হাজির করাই সেক্ষেত্রে বিধি। আদালতের পিয়নের কথা তাঁহার কানে যেন এখনও বাজিতেছে।

ছি ছি ছি! আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া তিনি ছি-ছি করিয়া সারা হইয়া গেলেন। ছিল, পথ ছিল—একমাত্র পথ। কিন্তু সেও তাঁহার পক্ষে রুদ্ধ। মরিয়া নিষ্কৃতি পাইবারও যে

উপায় তাঁহার নাই। অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ অসহায় স্বামীর কথা মনে করিয়া প্রতিদিন দেবতার সম্মুখে তাঁহাকে যে কামনা করিতে হয়, ঠাকুর, এ পোড়া অদৃষ্টে যেন বৈধব্যের বিধানই তুমি ক'রো। সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে কঙ্কণ নিয়ে মৃত্যুভাগ্য আমি চাই না, চাই না, চাই না। সে দুর্ভাগ্যের ভাগ্যই তাঁহার জীবনের যে একমাত্র কামনা।

মানদা ক্রোধে ক্রূর হইয়া ফিরিয়া আসিতেই তিনি দিশাহারার মত বলিলেন, আমি কি করব মানদা ?

মানদা উত্তর দিতে পারিল না। মর্মান্তিক দুঃখে, অসহ্য রাগে সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে সে চোখের জল মুছিয়া উপর দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, মাথার পরে তুমি বজ্রাঘাত কর। নির্ব্বংশ কর। তবেই বুঝব তোমার বিচার ; নইলে তুমি কানা—কানা—কানা।

সুনীতি এত দুঃখের মধ্যেও শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, ছি মা, আমার অদৃষ্ট। কেন পরকে মিথ্যে শাপ-শাপান্ত করছিস ?

মিথ্যে ? আমি তো আমার চোখের মাথা খাই নাই মা, মুখপোড়া ভগবানের মত। আমি যে নিজের চোখে দেখে এলাম !

কি ? কার কথা বলছিস ?

মজুমদার আর শ্রীবাস চাষা। দুজনে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল গো। এ যে তাদের কীর্তি গো।

মজুমদার ঠাকুরপো ! না না, এতখানি ছোট কি মানুষ হ'তে পারে ?

মানদা ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল, সে দুই হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, নাও, দু হাত তুলে আশীর্বাদ কর মজুমদারকে—কর। সে আবার অকস্মাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সুনীতি মূর্তিমতী হতাশার মত উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সর্বনাশা চর !

অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল, ওদিকে ঠাকুর-বাড়ির দরজায় কে যেন আঘাত করিয়া ইঙ্গিতে আগমনের সাড়া জানাইতেছে। কোন মেয়েছেলে নিশ্চয়। এদিকের দুয়ার দিয়া যাওয়া-আসার অধিকার কেবল মহিলাদেরই। তিনি বলিলেন, দেখ্ মা তো মানদা, কে ডাকছেন।

মানদাও শুনিয়াছিল, সে কিন্তু বেশ বুঝিয়াছিল, আসিয়াছেন রায়-বাড়ির কোন বধূ বা কন্যা। আজিকার এই ঘটনা লইয়া লজ্জা দিতে আসিয়াছেন। বলিল, ডাকবে আবার কে ? রায়গুষ্টির কেউ এসেছে। তোমাকে বলতে এসেছে, ছি ছি ছি ! তোমাকে আদালতে সাক্ষী মেনেছে ! কি ঘেন্নার কথা ! খুলব না আমি দরজা, চুপ ক'রে থাক তুমি।

উত্তেজনায় মানদা এমন জ্ঞান হারাইয়াছিল যে, সুনীতিকে সে বার কয়েক 'তুমি' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া ফেলিল।

সুনীতি বলিলেন, না, দরজা খুলে দেখ্, কে এসেছেন ! খবরদার, কোন কড়া কথা বলিস নে যেন।

গজগজ করিতে করিতে গিয়া দরজা খুলিয়াই মানদা বিস্ময়ে সম্ভ্রমে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। এই স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে তাহাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া ছোট রায়-বাড়ির গিন্নী হেমাঙ্গিনী,

সঙ্গে তাঁহার বারো-তেরো বৎসরের মেয়ে উমা।

মানদা প্রসন্ন হইতে পারিল না। সুনীতি কিন্তু পরম আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, দিদি! মনে মনে যেন আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম দিদি।

হেমাঙ্গিনী সুন্দর হাসি হাসিয়া বলিলেন, আমি কিন্তু কিছু জানতে পারি নি ভাই। দেবতা-টেবতা ব'লো না যেন। আজ আমি তোমার দাদার দূত হয়ে এসেছি। তিনিই পাঠালেন আমাকে।

সুনীতি ঈষৎ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, কেন দিদি?

বলছি। আরে উমা গেল কোথায়? উমা! উমা!

উমা ততক্ষণে বাড়ির এদিক ওদিক সব দেখিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কোথায় এক কোণ হইতে সে উত্তর দিল, কি?

হেমাঙ্গিনী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, করছিস কি? এখানে এসে ব'স।

উত্তর আসিল, আমি সব দেখছি।

সুনীতি হাসিয়া বলিলেন, অ-উমা-মা, এখানে এস না, তোমায় একবার দেখি।

উমা আসিয়া দরজায় দুই হাত রাখিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আমাকে ডাকছেন?

সুনীতি বলিলেন, বাঃ, উমা যে বড় চমৎকার দেখতে হয়েছে, অনেকটা বড় হয়ে গেছে এর মধ্যে! ওকে কলকাতায় আপনার বাপের বাড়িতে রেখেছেন, নয় দিদি?

হ্যাঁ ভাই, এখানকার শিক্ষা-দীক্ষার ওপর আমার মোটেই শ্রদ্ধা নেই। ছেলেকে অনেক দিন থেকেই সেখানে রেখেছি, মেয়েকেও পাঠিয়ে দিয়েছি এক বছরের ওপর। তারপর মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, উনি কিন্তু ভারী চঞ্চল আর ভারী আদুরে। সেখানে গিয়ে কেবল বাড়ি আসবার জন্যে ঝোঁক ধরেন। অমল কিন্তু আমার খুব ভাল ছেলে, সে এখানে আসতেই চায় না। বলে, ভাল লাগে না এখানে।

উমা ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তা লাগবে কেন তার? দিনরাত্রি সে কলকাতায় ঘুরছেই—ঘুরছেই। বন্ধু কত তার সেখানে। আর আমাকে একা মুখটি বন্ধ ক'রে থাকতে হয়। সে বুঝি কারও ভাল লাগে?

সুনীতি হাসিলেন, বলিলেন, আপনি ভারী কঠিন দিদি, এই সব ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন কেমন ক'রে? ছেলেকে অবশ্য পাঠাতেই হয়, কিন্তু এই দুধের মেয়ে, একেও পাঠিয়ে দিয়েছেন?

হেমাঙ্গিনী কোন উত্তর দিলেন না, শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মেয়েকে বলিলেন, যা তুই, দেখে আয়, এদের বাড়িটা ভারী সুন্দর, কিন্তু কাল দুপুরের মত বাইরে গিয়ে পড়িস নে যেন।

উমা চলিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী এতক্ষণে সুনীতিকে বলিলেন, জান সুনীতি, এই বাড়ির কথাই আমার মনে অহরহ জাগে। আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না, ঠাকুরজামাইয়ের এই অবস্থার কারণ, এ-বাড়ির এই দুর্দশার একমাত্র কারণ হ'ল রাধারাণী—ছোট রায়-বংশের

মেয়ে। এত বড় দাম্ভিক মুখরার বংশ আর আমি দেখি নি ভাই। আমার ছেলেমেয়ে, বিশেষ ক'রে মেয়েকে আমি এর হাত থেকে বাঁচাতে চাই। রাধারাণীর অদৃষ্টের কথা ভাবি আর আমি শিউরে উঠি।

সুনীতি চুপ করিয়া রহিলেন, হেমাঙ্গিনী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, তোমার দাদাই আমাকে পাঠালেন, তোমার কাছেই পাঠালেন।

সুনীতি ইন্দ্র রায়ের বক্তব্য শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, হেমাঙ্গিনী বলিলেন, দায়রা মামলায় মজুমদারের চক্রান্তে যে তোমাকে সাক্ষী মানা হয়েছে, সে তিনি শুনেছেন।

মুহূর্তে সুনীতি কাঁদিয়া ফেলিলেন, সে কান্নায় কোন আক্ষেপ ছিল না, শুধু দুইটি চোখের কোণ বাহিয়া দুইটি অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। হেমাঙ্গিনী সস্নেহে আপনার অঞ্চল দিয়া সুনীতির মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, কাঁদছ কেন? সেই কথাই তো তোমার দাদা ব'লে পাঠালেন তোমাকে, সুনীতি যেন ভয় না পায়, কোন লজ্জা-সঙ্কোচ না করে। রাজার দরবারে ডাক পড়েছে, যেতে হবে, কিসের লজ্জা এতে?

আবার সুনীতির চোখের জলে মুখ ভাসিয়া গেল, তিনি নিজেই এবার আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, কিন্তু ওঁকে কার কাছে রেখে যাব দিদি? সেই যে আমার সকলের চেয়ে বড় ভাবনা। তারপর আমিই বা কার সঙ্গে সদরে যাব?

হেমাঙ্গিনী চিন্তাকুল মুখে বলিলেন, প্রথম কথাটাই আমরা ভাবি নি সুনীতি। শেষটার জন্যে তো আটকাচ্ছে না। সে তোমার ছেলেকে আসতে লিখলেই হবে, অহীনই তোমার সঙ্গে যাবে। কিন্তু—

সুনীতি বলিলেন, আরও ভাবছি কি জানেন? ওঁর এই মাথার গোলমালের ওপর এই খবরটা কানে গেলে যে কি হবে, সেই আমার সকলের চেয়ে বড় ভাবনা। এই দাঙ্গার আগের দিন, মজুমদারঠাকুরপো ওই শ্রীবাস পালকে সঙ্গে ক'রে একেবারে বাড়ির মধ্যে চ'লে এলেন। আমি কি করব ভেবে না পেয়ে ছুটে গেলাম ওঁর কাছে। কথাটা ব'লেও ফেলেছিলাম। সেই শুনে কেমন যেন হয়ে গেলেন, বললেন, আমায় একটু জল দিতে পার সুনীতি? আমি বুঝলাম, বুঝে মাথা ধুয়ে দিলাম, বাতাস করলাম; কিন্তু তবুও সমস্ত রাত্রি ঘুমোলেন না। তাই ভাবছি, এই কথা কানে গেলে উনি কি তা সহ্য করতে পারবেন?

হেমাঙ্গিনী চুপ করিয়া রহিলেন, তিনি উপায় অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর বলিলেন, তুমি ব'লে রাখ এখন থেকে, তুমি ব্রত করেছ, তোমায় গঙ্গাস্নানে যেতে হবে। ঠাকুরজামাইয়ের সেবাযত্নের ভার আমার ওপর নিশ্চিন্ত হয়ে দিতে পারবে তো তুমি?

সুনীতি বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক হইয়া হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আবার অজস্র ধারায় তাঁহার চোখ বাহিয়া জল ঝরিতে আরম্ভ করিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, অহীনকে আসতে চিঠি লেখ। রাত্রে সে ওঁর কাছে থাকবে; আমি তা হ'লে এ-বাড়ি ও-বাড়ি দু বাড়িই দেখতে পারব। আর তোমার সঙ্গে আমার অমলকে পাঠিয়ে দেব। কেমন?

সুনীতির চোখে আর অশ্রুধারা-প্রবাহের বিরাম ছিল না। হেমাঙ্গিনী আবার তাঁহার চোখ-মুখ সযত্নে মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, কেঁদো না সুনীতি। আমিও যে আর চোখের জল ধ'রে রাখতে পারছি না। আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, উমা! উমা!

উমার সাড়া কিন্তু কোথাও মিলিল না। হেমাঙ্গিনী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, বংশের স্বভাব কখনও যায় না। মুখপুড়ী কলকাতা থেকে এসে এমন বেড়াতে ধরেছে! বলে, দেখব না, কলকাতায় এমন মাঠ আছে? আকাশে মেঘ উঠেছে, এখুনি বৃষ্টি নামবে—মেয়ের সে খেয়াল নেই।

সুনীতি ডাকিলেন, মানদা! উমা-মা কোথায় গেল রে? দেখ্ তো। মানদারও সাড়া পাওয়া গেল না, সুনীতি ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলেন দিবানিদ্রার পরম আরামে মানদার নাক ডাকিতেছে। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল, উপরে কোথায় যেন কলকণ্ঠে কেহ গান বা আবৃত্তি করিতেছে। হেমাঙ্গিনীও বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহারও কানে সুরটা প্রবেশ করিল, তিনি বলিলেন, ওই তো!

সুনীতি বলিলেন, ওঁর ঘরে।

সন্তর্পণে উভয়ে রামেশ্বরের ঘরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, উমা গভীর একাগ্রতার সহিত ছন্দলীলায়িত ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়া সুমধুর কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করিতেছে—

নয়নে আমার সজল মেঘের
　　নীল অঞ্জন লেগেছে
　　নয়নে লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি
　　বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
　　নীল অঞ্জন লেগেছে॥

সম্মুখে রামেশ্বর বিস্ফারিত বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে আবৃত্তিরতা স্বচ্ছন্দভঙ্গী উমার দিকে চাহিয়া আছেন। হেমাঙ্গিনী ও সুনীতি ঘরে প্রবেশ করিলেন; তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। বালিকার কলকণ্ঠের ঝঙ্কারে, নিপুণ আবৃত্তির শব্দার্থে সৃজিত রূপস্বপ্নে, কবিতার ছন্দের অন্তর্নিহিত সঙ্গীত-মাধুর্যে, একটি অপূর্ব আনন্দময় ভাবাবেশে ঘরখানি বর্ষার সজল মেঘময় আকাশতলের শ্যামলস্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন কৃষিক্ষেত্রের মত পরিপূর্ণ হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারাও নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্লোকে শ্লোকে আবৃত্তি করিয়া উমা শেষ শ্লোক আবৃত্তি করিল—

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
ঝরে ঘনধারা নব পল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লীর রবে,
তীর ছাপি' নদী কল-কল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচে রে॥

আবৃত্তি শেষ হইয়া গেল। ঘরের মধ্যে সেই আনন্দময় আবেশ তখনও যেন নীরবতার মধ্যে ছন্দে ছন্দে অনুভূত হইতেছিল। রামেশ্বর আপন মনেই বলিলেন, নাচে—নাচে—হৃদয় সত্যিই ময়ূরের মত নাচে!

হেমাঙ্গিনী এবার প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, ভাল আছেন চক্রবর্তী মশায়?

কে? স্বপ্নোত্থিতের মত রামেশ্বর বলিলেন, কে? তারপর ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন, রায়-গিন্নী! আসুন আসুন, কি ভাগ্য আমার!

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, ও রকম ক'রে বললে যে লজ্জা পাই চক্রবর্তী মশায়। আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। তারপর কন্যাকে বলিলেন, তুমি প্রণাম করেছ উমা? নিশ্চয় কর নি! তোমার পিসেমশায়।

সবিস্ময়ে রামেশ্বর প্রশ্ন করিলেন, আপনার মেয়ে?

হ্যাঁ।

সাক্ষাৎ সরস্বতী। আহা, 'ময়ূরের মত নাচে রে হৃদয় নাচে রে।' কি মধুর!

উমা এই ফাঁকে টুপ করিয়া রামেশ্বরের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া লইল। পায়ে স্পর্শ অনুভব করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া উমাকে প্রণাম করিতে দেখিয়া রামেশ্বর চমকিয়া উঠিলেন, আর্তস্বরে বলিলেন, না না, আমাকে প্রণাম করতে নেই। আমার হাতে—

হেমাঙ্গিনী বাধা দিয়া সকরুণ মিনতিতে বলিয়া উঠিলেন, চক্রবর্তী মশায়, না না।

রামেশ্বর স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, আকাশে মেঘ করেছে—দিক্‌হস্তীর মত কালো বিক্রমশালী জলভরা মেঘ। মহাকবি কালিদাসকে মনে প'ড়ে গেল। আপনার মনেই শ্লোক আবৃত্তি করছিলাম মেঘ-দূতের। এমন সময় আপনার মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল। আমার মনে হ'ল কি জানেন? মনে হ'ল চক্রবর্তী-বাড়ির লক্ষ্মী বুঝি চিরদিনের মত পরিত্যাগ ক'রে যাবার আগে আমাকে একবার দেখা দিতে এসেছেন। আমি আবৃত্তি বন্ধ করলাম। আপনার মেয়ে—কি নাম বললেন?

হেমাঙ্গিনী উত্তর দিবার পূর্বে উমাই উত্তর দিল, উমা দেবী।

উমা দেবী! হ্যাঁ, তুমি উমাও বটে, দেবীও বটে। উমা আমায় বললে, কিসের মন্ত্র বলছিলেন আপনি? আর একবার বলুন না। আমি বললাম, মন্ত্র নয়, শ্লোক, সংস্কৃত কবিতা। কবি কালিদাস মেঘদূতে বর্ষার বর্ণনা করেছেন, তাই আবৃত্তি করছিলাম। উমা আমায় বললে, আপনি বাংলা কবিতা জানেন না? কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি কি পুরস্কার পেয়েছেন! তাঁর খুব ভাল কবিতা আছে। আমি বললাম, তুমি জান? ও আমায় কবিতা শোনালে। বড় সুন্দর কবিতা, বড় সুন্দর কবিতা, বড় সুন্দর। বাংলায় এমন কাব্য রচিত হয়েছে! ভাগ্য, আমার ভাগ্য—পৃথিবীতে বঞ্চনাই আমার ভাগ্য। বাঃ, 'নীল অঞ্জন লেগেছে নয়নে লেগেছে'!

সকলেই স্তব্ধ হইয়া রহিল। উমা কিন্তু চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, কয়েক মুহূর্ত কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া সে বলিল, আপনি কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক আমায় শোনাবেন বলেছেন!

রামেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, তোমার মত সুন্দর ক'রে কি বলতে আমি পারব মা?

উমা হাসিয়া বলিল, ওটা আমি আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার জন্যে শিখেছিলাম কিনা। কিন্তু আপনিও তো খুব ভাল বলছিলেন, বলুন আপনি।

রামেশ্বর কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া লইয়া বলিলেন, বলি শোন—

তাং পার্বতীত্যাভিজনেন নাম্না বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব।
উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম॥
মহীভৃতঃ পুত্রবতোঽপি দৃষ্টিস্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্।
অনন্ত পুষ্পস্য মধোর্হি চুতে দ্বিরেফমালা সবিশেষসঙ্গা॥

এর মানে জান মা? পর্বতরাজ হিমালয়ের এক কন্যা হ'ল, গোত্র ও উপাধি অনুসারে আত্মীয়বর্গ, বন্ধুজনপ্রিয় সেই কন্যার নাম রেখেছিল পার্বতী। পরে হিমাদ্রি-গৃহিণী সেই কন্যাকে তপস্যাপরায়ণা দেখে বললেন, উমা! অর্থাৎ—বৎসে, ক'রো না, তপস্যা ক'রো না। সেই থেকে সুমুখী কন্যার নাম হ'ল উমা। তারপর কবি বলছেন, পর্বতরাজের পুত্র-কন্যা আরও অনেকেই ছিল, কিন্তু বসন্তকালে অসংখ্যবিধ পুষ্পের মধ্যে ভ্রমর যেমন সহকারপুষ্পেই অনুরক্ত হয়, তেমনি পর্বতরাজের চোখ দুটি উমার মুখের পরেই আকৃষ্ট হ'ত বেশি, সেইখানেই ছিল যেন পূর্ণ পরিতৃপ্তি। তুমি আমাদের সেই উমা। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, তুমি প্রচুর বিদ্যাবতী হবে। আজ যা তুমি শোনালে—আহা! সেই উমারই মত বিদ্যা তোমার আপনি আয়ত্ত হবে।

তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ॥

হেমাঙ্গিনী ও সুনীতির চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। এই এক মানুষ, আবার এই মানুষই ক্ষণপরে এমন অসহায় আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িবেন, নিজের প্রতি নিজেরই অহেতুক ঘৃণায় এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করিবেন যে, অন্যের ইচ্ছা হইবে আত্মহত্যা করিতে।

উমা বলিল, আমায় সংস্কৃত কবিতা শেখাবেন আপনি? এখানে যে কদিন আছি আমি রোজ আপনার কাছে আসব.?

আসবে ? তুমি আসবে মা ?

হ্যাঁ। কিন্তু এমন ক'রে ঘরের মধ্যে দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে থাকেন কেন আপনি ? ওগুলো খুলে দিতে হবে কিন্তু।

মুহূর্তে রামেশ্বরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন, বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, রায়-গিন্নী, আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে না ?

১৬

সেই বন্দোবস্তই হইল।

অহীন্দ্র কলেজ কামাই করিয়াই আসিল। সুনীতি অহীন্দ্রকে লইয়া একটু শঙ্কিত ছিলেন। রামেশ্বরের সন্তান, মহীর ভাই সে। অহীন্দ্র কিন্তু হাসিয়া বলিল, এর জন্যে তুমি এমন লজ্জা পাচ্ছ কেন মা ? এ-সংসারে সত্যকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করা প্রত্যেক মানুষের ধর্ম, এতে রাজা-প্রজা নেই, ধনী-দরিদ্র নেই। বিচারক মানুষ হ'লেও তিনি তখন বিধাতার আসনে ব'সে থাকেন।

সুনীতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, শুধু তাই নয়, বুকে যেন তিনি বল পাইলেন ; সঙ্গে সঙ্গে বুকখানি পুত্রগৌরবেও ভরিয়া উঠিল। তিনি ছেলের মাথায় চুলগুলির ভিতর আঙুল চালাইতে চালাইতে বলিলেন, মুখহাত ধুয়ে ফেল্ বাবা, আমি দুখানা গরম নিমকি ভেজে দিই। ময়দা আমার মাখাই আছে।

মানদা নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল, সে এবার বলিয়া উঠিল, আপনি ভালই বললেন দাদাবাবু ; কিন্তু আমার মন ঠাণ্ডা হ'ল না। বড় দাদাবাবু হ'লে—। অকস্মাৎ ক্রোধে সে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিয়া উঠিল, বড়দাদাবাবু হ'লে ওই মজুমদার আর শ্রীবাসের মুণ্ডু দুটো নখে ক'রে ছিঁড়ে নিয়ে আসতেন।

সুনীতি শঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া গেলেন ; অহীন্দ্র কিন্তু মৃদু হাসিল, বলিল, আমিও নিয়ে আসতাম রে মানদা, যদি মুণ্ডু দুটো আবার জোড়া দিতে পারতাম। না হ'লে ওরা বুঝবে কি ক'রে যে, আমাদের মুণ্ডু ছিঁড়ে নিয়েছিল, আর এমন কাজ করব না !

সুনীতির চোখে এবার জল আসিল, অহীন্দ্র তাঁহার মর্মকে বুঝিয়াছে, সংসারে দুঃখ কি কাহাকেও দিতে আছে ? আহা, মানুষের মুখ দেখিয়া মায়া হয় না ?

মানদা কি উত্তর দিতে গেল, কিন্তু বাহিরে কাহার জুতার দ্রুত শব্দে সে নিরস্ত হইয়া দুয়ারের দিকে চাহিয়া রহিল। একলা মানদাই নয়, সুনীতি অহীন্দ্র সকলেই। পরমুহূর্তেই ষোল-সতেরো বৎসরের কিশোর একটি ছেলে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। স্নিগ্ধ গৌর দেহবর্ণ, পেশীসবল দেহ—সর্বাঙ্গে সর্বপরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন তারুণ্যের একটি উজ্জ্বল লাবণ্য যেন ঝলমল করিতেছে।

সুনীতি সাগ্রহে আহ্বান করিয়া বলিলেন, অমল ! এস, এস।

সুনীতির কথা শেষ হইবার পূর্বেই অমল অহীন্দ্রের হাত দুইটি ধরিয়া বলিল, অহীন ?

অহীন্দ্র স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ অহীন। তুমি অমল ?

অমল বলিল, উঃ, কত দিন পরে দেখা বল তো ? সেই ছেলেবেলায় পাঠশালায়। কতদিন যে আমি তোমাকে চিঠি লিখব ভেবেছি! কিন্তু ইংলণ্ডের রাজা আর ফ্রান্সের রাজায় যুদ্ধ হ'ল, ফলে দুটো দেশের দেশবাসীরা অকারণে পরস্পরের শত্রু হতে বাধ্য হ'ল।—বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

অহীন্দ্রও হাসিয়া বলিল, ইউ টক ভেরী নাইস!

অমল বলিল, ইউ লুক ভেরী নাইস। ব্রাইট ব্লেড অব এ শার্প সোর্ড—কাব্যের ভাষায়, খাপখোলা সোজা তলোয়ার।

সুনীতি বিমুগ্ধদৃষ্টিতে দুইটি কিশোরের মিতালির লীলা দেখিতে ছিলেন। তিনি এইবার মানদাকে বলিলেন, মানদা, দে তো মা, একখানা ছোট সতরঞ্চি পেতে। ব'স বাবা তোমরা, আমি নিমকি ভাজব, খাবে দুজনে তোমরা। উমাকে আনলে না কেন বাবা অমল!

অমল বলিল, তার কথা আর বলবেন না পিসীমা। অকস্মাৎ সে কাব্য নিয়ে, যাকে বলে ভয়ানক মেতে ওঠা, সেই ভয়ানক মেতে উঠেছে। অনবরত রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ করছে, আবৃত্তি করছে। আমায় তো জ্বালাতন ক'রে খেলে!

সুনীতির সেই দিনের ছবি মনে পড়িয়া গেল। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, আহা, তাঁহার যদি এমনি একটি কন্যা থাকিত, তবে এমনি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিত।

অমল বলিল, এই দেখুন পিসীমা, কাল তো আপনাকে নিয়ে আমি যাচ্ছি সদরে, কিন্তু ফিরে এলেই যে অহীন পালাবে, সে হবে না।

অহীন হাসিয়া বলিল, আমার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস কামাই হবে বলে ভাবনা কিনা—

অমল বলিল, তুমি বুঝি সায়েন্স স্টুডেণ্ট ? আই সী!

সুনীতি কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। আদালতটা লোকে গিসগিস করিতেছিল। অমল তাঁহার কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, ভয় কি পিসীমা, কোন ভয় করবেন না। পরমুহূর্তে সে আত্মগতভাবে বলিয়া উঠিল, এ কি, বাবা এসে গেছেন দেখছি!

সুনীতি দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলেন, ঘর্মাক্ত-পরিচ্ছদ, রুক্ষচুল, শুষ্কমুখ, অস্নাত, অভুক্ত ইন্দ্র রায় আদালতে প্রবেশ করিতেছেন, সঙ্গে একজন উকিল। উকিলটি আসিয়াই জজের কাছে প্রার্থনা করিল, মহামান্য বিচারকের দৃষ্টি আমি একটি বিশেষ বিষয়ে আকৃষ্ট করতে চাই। আদালতের সাক্ষীর কাঠগড়ায় এই যে সাক্ষী—ইনি এই জেলায় একটি সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বংশের বধূ। উভয় পক্ষের উকিলবৃন্দ যেন তাঁর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও জেরা করেন। মহামান্য বিচারক সে ইঙ্গিত তাঁদের দিলে সাক্ষী এবং আমরা—শুধু আমরা কেন, সর্বসাধারণই চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ইন্দ্র রায় সুনীতির কাঠগড়ার নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমার কোন ভয় নাই বোন, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তোমার পেছনে।

সাক্ষ্য অল্পেই শেষ হইয়া গেল; বিচারক সুনীতির মুখের দিকে চাহিয়াই উকিলের আবেদনের সত্যতা বুঝিয়াছিলেন, তিনি অতি প্রয়োজনীয় দুই চারিটা প্রশ্ন ব্যতীত সকল প্রশ্নই অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন। কাঠগড়া হইতে নামিয়া সুনীতি সেই প্রকাশ্য বিচারালয়ে সহস্র চক্ষুর সম্মুখে পায়ে হাত দিয়া ধূলা লইয়া ইন্দ্র রায়কে প্রণাম করিলেন। রায় রুদ্ধস্বরে বলিলেন, ওঠ বোন, ওঠ। তারপর অমলকে বলিলেন, অমল, নিয়ে এস পিসীমাকে। একটা গাড়ির ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি, দেখি আমি সেটা।

দেখিবার কিন্তু প্রয়োজন ছিল না। রায়ের কর্মচারী মিত্তির গাড়ি লইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল। সুনীতি ও অমলকে গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া রায় অমলকে বলিলেন, তুমি পিসীমাকে নিয়ে বাড়ি চ'লে যাও। আমার কাজ রয়েছে সদরে, সেটা সেরে কাল আমি ফিরব।

সুনীতি লজ্জা করিলেন না, তিনি অসঙ্কোচে রায়ের সম্মুখে অর্ধ-অবগুণ্ঠিত মুখে বলিলেন, আমার অপরাধ কি ক্ষমা করা যায় না দাদা?

রায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, পৃথিবীতে সকল অপরাধই ক্ষমা করা যায় বোন, কিন্তু লজ্জা কোনরকমেই ভোলা যায় না।

•

পরামর্শ অনুযায়ী অতি যত্নে সংবাদটি রামেশ্বরের নিকটে গোপন রাখা হইয়াছিল। রচিত মিথ্যা কথাটি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন হেমাঙ্গিনী। তিনি বলিয়াছিলেন, সুনীতি একটা ব্রত করছে, একবার গঙ্গাস্নানে যেতে হয়, কিন্তু আপনাকে রেখে কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না। আমি বলছি যে, আমি আপনার সেবাযত্নের ভার নেব; ব্রত কি কখনও নষ্ট করে! আপনি ওকে বলুন চক্রবর্তী মশায়।

রামেশ্বর উত্তর দিয়াছিলেন, না না না। রায়-গিন্নী ঠিক বলেছেন সুনীতি, ব্রত কি কখনও পণ্ড করে! আমি বেশ থাকব।

সন্ধ্যায় সুনীতি অমলের সঙ্গে রওনা হইয়া গেলেন। রাত্রির খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা সুনীতি নিজেই করিয়া গিয়াছিলেন। অহীন্দ্র রামেশ্বরের কাছে রহিল। পরদিন হেমাঙ্গিনী সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন, দ্বিপ্রহরে খাবারের থালাখানি আনিয়া আসনের সম্মুখে নামাইয়া দিতেই রামেশ্বর স্মিতমুখে বলিলেন, সুনীতির ব্রত সার্থক হোক রায়-গিন্নী, তার গঙ্গাস্নানের পুণ্যেই বোধ করি আপনার হাতের অমৃত আজ আমার ভাগ্যে জুটল।

হেমাঙ্গিনী সকরুণ হাসি হাসিলেন। সত্যই সেকালে রামেশ্বর হেমাঙ্গিনীর হাতের রান্নার বড় তারিফ করিতেন। আজ রাধারাণী গিয়াছে বাইশ-তেইশ বৎসর—এই বাইশ-তেইশ বৎসর পরে আজ আবার তিনি রামেশ্বরকে রাঁধিয়া খাওয়াইলেন! খাওয়া হইয়া গেলে হেমাঙ্গিনী বাসন কয়খানি উঠাইয়া লইবার উপক্রম করিতেই রামেশ্বর হাত জোড় করিয়া বলিলেন, না না

রায়গিন্নী, না।

অহীন্দ্র বলিল, আমি মানদাকে ডেকে দিচ্ছি।

মানদা উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি লইয়া গেলে হেমাঙ্গিনী বলিলেন, তা হ'লে এইবার আমি যাই চক্রবর্তী মশায়।

রামেশ্বর সকরুণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, চ'লেই তো গিয়েছিলেন রায়গিন্নী, এ বাড়িতে আর যে কখনও পায়ের ধুলো দেবেন, এ স্বপ্নেও ভাবি নি। আবার যখন দয়া ক'রে এসেছেনই, তবে 'যাই' ব'লে যাচ্ছেন কেন, বলুন 'আসি'। যদি আর নাও আসেন, তবু আশা করতে পারব, আসবেন—রায়গিন্নী একদিন না একদিন আসবেন।

কথাটা নিছক কৌতুক বলিয়া লঘু করিয়া লইবার অভিপ্রায়েই রায়গিন্নী বলিলেন, আপনার সঙ্গে মেয়েলি কথাতে কেউ পারবে না চক্রবর্তী মশায়। আচ্ছা তাই-ই বলছি, আসি। কেমন, হ'ল তো? তারপর তিনি অহীন্দ্রকে বলিলেন, তুমি এইবার আমার সঙ্গে এস বাবা অহীন, খেয়ে আসবে।

উভয়ে নীচে আসিয়া দেখিলেন, উমা মানদার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, চিনিস অহীনদাকে?

উমা বলিল, হ্যাঁ। অহীনদা যে ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেয়েছেন।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, সেইজন্যে চেন আমাকে? কিন্তু সে তো কপালে লেখা থাকে না?

মৃদু হাসিয়া উমা বলিল, থাকে।

বল কি?

হ্যাঁ। সায়েবদের মত যে ফরসা রং আপনার; দেখলেই ঠিক চেনা যাবে যে, এই স্কলারশিপ পেয়েছে। সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অহীন্দ্র এই প্রগল্‌ভা বালিকাটির কথায় লজ্জিত না হইয়া পারিল না। হেমাঙ্গিনী খাবারের থালা নামাইয়া দিয়া বলিলেন, ওর সঙ্গে কথায় তুমি পারবে না বাবা, তুমি খেতে ব'স। ও ওদের বংশের—। কথাটা বলিতে গিয়াও তিনি নীরব হইয়া গেলেন।

উমা বসিয়া থাকিতে থাকিতে স্নুট করিয়া উঠিয়া একেবারে রামেশ্বরের দরজাটি খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার এই আকস্মিক আবির্ভাবে রামেশ্বর পুলকিত হইয়া উঠিলেন, আপনার বিকৃতমস্তিষ্ক-প্রসূত রোগকল্পনার কথাও সে আকস্মিকতায় ভুলিয়া গেলেন তিনি, বলিলেন, উমা? এস এস মা, এস।

উমা আসিয়া পরমাত্মীয়ের মত কাছে বসিয়া বলিল, বলুন, সংস্কৃত কবিতা বলুন।

রামেশ্বর অল্প হাসিয়া বলিলেন, তুমি বল মা বাংলা কবিতা, আমি শুনি। সেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা একটি বল তো। তোমার মুখে, আহা, বড় সুন্দর লাগে। জান মা, মধুরভাষিণী গিরিরাজতনয়া যখন অমৃতস্রাবী কণ্ঠে কথা বলতেন, তখন কোকিলদের কণ্ঠস্বরও বিষমবিদ্ধা বীণার কর্কশধ্বনি ব'লেই মনে হ'ত।

স্মরেণ তস্যামমৃতস্রুতেব প্রজল্পিতায়ামভিজাতবাচি।
অপ্যন্যপুষ্টা প্রতিকূলশব্দা শ্রোতুর্বিতন্ত্রীরিব তাড্যমানা।

তার চেয়ে তুমি বল, আমি শুনি।

উমাকে আর অনুরোধ করিতে হইল না, সে আজ কয়েক দিন ধরিয়া এই কারণেই শেখা কবিতাগুলি নূতন করিয়া অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছে।

রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া ;
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎ-বাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।

*　　*　　*

ভৈরব তুমি কি বেশে এসেছ,
ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী ;
রুদ্রবীণায় এই কি বাজিল
সু-প্রভাতের রাগিণী ?
মুগ্ধ কোকিল কই ডাকে ডালে,
কই ফোটে ফুল বনের আড়ালে ?
বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
অমানিশা গেল কাটিয়া
তোমার খড়্গ আঁধার-মহিষে
দুখানা করিল কাটিয়া।

রামেশ্বর বিস্ফারিত নেত্রে উমার মুখের দিকে চাহিয়া শুনিতেছিলেন। আবৃত্তি শেষ করিয়া উমা বলিল, কেমন লাগল, বলুন ?

রামেশ্বর আবেশে তখন যেন আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, তবু অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, অপূর্ব অপূর্ব ! 'তোমার খড়্গ আঁধার-মহিষে দুখানা করিল কাটিয়া' !—তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

উমা বলিল, আমি তবু বেশী জানি না, দু-চারটে শিখেছি কেবল। আমার দাদা খুব জানেন। রবীন্দ্রনাথ একেবারে কণ্ঠস্থ। আর ভারী সুন্দর আবৃত্তি করেন। আপনি তাঁকে দেখেন নি, না ?

না, সে তো আসে নি, কেমন ক'রে দেখব, বল ?

দাঁড়ান, আসুন ফিরে পিসীমাকে নিয়ে। আমার পিসীমা কে জানেন তো ?

তোমার পিসীমা ! তুমি তো ইন্দ্রের মেয়ে। তোমার পিসীমা ?

হ্যাঁ। অহিদার মা-ই যে আমার পিসীমা, হন তো পিসীমা, আমরা বলি !

ও ঠিক ঠিক, আমার মনে ছিল না।

আমার দাদাই তো তাঁকে নিয়ে সদরে গেছেন। আচ্ছা, পিসীমাকে কেন সাক্ষী মানলে, বলুন তো? কে কোথায় চরের ওপর দাঙ্গা করলে, উনি তার কি করবেন? ওই যে কে মজুমদার আছে, সে-ই খুব শয়তান লোক—ও-ই এ সব করছে। এ কি, আপনি এমন করছেন কেন? পিসেমশায়! পিসেমশায়!

রামেশ্বরের দৃষ্টি তখন বিস্ফারিত, সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কম্পমান, দুই হাতের মুঠি দিয়া খাটের মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন, একটু জল দিতে পার মা—একটু জল?

পরক্ষণেই তিনি দারুণ ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন। উমা ব্যস্ত বিব্রত হইয়া বারান্দায় ছুটিয়া গিয়া ডাকিল, মা! ও মা! পিসেমশায় যে পড়ে গেলেন মেঝের ওপর। অহিদা!

জ্ঞান হইলে রামেশ্বর হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে তিরস্কার-ভরা দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আপনি আমায় মিথ্যে কথা বললেন রায়-গিন্নী?

হেমাঙ্গিনী কথাটা বুঝিতে পারিলেন না, রামেশ্বর নিজেই বলিলেন, মজুমদার সুনীতিকে দায়রা-আদালতের কাঠগড়াতে দাঁড় করালে শেষ পর্যন্ত!

হেমাঙ্গিনী চমকিয়া উঠিলেন। তবু তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, না, কে বললে আপনাকে?

রামেশ্বর উমার দিকে চাহিলেন, উমার মুখ বিবর্ণ, পাংশু। তিনি চোখ দুইটি বন্ধ করিয়া যেন ভাবিয়া লইয়াই বলিলেন, এই দিকে নীচে কাছারির বারান্দায় কে বলছিল, আমি শুনলাম।

হেমাঙ্গিনী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অহীন্দ্র পাখা দিয়া বাপের মাথায় বাতাস দিতেছিল, রামেশ্বর অকস্মাৎ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, দেখ তো অহি, আমার বন্দুকটা ঠিক আছে কিনা, দেখ তো।

অহীন্দ্র নীরবে বাতাস করিয়াই চলিল। রামেশ্বর আবার বলিলেন, দেখ অহি, দেখ।

অহীন্দ্র মৃদুস্বরে বলিল, বন্দুক তো নেই।

কি হ'ল? অকস্মাৎ যেন তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, মহী, মহী—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। জান তুমি অহি; মহী দ্বীপান্তর থেকে কবে ফিরবে, জান?

হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিয়া বলিলেন, একটু ঘুমোন দেখি আপনি। যা তো উমা, বাক্স থেকে ওডিকোলনের শিশিটা নিয়ে আয় তো।

শুশ্রূষায় রামেশ্বর শান্ত হইয়া ঘুমাইলেন। যখন উঠিলেন, তখন সুনীতি ফিরিয়াছেন।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রামেশ্বর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুনীতির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, তুমি রাধারাণী, না সুনীতি?

ঝরঝর-ধারায় চোখের জলে সুনীতির মুখ ভাসিয়া গেল। রামেশ্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তুমি সুনীতি, তুমি সুনীতি। সে এমন কাঁদত না, কাঁদতে সে জানত না।

অকস্মাৎ আবার বলিলেন, শোন শোন—খুব চুপি চুপি। জজ সাহেব কি আমার খোঁজ

করছিলেন ? আমাকে কি ধ'রে নিয়ে যাবেন ?

সুনীতি কোন সান্ত্বনা দিলেন না, কথার কোন প্রতিবাদ পর্যন্ত করিলেন না, নীরবে জানালাটা খুলিয়া দিলেন।

আব্ছা অন্ধকারের মধ্যেও চরটা দেখা যায়। যাইবেই তো, চক্রান্তের চক্রবেগে সেটা এই বাড়িকেই বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে।

১৭

মামলার রায় বাহির হইল আরও আট মাস পর। দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া মকদ্দমা। দায়রা-আদালতের বিচারে দাঙ্গা ও নরহত্যার অপরাধে নবীন বাগদী ও তাহার সহচর দুইজন বাগ্দীর কঠিন সাজা হইয়া গেল। নবীনের প্রতি শাস্তিবিধান হইল ছয় বৎসর দ্বীপান্তর বাসের; আর তাহার সহচর দুইজনের প্রতি হইল দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাবাসের আদেশ। দায়রা মকদ্দমা; সাক্ষীর সংখ্যা একশতেরও অধিক; তাহাদের বিবৃতি, জেরা এবং এই দীর্ঘ বিবৃতি ও জেরা বিশ্লেষণ করিয়া উভয় পক্ষের উকিলের সওয়াল-জবাব শেষ হইতে দীর্ঘদিন লাগিয়া গেল। দাঙ্গা ঘটিবার দিন হইতে প্রায় দুই বৎসর।

রায় বাহির হইবার দিন গ্রামের অনেক লোকই সদরে গিয়া হাজির হইল। নবীন বাগ্দীর সংসারে উপযুক্ত পুরুষ কেহ ছিল না। তাহার উপযুক্ত পুত্র মারা গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে এক নাবালক পৌত্র, পুত্রবধূ ও তাহার স্ত্রী মতি বাগদিনী। মতি নিজেই সেদিন পৌত্রকে কোলে করিয়া সদরে গিয়া হাজির হইল। রংলাল কিন্তু যাইতে পারিল না; অনেক দিন হইতেই সে গ্রামের বাহির হওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। অতি প্রয়োজনে বাহির যখন হয়, তখন সে মাথা হেঁট করিয়াই চলে; সদর-রাস্তা ছাড়িয়া জনবিরল পথ বাছিয়া চলে। আজ সে বাড়ির ভিতর দাওয়ার উপর গুম হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার স্ত্রী বলিল, হ্যাঁ গো, বলি সকালবেলা থেকে বসলে যে ? আলুগুলো তুলে না ফেললে আর তুলবে কবে ? কোন্ দিন জল হবে, হ'লে আলু আর একটিও থাকবে না, সব প'চে যাবে।

রংলাল বলিল, হুঁ।

হুঁ তো বলছ, কিন্তু হইলে যে সেই ব'সেই রাজা-রুজিরের মত !—বলিয়া রংলালের স্ত্রী ঈষৎ না হাসিয়া পারিল না।

অকস্মাৎ রংলাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, ভগমান ! এত নোক মরছে, আমার মরণ হয় না কেনে, বল দেখি ? সংসারের কচকচি আর আমি সইতে লারছি।—বলিতে বলিতে সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার স্ত্রী অবাক হইয়া গেল, সে কি যে বলিবে, খুঁজিয়া পর্যন্ত পাইল না; বুঝিতেও সে পারিল না, অকস্মাৎ সংসার কোন্ যন্ত্রণায় এমন করিয়া রংলালকে অধীর করিয়া তুলিল। দুঃখে অভিমানে তাহারও চোখ ফাটিয়া জল

আসিতেছিল।

রংলাল কপালের রগ দুইটা আঙুল দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, মাথা আমার খ'সে গেল। আমি আজ খাব না কিছু।—বলিয়া সে ঘরে গিয়া উপুড় হইয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িল।

আরও একজন অধীর উৎকণ্ঠার উদ্বেগে ও অসহ মনঃপীড়ায় পীড়িত হইতেছিলেন। অতি কোমল হৃদয়ের স্বভাবধর্ম,—অতি-মমতায়, সুনীতি এখন হইতেই নবীন ও তাহার সহচর কয়-জনের জন্য গভীর বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। উৎকণ্ঠার উদ্বেগে তাঁহার দেহমন যেন সকল শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। উনানে একটা তরকারী চড়াইয়া সুনীতি ভাবিতেছিলেন ওই কথাই। সোরগোল তুলিয়া মানদা আসিয়া বলিল, পোড়া পোড়া গন্ধ উঠছে যে গো! আপনি ব'সে এইখানে, আর তরকারী পুড়ছে! আমি বলি, মা বুঝি ওপরে গিয়েছেন! নামান, নামান, নামান।

এতক্ষণে সচকিত হইয়া সুনীতি গন্ধের কটুত্ব অনুভব করিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। চারিপাশে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, ওই যা, সাঁড়াশিটা আবার আনি নি। আন তো মা মানদা।

মানদা অল্প বিরক্ত হইয়াই বলিল, ওই যে সাঁড়াশি—ওই যে গো বাঁ হাতের নীচেই যে গো।

সুনীতি এবার দেখিতে পাইলেন, সাঁড়াশিটার উপরেই বাঁ হাত রাখিয়া তিনি বসিয়া আছেন। তাড়াতাড়ি তিনি কড়াটা নামাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু হাতেও যেন কেমন সহজ শক্তি নাই, হাতখানা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মানদার সতর্ক দৃষ্টিতে সেটুকু এড়াইয়া গেল না. সে এবার উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিল, কর্তাবাবু আজ কেমন আছেন মা?

ম্লান হাসিয়া সুনীতি বলিলেন, তেমনিই আছেন।

বাড়ে নাই তো কিছু, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

না। কদিন থেকে বরং একটু শান্ত হয়েই আছেন।

তবে?—মানদা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল।

সুনীতিও এবার বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, কি রে? কি বলছিস তুই?

মানদা বলিল, এমন মাটির পিতিমের মত ব'সে রয়েছেন যে?

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুনীতি বলিলেন, নবীনদের মামলার আজ রায় বেরুবে মানদা। কি হবে বল্ তো ওদের? যদি সাজা হয়ে যায়—! আর তিনি বলিতে পারিলেন না, তাঁহার রক্তাভ পাতলা ঠোঁট দুইটি বিবর্ণ হইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল, কোমল দৃষ্টিতে চোখ দুইটি জলে ভাসিয়া বেদনার যুগ্ম-সায়রের মত টলমল করিয়া উঠিল।

মানদাও একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, সে আর আপনি-আমি কি করব, বলুন? মানুষের আপন আপন অদেষ্ট; অদেষ্টর লেখন কি কেউ মুছতে পারে মা?

অসহায় মানুষের মামুলী সান্ত্বনা ছাড়া আর মানদা খুঁজিয়া কিছু পাইল না; কিন্তু সুনীতির হৃদয়ের পরম অকৃত্রিম মমতা চিরদিনের মতই আজও তাহাতে প্রবোধ মানিল না। জলভরা চোখে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তিনি বলিলেন, মানুষ ম'রে যায়, বুঝতে পারি মানদা—তাতে মানুষের হাত নেই। কিন্তু এ কি দুঃখ বল্ তো? এক টুকরো জমির জন্যে মানুষ মানুষকে খুন ক'রে ফেললে, আর তারই জন্যে, যে খুন করলে তাকে রেখে দেবে খাঁচায় পুরে জানোয়ারের মত, কিংবা হয়তো গলায় ফাঁসি লটকে—! কথা আর শেষ হইল না, চোখের জলের সমুদ্র সর্বহৃদয়ব্যাপী প্রগাঢ় বেদনার অমাবস্যা-স্পর্শে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—হু হু করিয়া চোখের জল ঝরিয়া মুখ-বুক ভাসাইয়া দিল।

মানদার চোখও শুষ্ক রহিল না, তাহারও চোখের কোণ ভিজিয়া উঠিল; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, সে আক্রোশভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুমি ভেবো না মা, ভগবান এর বিচার করবেনই। ঘরে আগুন লাগবে, নির্ব্বংশ হবে—

বাধা দিয়া সুনীতি বলিলেন, না না মানদা, শাপ-শাপান্ত করিস নে মা। কত বার তোকে বারণ করেছি, বল্ তো?

মানদা এবার সুনীতির উপরই রুষ্ট হইয়া উঠিল; সুনীতির এই কোমলতা সে কোনমতেই সহ্য করিতে পারে না। ক্রোধ নাই, আক্রোশ নাই, এ কি ধারার মানুষ! সে রুষ্ট হইয়াই সে স্থান হইতে অন্যত্র সরিয়া গেল।

সুনীতি বেদনাহত অন্তরেই আবার রান্নার কাজে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রামেশ্বরের স্নান-আহারের সময় হইয়া আসিয়াছে। সেই ঘটনার পর হইতে রামেশ্বর আরও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন; পূর্বে আপন মনেই অন্ধকার ঘরে কাব্য আবৃত্তি করিতেন, ঘরের মধ্যে পায়চারিও করিতেন, কিন্তু এখন অধিকাংশ সময়ই স্তব্ধ হইয়া ওই খাটখানির উপর বসিয়া থাকেন, আর প্রদীপের আলোয় হাতের আঙুলগুলি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখেন। কখনও কখনও সুনীতির সহিত কথার আনন্দের মধ্যে খাট হইতে নামিতে চাহেন, সুনীতি হাত ধরিয়া নামিতে সাহায্য করেন। অন্ধকারে রাত্রে জানালার ধারে দাঁড়াইয়া অতি সন্তর্পণে মুক্ত পৃথিবীর সহিত অতি গোপন এবং ক্ষীণ একটি যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন। আপনার দুর্ভাগ্যের কথা মনে করিয়া সুনীতি ম্লান হাসি হাসেন, তখন চোখে তাঁহার জল আসে না।

পিতলের ছোট একটি হাঁড়িতে মুঠাখানেক সুগন্ধি চাল চড়াইয়া দিয়া স্বামীর স্নানের উদ্যোগ করিতে সুনীতি উঠিয়া পড়িলেন। এই বিশেষ চালটি ছাড়া অন্য চাল রামেশ্বর খাইতে পারেন না।

অপরাহ্নের দিকে সুনীতির মনের উদ্বেগ ক্রমশ যেন বাড়িয়াই চলিয়াছিল; সংবাদ পাইবার জন্য তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। অন্য দিন খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি স্বামীর নিকট বসিয়া গল্পগুজবে তাঁহার অস্বাভাবিক জীবনের মধ্যে সাময়িকভাবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন; কোন কোন দিন রামায়ণ বা মহাভারত পড়িয়া শুনাইয়া থাকেন।

আজ কিন্তু আর সেখানেও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। আজ তিনি বই লইয়াই বসিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠের মধ্যে পাঠকের অন্তরে যে তন্ময়যোগ থাকিলে শ্রোতার অন্তরকেও তন্ময়তায় বিভোর করিয়া আকর্ষণ করা যায়, আপন অন্তরের সেই তন্ময়যোগটি তিনি আজ আর কোনমতেই স্থাপন করিতে পারিলেন না।

একটা ছেদের মুখে আসিয়া সুনীতি থামিতেই রামেশ্বর বলিলেন, তুমি যদি সংস্কৃতটা শিখতে সুনীতি, তোমার মুখে মূল মহাকাব্য শুনতে পেতাম। অনুবাদ কিনা, এতে কাব্যের আনন্দটা পাওয়া যায় না।

সুনীতি অপরাধিনীর মত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আজ তা হ'লে এই পর্যন্তই থাক।

রামেশ্বর অভ্যাসমত মৃদুস্বরে বলিলেন, থাক। তারপর মাটির পুতুলের মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। সুনীতি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। রামেশ্বর সহসা বলিলেন, অহীন—অহীন কোথায় পড়ে, বল তো ?

বহরমপুর মুরশিদাবাদে। এই যে কাল তুমি মুরশিদাবাদের গল্প করলে, বললে, অহীন খুব ভাল জায়গায় আছে; আমাদের দেশের ইতিহাস মুরশিদাবাদ না দেখলে জানাই হয় না!

হ্যাঁ হ্যাঁ। রামেশ্বরের এবার মনে পড়িয়া গেল। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ। জান সুনীতি, এই—

বল।

এই, মানুষের সকলের চেয়ে বড় অপরাধ হ'ল মানুষকে হত্যা করার অপরাধ। ও অপরাধ কখনও ভগবান ক্ষমা করবেন না। মুরশিদাবাদের চারিদিকে সেই অপরাধের চিহ্ন। আর সেই হ'ল তার পতনের কারণ। উঃ ফৈজীকে নবাব দেওয়াল গেঁথে মেরেছিল। একটা ছোট অন্ধকূপের মত ঘরে পুরে দরজাটা তার গেঁথে দিয়েছিল। কী ক'রেই ফৈজীকে মেরেছিল—উঃ! রামেশ্বর চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—হে ভগবান! হে ভগবান!

সুনীতির চোখ সজল হইয়া উঠিল, নীরবে নতমুখে বসিয়া থাকার সুযোগে সে-জল চোখ হইতে মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাঁহার মনে পড়িতেছিল—ননী পালকে, হতভাগ্য হীন—তাঁহার মহীনকে—চরের দাঙ্গায় নিহত সেই অজানা অচেনা হতভাগ্যকে, হতভাগ্য নবীন ও তাহার সহচর কয়েকজনকে। তিনি গোপনে চোখ মুছিয়া ঘরের বাহিরে যাইবার জন্য উঠিলেন; একবার মানদাকে পাঠাইবেন সংবাদের জন্য।

রামেশ্বর ডাকিলেন, সুনীতি! কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুনীতি চমকিয়া উঠিলেন; রামেশ্বরের কণ্ঠস্বর বড় ম্লান, কাতরতার প্রকাশ তাহাতে সুস্পষ্ট।

সুনীতি উদ্বিগ্ন হইয়াই ফিরিলেন, কি বলছ ?

রামেশ্বর কাতর দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, দেখ। আমার—আমার শরীরটা—দেখ, আমাকে একটু শুইয়ে দেবে ?

সযত্নে স্বামীকে শোয়াইয়া দিয়া সুনীতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন, শরীর কি খারাপ বোধ হচ্ছে ?

সে কথার জবাব না দিয়া রামেশ্বর বলিলেন, আমার গায়ে একখানা পাতলা চাদর টেনে দাও তো, আর ওই আলোটা, ওটাকে সরিয়ে দাও।—বলিতে বলিতেই তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন, ঈষৎ উত্তেজিত স্বরেই এবার তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তুমি জান আমার চোখে আলোর মধ্যে যন্ত্রণা হয়, তবু ওটা জ্বালিয়ে রাখবে দপদপ ক'রে !

প্রতিবাদে ফল নাই, সুনীতি তাহা ভাল করিয়াই জানেন ; তিনি নীরবেই আলোটা কোণের দিকে সরাইয়া দিলেন, পাতলা একখানি চাদরে স্বামীর সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার মন বার বার বাহিরের দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছিল। ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া সুনীতি ডাকিলেন, মানদা !

মানদা দিবানিদ্রা শেষ করিয়া উঠান ঝাঁট দিতেছিল, সে বলিল, কি মা ?

একবার একটা কাজ করবি মা ?

বলুন।

একবার পাড়ায় একটু বেরিয়ে জেনে আয় না মা, সদর থেকে খবর-টবর কিছু এসেছে কি না।

মানদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এর মধ্যে কোথায় কে ফিরবে গো, আর ফিরবেই বা কেমন ক'রে ? ফিরতে সেই রাত আটটা-নটা।

সে-কথা সুনীতি নিজেও জানেন, তবুও বলিলেন, ওরে, বার্তা আসে বাতাসের আগে। লোক কেউ না আসুক, খবর হয়তো এসেছে, দেখ না একবার। মায়ের কথা শুনলে তো পুণ্যিই হয়।

ঝাঁটাটা সেইখানেই ফেলিয়া দিয়া মানদা বিরক্তিভরেই বাহির হইয়া গেল। সুনীতি স্তব্ধ হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, বাগ্দীপাড়ায় যদি কেহ কাঁদে, তবে সে কান্না তো ছাদের উপর হইতে শোনা যাইবে! কম্পিতপদে তিনি ছাদে উঠিয়া শূন্য দৃষ্টিতে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি স্বস্তির একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, নাঃ কেহ কাঁদে না। এতক্ষণে তাঁহার দৃষ্টি সজাগ হইয়া উঠিল। আপনাদের কাছারির সম্মুখের খামার বাড়ির দিকেই তিনি তাকাইয়াছিলেন ; একটা লোক ধানের গোলার কাছে দাঁড়াইয়া কি করিতেছে! লোকটা তাঁহাদেরই গরুর মাহিন্দার ; ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন, খড়ের পাকানো মোটা 'বড়' দিয়া তৈয়ারি মরাইটার ভিতর একটা লাঠি গুঁজিয়া ছিদ্র করিয়া ধান চুরি করিতেছে। তিনি লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, উপরে চোখ তুলিলেই সে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। অতি সন্তর্পণে সেদিক হইতে সরিয়া ছাদের ও-পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। গ্রামের ভাঙা তটভূমির কোলে কালীর বালুময় বুক চৈত্রের অপরাহ্নে উদাস হইয়া উঠিয়াছে। কালীর ও-পারে চর, সর্বনাশা চর! কিন্তু চরখানি আজ তাঁহার চোখ জুড়াইয়া দিল। চৈত্রের প্রারম্ভে কচি কচি বেনাঘাসের পাতা বাহির হইয়া

চরটাকে যেন সবুজ মখমলের মত মুড়িয়া দিয়াছে। হালকা সবুজের মধ্যে সাঁওতালদের পল্লীটির গোবরে-মাটিতে নিকানো, খড়িমাটির আলপনা দেওয়া ঘরগুলি যেন ছবির মত সুন্দর। উঃ, পল্লীটি ইহার মধ্যে কত বড় হইয়া উঠিয়াছে! সম্পূর্ণ একখানি গ্রাম। পল্লীর মধ্য দিয়া বেশ একটি সুন্দর পথ; সবুজের মধ্যে শুভ্র একটি আঁকা-বাঁকা রেখা, নদীর কূল হইতে সাঁওতাল-পল্লী পার হইয়া প্রান্তরের মধ্য দিয়া ও-পারের গ্রামের ঘন বনরেখার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। সাঁওতালদের পল্লীর আশেপাশে কতকগুলি কিশোর গাছে নূতন পাতা দেখা দিয়াছে। চোখ যেন তাঁহার জুড়াইয়া গেল। তবুও তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিলেন না। এমন সুন্দর চর, এমন কোমল—এখান হইতেই সে কোমলতা তিনি যেন অনুভব করিতেছেন—তাহাকে লইয়া এমন হানাহানি কেন করে মানুষ? আর, কোথায়—চরটার কোন্ অন্তস্তলে লুকাইয়া আছে এমন সর্বনাশা চক্রান্ত?

নীচে হইতে মানদা ডাকিতেছিল, সুনীতি ত্রস্ত হইয়া দোতলার বারান্দায় নামিয়া আসিলেন। নীচের উঠান হইতে মানদা বলিল, এক-এক সময় আপনি ছেলেমানুষের মত অবুঝ হয়ে পড়েন মা। বললাম, রাত আটটা-নটার আগে কেউ ফিরবে না আর না ফিরলে খবর আসবে না। টেলিগেরাপ তো নাই মা আপনার শ্বশুরের গাঁয়ে যে, তারে তারে খবর আসবে!

সুনীতি!—ঘরের ভিতর হইতে রামেশ্বর ডাকিতেছিলেন। শান্ত মনেই সুনীতি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রামেশ্বর বালিশে ঠেস দিয়া অর্ধশায়িতের মত বসিয়া আছেন, সুনীতিকে দেখিয়া স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠেই বলিলেন, অহীনকে লিখে দাও তো, রবীন্দ্রনাথ ব'লে যে বাংলা ভাষার কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থ যেন সে নিয়ে আসে। তা হ'লে তুমি পড়বে, তাতে কাব্যের রস পুরোই পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, আর যদি কাদম্বরীর অনুবাদ থাকে, বুঝলে?

সংবাদ যথাসময়ে আসিল এবং শ্রীবাস ও মজুমদারের কল্যাণে উচ্চরবেই তাহা তৎক্ষণাৎ রীতিমত ঘোষিত হইয়া প্রচারিত হইয়া গেল। সেই রাত্রেই সর্বরক্ষা-দেবীর স্থানে পূজা দিবার অছিলায় গ্রামের পথে পথে তাহারা ঢাক-ঢোল লইয়া বাহির হইল। ইন্দ্র রায়ের কাছারিতে রায় গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার কাছারির সম্মুখে শোভাযাত্রাটি আসিবামাত্র তিনি হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়া পথের উপরেই দাঁড়াইলেন।

শোভাযাত্রাটির গতি স্তব্ধ হইয়া গেল।

রায় বলিলেন, জনার্দন কলিতে আজকাল পার্শ্বপরিবর্তন করেছেন; সুতরাং তিনি যে তোমাদের পক্ষে, এ আমি জানতাম মজুমদার! তারপর, নবনেটাকে দিলে লটকে?

মজুমদার বিনীত হাসি হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে না, নবীনের ছ বছর দ্বীপান্তর হ'ল, আর দুজনের দুবছর ক'রে জেল।

রায় হাসিয়া বলিলেন, তবে আর করলে কি হে? এস এস একবার ভেতরেই এস, শুনি বিবরণ; কই, শ্রীবাস কই? এস পাল, এস।

কৃত্রিম শ্রদ্ধার সমাদরের আহ্বানে শ্রীবাস ও মজুমদার উভয়েই শুকাইয়া গেল। সভয়ে মজুমদার বলিল, আজ্ঞে, আজ মাপ করুন, পূজো দিতে যাচ্ছি।

ঢাক বাজিয়ে পূজো দিতে যাচ্ছ, কিন্তু বলি কই হে? চরে বলি হয়ে গেল, আর মা সর্বরক্ষার ওখানে বলি দেবে না? মায়ের জিভ যে লকলক করছে, আমি যে দিব্যচক্ষে দেখছি।

মজুমদার ও শ্রীবাসের মুখ মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। সমস্ত বাজনাদার ও অনুচরের দল সভয়ে শ্বাসরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রায় আর দাঁড়াইলেন না, তিনি আবার একবার মৃদু হাসিয়া ছোট একটি "আচ্ছা" বলিয়া কাছারির কটকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিছুক্ষণ পর স্তব্ধ শ্রীবাস ও যোগেশ মজুমদার অনুভব করিল, আলো যেন কমিয়া আসিতেছে। পিছনে ফিরিয়া মজুমদার দেখিল, শ্রীবাসের হাতের আলোটি ছাড়া আর একটিও আলো নাই, বাজনদার অনুচর সকলেই কখন নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে।

ওদিকে চক্রবর্তী-বাড়িতে সুনীতি স্তব্ধ হইয়া দাওয়ার উপর বসিয়াছিলেন, চোখ দিয়া জল ঝরিতেছিল অন্ধকারের আবরণের মধ্যে। তাঁহার সম্মুখে নাতিকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া নবীনের স্ত্রী। সেও নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। বহুক্ষণ পর সে বলিল, সদরে সব বললে হাইকোর্টে দরখাস্ত দিতে।

সুনীতি কোনমতে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, দরখাস্ত নয়, আপীল।

খালাস যদি না হয় রাণীমা, তবে আপনকারা ছাড়া আমরা তো কাউকে জানি না।

কিন্তু খরচ যে অনেক মা; সে কি তোরা যোগাড় করতে পারবি?

নবীনের স্ত্রী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুনীতি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তাও পরামর্শ ক'রে দেখব বাগ্দী-বউ; অহীন আসুক, আর পাঁচ-সাত দিনেই তার পরীক্ষা শেষ হবে, হ'লেই সে আসবে।

মতি বাগদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, আপনকারা তাকে কাজে জবাব দিয়েছিলেন; কিন্তু আমাকে যে আপুনি না রাখলে কেউ রাখবার নাই রাণীমা।

* * *

অহীন্দ্র বাড়ি আসিতেই সুনীতি তাহাকে ইন্দ্র রায়ের নিকট পাঠাইলেন। মনে গোপন সঙ্কল্প ছিল, চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় হইলে আপনার অবশিষ্ট অলঙ্কার হইতেও কিছু বিক্রয় করিয়া খরচ সংস্থান করিয়া দিবেন। কিন্তু রায় নিষেধ করিলেন, বলিলেন, খরচ অনেক, শতকের মধ্যেও কুলোবে না বাবা। তা ছাড়া—, অকস্মাৎ তিনি হাসিয়া বলিলেন, তোমরা আজকালকার, কি বলে, ইয়ংমেন, তোমরা ভাববে, আমরা প্রাচীন কালের দানব সব; কিন্তু আমরা বলি কি, জান? ছ বছর জেল খাটতে নবীনের মত লাঠিয়ালের কোন কষ্টই হবে না। বংশানুক্রমে ওদের এ-সব অভ্যেস আছে।

অহীন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। রায় হাসিয়া বলিলেন, তুমি তো চুপ ক'রে রইলে; কিন্তু অমল হ'লে একচোট বক্তৃতাই দিয়ে দিত আমাকে। এখন একজামিন কেমন দিলে, ব'ল?

এবার স্মিতমুখে অহীন্দ্র বলিল, ভালই দিয়েছি আপনার আশীর্বাদে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রায় বলিলেন, আশীর্বাদ তোমাকে বার বার করি অহীন্দ্র। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়—

অহীন্দ্র কথাটা সমাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। রায় বলিলেন, তোমার বাবাকে এবার কেমন দেখলে বল তো ?

ম্লান কণ্ঠে অহীন্দ্র বলিল, আমি তো দেখছি, মাথার গোলমাল বেড়েছে।

রায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, যাও, বাড়ির ভেতরে যাও, তোমার—মানে, অমলের মা এরই মধ্যে চার-পাঁচ দিন তোমার নাম করেছেন।

অহীন্দ্রকে বাড়ির মধ্যে দেখিয়া হেমাঙ্গিনী আনন্দে যেন অধীর হইয়া উঠিলেন। অহীন্দ্র প্রণাম করিতেই উজ্জ্বল মুখে প্রশ্ন করিলেন, পরীক্ষা কেমন দিলে বাবা ?

ভালই দিয়েছি মামীমা, আপনার আশীর্বাদে।

অমল কি লিখেছে জান ? সে লিখেছে অহীনের এবার ফার্স্ট হওয়া উচিত।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, সে আমাকেও লিখেছে। সে তো এবার ছুটিতে আসছে না লিখেছে।

না। সে এক ধন্যি ছেলে হয়েছে বাবা। তাদের কলেজের ছেলেরা দল বেঁধে কোথায় বেড়াতে যাবে, তিনি সেই হুজুগে মেতেছেন। তার জন্যে উমার এবার আসা হ'ল না।

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন অমল আসিয়া হাজির হইল। আষাঢ়ের প্রথমেই ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘ করিয়া বর্ষা নামিয়াছিল, সেই বর্ষা মাথায় করিয়া গভীর রাত্রে স্টেশন হইতে গরুর গাড়ি করিয়া একেবারে অহীন্দ্রদের দরজায় আসিয়া সে ডাক দিল, অহীন ! অহীন !

ঝড় ও বর্ষণের সেদিন সে এক অদ্ভুত গোঙানি ! সন্ধ্যার পর হইতেই এই গোঙানিটা শোনা যাইতেছে। অহীন্দ্র ঘুম ভাঙিয়া কান পাতিয়া শুনিল, সত্যই কে তাহাকে ডাকিতেছে !

সে জানালা খুলিয়া প্রশ্ন করিল, কে ?

আমি অমল। ভিজে ম'রে গেলাম, আর তুমি বেশ আরামে ঘুমোচ্ছ ? বাঃ, বেশ !

তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, তুমি এমনভাবে ?

অমল অহীন্দ্রের হাতে ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স ? তুমি ফোর্থ হয়েছ।

অহীন্দ্র সর্বাঙ্গসিক্ত অমলকে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় বুকে জড়াইয়া ধরিল। শব্দ শুনিয়া সুনীতি উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, সমস্ত শুনিয়া নির্বাক হইয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। চোখ তাঁহার জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। চোখ যেন তাঁহার সমুদ্র, আনন্দের পূর্ণিমায়, বেদনার অমাবস্যায় সমানই উথলিয়া উঠে।

অহীন্দ্র বলিল, অমলকে খেতে দাও মা।

সুনীতি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অমল বলিল, না পিসীমা, স্টেশনে এক পেট খেয়েছি; এখন যদি আবার খাওয়ান তবে সেটা সাজা দেওয়া হবে। বরং চা এক পেয়ালা ক'রে দিন।

আর অহীন, আলোটা আন তো, ব্যাগ থেকে কাপড়-জামা বের ক'রে পাল্টে ফেলি। বাড়ি আর যাব না রাত্রে, কাল সকালে যাব।

চা করিয়া খাওয়াইয়া অহীন্দ্র ও অমলকে শোয়াইয়া আনন্দ-অধীর চিত্তে সুনীতি স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। রামেশ্বর খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া বাহিরের দুর্যোগের দিকে চাহিলেন, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে, কিন্তু সে তীব্র আলোকের মধ্যেও নিস্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। বিদ্যুৎ-চমকের আলোকে সুনীতি দেখিলেন, গ্রামের প্রান্তে প্রান্তে কালীর বুক জুড়িয়া বিপুলবিস্তার একখানা সাদা চাদর কে যেন বিছাইয়া দিয়াছে। ঝড় ও বর্ষণের মধ্যে যে অদ্ভুত গোঙানি শোনা যাইতেছে, সেটা ঝড়ের নয়, বর্ষণের নয়, কালীর ক্রুদ্ধ গর্জন। কালীর বুকে বন্যা আসিয়াছে।

১৮

আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে এবার কালিন্দীর বুকে বান আসিয়া পড়িল।

এক দিকে রায়হাট, অন্য দিকে সাঁওতালদের 'রাঙাঠাকুরের চর'—এই উভয়ের মাঝে রাঙা জলের ফেনিল আবর্ত ফুলিয়া ফুলিয়া খরস্রোতে ছুটিয়া চলিয়াছে। আবর্তের মধ্যে কলকল শব্দ শুনিয়া মনে হয়, সত্য সত্যই কালী যেন খলখল করিয়া হাসিতেছে। কালী এবার ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিয়াছে।

গত কয়েক বৎসর কালিন্দীর বন্যা তেমন প্রবল কিছু হয় নাই, এবার আষাঢ়ের প্রথমেই ভীষণ বন্যায় কালী ফাঁপিয়া ফুলিয়া রাক্ষসীর মত হইয়া উঠিল। বর্ষাও নামিয়াছে এবার আষাঢ়ের প্রথমেই। জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তির দিনই আকাশের ভ্রাম্যমাণ মেঘপুঞ্জ ঘোরঘটা করিয়া আকাশ জুড়িয়া বসিল। বর্ষণ আরম্ভ হইল অপরাহ্ণ হইতেই। পরদিন সকাল—অর্থাৎ পয়লা আষাঢ়ের প্রাতঃকালে দেখা গেল, মাঠঘাট জলে থৈ-থৈ করিতেছে। ধানচাষের 'কাড়ান' লাগিয়া গিয়াছে। ইহাতেই কিন্তু মেঘ ক্ষান্ত হইল না, তিন-চার দিন ধরিয়া প্রায় বিরামহীন বর্ষণ করিয়া গেল। কখনও প্রবল ধারায়, কখনও বা রিমিঝিমি, কখনও মৃদু ফিনকির মত বৃষ্টির ধারাগুলি বাতাসের বেগে কুয়াশার বিন্দুর মত ভাসিয়া যাইতেছিল। অনেককালের লোকও বলিল, এমন সৃষ্টিছাড়া বর্ষা তাহারা জীবনে দেখে নাই। এ-বর্ষাটির না আছে সময়জ্ঞান, না আছে মাত্রাজ্ঞান।

দেখিতে দেখিতে কালীর বুকেও বন্যা আসিয়া গেল দুর্দান্ত ঝড়ো হাওয়ার মত। এ-বেলা ও-বেলা বান বাড়িতে বাড়িতে রায়হাটের তালগাছপ্রমাণ উঁচু, ভাঙা কূলের কানায় কানায় হইয়া উঠিল ; ভাঙা তটের কোলে কোলে কালীর লাল জল সূর্যের আলোয় রক্তাক্ত ছুরির মত ঝিলিক হানিয়া তীরের গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে খানিকটা করিয়া রায়হাটের কূল কাটিয়া ঝুপঝুপ শব্দে খসিয়া পড়িতেছে।

রায়হাটের চাষীরা বলে, কালী জিব চাটছে রাক্ষসীর মত, ভাগ্যে আমাদের কাঁকুরে মাটি!

সত্য কথা। রায়হাটের ভাগ্য ভাল যে, রায়হাটের বুক সাঁওতাল পরগণার মত কঠিন রাঙা মাটি ও কাঁকর দিয়া গড়া। নরম পলিমাটিতে গঠিত হইলে কালীর শাণিত জিহ্বার লেহনে কোমল মাটির তটভূমি হইতে বিস্তৃত ধস, কোমল দেহের মাংসপিণ্ডের মত খসিয়া পড়িত। রায়হাট ইহারই মধ্যে কঙ্কালসার হইয়া উঠিত। দুই-তিন বৎসরে কালী মাত্র হাত-পাঁচেক পরিমিত কূল রায়হাটের কোলে কোলে খাইয়াছে। এবার কিন্তু বন্যাতেই ইহার মধ্যে হাত দুয়েক খাইয়া ফেলিয়াছে, এখনও পূর্ণ ক্ষুধায় লেহন করিয়া চলিয়াছে। ওপারে চরটাও এবার প্রায় চারিদিকে বন্যায় ডুবিয়া ছোট একটি দ্বীপের মত কোনমতে জাগিয়া আছে। চরের উপরেই এখন কালীনদীর ও-পারে খেয়ার ঘাট, ঘাট হইতে একটা কাঁচা পথ চলিয়া গিয়াছে চরের ও-দিকের গ্রাম পর্যন্ত। সেই পথটা মাত্র ও-দিকে একটা যোজকের মত জাগিয়া আছে।

চরের উপর শ্রীবাস পাল যে দোকানটা করিয়াছে, সেই দোকানের দাওয়ায় সাঁওতালদের কয়জন মাতব্বর বসিয়া অলস দৃষ্টিতে এই দুর্যোগের আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। কমল মাঝি, সেই রহস্যপ্রবণ কাঠের মিস্ত্রী চূড়াও বসিয়া আছে। আরও জন দুয়েক নীরবে 'চুটি' টানিতেছিল। শালপাতায় জড়ানো কড়া তামাকের বিড়ি উহারা নিজেরাই তৈয়ারি করে, তাহার নাম 'চুটি'। কড়া তামাকের কটু গন্ধে জলসিক্ত ভারী বাতাস আরও ভারী হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই চারিজন রাহী খেয়াঘাটে যাইতেছে বা খেয়াঘাট হইতে আসিতেছে।

দোকানের তক্তাপোশের উপর শ্রীবাস নিজে একখানা খাতা খুলিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। ও-পাশে শ্রীবাসের ছোট ছেলে একখানা চাটাই বিছাইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়াছে, তাহার কোলের কাছে একটা কাঠের বাক্স, একপাশে একটা তরাজু, ওজনের বাট-খারাগুলি—সেরের উপর আধসের, তাহার উপর একপোয়া—এমনি ভাবে আধ-ছটাকটি চূড়ায় রাখিয়া মন্দিরের আকারে সাজাইয়া রাখিয়াছে। সহসা এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শ্রীবাস বলিল, কি রে, সবাই যে তোরা 'থম্ভ' মেরে গেলি! কি বলছিস বল্, আমার কথার জবাব দে!

কমল নির্লিপ্তের মত উত্তর দিল, কি বুলব গো? আপুনি যি যা-তা বুলছিস!

শ্রীবাসের কপাল একেবারে প্রশস্ত টাকের প্রান্তদেশ পর্যন্ত কুঁচকাইয়া উঠিল; বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল, আমি যা-তা বলছি! আপনার পাওনাগণ্ডা চাইলেই সংসারে যা-তা বলাই হয় যে, তার আর তোদের দোস কি, বল্?

সাঁওতালেরা কেহ কোনও উত্তর দিল না, শ্রীবাসই আবার বলিল, বাকি তো এক বছরের নয়, বাকি ধর্ গা যেঁয়ে—তোর তিন বছরের। যে বছর দাঙ্গা হ'ল সেই বছর থেকে তোরা ধান নিতে লেগেছিস। দেখ্‌কেনে হিসেব ক'রে। দাঙ্গা হ'ল, মামলা হ'ল, মামলাই চলেছে

দু বছর, তারপর লবীনের ধর্ গা যেঁয়ে—এক বছর করে জেল খাটা হয়ে গেল। বটে কি না?

কমল সে কথা অস্বীকার করিল না, বলিল, হুঁ, সি তো বটে গো—ধান তো তিনটে হ'ল, ইবার তুর চারটে হবে।

তবে?

মাঝি এ 'তবে'র উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। আবার চুপ করিয়া ভাবিতে বসিল। সাঁওতালদের সহিত শ্রীবাসের একটা গোল বাধিয়া উঠিয়াছে। দাঙ্গার বৎসর হইতে শ্রীবাস সাঁওতালদের ধান্য-ঋণ দাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ষার সময় যখন তাহারা জমিতে চাষের কাজে লিপ্ত থাকে, তখন তাহাদের দিনমজুরির উপার্জন থাকে না। সেই সময়ে তাহারা স্থানীয় ধানের মহাজনের নিকট সুদে ধান লইয়া থাকে এবং মাঘ-ফাল্গুনে ধান মাড়াই করিয়া সুদে-আসলে ধার শোধ দিয়া আসে। এবার অকস্মাৎ এই বর্ষা নামিয়া পড়ায় ইহারই মধ্যে সাঁওতালদের অনটন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অন্য দিক্ দিয়া চাষও আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। তাহারা শ্রীবাসের কাছে ধান ধার করিতে আসিয়াছে। কিন্তু শ্রীবাস বলিতেছে, তাহাদের পূর্বের ধার এখনও শোধ হয় নাই। সেই ধারের একটা ব্যবস্থা আগে না করিয়া দিলে আবার নূতন ঋণ সে কেমন করিয়া দিবে? কিন্তু কথাটা তাহারা বেশ বুঝিতে পারিতেছে না, অস্বীকারও করিতে পারিতেছে না। তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া শুধু ভাবিতেছে।

কতকগুলি দশ-বারো বছরের উলঙ্গ ছেলে কলরব করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল—মারাং গাডো, মারাং গাডো, খিকৃড়ী! অর্থাৎ বড় ইঁদুর, বড় ইঁদুর, খেঁকশিয়াল! কথা বলিতে বলিতে উত্তেজনায় আনন্দে তাহাদের চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিতেছে; কালো কালো মূর্তিগুলির বিস্ফারিত চোখের সাদা ক্ষেতের মধ্যে ছোট ছোট কালো তারাগুলি উত্তেজনায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছে!

কাঠের ওস্তাদ সর্বাগ্রে ব্যগ্রতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে বলিল, ও-কারে? কুথাকে?

বানের জলের ধারে গো! ভুঁয়ের ভিতর থেকে গুল গুল ক'রে বার হ'ছে গো।

দুই-তিনজন কলরব করিয়া উঠিল, গোড়া ভুগ্যারে-কো চোঁ-চোঁয়াতে। অর্থাৎ গর্তের ভিতর সব চোঁ-চোঁ করছে।

এইবার সকলেই আপনাদের ভাষায় কমলের সহিত কি বলা-কওয়া করিয়া উঠিয়া পড়িল। শ্রীবাস রুষ্ট হইয়া বলিল, লাফিয়ে উঠলি যে ইঁদুরের নাম শুনে? আমার ধানের কি করবি, ক'রে যা।

ওস্তাদ বলিল, আমরা কি বুলব গো? উই মোড়ল বুলবে আমাদের। আর যাব না তো খাব কি আমরা? তু ধান দিবি না বুলছিস। ঘরে চাল নাই, ছেলেপিলে সব খাবে কি? ওইগুলা সব পুঁড়ায়ে খাব।

পাড়ার ভিতর হইতে তখন সারি বাঁধিয়া জোয়ান ছেলে ও তরুণীর দল বর্ষণ মাথায় করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে—ইন্দুর-খেঁকশিয়ালের সন্ধানে। ছেলের দল আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল,

সমস্বরেই বলিয়া উঠিল, দেলা-দেলা! চল চল!

বুড়ার দলও ছেলেদের পিছনে পিছনে তাহাদেরই মতন নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল।

শ্রীবাসও অকস্মাৎ লোলুপ হইয়া উঠিল; সে কমলকে বলিল, মোড়ল বল্ কেনে ওদের, খরগোশ পেলে আমাকে যেন একটা দেয়।

আসল ব্যাপারটা খুবই সোজা, সাঁওতালেরা সেটা বেশ বুঝিতে পারে; কিন্তু আসল সত্যের উপরে জাল বুনিয়া শ্রীবাস যে আবরণ রচনা করিয়াছে, সেটা খুবই জটিল—তাহার জট ছাড়াইতে উহারা কিছুতেই পারিতেছে না। শ্রীবাস চায় সাঁওতালদের প্রাণান্তকর পরিশ্রমে গড়িয়া তোলা জমিগুলি। সে কথা তাহারা মনে মনে বেশ অনুভব করিতেছে; কিন্তু ঋণ ও সুদের হিসাবের আদি-অন্ত তাহারা কোনমতেই খুঁজিয়া পাইতেছে না। এই তিন বৎসরের মধ্যেই তাহাদের জমিগুলিকে প্রথম শ্রেণীর জমিতে তাহারা পরিণত করিয়া তুলিয়াছে। জমির ক্ষেত্র সুসমতল করিয়াছে, চারিদিকের আইল সুগঠিত করিয়া কালীর পলিমাটিতে-গড়া জমিকে চষিয়া খুঁড়িয়া সার দিয়া তাহাকে করিয়া তুলিয়াছে স্বর্ণপ্রসবিনী। চরের প্রান্তভাগ যে জমিটা চক্রবর্তী-বাড়ি খাসে রাখিয়া তাহাদের ভাগ বিলি করিয়াছে, সেগুলিকে পর্যন্ত পরিপূর্ণ জমির আকার দিয়া গড়িয়া ফেলিয়াছে। শ্রীবাসের জমিও তাহারাই ভাগে করিতেছে, সে-জমিও প্রায় তৈয়ারী হইয়া আসিল। বে-বন্দোবস্তী বাকী চরটার জঙ্গল হইতে তাহারা জ্বালানির জন্য আগাছা ও ঘর ছাওয়াইবার উদ্দেশ্যে বেনা-ঘাস কাটিয়া প্রায় পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের নিজেদের পল্লীর পাশে পাশে আম কাঁঠাল মহুয়া প্রভৃতি চারাগুলি মানুষের মাথা ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, শজিনাডালের কলমগুলিতে তো গত বৎসর হইতে ফুল দেখা দিয়াছে। বাঁশের ঝাড়গুলিতে চার-পাঁচটি করিয়া বাঁশ গজাইয়াছে, শ্রীবাস হিসাব করিয়াছে, এক-একটি বাঁশ হইতে যদি তিনটি করিয়াও নূতন বাঁশ গজায়, তবে এই বর্ষাতেই প্রত্যেক ঝাড়ে পনেরো-কুড়িটি করিয়া নূতন বাঁশ হইবে।

জায়গাটিও আর পূর্বের মত দুর্গম নয়, শ্রীবাসের দোকানের সম্মুখ দিয়া যে-রাস্তাটা গাড়ির দাগে দাগে চিহ্নিত হইয়াছিল, সেটি এখন সুগঠিত পরিচ্ছন্ন একটি সাধারণের ব্যবহার্য রাস্তায় পরিণত হইয়াছে। রাস্তাটা সোজা সাঁওতাল-পল্লীর ভিতর দিয়া নদীর বুকে যেখানে নামিয়াছে, সেইখানেই এখন খেয়ার নৌকা ভিড়িয়া থাকে, এইটাই এখন এ-পারের খেয়াঘাট। খেয়ার যাত্রীদের দল এখন এইদিকেই যায় আসে। গাড়িগুলিও এই পথে চলে। রাস্তার এ-প্রান্তটা সেই গাড়ির চাকার দাগে দাগে একেবারে এ-পারের চক আফজলপুরের পাকা সড়কের সঙ্গে গিয়া মিশিয়াছে। ওই পাকা সড়কে যাইতে যাইতে মুরশিদাবাদের ব্যাপারীদের কলাই, লঙ্কা প্রভৃতির গাড়ি এখানে আসিতে শুরু করিয়াছে। তাহারা কলাই, লঙ্কা বিক্রয় করে ধানের বিনিময়ে। এখানে কলাই, লঙ্কা বেচিবার সুবিধা করিতে পারে না, তবে সাঁওতালদের অল্প দর দিয়া ধান কিছু কিছু কিনিয়া লইয়া যায়। গরু-ছাগল কিনিবার জন্য মুসলমান পাইকারদের তো আসা-যাওয়ার বিরাম নাই। দুই-চারি ঘর গৃহস্থেরও এ-পারে আসিয়া বাস করিবার সঙ্কল্পের কথা শ্রীবাসের কানে আসিতেছে। বে-বন্দোবস্তী ও-দিকের ওই চরটার উপর

তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ঘাস ও কাঠ কাটিয়া সাঁওতালরাই ও-দিকটাকে এমন চোখে পড়িবার মত করিয়া তুলিল। আবার ইহাদের গরুর পায়ে পায়ে এবং ঘাস ও কাঠবাহী গাড়ির চলাচলে ওই জঙ্গলের মধ্যেও একটা পথ গড়িয়া উঠিতে আর দেরি নাই। নবীন ও রংলালের সহিত দাঙ্গা করার জন্য শ্রীবাস এখন মনে মনে আপসোস করে। এত টাকা খরচ করিয়া এক শত বিঘা জমি লইয়া তাহার আর কি লাভ হইয়াছে? লাভের তুলনায় ক্ষতিই হইয়াছে বেশি। আজ চক্রবর্তী বাড়িতে গিয়া জমি বন্দোবস্ত লইবার পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মামলার খরচে তাহার সঞ্চয় সমস্ত ব্যয়িত হইয়া অবশেষে মজুমদারের ঋণ তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। মামলা না করিয়া বাকি চরটা সে যদি বন্দোবস্ত লইত, তবে সে কেমন হইত? আর গোপনে দখল করিবারও উপায় নাই, ছোট রায়—ইন্দ্র রায়ের শ্যেনদৃষ্টি এখন এখানে নিবদ্ধ হইয়া আছে। রায় এখন চক্রবর্তীদের বিষয়-বন্দোবস্তের কর্তা। সে দৃষ্টি, সে নখরের আঘাতের সম্মুখীন হইতে শ্রীবাসের সাহস নাই। সেদিনের সেই সর্বরক্ষাতলার বলির কথা মনে করিয়া বুক এখনও হিম হইয়া যায়। এখন একমাত্র পথ আছে, ওই সাঁওতালদের উঠাইয়া ওই দিকে ঠেলিয়া দিয়া এদিকটা যদি কোনরূপে গ্রাস করিতে পারা যায়। জমি-বাগান-বাঁশ লইয়া এ-দিকটা পরিমাণে কম হইলেও এটুকু নিখাদ সোনা।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া শ্রীবাস জাল রচনা শুরু করিয়াছে। মাকড়সা যেমন জাল রচনা করে, তেমনি ভাবেই হিসাবের খাতায় কলমের ডগায় কালির সূত্র টানিয়া যোগ দিয়া গুণ দিয়া জালখানিকে সে সম্পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই সে বলিতেছে, আমার খাতায় টিপছাপ দিয়ে বকেয়ার একটা আধার ক'রে দে। তারপর আবার ধান লে কেনে?

একা বসিয়া অনেক ভাবিয়া কমল বলিল, হা পাল মশায়, ইটো কি ক'রে হ'ল গো? আমরা বছর বছর ধান দিলম যি! তুর ছেলে লিলে!

হাসিয়া পাল বলিল, দিস নাই এমন কথা বলেছি আমি?

তবে? বাকিটো তবে কি ক'রে বুলছিস গো?

এই দেখ, বোঙাজাতকে কি ক'রে সমঝাই, বল দেখি? আচ্ছা শোন্, ভাল ক'রে বুঝে দেখ্। যে ধানটো তোরা নিলি, এই তোর হিসেবই খুলছি আমি। এই দেখ্ পহিল সালে তু নিলি তিন বিশ ধান। তিন বিশের বাড়ি, মানে সুদ ধর্ গা যেঁয়ে—দেড় বিশ। হ'ল গা যেঁয়ে—সাড়ে চার বিশ। বটে তো?

কমল হিসাব-নিকাশের মধ্যে আর ভাল ঠাওর পাইল না, বলিল, হুঁ, সি তো হ'ল।

পাল আবার আরম্ভ করিল, তারপর তু দিলি সে বছর তিন বিশ আট আড়ি পাঁচ সের। বাকি থাকল বাইশ আড়ি পাঁচ সের—মানে, এক বিশ দু আড়ি পাঁচ সের। তার ফিরে বছরে তুই নিয়েছিস তিন বিশ চোদ্দ আড়ি। আর গত বছরের বাকি এক বিশ দু আড়ি পাঁচ সের। আর সুদ ধর্ দু বিশ তিন আড়ি আড়াই সের।

কমল দিশা হারাইয়া বলিল, হুঁ।

পাল হাসিয়া বলিল, তবে? তবে যে বলছিস, কি ক'রে হ'ল গো? ন্যাকা সাজছিস্?

কমল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শ্রীবাস ছেলেকে বলিল, সাজ্ তো বাবা, কড়া দেখে এক কল্কে তামুক। বাদলে—বাতাসে শীত ধ'রে গেল। কি বলে রে মাঝি, শীত-শীত করছে, তোদের কথায় কি বলে ?

কমল কোন উত্তর দিল না, পালের ছেলে তামাক সাজিতে সাজিতে হাসিয়া বলিল, রবাং হো রাবাং কানা, নয় রে মাঝি ?

পাল কৃত্রিম আনন্দিত-বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বলিল, তুই শিখেছিস নাকি রে ? শিখিস্ শিখিস্। বুঝলি মোড়ল, ওকে শিখিয়ে দিস তোদের ভাষা।

কিন্তু কমল ইহাতে খুশী হইল না। সে গভীর চিন্তায় নীরব হইয়াই বসিয়া রহিল। পালের ছেলে তামাক সাজিয়া একটু আড়ালে নিজে কয়েক টান টানিয়া হুঁকাটি বাপের হাতে দিল; পাল দেওয়ালে ঠেস দিয়া ফড়াৎ ফড়াৎ শব্দে হুঁকায় টান দিতে আরম্ভ করিল। দূরে চরের প্রান্তভাগে বন্যার কিনারায় কিনারায় উত্তেজনায় আত্মহারা সাঁওতালদের আনন্দোন্মত্ত কোলাহল উঠিতেছে। সে কোলাহলের মধ্যে নদীর ডাকও ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। আকাশে সীসার আস্তরণের মত দিগন্ত-বিস্তৃত মেঘের কোলে কোলে ছিন্ন-ছিন্ন খণ্ড কালো মেঘ অতিকায় পাখীর মত দল বাঁধিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। শ্রীবাস বাহ্য উদাসীনতার আবরণের মধ্যে থাকিয়া উৎকণ্ঠিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কমলের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। কমলকে আপ্যায়িত করিবার নানা কৌশল একটার পর একটা আবিষ্কার করিয়া আবার সেটাকে নাকচ করিতেছিল, পাছে কমল তাহার দুর্বলতাটা ধরিয়া ফেলে। সহসা সে একটা কৌশল আবিষ্কার করিয়া খুশী হইয়া উঠিল এবং কৃত্রিম ক্রোধে ছেলেকে ধমকাইয়া উঠিল, বলি গণেশ, তোর আক্কেলটা কেমন, বল দেখি ? মোড়ল মাঝি ব'সে রয়েছে কখন থেকে, বর্ষা-বাদলের দিন, এইটুকু তামাকের পাতা, একটু চুন তো দিতে হয় ! সাঁওতাল হ'লেও মোড়ল হ'ল মান্যের লোক।

গণেশ ব্যস্ত হইয়া তামাকের পাতা ও একটা কাঠের চামচে করিয়া চুন আনিয়া মোড়লের কাছে নামাইয়া দিল। মোড়ল চুন ও তামাকপাতা লইয়া খইনি তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিল। এতক্ষণে সে যেন খানিকটা চেতনা ফিরিয়া পাইল, বলিল, ধান যখন নিলম আপনার ঠেঞে, তখন সিটি দিব না, কি ক'রে বুলব গো মোড়ল ?

পাল হাসিয়া বলিল, এই ! মাঝি, সব বেচে মানুষ খায়, কিন্তু ধরম বেচে খেতে নাই। তোরা দিবি না—এ ভাবনা আমার এক দিনও হয় নাই। তোর সঙ্গে কারবার করছি এতদিন, তোকে আমি খুব জানি। তবে কি জানিস, এই মামলা-মকদ্দমায় প'ড়ে আমি নিজে কিছু দেখতে পারলাম না। ছেলেগুলো সব বোকা, ছেলেমানুষ তো। বছর বছর হিসেব ক'রে যদি ব'লে দিত যে, মাঝি এই তোদের সব বাকি থাকল, তবে তো এই গোলটি হ'ত না। আমি এবার খাতা খুলে দেখে একেবারে অবাক !

কমল খানিকটা খইনি ঠোঁটের ফাঁকে পুরিয়া বলিল, হুঁ, আমরাও তো তাই হলাম গো।

শ্রীবাস ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল, তার জন্যে ছেলেগুলোকে আমি মারতে শুধু বাকি রেখেছি। আবার ক্ষণিক নীরবতার পর বলিল, এবার থেকে সূক্ষ্ম হিসাব ক'রে আমি নিজে

ব'সে তোদের ঝঞ্ঝাট মেরে দোব, কিছু ভাবিস না তোরা।

কমল বলিল, হুঁ, সেইটি তু ক'রে দিবি মোড়ল।

নিশ্চয়। এখন এক কাজ কর্, তোরা বাপু, খাতাতে যে বাকি আছে, সেই বাকির হিসেবে একটি টিপছাপ দে। আর কার কি ধান চাই বল্, আমি জুড়ে দেখি, কত ধান লাগবে মোটমাট। তারপর লে কেনে ধান কালই।

কমল টিপছাপের নামে আবার চুপ করিয়া গেল। টিপসহিকে উহাদের বড ভয়। ওই অজানা কালো কালো দাগের মধ্যে যেন নিয়তির দুর্বার শক্তি তাহারা অনুভব করে। খত শোধ করিতে না পারিলে শুধু তো এখানেই শাস্তি হইয়া শেষ হইবে না! আরও, খত কেমন করিয়া সর্বস্ব গ্রাস করে, সে তো সে এই বয়সে কত বার দেখিয়াছে। কালো দাগগুলো যেন কালো ঘোড়ার মত ছুটিয়া চলে।

শ্রীবাস বলিল, তোদের তো আবার পূজো-আচ্চা আছে, ধান পোঁতার আগে সেই সব পূজোটুজো না ক'রে চাষে লাগতে পারবি না?

আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কমল বলিল, হু।

কি পরব বলে রে একে, নাম কি পরবের?

নাম বটে 'বাতুলী' পরব। আবার 'কদ্‌লেতা' পরবও বুলছে। 'রোওয়া' পরবও বলে। 'বাইন' পরবও বুলছে। যারা যেমন মনে করে, বুলে।

পরবে কি হবে তুদের?

কমল এবার খানিকটা উৎসাহিত হইয়া উঠিল, 'জাহর সারনে'—আমাদের দেবতার থানে গো, পূজো হবে। 'এডিয়াসিম'—আমাদের মোরগাকে বলে 'এডিয়াসিম', ওই মোরগা কাটা হবে, পচুই মদ দিব দেবতাকে, শাক দিব দু-তিন রকম। তারপরে রাঁধা-বাড়া হবে উই দেবতা থানে, লিয়ে খেঁয়ে-দেয়ে সব নাচগান করব।

তবে তো অনেক ব্যাপার রে! তা আমাদিকে নেমতন্ন করবি না?

কমল বড় বড় দাঁত মেলিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল, কৌতুক করিয়া বলিল, আপুনি আমাদের হাঁড়ি মদ খাবি মোড়ল?

শ্রীবাস বলিল, তা আমাকে না হয় দোকান থেকে 'পাকিমদ' এনে দিবি!

কমল পশ্চাদপদ হইল না, বলিল, হু, তা দিব।

হা-হা করিয়া হাসিয়া শ্রীবাস বলিল, না না, ও আমি তোকে ঠাট্টা করছিলাম।

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, উঁ—হুঁ, সি হবে না। আমি যখুন নেওতা দিলম, তখুন তুকে উটি লিতে হবে।

বেশ, তা দিস্। সে হবে কবে তোদের?

জল তো হয়েই গেল গো। এই ধানটি হ'লেই পূজো করব। তারপরে চাষে লেগে যাব। তা আপুনি ধান দিবি তবে তো হবে।

বেশ। সবাইকে নিয়ে আয়, এসে টিপছাপ দিয়ে দে, পরশু নিয়ে নে ধান। ধান তো

আমার এইখানেই আছে।

কমল ম্লানমুখে বলিল, তাই দিবে সব কাল।

গণেশ বলিল, মোড়ল, ধান নিতে দোকানে সব সকালে সকালে পাঠিয়ে দিস একটু। আজ তো আবার তোদের অনেক কিছু চাই রে ; ইঁদুর খরগোশ খেঁকশিয়াল মারলি, মসলা-পাতি চাই তো ?

কমল হাসিয়া বলিল, হুঁ। বলিতে বলিতে অকস্মাৎ যেন একটা অতি প্রয়োজনীয় কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল, বলিল, 'ডিবিয়া সুমুম' এনেছিস গো ? করঙ্গা সুমুম জ্বলছে না ভাল বাতাসে।

হ্যাঁ, এক টিন কেরোসিন তেল এনেছি, ব'লে দিস সব ডিবিয়াও এনেছি। তোর নাতনীর হাতে একটা লণ্ঠন দেখছিলাম মাঝি, ওটা কোথা কিনলি রে ?

কমল বলিল, উ উয়াকে রাঙাবাবুর মা দিয়েছে। ভাগে জমি করেছে জামাইটো, মেয়েটা উনিদের পাটকাম করছে কিনা।

শ্রীবাসের একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বলিল, আচ্ছা, তোর নাত-জামাই তো কই ধান নেয় না মোড়ল ? আবার তোর সঙ্গে পৃথকও তো বটে।

কমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বিয়া দিলেই বেটী পর হয়ে যায় গো! আর জামাইটো হ'ল পরের ছেলে। আমরা বুলছি কি জানিস, এটাঃ হপন বীর, সিম বাকো আপনারোয়াঃ—মানে বুলছে জামাইটো পরের ছেলে, বনের মুরগীর মত উ পোষ মানে না।

ও দিক হইতে কলরব করিতে করিতে শিকার সমাধা করিয়া সাঁওতালের দল ফিরিতেছিল। পুরুষ নারী ছেলে—বাদ বড কেহ ছিল না। অধিকাংশের হাতেই লাঠি, জন-কয়েকের কাঁধে ধনুক, হাতে তীর, খালি হাত যাহাদের তাহারাও রাশীকৃত মরা ইঁদুর, গোটাকয়েক খেঁকশিয়াল, গোটা-চারেক বুনো খরগোশ লেজে দড়ি ঝুলাইয়া লইয়া চলিয়াছে। সেই দীর্ঘাঙ্গী তরুণীটির হাতে ছিল দুইটা খরগোশ, সে অভ্যাসমত দর্পিত উচ্ছল ভঙ্গীতে আসিয়া কমলকে আপনাদের ভাষায় বলিল, এ-দুটা রাঙাবাবুকে দিতে হইবে। তুমি বল ইহাদের, ইহারা বলিতেছে, দিবে না। রাঙাবাবু ও-পারের ঘাটে বসিয়া আছে, আমি তাকে দেখিয়াছে।

দলের তরুণীগুলি সকলেই সমস্বরে সায় দিয়া উঠিল, হ্যাঁ হ্যাঁ। হুই. নদীর উ পারে ব'সে রইছে। আমরা দেখলাম। আমাদের রাঙাবাবু।

শ্রীবাসের খরগোশ মাংসের উপর প্রলোভন ছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, হ্যাঁ মাঝি, আমি যে বললাম একটা খরগোশের জন্তে, আমাকে একটা দে।

কমলের নাতনীই শ্রীবাসকে জবাব দিল। কেহ কিছু বলিবার পূর্বেই সে বলিল, কেনে, তুকে দিব কেনে ? তুকে দিব তো আমরা কি খাব ?

শ্রীবাস ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, এ তো আচ্ছা মেয়ে রে বাবা! ওই তো তোরা দিতে

যাচ্ছিস রাঙাবাবুকে। তা আমাকে দিবি না কেনে ?

কমলের নাতনী পরম বিস্ময়ের সহিত একটা আঙুল শ্রীবাসের দিকে দেখাইয়া আপনাদের ভাষায় বলিয়া উঠিল, এ লোকটা পাগল, না খ্যাপা ?

মেয়ের দল খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। শ্রীবাসের ছেলে গণেশ সাঁওতালী ভাষা বুঝিতে পারে ; তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, সে কঠিন স্বরেই বলিয়া উঠিল, এই সারী, যা-তা বলিস না বলছি।

কমলের ওই নাতনীর নাম সারী ; শুক-সারীর সারী নয়—উহাদের ভাষায় সারীর অর্থ উত্তম ভাল। সারী বলিল, কেনে বুলবে না ? ই কথা উ বলছে কেনে ? রাঙাবাবুর সাথে সাথ করছে কেনে ? উ আমাদের জমিদার, আমাদিকে জমি দিলে, আমাদিকে ধান দেয় ; তুদের মত সুদ লেয় না।

সারীর কথার ভঙ্গিতে কমলও এবার লজ্জিত হল, সে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া বলিল, উনিকে সবাই খুব-ভালবাসে মোড়ল, উনি আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতি।

মেয়েগুলি মুগ্ধ বিস্ময়ের সুরে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল আপনাদের ভাষায়, তিমুনি আগুনের পারা রং !—আঃ-য়-গো ! বিস্ময়সূচক 'আয়-গো' শব্দটির দীর্ঘায়িত ধ্বনির সুর তাহাদের কণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনির মতই বাজিয়া উঠিল।

১৯

একা অহীন্দ্র নয়, অমল এবং অহীন্দ্র দুইজনেই প্রাতঃকালে কালিন্দীর ঘাটে আসিয়া বসিয়াছিল। বর্ষার জলে ভিজিবার জন্যে দুইজনে বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিল। নদীর ঘাটে আসিয়া কালীর বন্যা দেখিয়া সেইখানে তাহারা বসিয়া পড়িল। খেয়াঘাটের উপরে পথের পাশেই এক বৃদ্ধ বট ; বটগাছটির শাখাপল্লব এত ঘন এবং পরিধিতে এমন বিস্তৃত যে, বৃষ্টির জলধারা তাহার তলদেশের মাটিকে স্পর্শ করিতে পারে না, গাছের পাতা-ঝরা জল স্থানে স্থানে ঝরিয়া পড়ে মাত্র। গাছের গোড়ায় মোটা মোটা শিকড়গুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া চারিপাশে মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের উপরের খানিকটা অংশ অজগরের পিঠের মত মাটির উপরে জাগিয়া আছে, সেই শিকড়ের উপরে বসিয়া তাহারা দুইজনে কালীর খরস্রোতের মধ্যে ঢিল ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে কথা বলিতেছিল। গাছটারই তলায় তাহাদের হইতে কিছু দূরে, খান-দুই গরুর গাড়ি খেয়ানৌকার অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। বর্ষার বাতাসে গরুগুলির সর্বাঙ্গের লোম খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, গাড়োয়ান দুইজন এবং আর জন-কয়েক খেয়ার যাত্রী ভিজা কাঠের আগুনের ধোঁয়ার সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া তামাক টানিয়া কাশিতেছে, গল্প করিতেছে।

বহুদিনের প্রাচীন বট, এই গাছের তলায় বহু বৎসর হইতেই পথের রাহীরা এমনই করিয়া

আশ্রয় গ্রহণ করে। গাছটার নামই 'আঁটের বটতলা'। পথের মধ্যে অপরিচিত পথিকেরা জোট বাঁধিয়া এই স্থানে আশ্রয় লইয়া থাকে—এই আশ্রয় লওয়াকে এ-দেশে বলে আঁট-দেওয়া। গাছের তলাতেই একটা গরুর গাড়ির টাপর বা ছই পাতিয়া তাহারই আশ্রয়ের তলে উবু হইয়া বসিয়া খেয়াঘাটের ঠিকাদারও তামাক টানিতেছিল।

আপনার বক্তব্যের উপর খুব জোর দিয়াই অমল কথা বলিতেছিল। সে এবার ধরিয়াছে, অহীন্দ্রকে কলিকাতায় পড়িতে হইবে। অহীন্দ্রের কোন অজুহাতই সে শুনিতে চায় না; সে বার বার বলিতেছে, তোমার মত স্টুডেণ্টের পক্ষে মফঃস্বল কখনও উপযুক্ত ক্ষেত্র হ'তে পারে না।

কৌতুকভরে অহীন্দ্র বলিল, বল কি ?

নিশ্চয়। অন্তত তিন ধাপ যে খাটো, সেটা তো প্রমাণিত হয়েই গেছে তোমার রেজাল্টে ?

মানে ?

ভেরি ঈজি। কলকাতায় থাকলে তোমার নাম থাকত সর্বাগ্রে—এ আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি। ক্ষেত্রের উর্বরতা-অনুর্বরতা তোমার সায়েন্সে স্বীকৃত সত্য, বীজের অদৃষ্টের ঘাড়ে দোষ চাপানোর মত অবৈজ্ঞানিক মতবাদ নিশ্চয় তুমি পোষণ করতে পার না।

এবার অহীন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, তুমি কি আসল কারণটা বুঝতে পার না অমল ?

অমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, অনেক কলেজ তোমাকে ফ্রী-স্টুডেণ্টশিপ দেবে, স্টাইপেণ্ড দেবে, হোস্টেল পর্যন্ত ফ্রী ক'রে দেবে। তার ওপর তোমার স্কলারশিপ থাকবে, সুতরাং তোমার আটকাচ্ছে কোথায় ?

অহীন্দ্র গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, তুমি সবটা বুঝতে পারছ না অমল। তবে তোমাকে বলতে আমার বাধা নেই। আমাকে মাসে মাসে এবার থেকে মাকে কিছু ক'রে না পাঠালে চলবে না। নিয়মিত আদায়পত্র তো হয় না, টাকার অভাবে মা অনেক সময় বিব্রত হয়ে পড়েন। আর মাকে আমার রান্না করতে হয়, মানদা ঝি বিনা মাইনেতে কাজ করে, অন্ততঃ এ দুটো খরচ আমাকে পাঠাতেই হবে।

অমল চুপ করিয়া গেল। কথাগুলির মধ্যে যে একটি বেদনাদায়ক সঙ্কোচ লুকাইয়া আছে, সেই সঙ্কোচে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। প্রাণঢালা অন্তরঙ্গতায় সে অহীন্দ্রের অন্তরঙ্গ, তবুও তাহার মনে হইল, এ কথাটা জোর করিয়া অহীন্দ্রের কাছে শুনিয়া সে অনধিকারচর্চা করিয়াছে। এ-দিকে, ও-পার হইতে নৌকাখানা আসিয়া পড়ায় খেয়াঘাট কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল। গাছতলায় গাড়ি লইয়া গাড়োয়ানেরা ব্যস্ত হইয়া পড়িল।—শীতার্ত গরু কয়টাকে গাড়িতে জুড়িবার পূর্ব হইতেই ঠ্যাঙাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, চীৎকার শুরু করিয়া দিয়েছে। যাত্রী যাহারা নামিতেছে তাহারা চীৎকার করিতেছে কম নয়।

ঘাটের ঠিকাদার গরুর গাড়ির টাপরের ভিতর বসিয়াই পারের পয়সা আদায় করিতে

করিতে একজনের সঙ্গে বিতণ্ডা জুড়িয়া দিয়াছে, একটি ছেলের পারানির পয়সা লইয়া। লোকটি বলিতেছে, কোম্পানির র‍্যালে ছেলের জন্যে হাফ-টিকিট, আর তোমার লৌকোতে নাই বললে চলবে কেনে হে বাপু? মগের মুলুক পেয়েছ লেকিনি তুমি?

গরুর গাড়ির গাড়োয়ান অত্যন্ত সাবধানতার সহিত গরুগুলিকে চালনা করিতে করিতে চেঁচাইতেছিল, অ-ই—হ-হ! ইঁদিগেই—

নিতান্ত প্রয়োজনীয় সময়ে এমনি কলরবমুখর একটি বিষয়ান্তরের সুযোগ পাইয়া অমল অহীন্দ্র দুইজনেই যেন বাঁচিয়া গেল। হাফটিকিট-যুক্তিবাদী লোকটির কথায় অকস্মাৎ প্রচুর কৌতুক অনুভব করিয়া অমল বেশ খানিকটা হাসিয়া লইয়া বলিল, ফাইন আর্‌গুমেণ্ট কিন্তু।

যাত্রী, গাড়ি বোঝাই করিয়া খেয়ানৌকা আবার ও-পারের দিকে রওনা হইল। খেয়ার মাঝি লগির একটা খোঁচা দিয়া নৌকাখানাকে তটভূমির সংস্পর্শ হইতে ঠেলিয়া জলে ভাসাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, হরিহরি বল সব। মিঞাসাহেবেরা আল্লা-আল্লা বল।

হিন্দুর সংখ্যাই বেশি ছিল অথবা সবাই বোধ হয় হিন্দু ছিল, সমবেত কণ্ঠের একটা উচ্চ কলরোল উঠিল, হরি—বো—ল।

আবার ঘাট নিস্তব্ধ হইয়া গেল। শুধু নদীর আবর্তের কুটিল নিম্ন কলকল শব্দ একই ভঙ্গিতে একটানা ধ্বনিত হইয়া চলিল। সে মৃদু ধ্বনি উঠিলেও জনবিরল খেয়াঘাটের উপরে যে দুই-তিনটি মানুষ বসিয়া ছিল, তাহাদের অন্তরের স্তব্ধতা সে ধ্বনিতে ক্ষুণ্ণ হইল না; জনবিরল খেয়া-ঘাটের শান্ত উদাসীনতার মধ্যে নদীর নিম্নস্বর সুশোভনরূপে অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। কানে বাজিলেও মনে ধরা পড়িবার মত ধ্বনি সে নয়।

অমল ও অহীন্দ্রের মনের বহির্দ্বারে অকস্মাৎ-আসিয়া-পড়া কৌতুক ফুরাইয়া গিয়াছে; আবার তাহারা দুইজনই গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। একটা কাঠি দিয়া অমল বালির উপর আঁকিতেছে একটা অর্থহীন চিত্র। অহীন্দ্রের স্থিরদৃষ্টি নদীর বুকের উপর। অমল সহসা বলিল, আচ্ছা, আমি যদি একটা টুইশানি যোগাড় ক'রে দিই? এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পড়াবে, পনেরো টাকা কি কুড়ি টাকা তাঁরা দেবেন। তা হ'লে তো তোমার আপত্তি থাকতে পারে না?

অমলের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া অহীন্দ্র বলিল, আরও পরিষ্কার ক'রে বল। তুমি কি উমাকে পড়াবার কথা বলছ?

অমলও অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তাই যদি বলি?

পারব না।—দৃঢ়স্বরেই অহীন্দ্র জবাব দিয়া বসিল।

এবারও অমল হাসিল, বলিল, জানি। তবু কথাটা ভাল ক'রেই জেনে নিলাম। যাক, সে কথা নয়; আমি বলছি আমার মামাতো ভাইকে পড়াবার কথা। ছেলেটি থার্ড ক্লাসে পড়ছে, তাকে পড়াবার জন্যে তাঁরা মাস্টার খুঁজছেন।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া লইয়া অহীন্দ্র বলিল, ভাল রাজী হলাম। তারপর অল্প হাসিয়া বলিল,

চল, দেখি তোমার কলকাতা কেমন। মফঃস্বলের চেয়ে কতখানি ওপরে অবস্থান করছেন, পরখ ক'রে দেখা যাক।

অমল হাসিয়া বলিল, অনেক—অনেক। অনেক ওপরে অহি, তিন ধাপ নয়, আরও বেশী ওপরে। দেখছো না, প্রাইভেট টুইশনির কথা বলতেই তুমি ধ'রে নিলে উমাকে পড়াবার কথা। অর্থাৎ, মনে ক'রে নিলে উমাকে পড়াবার ভানে আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই। যে-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে, তাতে পুরাকাল হ'লে আমার ভস্ম হয়ে যাবার কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেন? ধর, তাই যদি হ'ত তাতেই বা ক্ষতি কি ছিল? শ্রমবিনিময়ে মূল্য নেবে, তাতে মর্যাদার হানিটা কোথায়? এই হ'ল তোমার মফঃস্বল-মেণ্টালিটি।

অহীন্দ্র রাগ করিল না, হাসিয়াই বলিল, এ কথায় কিন্তু কলকাতার লোকেরই হার হ'ল অমল। মূল্য অপেক্ষা অমূল্য বস্তুর দাম বেশি এবং মূল্য না নিলে তবেই সংসারে অমূল্য বস্তু মেলে—এ সত্য কলকাতার লোকে জানে না, মফঃস্বলের লোকেরাই জানে প্রমাণ হচ্ছে।

অমল হাসিয়া বলিল, বিজ্ঞানের ছাত্রের অযোগ্য কথা বললে অহীন। বৈজ্ঞানিকের কাছে অমূল্য শব্দের অ অক্ষরটা অঙ্কের পূর্ববর্তী শূন্য ছাড়া আর কিছুই নয়; যতই উচ্চ মূল্যের বস্তু হোক, একটা মূল্য সে নির্ধারিত করবেই করবে; সেইটাই তার জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যের পরিচয়।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, আমার মূল্য তোমার কাছে তা হ'লে কত তুমি বলতে পার?

অমল বলিল; তোমার কাছে আমার যত মূল্য, সেইটে ইন্‌টু টেন।

আমার কাছে তো তুমি অমূল্য। অমূল্য ইনটু টেনের ভ্যালু কত, বল তো?

তুমি একটা বোগাস, যত কূটবুদ্ধি তোমার।—অমল হাসিয়া এবার পরাজয় মানিয়া লইল।

এতক্ষণে তাহারা সহজ স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল, বাহির এতক্ষণে অন্তরে প্রবেশ করিল।

নদীর বন্যা, আকাশের ঘনঘোর মেঘ, স্রোতের নিম্ন কলস্বর, বাতাসের শব্দস্পর্শ, ভিজা-মাটির গন্ধ এতক্ষণে তাহারা স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিল। আবর্তকুটিল গৈরিকবর্ণের বিশাল জলস্রোতের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া অমল বলিল, কালিন্দী আমাদের অদ্ভুত, বহুরূপা, রহস্যময়ী! অনেক দিন আগে, ছেলেমানুষ ছিলাম, তখন দেখেছি কালিন্দীর বান। আর এই দেখছি।

অহীন্দ্র বলিল, এখানকার প্রবাদ কি জান? এখানকার লোকে বলে, উনি নাকি যমের সহোদরা; অর্থাৎ যমুনার কাহিনীটা এঁর ওপর আরোপ করতে চায়। কালিন্দী নাকি যে বস্তুটিকে গ্রাস করতে বদন ব্যাদান করেন, তার রক্ষা কিছুতেই নেই। যম এসে সেখানে দোসর হয়ে ভগ্নীর পাশে দাঁড়ান। এক চাষী, তার নাম রংলাল, সেই আমাকে বলেছিল। অদ্ভুত বিশ্বাস, বললে, উনি যে-কালে হাত বাড়িয়েছেন, সে-কালে রায়হাটের আর রক্ষা নেই।

কালীর তটভূমির ভাঙনের দিকে চাহিয়া অমল বলিল, ওদের সংস্কারের কথা বাদ দিয়েও কথাটা সত্যি, ভাঙনের দিকে চেয়ে দেখ দেখি।

মৃদু হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, এদিকে ভাঙছে ও-দিকে গড়ছে। ও-পারের চরটা বছর বছর পরিধিতে অল্প অল্প ক'রে বেড়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের কলহ বাড়ছে। গোড়া থেকেই ব্যাপারটা আমি জানি। আমি হলপ ক'রে বলতে পারি অমল, যে, এ-গ্রামে—শুধু এ-গ্রামে কেন, আশেপাশে এমন লোক নেই, যার লোভ নেই ওই চরটার মাটির ওপর।

চরটার দিকে চাহিয়া অমল বলিল, চরটা কিন্তু সত্যিই লোভনীয় হয়ে উঠেছে, তা ছাড়া মাটিও বোধ হয় খুব উর্বর।

খুব উর্বর। রংলাল বলেছিল, ও মাটিতে সোনা ফলে—

চল, একদিন দেখে আসি। কাল চল।···আরে আরে, অত সব চেঁচামেচি করছে কেন? আরে বাপ রে, দল বেঁধে চাপে যে! নৌকোখানা ডুবে যাবে!

ও-পারের চরের পার-ঘাটে দল বাঁধিয়া সাঁওতালদের মেয়েরা নৌকায় চড়িতে চড়িতে কলরব করিতেছে। নৌকায় উঠিয়া মেয়ের দল চাপিয়া বসিয়াছে, সেই ভারে এবং চাঞ্চল্যে নৌকাটা টলমল করিতেছে, তাহাতেই তাহারা সভয় কৌতুক কলরব করিতেছে। এ-পার হইতে ঘাটের ঠিকাদারও শঙ্কিত হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল, অই, অই, এরা করছে কিরে বাপু? হে-ই! হে-ই!

কি তাহার কণ্ঠধ্বনি নদীর কল্লোল ভেদ করিয়া ও-পারের দলবদ্ধ সাঁওতালদের কলরবের মধ্যে আত্মঘোষণা করা দূরের কথা, বোধহয় পৌছিতেই পারিল না। শেষ পর্যন্ত বেচারা কাশিয়া সারা হইল। কাশিতে কাশিতেই সে বলিল, মর, তবে মর তোরা ডুবে, নিক, নিক, কালী নিক তোদিগে। অসীম বৈরাগ্যের সহিত সে নদীর দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া নূতন করিয়া তামাক সাজিতে শুরু করিল।

অহীন্দ্রের মুখে একটি পুলকিত হাসির রেশ ফুটিয়া উঠিল, সে নৌকাভরা সাঁওতাল মেয়েদের দিকে চাহিয়া বলিল, একটা মজা দেখবে দাঁড়াও।

হঠাৎ মজাটা কোত্থেকে আসবে?

ওই নৌকায় চ'ড়ে আসছে।

বল কি? ব্যাপারটা কি?

আমার পূজারিণীর দল আসছে। আমি ওদের রাঙাবাবু।

অমল মুগ্ধ হইয়া গেল, বলিল, বিউটিফুল! চমৎকার নাম দিয়েছে তো। কিন্তু এ যে একটা রোমান্স হে!

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, রোমান্সই বটে। আবার চরটার নাম দিয়েছে রাঙাঠাকুরের চর। আমার ঠাকুরদার সাঁওতাল-হাঙ্গামায় যোগ দেওয়ার কথা জান তো? তাঁর প্রতি ওদের প্রগাঢ় ভক্তি। তাঁকে বলত ওঁরা—রাঙাঠাকুর। আমি নাকি সেই রকম দেখতে। চোখগুলো খুব বড় বড় ক'রে বলে, তেমনি আগুনে—র পারা রং।

ঘাটের ঠিকাদারটি তামাক সাজিতে সাজিতে অহীন্দ্র ও অমলের কথাবার্তা সবই কান পাতিয়া শুনিতেছিল, সে আর থাকিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, তা আজ্ঞে, ওরা ঠিক কথাই বলে, বাবুমশায়। আমাদের চক্রবর্তী-বাবুদের বাড়ির মত রং এ চাকলায় নাই, তার ওপর আপনার রং ঠিক আগুনের পারাই বটে।

অমল ফিসফিস করিয়া বলিল, মাই গড! লোকটা আমাদের কথা সব শুনেছে নাকি?

হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, অসম্ভব নয়। চুরি ক'রে পরের কথা শোনায় মানুষ চুরির আনন্দ পায়।

ঠিকাদারটা এবার বাহির হইয়া আসিয়া অহীন্দ্র ও অমলের সম্মুখে সবিনয় ভঙ্গিতে উবু হইয়া বসিয়া বলিল, বাবুমাশায়!

অহীন্দ্র বলিল, বল।

আজ্ঞে।—বলিয়াই সে একবার সঙ্কোচভরে মাথা চুলকাইয়া লইল, তারপর আবার বলিল, আজ্ঞে, বাদলের দিন, আমার কাছে সিগরেট তো নাই! তামুকও খুব কড়া, তা বিড়ি ইচ্ছে করুন কেনে।

অমল খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, অহীন্দ্র ঈষৎ হাসিল, হাসিয়া সে বলিল, না আমরা বিড়ি সিগারেট তামাক—এসব খাই নে, ওসব কিছু দরকার নেই আমাদের।

লোকটি অপ্রস্তুত হইয়া অপ্রতিভভাবে হাসিয়া বলিল, আমি বলি—। কিছুক্ষণ অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া সে আবার বলিল, আমি আজ্ঞে আর একটা কথা নিবেদন করছিলাম।

অমল হাসিয়া ইংরেজীতে বলিল, হোয়াট নেক্‌স্ট? এ গ্লাস অব ওয়াইন?

লোকটি কিছু বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, আজ্ঞে?

গম্ভীরভাবে অহীন্দ্র বলিল, কিছু না। ও উনি আমাকে বলছেন। তুমি কি বলছ, বল?

হাত দুইটি জোড় করিয়া এবার লোকটি বলিল, আজ্ঞে, ওই চরের ওপর খানিক জমির জন্যে বলছিলাম।

একটি মৃদু হাসি অহীন্দ্রের মুখে ফুটিয়া উঠিল, বলিল, জমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বেশী আমার দরকার নেই, এই বিঘে দশ-পনেরো।

এ-কথার জবাব তো আমি দিতে পারব না বাপু। আমার মুরুব্বীরা রয়েছেন, তাঁরা যা করেন তাই হবে।

আজ্ঞে, আমার বিঘে পাঁচেক হলেও হবে।—লোকটি কাকুতি করিয়া এবার বলিয়া উঠিল, আমি একটি দোকান ও-পারে করব মনে করছি।

দোকান? দোকান তো একটা আছে ও-পারে। শ্রীবাস মোড়ল করেছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারও ইচ্ছে, একখানা দোকান করি। লোকও তো কেরমে কেরমে বাড়ছে। আর চিবাস আপনার গলা কেটে লাভ করে। দরে তো চড়া পাবেন না, মারে ওজনে। সের-করা আধপো ওজন কম। দু-রকম বাটখারা রাখে আজ্ঞে। ধান-চাল নেয় যে বাটখারায় সেটা আবার সের-করা আধপো বেশী।

অমল এবার বলিল, সেই মতলবে তুমিও দোকান করতে চাও, কেমন ?

আজ্ঞে না। এই আপনাদের চরণে হাত দিয়ে আমি বলতে পারি আজ্ঞে। ও-রকম পয়সা আমার গোরক্ত ব্রহ্মরক্তের সমান। আমি আপনার ষোল-আনার ওপর দেব, ষোল-আনা পয়সা নেব—বলিয়া সে বুড়ো আঙুল ও মাঝের আঙুলটি একত্র করিয়া ওজন করিবার ভঙ্গিতে ডান হাতখানি তুলিয়া ধরিল যেন সে এখনই ওজন করিতেছে। অমল অহীন্দ্র উভয়েই সে ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ও-দিকে সাঁওতাল মেয়েগুলির কলরবের ভাষা স্পষ্ট শোনা যাইতেছে, কিন্তু এখনও বুঝা যাইতেছে না। একে একে কথা কহিতে উহারা জানে না। একসঙ্গে পাখীর ঝাঁকের মত কলরব করে। অহীন্দ্র ঠিকাদারকে বলিল, যাও যাও, তোমার নৌকো এসে পড়ল।

পিছন ফিরিয়া নৌকাখানার দিকে চাহিয়া ঠিকাদার বলিল, সব মাঝিন, একজনাও যাত্রী নাই। খেয়াটাই লোকসান। বলিতে বলিতে সে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, জ্বালালে রে বাবা, ঘাট দুটো কেটে, ঝুড়ি কতক মাটি ফেলে দিয়ে মনে করছে মাথা কিনেছে সব। এই মেঝেন, এই, তোরা কি ভেবেছিস বল তো ? এমন ক'রে দল বেঁধে আসবার তোদের কথা ছিল নাকি ?

ঘাটে নামিয়াই সারী ঠিকাদারের সঙ্গে প্রায় ঝগড়া বাধাইয়া তুলিল। সে বলিল, আসবো না কেনে। আমরা যি পাড়াসুদ্ধু, তিন দিন খেটে দিলম ; ই-দিগের ঘাট, উ-পারের ঘাট ভাল ক'রে দিলম। সারীর পিছনে দলসুদ্ধ মেয়েরা তাহাদের আপনাদের ভাষায় কলরব করিয়া সারীকে সমর্থন করিতে লাগিল।

ঠিকাদার বলিল, তাই ব'লে একসঙ্গে দল বেঁধে আসবি নাকি ? এ-খেয়াতে একটা পয়সা নাই। কি, কাজ কি তোদের ? এত ঝাঁটা-ঝুড়ি নিয়ে যাবি কোথা সব ?

বেচতে যাব। ডাওর করল, ঘরকে ধান নাই, খাব কি আমরা ?

প্রত্যেকের হাতেই ঝাঁটা ও ঝুড়ির বোঝা! নানান ধরণের ঝাঁটা—শরপাতার ঝাঁটা, কুচিকাঠির ঝাঁটা, কাশকাঠির ঝাঁটা, ছোট বড় নানা ধরণের। ঝাঁটাগুলির বাঁধনের ছাঁদও বিচিত্র। ঝুড়িগুলিও সুন্দর এবং নানা আকারের।

ঠিকাদার এবার ঝগড়ার স্বর ছাড়িয়া মোলায়েম সুরে বলিল, বেশ, কই, আমাকে খান-কয়েক ঝাঁটা দিয়ে যা দেখি।

পোয়সা, পোয়সা দে। সারী হাত পাতিয়া দাঁড়াইল।

ঠিকাদার কিছুক্ষণ বিচিত্র ভঙ্গিতে নীরবে বর্বর মেয়েগুলির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, আচ্ছা, যা। তারপর আবার পার কেমন ক'রে হোস, তা দেখব আমি। বলে সেই, লায়ে পেরিয়ে লাউরেকে বলে শালা, সেই বিত্তান্ত।

সারী তাহার এই ভীতিপ্রদর্শনকে গ্রাহ্যও করিল না। ঘাট হইতে উঠিয়া একেবারে অহীন্দ্র ও অমলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিছনে পিছনে মেয়েদের দল। আর তাহাদের মুখে কলরব নাই, চোখে মুগ্ধ বিস্ময়ভরা দৃষ্টি, মুখে স্মিত সলজ্জ হাসি। পরস্পরের গলায় হাত

রাখিয়া ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিতে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমনি ভঙ্গিতেই দাঁড়ানো উহাদের অভ্যাস। পথে চলে, তাও এমনি ভাবে এ উহার গলা ধরিয়া বঙ্কিম ছন্দে হেলিয়া দুলিয়া চলে।

অমল মুগ্ধ হইয়া গেল, বলিল, বিউটিফুল! মনে হচ্ছে অজন্তা অথবা কোন প্রাচীনযুগের গুহার প্রাচীরচিত্র যেন মূর্তি ধ'রে বেরিয়ে এল।

মৃদু হাসিয়া বলিল, কি রে কোথায় যাবি সব দল বেঁধে?

সারী বলিল—আপোনার কাছে এলম গো, আমরা আজ সব শিকার করলম, তাই আনলম দুটো সুসুরে—উই যি, তোরা কি বুলিস গো?

পিছন হইতে তিন-চারজন কলরব করিয়া উঠিল, খোরগোশ, খোরগোশ।

রক্তাক্ত খরগোশ দুইটা অহীন্দ্র ও অমলের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া সারী বলিল, হুঁ, খোরগোশ আনলম আপনার লেগে গো।

একটা খরগোশের মাথা স্থূল-ফলা তীরের আঘাতে একবার ভাঙিয়া দুইখানা হইয়া গিয়াছে, অন্যটার বুকে গভীর একটা ক্ষত, সে ক্ষত হইতে এখনও অল্প অল্প রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে।

অহীন্দ্র এক অদ্ভুত স্থিরদৃষ্টিতে রক্তাক্ত পশু দুইটির দিকে চাহিয়া রহিল; এমন রক্তাক্ত দৃশ্যের আবির্ভাবের আকস্মিকতায় সে যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। অমল একটা খরগোশের লেজ ধরিয়া তুলিয়া বলিল; এত বড় খরগোশ এখানে পাওয়া যায়?

হেঁ গো, অনেক রইয়েছে আমাদের চরে। ভারী খারাপ করছে সব। ভুট্টা বরবটি গাছপালার ডগাগুলি কেটে কেটে খেয়ে দিচ্ছে।—একা সাবী নয়, পাঁচ-ছয়জনে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল। নিজ হইতে বলিবার মত কথা উহারা ভাবিয়া পায না, প্রশ্নের উত্তরে কথা বলিবার সুযোগ পাইলেই সকলেই কথা বলিবার জন্য কলরব করিয়া উঠে।

অমল উৎসাহিত হইয়া উঠিল, সে অহীন্দ্রকে ঠেলা দিয়া বলিল, চল, কাল চরে শিকার ক'রে আসি। বলিতে বলিতে অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেল; অহীন্দ্রের উজ্জ্বল গৌরবর্ণের মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে, চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, স্বচ্ছ অশ্রুজলতলে পিঙ্গল তারা দুইটি আসন্নমৃত্যু প্রবাল-কীটের মত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

অমল শঙ্কিত হইয়া বলিল, এ কি, কি হ'ল তোমার?

অহীন্দ্রের ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিল, সে বলিল, ও দুটো সরাও ভাই সামনে থেকে। ও বীভৎস দৃশ্য আমি সইতে পারি না।

অমল খরগোশ দুইটা তুলিয়া লইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, বাবুর বাড়িতে দিগে যা।

অহীন্দ্র শিহরিয়া উঠিল, বলিল, না না না। মা দেখলে সমস্ত দিন ধ'রে কাঁদবেন।

অমল নির্বাক হইয়া গেল, এমন ধারার কথা সে যেন কখনও শোনে নাই। সম্মুখে সমবেত কালো মেয়েগুলির মুখের স্মিত হাসিও মিলাইয়া গেল, অপরাধীর মত সঙ্কুচিত শুষ্কমুখে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সারী কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, হাঁ বাবু, খাবি না তবে খোরগোশ? আমরা আনলম আপনার লেগে।

অহীন্দ্র অনেকটা আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়াছিল, এতক্ষণে সে ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, বাবুর বাড়িতে দিগে যা। জানিস তো ছোট রায় মহাশয়ের বাড়ি? ইনি ছোট রায় মহাশয়ের ছেলে।

মেয়েগুলি আপনাদের ভাষায় মৃদুস্বরে কলরব করিয়া অমলকে লইয়া আলোচনা জুড়িয়া দিল। অমল অহীন্দ্রের কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, না, ওরা ওদুটো নিয়ে যাক।

অহীন্দ্র বলিল, না, তাতে ওরা দুঃখ পাবে। তোমাদের বাড়িতেই দিয়ে যাক।

বেশ, তা হ'লে তোমাকেও আমাদের ওখানে খেতে হবে।

খাব।

হাসিয়া অমল বলিল, তা হ'লে তুমি জাপানী বৌদ্ধ।

অহীন্দ্র এবার অল্প একটু হাসিল, হাসিয়া বলিল, দিনে না, রাত্রে খাব কিন্তু; দিনে রান্না করতে দেরিও হবে। আর মায়ের রান্নাবান্না বোধহয় হয়েই গেছে।

মেয়েগুলি কথা না বুঝিয়াও এতক্ষণে অকারণে হাসিয়া উৎফুল্ল এবং সহজ হইয়া উঠিল। সারী বলিল, তাই দিব তবে রায় মহাশয়ের বাড়িতে রাঙাবাবু?

হঁ্যা।

মেয়ের দল কলরব করিতে করিতে চলিয়া গেল। অমল বলিল, চল তা হ'লে আমরাও যাই।

ঘাটের ঠিকাদার ঠিক সময়ে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে জোড়হাত করিয়া বলিল, বাবু, তা হ'লে আমার আরজির কথাটা মনে রাখবেন।

২০

সেদিন অপরাহ্লে দুর্যোগটা সম্পূর্ণ না কাটিলেও স্তিমিত হইয়া আসিল। বর্ষণ ক্ষান্ত হইয়াছে পশ্চিমের বাতাস স্তব্ধ হইয়া দক্ষিণ দিক হইতে মৃদু বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই বাতাসে আকাশের মেঘগুলি দিক্‌পরিবর্তন করিয়া উত্তর দিকে চলিয়াছে।

ইন্দ্র রায় কাছারির সামনের বারান্দায় মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিতেছিলেন; হাত দুইটি পিছনের দিকে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। একটা কলরব তুলিয়া অচিন্ত্যবাবু বাগানের ফটক খুলিয়া প্রবেশ করিলেন, গেল, এবার পাষণ্ড মেঘ গেল। বাপ রে, বাপ রে, বাপ রে। আজ ছদিন ধ'রে বিরাম নেই জলের। আর কি বাতাস! উঃ, ঠাণ্ডায় বাত ধ'রে গেল মশায়! তিনি আকাশের মেঘের দিকে মুখ তুলিয়া বলিলেন, এইবার? এইবার কি করবে বাছাধন? যেতে তো হ'ল 'বামুন বাদল বান, দক্ষিণে পেলেই যান'—দক্ষিণে বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে, যাও, এইবার যাও কোথায় যাবে।

রায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কি ব্যাপার? অনেক কাল পরে যে।

অচিন্ত্যবাবু সপ্রতিভভাবে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক দিন পরেই বটে। শরীর সুস্থ না থাকলে কি করি বলুন? অবশেষে কলকাতায় গিয়ে—। অকস্মাৎ অকারণে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, বলুন তো কি ব্যাপার?

হাসিতে হাসিতেই অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, দেখুন ভাল ক'রে দেখুন, দেখে বলুন। হেঁ হেঁ, পারলেন না তো?—বলিয়া আপনার দাঁতের উপর আঙুল রাখিয়া বলিলেন, দাঁত—দাঁত। পার্ল-লাইক টীথ, এই রকম মুক্তোর পাঁতির মত দাঁত ছিল আমার? পোকাখেকো কালো কালো দাঁত, মনে আছে?

এইবার ইন্দ্র রায়ের মন কৌতুকবোধে সচেতন হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তাই তো মশায়, সত্যিই এ যে মুক্তোর পাঁতির মত দাঁত!

সগর্বে অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, তুলিয়ে ফেললাম। ডাক্তার বললে কি জানেন? বললে, ওই দাঁতই তোমার ডিসপেপ্‌সিয়ার কারণ। এখন আপনার পাথর খেলে হজম হয়ে যাবে।

বলেন কি?

নি-শ্চ-য়। দেখুন না, ছ মাসের মধ্যে কি রকম বিশালকায় হয়ে উঠি। একেবারে যাকে বলে—ইয়ংম্যান। পরমুহূর্তেই অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জানেন? খাবারদাবার, মানে যাকে বলে পুষ্টিকর খাদ্য, সে তো এখানে খাওয়া যাচ্ছে না।

রায় বলিলেন, এটা আপনি অযথা নিন্দে করছেন আমাদের দেশের। দুধ-ঘি এসব তো প্রচুর পাওয়া যায় আমাদের এখানে।

বিষম তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে দুধ ও ঘিকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, আরে মশায়, কি যে বলেন আপনি, বিশেষ ক'রে নিজে তান্ত্রিক হয়ে, তার ঠিক নেই। দুধ-ঘিই যদি পুষ্টিকর খাদ্য হ'ত, তবে গরুই হ'ত পশুরাজ। মাংস—মাংস খেতে হবে, তবে দেহে বল হবে। দুধ-ঘি খেয়ে বড় জোর চর্বিতে ফুলে ষণ্ড হওয়া চলে, বুঝলেন?

রায় হাসিয়া বলিলেন, তা বটে, দুধ-ঘি খেয়ে ষণ্ড হওয়া চলে, পাষণ্ড হওয়া চলে না, এটা আপনি ঠিক বলেছেন।

অচিন্ত্যবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। অপ্রতিভভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিরক্তিভরে বলিলেন, আমিই বোকামি করলাম, আরও কিছুদিন কলকাতায় থাকলেই হ'ত। তা, একটা সাহেব কোম্পানির তাড়ায় এলাম চ'লে। ভাবলাম সাঁওতালদের একটা দুটো পয়সা দিয়ে একটা ক'রে হরিয়াল, কি তিতির, নিদেন ঘুঘু মারার ব্যবস্থা ক'রে নেব। তা ছাড়া এখানে বন্য শশকও তো প্রচুর পাওয়া যায়, সে পেলে না হয় দু গণ্ডা তিন গণ্ডা পয়সাই দেওয়া যাবে। শশক-মাংস নাকি অতি উপাদেয় অতি পুষ্টিকর। মানে, ওরা খায় যে একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ভিটামিন—ছোলা, মসুর, এই সবের ডগা খেয়েই তো ওদের দেহ তৈরী।

রায় বলিলেন, আজ আমি আপনাকে শশক-মাংস খাওয়াব, আমার এখানেই রাত্রে

খাবেন, নেমন্তন্ন করলাম। চরের সাঁওতালরা আজ ছুটো খরগোশ দিয়ে গেছে।

অচিন্ত্যবাবু হাসিয়া বলিলেন, সে আমি শুনেছি মশায়, বাড়িতে ব'সেই তার গন্ধ পেয়েছি।

রায় হাসিয়া উত্তর দিলেন, তা হ'লে, সিংহ ব্যাঘ্র না হ'তে পারলেও ইতিমধ্যেই আপনি অন্তত শৃগাল হয়ে উঠেছেন দেখছি। ঘ্রাণশক্তি অনেকটা বেড়েছে।

অচিন্ত্যবাবু অপ্রস্তুত হইয়া ঠোঁটের উপর খানিকটা হাসি টানিয়া বসিয়া রহিলেন। রায় বলিলেন, আসবেন তা হ'লে রাত্রে!

অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, বেশ। আবার এখন এই ভিজে মাটিতে ট্যাংট্যাং ক'রে যাচ্ছে কে, তাই আসব! সেই একেবারে খেয়ে-দেয়ে যাব। অম্বল ভাল হ'ল তো সর্দি টেনে আনব নাকি? তা ছাড়া আসল কথাই তো আপনাকে এখনো বলা হয় নি। এক্ষুণি বললাম না, সায়েব কোম্পানির কথা? এবার যা একটা ব্যবসার কথা ক'য়ে এসেছি, কি বলব আপনাকে, একেবারে তিন শ পারসেণ্ট লাভ; ছু'শ পারসেণ্টের আর মার নেই।

সকৌতুকে ভ্রূ ছুইটি ঈষৎ টানিয়া তুলিয়া রায় বলিলেন, বলেন কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। খসখস চালান দিতে হবে, খসখস বোঝেন তো?

তা বুঝি, বেনাঘাসের মূল।

অচিন্ত্যবাবু পরম সন্তুষ্ট হইয়া দীর্ঘস্বরে বলিলেন, হ্যাঁ। সাঁওতাল ব্যাটারা চর থেকে তুলে ফেলে দেয়, সেইগুলো নিয়ে আমরা সাপ্লাই করব। দেখুন হিসেব ক'রে, লাভ কত হয়।

রায় জবাব দিলেন না, খানিকটা হাসিলেন মাত্র। অন্দরের ভিতর হইতে শাঁখ বাজিয়া উঠিল, ঈষৎ চকিত হইয়া রায় চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, পশ্চিম-দিগন্তে অল্পমাত্রায় রক্তসন্ধ্যার আভাস থাকায় অন্ধকার তেমন ঘন হইয়া উঠিতে পারে নাই। গম্ভীরস্বরে তিনি ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন, তারা তারা! তারপর অচিন্ত্যবাবুকে বলিলেন, তা হ'লে আপনি একটু নায়েবের সঙ্গে ব'সে গল্প করুন, আমি সান্ধ্যকৃত্য শেষ ক'রে নিই।

অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, একটি গোপন কথা ব'লে নিই। মানে মাংস হ'লেও একটু ছুধের ব্যবস্থা আমার চাই কিন্তু, ব্যাপারটা হয়েছে কি জানেন, দাঁত তুলে দিয়ে ডাক্তারেরা বলেন বটে, আর হজমের গোলমাল হবে না আমি কিন্তু মশায়, অধিকন্তু না দোষায় ভেবে আফিং খানিকটা ক'রে আরম্ভ করেছি। বুঝলেন, তাতেই হয়েছে কি, ওই গব্যরস একটু না হ'লে আবার ঘুম আসছে না।

রায় মৃদু হাসিয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। একজন চাকর প্রদীপ ও প্রধূমিত ধূপদানি লইয়া কাছারির ছুয়ারে ছুয়ারে সন্ধ্যা দেখাইয়া ফিরিতেছিল, অন্য একজন চাকর ছুই-তিনটা লণ্ঠন আনিয়া ঘরে বাহিরে ছোট ছোট তেপায়াগুলির উপর রাখিয়া দিল।

সমৃদ্ধ রায় বংশের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে অন্তত: ছুই শ বৎসর পূর্বে, হয়তো দশ-বিশ বৎসর বেশীই হইবে, কম হইবে না। তাহার পূর্বকাল হইতেই রায়েরা তান্ত্রিক দীক্ষায় পুরুষানুক্রমে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছেন। ছোট রায়ের প্রপিতামহ অবধি তন্ত্রের একটা মোহময় প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন; আজও গল্প শোনা যায়, অমাবস্যা অষ্টমী প্রভৃতি পক্ষ পর্বে

তাঁহারা শ্মশানে গিয়া জপতপ করিতেন। তাহারও পূর্বে কেহ একজন নাকি লতাসাধনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। যুগের প্রভাবে তন্ত্রের সেই মোহময় প্রভাব এখন আর নাই। কিন্তু তবুও তন্ত্রকে একেবারে তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইন্দ্র রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় তন্ত্রমতে সায়ংসন্ধ্যায় বসেন, তখন গলায় থাকে রুদ্রাক্ষের মালা, কাঁধের উপর থাকে কালী-নামাবলী, সম্মুখে থাকে নারিকেলের খোলার একটি পাত্র আর থাকে মদের বোতল ও কিছু খাদ্য—মৎস্য বা মাংস। এক-একবার নারিকেলের মালার পাত্রটি পরিপূর্ণ করিয়া জপতপ ও নানা মুদ্রাভঙ্গিতে তাহা শোধন করিয়া লইয়া পান করেন, তাহার পর আবার আরম্ভ করেন ধ্যান ও জপ; একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ শেষ করিয়া আবার দ্বিতীয় বার পাত্র পূর্ণ করিয়া ওই ক্রিয়ারই পুনরাবৃত্তি করেন। এমনি ভাবে তিন বারে তৃতীয় পাত্র শেষ করিয়া তিনি সান্ধ্যকৃত্য শেষ করেন, কিন্তু ইহাতেই তাঁহার দেড় ঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টা কাটিয়া যায়, তিন পাত্রের অধিক তিনি সাধারণত পান করেন না।

হেমাঙ্গিনী স্বামীর সান্ধ্যকৃত্যের আয়োজন করিয়াই রাখিয়াছিলেন, ইন্দ্র রায় আসিয়া কাপড় বদলাইয়া আসন গ্রহণ করিতেই তিনি গৃহদেবী কালীমায়ের প্রসাদী কিছু মাছ আনিয়া নামাইয়া দিলেন। রায় বলিলেন, দেখ, আচন্ত্যবাবুকে আজ নেমন্তন্ন করেছি, তাঁর দুধ একটু ঘন ক'রেই জ্বাল দিয়ে রেখো। ভদ্রলোক আফিং ধরেছেন, ঘন দুধ না হ'লে তৃপ্তি হবে না।

হাসিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বেশ। কিন্তু আর কাউকে নেমন্তন্ন কর নি তো? তোমার তো আবার নারদের নেমন্তন্ন!

না। রায় একটু হাসিলেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, আজ তুমি কি এত ভাবছ বল তো?

নাঃ, ভাবি নি কিছু।

রায়ের কথার সুরের মধ্যে একটি ক্ষীণ ক্লান্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল বলিয়া হেমাঙ্গিনীর মনে হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কুণ্ঠিতভাবে হেমাঙ্গিনী বলিলেন, অমল ছেলেমানুষ, সে কাজটা ছেলেমানুষি ক'রেই করেছে, সেটা—

এইভাবে বাধা দিয়ে রায় বলিলেন, ও-কথা উচ্চারণ ক'রো না হেম; তুমি কি আমাকে এমন সঙ্কীর্ণ ভাব? এই সন্ধ্যা করবার আসনে ব'সেই বলছি হেম, সত্যিই আমার আর কোন বিদ্বেষ নেই রামেশ্বর বা তার ছেলেদের ওপর। সুনীতির বড়ছেলে রাধারাণীর মর্যাদা রাখতে যা করেছে, তাতে রাধুর গর্ভের সন্তানের সঙ্গে তাদের কোন পার্থক্য আর থাকতে দেয় নি।

হেমাঙ্গিনী চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিতে মন যেন তাঁহার সায় দিল না। রায় হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে আমি সন্ধ্যাটা সেরে নিই, তুমি নিজে দাঁড়িয়ে রান্নাবান্নাটা দেখে দাও বরং ততক্ষণ।

হেমাঙ্গিনী চলিয়া গেলেন।

রায় একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইষ্টদেবীকে পরম আন্তরিকতার সহিত স্মরণ করিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, তারা, তারা! সবই তোমার ইচ্ছা মা। তারপর তিনি শাস্ত্রবিধান-অনুযায়ী

ভঙ্গিতে আসন করিয়া সান্ধ্যকৃত্য আরম্ভ করিলেন।

হেমাঙ্গিনীর ভুল হইবার কথা নয়। দুর্দান্ত কৌশলী হইলেও ইন্দ্র রায় হেমাঙ্গিনীর নিকট ছিলেন শান্ত সরল উদার। একবিন্দু কপটতার ছায়া কোনদিন তাঁহার মনোতল ছায়াবৃত করিয়া হেমাঙ্গিনীর দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত বা প্রতারিত করে নাই। অমল অহীন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, এ সংবাদ শুনিবামাত্র রায়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়া সামাজিক নিমন্ত্রণ-ব্যবহার বন্ধ না হইলেও, ছোট রায়-বাড়ি ও চক্রবর্তী-বাড়ির মধ্যে আহার-ব্যবহারটা রাধারাণীর নিরুদ্দেশের পর হইতে প্রকৃতপক্ষে বন্ধই ছিল। সামাজিক ক্রিয়াকলাপে দুই বাড়িই ব্রাহ্মণ কর্মচারী বা আপন আপন পূজক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া সামাজিক দায়িত্ব রক্ষা করিতেন।

তাহার পর অকস্মাৎ যেদিন ইন্দ্র রায়েরই নিয়োজিত ননী পাল চক্রবর্তীদের অপমান করিতে গিয়া রায়-বংশেরই কন্যার অপমান করিয়া বসিল এবং সে অপমানের প্রতিশোধে চক্রবর্তী-বংশের সন্তান মহীন্দ্র তাহাকে হত্যা করিয়া ফাঁসি বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত হইল, সেদিন হইতে ইন্দ্র রায় যা-কিছু করিয়া আসিতেছেন, সে সমস্ত দানের প্রতিদান হিসাবেই করিয়া আসিতেছেন, অন্তত তাঁহার মনে সেই ধারণাই ছিল। অহীন্দ্র এখানে আসিলে জল খাইয়া যাইত বা অমল অহীন্দ্রের বাড়িতে কিছু খাইয়া আসিত, তাহার অতি অল্পই তিনি জানিতেন, বেশির ভাগই ছিল তাঁহার অজ্ঞাত। যেটুকু জানিতেন, সেটুকুকে শুষ্ক শিষ্টাচার বলিয়াই গণ্য করিতেন। দানের প্রতিদানে, তাঁহার দিকের প্রতিদানের ওজনটাই ভারী করিবার ব্যগ্রতায় তিনি চলিয়াছিলেন। আজ যে তিনি সহসা অনুভব করিলেন যে, এই চলার বেগটা তাঁহার স্বেচ্ছা-আরোপিত বেগ নয়, নিজের ইচ্ছায় নিজের বেগেই তিনি চলিতেছেন না; অপরের চালনায় তিনি চালিত হইয়া চলিয়াছেন। আপনার সমস্ত চৈতন্যকে সতর্ক করিয়া রায় চারিটি দিক চাহিয়া দেখিলেন, তারপর চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখের দিকে। অদৃষ্টবাদী হিন্দুর মন তাঁহার, তিনি চারিদিকে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু কিছু যেন অনুভব করিলেন এবং সম্মুখের সমস্ত পথটা দেখিলেন এক রহস্যময় অন্ধকারের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য। তিনি পিছন ফিরিয়া পশ্চাতের পথের আকৃতি দেখিয়া সম্মুখের ওই অন্ধকারাবৃত পথের প্রকৃতি অনুমান করিতে গিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। চক্রবর্তী-বাড়ির জীবন-পথ যেখানেই রায়-বাড়ির জীবন-পথের সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছে, সেইখানেই একটা করিয়া ভাঙনের অন্ধকারময় খাত অতল অন্ধকূপের মত জাগিয়া রহিয়াছে।

কিন্তু উপায় কোথায়? দিক পরিবর্তন করিয়া চলিবার কথা মনে হইয়াছে; কিন্তু সেও পরম লজ্জার কথা। মনের ওজনে দান-প্রতিদানের পাল্লার দিকে চাহিয়া তিনি যে স্পষ্ট দেখিতেছেন, চক্রবর্তী-বাড়ির দানের পাল্লা এখনও মাটির উপর অনড় হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, সন্তান সম্পদ সব যে চক্রবর্তী-বাড়ি পাল্লাটার উপর চাপাইয়াছে। সুনীতি অহীন্দ্র গভীর বিশ্বাসের সহিত সকরুণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে তাহাদের পাওনা পাইবার প্রত্যাশায়।

জপ করিয়া শোধন-করা সুরাপূর্ণ পানপাত্র তুলিয়া পান করিয়া রায় গভীরস্বরে আবার

ডাকিলেন, কালী! কালী! মা! তারপর আবার তিনি জপে বসিলেন। কিন্তু কাছারি-বাড়ি হইতে অচিন্ত্যবাবুর চিলের মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আসিতেছে; লোকটা কাহারও সহিত চীৎকার করিয়া ঝগড়া বা তর্ক করিতেছে। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই আপনাকে সংযত করিয়া প্রগাঢ়তর নিষ্ঠার সহিত সকল ইন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করিয়া তিনি ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

অচিন্ত্যবাবু ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন অমল ও অহীন্দ্রের উপর। সন্ধ্যার পর তাহারা দুইজনে বেড়াইয়া আসিয়া চা পান করিতে করিতে পলিটিক্সের আলোচনা করিতেছিল। অচিন্ত্যবাবু নায়েবের কাছে বসিয়া অনর্গল বকিতেছিলেন, সহসা চায়ের পেয়ালা পিরিচের ঠুং ঠাং শব্দ শুনিবামাত্র তিনি সে-ঘর হইতে উঠিয়া অমলদের আসরে জাঁকিয়া বসিলেন। অমল তীব্রভাবে ইংরেজ-রাজত্বের শোষণ-নীতির সমালোচনা কবিতেছিল।

অহীন্দ্র বলিল, পরাধীন জাতির এই অদৃষ্ট অমল, পরাধীনতা থেকে মুক্ত না হলে এ শোষণ থেকে অব্যাহতির উপায় নেই।

পুতুলনাচের পুতুলের মত অচিন্ত্যবাবুর মুখ চায়ের কাপ হইতে অহীন্দ্রের দিকে ফিরিয়া গেল, সবিস্ময়ে অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, কি? ইংরেজ-রাজত্ব তুমি উল্‌টে দিতে চাও?

ঈষৎ হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, চাইলেও সে ক্ষমতা আমার নেই, তবে অন্তরে অন্তরে সকলেই স্বাধীনতা চায়, এটা সর্বজনীন সত্য।

তক্তাপোশের উপর একটা চাপড় মারিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, নো নো, নো—। বলিতে বলিতে উত্তেজনার চাঞ্চল্যে খানিকটা গরম চা তাঁহার কাপড়ে পড়িয়া গেল, ফলে তাঁহার বক্তব্য আর শেষ হইল না, চায়ের কাপ সামলাইতে তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

অমল বলিল, আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন!

অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, উত্তেজিত হব না? সাহেবদের তাড়িয়ে কি রাজত্ব করবে তোমরা বাপু? বলে, হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে চায়। এমন বিচার করবার তোমাদের ক্ষমতা আছে? তোমরা আজ চাকর রাখবে, কাল তাড়াবে কুকুরের মত। কই, গভর্নমেণ্টের একটা পিওনের চাকরি সহজে যাক তো দেখি! তারপর বুড়ো হ'লো তো পেনশান! আছে এ বিবেচনা তোমাদের?

অমল ও অহীন্দ্র উভয়েই এবার হাসিয়া ফেলিল।

অচিন্ত্যবাবু চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন, হেসো না, বুঝলে, হেসো না। এই হ'ল তোমাদের জাতের স্বভাব—বড়কে ছোট ক'রে হাসা আর ভায়ে ভায়ে লাঠালাঠি করা। ইংরেজ হ'ল আমাদের ভাই, তাদের লাঠি মেরে তাড়িয়ে নিজেরা রাজত্ব করবে? বাঃ, বেশ!

অমল ও অহীন্দ্র উভয়েই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অচিন্ত্যবাবু এবার অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোমরা তো অত্যন্ত ফাজিল ছেলে হে! বলি, এমন ফ্যাকফ্যাক ক'রে হাসছ কেন শুনি?

অমল বলিল, ইংরেজ আমাদের ভাই ?

তক্তাপোশের উপর প্রাণপণ শক্তিতে আবার একটা চাপড় মারিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, নিশ্চয়, সার্টেন্‌লি। ইংরেজ আমাদের ভাই, জ্ঞাতি, এক বংশ। পড়নি ইতিহাস! ওরাও আর্য, আমরাও আর্য। আরও প্রমাণ চাও? ভাষার কথা ভেবে দেখ। আমরা বাবাকে প্রাচীন ভাষায় বলি, পিতা পিতর্‌, ওরা বলে ফাদার। মাতর্‌ মাদার, বাবা, পাপা। ভ্রাতা ব্রাদার। তফাত কোনখানে হে বাবু? আমরা ভয় পেলে বলি হরি-বোল হরি-বোল, ওরা বলে হরিবল্‌ হরিবল্‌। চামড়ার তফাতটা তো বাইরের তফাত হে, সেটা কেবল দেশভেদে, জলবাতাস ভেদে হয়েছে।

তর্কটা আর অগ্রসর হইতে পারিল না, নায়েব আসিয়া বাধা দিল। বলিল, অচিন্ত্যবাবু, আপনি একটু থামুন মশায়, একটি বাইরের ভদ্রলোক এসেছেন, ধনী মহাজন লোক; কি ভাববেন বলুন তো?

অচিন্ত্যবাবু মুহূর্তে তর্ক থামাইয়া দিয়া ভদ্রলোক সম্বন্ধে উৎসুক হইয়া উঠিলেন, এ-ঘর ছাড়িয়া ও-ঘরে ভদ্রলোকটির সম্মুখে গিয়া চাপিয়া বসিয়া বলিলেন, নমস্কার, মহাশয়ের নিবাসটি জানতে পারি কি?

প্রতি-নমস্কার করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, আমার বাড়ি অবশ্য কলকাতায়, তবে কর্মস্থল আমার এখন এই জেলাতেই। সদর থেকেই আমি এসেছি।

এখানে—মানে, কি উদ্দেশ্যে—যদি অবশ্য—

আমি এখানে একটা চিনির কল করতে চাই। শুনেছি নদীর ও-পারে একটা চর উঠেছে, সেখানে আখের চাষ ভাল হ'তে পারে, তাই দেখতে এসেছি জায়গাটা।

অচিন্ত্যবাবু গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বেনার মূলের ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতা অনুভব করিয়া নীরবে গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন। নায়েব বলিল, আপনি বসুন একটু, আমি দেখি, কর্তাবাবুর সন্ধ্যা শেষ হয়েছে কিনা।

নায়েব বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, মা!

হেমাঙ্গিনী মাথার ঘোমটা অল্প বাড়াইয়া দিয়া ঘর হইতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, কিছু বলছেন?

আজ্ঞে, কর্তাবাবুর সন্ধ্যা শেষ হয়েছে?

তা হয়ে থাকবে বৈকি। কোনও দরকার আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, একটি ভদ্রলোক এসেছেন, চক্রবর্তী-বাড়ির ওই চরটা দেখবেন। তিনি একটা চিনির কল বসাবেন। আমাদের এখানে এসে উঠেছেন।

ও। আচ্ছা, আমি খবর দিচ্ছি, আপনি যান। চা জলখাবারও পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নায়েব চলিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী চায়ের জল বসাইয়া দিতে বলিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। অর্ধেকটা সিঁড়ি উঠিয়াই তিনি শুনিতে পাইলেন মৃদুস্বরে রায় আজ গান গাহিতেছেন—"সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।" তিনি একটু বিস্মিত হইয়া গেলেন, গান তো

রায় বড় একটা গান না। অভ্যাসমত তিন পাত্র 'কারণ' পান করিলে তিনি কখনও এতটুকু অস্বাভাবিক হন না। পর্ব বা বিশেষ কারণে তিন পাত্রের অধিক পান করিলে কখনও কখনও গান গাহিয়া থাকেন। হেমাঙ্গিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে সুরাপূর্ণ পাত্র রাখিয়া রায় মৃদুস্বরে গান গাহিতেছেন। তিনি বেশ বুঝিলেন, সন্ধ্যা শেষ হইয়া গিয়াছে, রায় আজ নিয়মের অতিরিক্ত পান করিতেছেন। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, এ কি? সন্ধ্যে তো হয়ে গেছে, তবে যে আবার নিয়ে বসেছ?

মত্ততার আবেশমাখা মৃদু হাসি হাসিয়া রায় হাত দিয়া পাশেই স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়া বলিলেন, ব'স ব'স। মাকে ডাকছি আমার। আমার সদানন্দময়ী মা। তিনি আবার পূর্ণপাত্র তুলিয়া লইলেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, ওই শেষ কর। আর খেতে পাবে না।

রায় বলিলেন, আজ আনন্দের দিন। চক্রবর্তী-বাড়ি আর রায়-বাড়ির বিরোধের শেষ কাঁটাও আজ মা তুলে দিলেন। আনন্দ করব না? পাঁচ হয়েছে সাত শেষ করব হেম, সাত-পাঁচ ভাবা আজ শেষ ক'রে দিলাম।

বলিয়া হেমাঙ্গিনীর মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া আবার গান ধরিলেন, "সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।"

২১

চিনির-কল-ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটির নাম বিমলবাবু। বিমলবাবু পরদিন সকালে গিয়া চর দেখিয়া আসিলেন। রাত্রের মধ্যে বান অনেক কমিয়াছে, তবুও চরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এখনও জলমগ্ন; সেই অবস্থাতেই তিনি চরটি দেখিয়া খুশি হইয়া উঠিলেন। সকলের চেয়ে বেশী খুশি হইলেন তিনি সাঁওতালদের দেখিয়া। ছোট রায়-বাড়ির নায়েব মিত্তির ছিল তাঁহার সঙ্গে, বিমলবাবু মিত্তিরকে বলিলেন, অদ্ভুত জাত মশায় এরা, যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি কি খাটে! আমাদের দেশী লোকের মত নয়, ফাঁকি দেয় না।

মিত্তির মৃদু হাসিয়া বিমলবাবু অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া বলিল, তাও অনেক ফাঁকি দিতে শিখেছে মশায়, আজকাল। ধীরে ধীরে শিখছে, বুঝলেন না? যখন ওরা প্রথম এল এখানে, তখন একটা লোকে যা কাজ করত, এখন সেই কাজ করে দুটো লোকে; দেড়টা লোক তো লাগেই।

বিমলবাবু ব্যবসায়ী লোক, কয়েকটি কলের মালিক, শ্রমিক মজুরদের সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রচুর। তাহার উপর তিনি উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক; মিত্তিরের কথা শুনিয়া তিনি একটু হাসিলেন, বলিলেন, কিন্তু এখনও ওরা একজনে যা করে, সে-কাজ করতে আমাদের দেশী লোক অন্তত দেড়টা লাগে। দুটোই বলতাম, তা আপনার ভয়ে দেড়টাই বলছি।

মিত্তির এবার সন্তোষের হাসি হাসিল। বিমলবাবু তাহাকে ভয় করিয়া কথা বলিতেছেন, এইটুকু তাহার বেশ ভালই লাগিল। হাসিয়া বিমলবাবুর কথা মানিয়া লইয়াই সে এবার বলিল, তা বটে।

বিমলবাবু বলিলেন, চলুন, একবার ওদের পাড়ার মধ্যে যাওয়া যাক। একটু আলাপ ক'রে রাখা যাক। কল চালাতে হ'লে ওদের না হ'লে তো চলবে না।

শ্রীবাসের দোকানের সম্মুখ দিয়াই পথ, দোকানের সম্মুখে আসিয়াই মিত্তির বলিল, ওরে বাপ রে। এখানেই যে সব ভিড় লাগিয়ে রয়েছিস রে মাঝিরা! কি করছিস্ সব এখানে?

শ্রীবাসের দোকানে বসিয়া মাঝিরা বাকির খাতায় টিপ-সহি দিতেছিল। শ্রীবাস একটি হুঁকা হাতে বসিয়া সমস্ত দেখিয়া লইতেছিল। মিত্তির ও অপরিচিত বিমলবাবুকে দেখিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি হুঁকাটি রাখিয়া উঠিয়া পথে নামিয়া আসিল, অর্ধনত হইয়া একটি নমস্কার করিয়া বলিল, পেনাম। তারপর, মিত্তির মশায়, কোন্ দিকে? এই বন্তের মধ্যে? আর এই বাবুটি?

মিত্তির হাসিয়া বলিল, ইনি হলেন কলকাতার লোক, এসেছেন চর দেখতে। এখানে একটা চিনির কল করবেন। তাই এসেছিলাম ওঁকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর তোমার এখানে এত ভিড় কিসের?

চিনির কল করবেন? বিস্ময়ে শ্রীবাসের চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

চিনির কলও হবে, সঙ্গে সঙ্গে আখের চাষও হবে। কিন্তু আপনার নামটি কি? দোকানটি আপনার? বিমলবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শ্রীবাসের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীবাসের মুখ কঠিন অসন্তোষে শুষ্ক হইয়া উঠিল, সে বলিল, কল কি এখানে চলবে আপনার? এত আখ পাবেন কোথা?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, কল হ'লেই চারিদিকে আখের চাষ বেড়ে উঠবে। দোকান আপনার খুব ভাল চলবে দেখবেন। তার ওপর জমিও বোধ হয় আছে আপনার এখানে, তাতেও আরম্ভ করুন আখের চাষ। কল আপনাদের অনিষ্ট করবে না, ভালই করবে। ভাল কথা, এখানে এবারেই আমার পনেরো লাখ ইঁট হবে। আপনার তো দোকান এই চরের ওপরেই? আমার অনেক কুলী আসবে শহর থেকে ইঁট তৈরী করবার জন্যে, দু মাসের মধ্যেই এসে পড়বে, দোকান আপনি বাড়িয়ে ফেলুন।

শ্রীবাসের মুখ ধীরে ধীরে কোমল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে এবার বলিল, তা আপনাদের মত ধনী যেখানে আসবে, সেখানে তো দশের অবস্থা ভালই হবে। দোকান আমি হুকুম হ'লেই বাড়াব। আর দেখতে শুনতে যা-হয় আমিই সব দেখে-শুনে দেব। এই দেখুন, এইসব সাঁওতাল বেবাক আমার তাঁবে। আমার কাছেই ধান খায় বছর বছর। এক নেয়, এক দেয়। ওদের সঙ্গে খুব সুখ আমার। লোকজন যা দরকার হবে, সব আমি ঠিক ক'রে দেব।

মিস্তির বলিল, আজকে এত ভিড় কিসের হে ?

আজ্ঞে, আজ ওদের 'রোয়া' পরব। মানে, চাষের জল তো লেগে গেল, তা ধান রুইবার আগে ওরা পুজো-টুজো দেবে। তারপর চাষে লাগবে। তাই সব জিনিসপত্তর নিচ্ছে, আর খোরাকির ধানও নিচ্ছে।

বিমলবাবু বলিলেন, তাই নাকি, আজ ওদের পর্ব ? তা হ'লে তো বড় ভাল দিনে এসে পড়েছি। বাঃ ! কই ওদের সর্দার কই ?

সাঁওতালদের সমস্ত দলটি নীরবে বসিয়া এক বিচিত্র দৃষ্টিতে বিমলবাবুকে দেখিতেছিল, বিস্ময়, ভয়, শ্রদ্ধা, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছু সে দৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পাইতেছিল ! বিমলবাবুর আহ্বানেও কমল সাড়া দিল না, তাহার প্রকাণ্ড দেহ লইয়া সে বিমলবাবুকে দেখিয়া খানিকটা নড়িয়া চড়িয়া বসিল মাত্র। শ্রীবাস ব্যস্ত হইয়া উঠিল, সম্ভ্রম ও সাঁওতালদের উপর আধিপত্য দুইই একসঙ্গে দেখাইয়া বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলিল, এই কমল মাঝি, কানে তোর ঢুকছে না, না কি ? এইদিকে আয়। কত বড়লোক ডাকছেন, দেখছিস্ না ?

কমল এবার উঠিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া নত হইয়া প্রণাম জানাইয়া বলিল, কি বলছিস আপুনি ?

হাসিয়া বিমলবাবু পরিষ্কার সাঁওতালী ভাষায় বলিলেন, তুমি এখানকার সর্দার ?

উপবিষ্ট সাঁওতালদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তাহাদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠিল, এই, এই, বাবু আমাদের কথা বুলছে, আমাদের কথা বুলছে ! উ বাবা রে !

বিমলবাবু সাঁওতালীতেই বলিলেন, হ্যাঁ, তোদের ভাষাতেই কথা বলছি আমি।

কমল ভাঙা ভাঙা বাংলাতেই প্রশ্ন করিল, আমাদের ভাষা আপুনি কি ক'রে জানলিন বাবু ?

আমার কাছে অনেক সাঁওতাল কাজ করে। আমার তিনটে কল আছে। কল বুঝিস তো ?

হঁ হঁ। আপুনি চলে, খুব ধুঁয়া উঠে হিসহিস ক'রে। একটা এই মোটা, এই বড় লোহার চোঙা থেকে ধুঁয়া উঠে, গুমগুম শব্দ উঠে। বয়লা চলে, রিঞ্জি চলে—

হ্যাঁ। বয়লার-এঞ্জিনে কাজ হয় কলে। এখানেও একটি কল করব আমি। তোরা সব কাজ করবি। তারপর, আজ তোদের রোয়া পরব বটে, নয় ?

কমলের বড় বড় হলুদ রঙের দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িল, বলিল, তাই তো করছি গো। জল তো অনেক হয়ে গেল। বীজ চারা-গুলান বড় হইছে, আর ব'সে থেকে কি হবে ?

ঠিক ঠিক। তা, চিত কোপে জম এঃয়া ? আজ কি কি খাওয়া-দাওয়া হবে রে, অ্যাঁ ?

হাসিয়া কমল এবার নিজের ভাষাতেই বলিল, জেল, দাকা, হাণ্ডি।

ওঃ, তা হ'লে তো আজ ভোজ রে তোদের ! মাংস, ভাত, পচুই—অনেক ব্যাপার যে ! কত হাণ্ডি করেছিস ?

সলজ্জভাবে কমল বলিল, করলম, তা মেলাই হবে গো ! মেয়েগুলো খাবে, আমরা খাব,

তবে তো আমোদ হবে।

ঠিক ঠিক। তা বেশ! এই নে, আজ তোদের পরবের দিন, খাওয়া-দাওয়া করবি।—বলিয়া মনিব্যাগ বাহির করিয়া ব্যাগ হইতে একখানি নোট বাহির করিয়া কমলের হাতে দিলেন। কমল সন্তর্পণে নোটখানির দুই প্রান্ত দুই হাতের আঙুল দিয়া ধরিয়া সবিস্ময়ে নোটখানার ছাপের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিমলবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, 'গেল্' টাকা, দশ টাকা পাবি ওটা দিলে।

সমস্ত দলটি সবিস্ময়ে এবার কলরব করিয়া উঠিল।

বিমলবাবু হাসিয়া মিত্তিরকে বলিলেন, চলুন তা হ'লে এবার। আসি এখন দোকানী মশায়। চললাম রে মাঝি।

কমল বলিল, হঁ-হঁ, আসুন গা আপুনি। খাটব, আপনার কলে আমরা খাটব।

সাঁওতাল-পল্লীর মাঝখান দিয়া পরিচ্ছন্ন মেটে পথটি এই কয় দিনের প্রচণ্ড বর্ষণে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়াই ছিল; তাহার উপর পর্ব উপলক্ষে মেয়েরা পথের উপর ঝাঁটা বুলাইয়াছে। প্রত্যেক বাড়ির দুয়ারে মুখে মুখে একটি করিয়া মাড়ুলি দিয়াছে। আপনাদের উঠানে মেয়েগুলি আজ খুব ব্যস্ত। তৎপরতার সহিত কাজ করিয়া ফিরিতেছে। ছোট ছোট মেয়েগুলি আঁচলে ভরিয়া শাক সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে। আজিকার পর্বে শাক একটা প্রধান উপকরণ।

চলিতে চলিতে মিত্তির বিকৃত মুখে বার বার জোরে জোরে নিশ্বাস টানিতে টানিতে বলিল, উঃ, মদে আজ ব্যাটারা বান ডাকিয়ে দেবে। পচুইয়ের গন্ধ উঠেছে দেখুন দেখি।

বিমলবাবু বলিলেন, প্রত্যেক বাড়িতে মদ তৈরি হচ্ছে আজ। পরব কিনা! পরবে ওরা কখনও দোকানের মদ কিনে খায় না; দোকানের মদ হ'ল অপবিত্র। আর তা ছাড়া পয়সাও লাগবে বেশি। মদের কথা বলিতে বলিতেই বিমলবাবুর যেন একটা জরুরী কথা মনে পড়িয়া গেল। কথার স্বরে ও ভঙ্গিমায় গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি বলিলেন, ভাল কথা, এখানে পচুইয়ের দোকান সবচেয়ে কাছে কোথায় বলুন তো?

মিত্তির বিস্ময় বোধ করিয়াও না হাসিয়া পারিল না। হাসিয়া বলিল, হঠাৎ পচুইয়ের দোকানের খোঁজ?—বলিয়াই হঠাৎ মিত্তির বিমলবাবুর মতলবটা অনুমান করিয়া লইল; বলিল, বুঝেছি, মেয়া চাই। মাছধরার বাতিক কি কলিকাতার বাবুদের সবারই মশাই? তা আমার বাবুর পুকুরে খুব বড় বড় মাছ, এক-একটা আঠারো সের, বিশ সের, বাইশ সের।

বিমলবাবু বললেন, না, মাছ ধরবার জন্যে নয়। আমার কুলী আসবে এখানে। পগমিল, বক্‌স মোল্ডিঙের লোক তো এখানে মিলবে না। অন্তত ষাট-সত্তরজন কুলী আসবে। পচুইয়ের দোকান কাছে না থাকলে তো অসুবিধা হবে।

বার বার ঘাড় নাড়িয়া ব্যাপারটা উপলব্ধি করিয়া মিত্তির বলিল, অ্যাই দেখুন, এই নইলে কি পাকা ব্যবসাদার হওয়া যায়? বটে, মশাই বটে! দিষ্টি রাখতে হবে চারদিকে। তা,

পচুইয়ের দোকান আপনার একটুকু দূরেই হবে। ক্রোশ দুয়ের কম নয়।

বিমলবাবু পকেট হইতে নোটবই বাহির করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়াই কথাটি নোট করিয়া লইলেন এবং তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, একটা দোকান স্যাংশন করিয়ে নেব এই-খানেই। কল হ'লে তো চাইই তা, আগে থেকেই ব্যবস্থা ক'রে নেব।

পথের ধারেই একটি ঘনপল্লব কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায় কতকগুলি সাঁওতালদের মেয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। গাছটির গোড়ায় সুন্দর একটি মাটির বেদী ও বেদীর চারিপাশে খানিকটা জায়গা গোবর ও মাটি দিয়া অপূর্ব পরিচ্ছন্নতার সহিত নিকানো; বেদীটির চারিদিক খড়ি-মাটির আলপনা দিয়া চিত্রিত করিয়া তোলা। মেয়েগুলি তখনও সম্মুখের নিকানো জায়গাটির উপর খড়িমাটির গোলা দিয়া আলপনার ছবি আঁকিতেছিল—পাখী ও পশুর ছবি, তাহার পাশে পাশে খেজুরগাছের ডালপালা, ধানগাছের ছবি; একটি মেয়ে আলপনার সাদা রেখার মধ্যে মধ্যে সিঁদুরের লাল টোপা দিতেছিল। দিতে দিতে মৃদুস্বরে সকলে মিলিয়া পর্বের কল্যাণী-গান গাহিতেছিল—

ঠাকুরাহি সিরিজিলা ইনা পিরথিমা হো,
ঠাকুরাহি সিরিজিলা গাইয়া জো ইয়ারে,
পুরুবাহি ডাহারালি গাইয়া জো ইয়ারে,
পুরুবাহি ডাহারালি—গাইয়া জো—

বিমলবাবু মৃদু হাসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; তাঁহাদের আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল। মেয়েদের দলও সবিস্ময়ে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহাদেরও গান মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া আসিয়াছিল। বেশীর ভাগ মেয়েরাই গান বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, গাহিতেছিল কেবল দুই-একজন প্রবীণা। মাঙ্গলিক গান তাহারা বন্ধ করিবে কি করিয়া?

মিত্তির বলিল, চলুন, চলুন।

মেয়েদের দল হইতে সেই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি, কমল মাঝির নাতনী সারী, আগাইয়া আসিয়া বলিল, একটি ধার দিয়ে যা গো বাবুরা। ই-ঠিনে আমাদের পূজো হবে।

কতকগুলো ছেলে মাথায় ফুলওয়ালা গোটাকয়েক লালরঙের মোরগের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। মহা উৎসাহ তাহাদের; আপনাদের ভাষায় অতিমাত্রায় মুখর পাখীর মত একসঙ্গে কলরব করিয়া বকিয়া চলিয়াছে। মিত্তির বলিল, ওরে বাপ রে। এতগুলো মুরগী আজ তোরা খাবি নাকি?

সারী বলিল, কেনে, উ কথা বুলছিস কেনে? তুর লোভ হচ্ছে নাকি?

মিত্তির বৈষ্ণব মানুষ, সে ঘৃণায় থুথু ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, রাম রাম রাম। অ্যাঁ, ই হারামজাদা মেয়ে বলে কি গো?

সারী বলিল, তবে তু খাবার কথা বুলছিস কেনে? উ আমরা দেবতাকে দিব। কাটব এই দেবতা-থানে। তারপর কুটিকুটি ক'রে একটি মাটিতে পুঁতব, আর সবগুলো বাঁধব। আগে থেকে খাবার কথা তু বুলছিস কেনে?

মিত্তির মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, চলুন মশায়, চলুন, আমার গা ঘিন-ঘিন করছে।

বিমলবাবু দেখিতেছিলেন সারীকে। চলিবার জন্য পা বাড়াইয়া তিনি বলিলেন, বাঃ, মেয়েটির দেহখানি চমৎকার, tall, graceful,—youth personified.

সারী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, কি বুলছিস তু উ-সব ?

মৃদু হাসিয়া বিমলবাবু অগ্রসর হইয়া গেলেন, কথার কোন উত্তর দিলেন না। নদীর পার-ঘাটের পাশেই অপেক্ষাকৃত বড় বড় সাঁওতাল ছেলেগুলি গরু-মহিষগুলিকে পরিপাটি করিয়া স্নান করাইতেছিল। কয়টা ছেলে আজও লম্বা লাঠি লইয়া জলের ধারের গর্তগুলিতে খোঁচা দিয়া শিকারের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

* * *

মিত্তির ও বিমলবাবু চলিয়া যাইতেই শ্রীবাস গভীর চিন্তান্বিত মুখে দোকানের সামনে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। এখানে চিনির কল হইবে। চরখানা বাড়িঘর লোকজনে ভরিয়া যাইবে। হ্যাঁ, দোকানটা বড় করিতেই হইবে। বর্ষার শেষেই একখানা লম্বা তিনকুঠারী ঘর আরম্ভ করিয়া দেওয়া চাইই। ঘরের বনিয়াদ ও মেঝেটা পাকা করিলেই ভাল হয়। যে ইঁদুরের উপদ্রব! ওই বাবুর ইঁট তো অনেক হইবে, পনেরো লাখ। তাহা হইতে ভাঙা-চোরা যাহা পড়িয়া থাকিবে, তাহাতেই তো একটা প্রকাণ্ড দালান তৈয়ারি হইতে পারিবে। আর লোক-জনের সঙ্গে একটু, যাহাকে বলে সুখ, সেই সুখ থাকিলে—। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবাসের ঠোঁটের ডগায় অতি মৃদু একটি হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই আবার সে গম্ভীর হইয়া পড়িল। আঃ, আরও খানিকটা জমি যদি সে দখল করিয়া রাখিত! জমির দাম হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইবে। দুই শ আড়াই শ টাকা বিঘা তো কথাই নাই!

সাঁওতালের দল শ্রীবাসের অপেক্ষাতেই বসিয়াছিল, তাহাদের কাজ-কর্ম বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। হিসাবের খাতায় টিপছাপ দিবার পর ধান মাপা হইবে। ওদিকে 'রোয়া' পর্বের সমারোহ তাহাদের বর্বর মনকে মুহুর্মুহু আকর্ষণ করিতেছে। তাহারা ক্রমাগত নড়িয়া চড়িয়া বসিতেছিল, আর ব্যগ্রদৃষ্টিতে শ্রীবাসকে লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার উপর এই আকস্মিক টাকাপ্রাপ্তিতে পর্বটা আরও রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। চূড়া, সেই কাঠের পুতুলের ওস্তাদ রসিক সাঁওতালটি, দেখিয়া শুনিয়া বলিয়া উঠিল, এ বাবা গো! মোড়লের আমাদের হ'ল কি? ডাঁশ কামড়াচ্ছে নাকি গো? এমন ক'রে ঘুরছে কেনে? ও সর্দার! তোমার মুখ কি কেউ সেলাই ক'রে দিলে নাকি?

কমল এবার ডাকিল, মোড়ল মশায় গো!

শ্রীবাস ঈষৎ চকিত হইয়া বলিল, কি? ও যাই। সে ফিরিয়া তক্তাপোশের উপর বসিল। কমল বলিল, লেন গো, টিপছাপগুলা লিয়ে লেন গো। ইয়ার বাদে আবার ধান মাপতে হবে।

হুঁ। হিসাবের খাতাটা কোলের কাছে টানিয়াই শ্রীবাসের মাথার মধ্যে একটা কথা বিদ্যুৎচমকের মত খেলিয়া গেল। জমির দাম বাড়িবে। টিপছাপ খাতায় না লইয়া একেবারে

বন্ধকী দলিল করিয়া লইলে—; কিন্তু বর্বরের দল বড় সন্দিগ্ধ। আবার একটা গোঁ ধরিয়া অবুঝের মত বলিবে, কেনে গো, উটিতে ছাপ কেনে দিব গো? তু যি বুললি, খাতাতে ছাপ দিতে হবে। পরমুহূর্তেই সে দোয়াতটা খাতার উপর উল্‌টাইয়া ফেলিল এবং আঁতকাইয়া বলিয়া উঠিল, যা সর্বনাশ হ'ল!

সাঁওতালদের দলও অপরিসীম উদ্বেগে উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, যাঃ।

শ্রীবাসের ছেলে বাপকে তিরস্কার করিয়া বলিল, কি করলে বল তো? হ'ল তো! যাক্, ও পাতাখানা বাদ—

বাধা দিয়া শ্রীবাস অত্যন্ত দুঃখিত ভঙ্গিতে বলিল, উহুঁ। এক কাজ কর, বোঁ করে ও-পারে ভেণ্ডারের কাছ থেকে ডেমি নিয়ে আয় খান-পঁচিশেক। তারপর খাতা বেঁধে নিলেই হবে।

শ্রীবাসের ছেলে গণেশ এবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল, তুমি ক্ষেপেছ নাকি? ডেমিতে কে কোন্‌কালে খাতা করে, শুনি?

দুরন্ত ক্রোধে অদ্ভুত দৃষ্টিতে বিকৃত মুখে শ্রীবাস নীরবে গণেশের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, তোকে যা করতে বলছি, তাই কর্। যা, এখুনি যা, যাবি আর আসবি।—বলিয়া বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল।

সাঁওতালেরা বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া শ্রীবাসের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, শ্রীবাস গম্ভীরমুখে উঠিয়া বলিল, টিপছাপ পরে হবে মাঝি, গণেশ কাগজ নিয়ে আসুক। ততক্ষণে তোরা আয়, বাখার ভেঙে ধানটা মেপে ঠিক ক'রে রাখ। তোদের সব আজ আবার পরব আছে।

সাঁওতালেরা এ কথায় খুশি হইয়া উঠিল। কমল বলিল, নাঃ, মোড়ল বড় ভাল লোক, বিবেচনা আছে মোড়লের।

চূড়া মাঝি ভ্রূ নাচাইয়া বলিল, কিন্তু ভারি বেকুব হয়ে গিয়েছে মোড়ল কালিটা ফেলে। ছেলের উপর রাগ দেখলি না।

চূড়ার ব্যাখ্যায় সকলেই ব্যাপারটা সকৌতুকে উপভোগ করিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সত্যই মোড়ল বড় বেকুব হইয়া গিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে খড়ের তৈয়ারী মোটা দড়া জড়াইয়া বাঁধা বাখারটা ভাঙিয়া স্তূপাকার করিয়া ধান ঢালা হইল। হুস-হাস করিয়া টিন-ভর্তি ধান মাপিয়া মাপিয়া ফেলা হইতে লাগিল। শ্রীবাস ধানের মাপের সঙ্গে হাঁকিতে আরম্ভ করিল, রাম—রাম, রাম-রাম, রাম—রামে দুই-দুই, দুই-রামে—তিন-তিন।

চূড়া এক পাশে বসিয়া একটা কাঠি লইয়া মাপের সঙ্গে সঙ্গে একটা করিয়া দাগ দিয়া সাঁওতালদের তরফ হইতে হিসাব করিয়া যাইতেছিল।

এ-দিকে গ্রামের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড জটলা পাকাইয়া উঠিল। সকাল হইতে না হইতে গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রটিয়া গেল, ও-পারের চরের উপর চিনির কল বসিতেছে। খাস কলিকাতা হইতে এক ধনী মহাজন আসিয়াছেন, তিনি সঙ্গে আনিয়াছেন প্রচুর টাকা—ছোট একটি ছালায় পরিপূর্ণ এক ছালা টাকা। সঙ্গে সঙ্গে রায়বংশের অন্য সমস্ত শরিকেরা একেবারে লোলুপ রসনায় গ্রাস বিস্তার করিয়া জাগিয়া উঠিল। অপরদিকে উর্বর-জমি-লোলুপ চাষীর দল বাঘের গোপন পার্শ্বচর শৃগালের মত জিভ চাটিতে চাটিতে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সর্বপ্রথম নবীন বাগ্দীর স্ত্রী মতি বাগ্দিনী শিশু পৌত্রকে কোলে করিয়া চক্রবর্তী-বাড়ীর অন্দরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে আরম্ভ করিল।

সংবাদটা শুনিয়া রংলাল বাড়ি ফিরিয়া অকারণ স্ত্রীর সহিত কলহ করিয়া প্রচণ্ড ক্রোধে লাঠির আঘাতে রান্নার হাঁড়ি ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিল। তারপর স্তব্ধ হইয়া মাটির মূর্তির মত বসিয়া রহিল।

মনের আক্ষেপে অচিন্ত্যবাবুর সমস্ত রাত্রি ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই। ফলে—অতিপুষ্টিকর শশক-মাংস বদহজম হেতু নানা গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছিল। ভদ্রলোক অন্ধকার থাকিতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া ঢক ঢক করিয়া এক গ্লাস জল ও খানিকটা সোডা খাইয়া মর্নিং ওয়াকের জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। খুব জোরে খানিকটা হাঁটিয়া তিনি সম্মুখে ভরা কালিন্দীর বাধা পাইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। ও-পারের চরটা অন্ধকারের ভিতর হইতে বর্ণে বৈচিত্র্যে সম্পদে অপরূপ হইয়া প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে; গভীর তমিস্রাময়ী কালী যেন কমলা রূপে রূপান্তরিতা হইতেছেন।

অচিন্ত্যবাবু লক্ষ্য করিতেছিলেন, বেনাঘাসের গাঢ় সবুজ ঘন জঙ্গল চরের এ প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। উঃ, রাশি রাশি খসখস ওই ঘন সবুজ আস্তরণের নিচে লুকাইয়া আছে! খেয়াঘাটের ঠিকাদার ঠিক এই সময়েই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। অচিন্ত্যবাবুকে দেখিয়া সে একটি প্রণাম করিয়া বলিল, আজ আজ্ঞে, ভাগ্যি আমার ভাল। পেভাতেই ব্রাহ্মণদর্শন হ'ল। এই ঘাট নিয়ে বুঝলেন কিনা, কত যে জাত-অজাতের মুখ সকালে দেখতে হয়! এ কাজ আপনার অতি পাজী কাজ মশাই। তবে দুটো পয়সা আসে, তাই বলি—

অসমাপ্ত কথা সে আকর্ণ-বিস্তার হাসিয়া সমাপ্ত করিল—

অচিন্ত্যবাবু আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, লাভ এবার তোমার ভালই হবে, বুঝলে কিনা। ও-পারের চরে কল বসছে, চিনির কল। লোকজনের আনাগোনা দেখতে দেখতে বেড়ে যাবে তোমার।

ঠিকাদার সবিস্ময়ে অচিন্ত্যবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কল? চিনির কল?

হ্যাঁ, চিনির কল। কাল কলকাতা থেকে মস্ত এক মহাজন এসেছে; সঙ্গে একটি ছালা

টাকা। আমি নিজের চোখে দেখেছি। কাল আমার ছোট রায়ের বড়িতে নেমন্তন্ন ছিল কিনা।

ঠিকাদার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, ই টাকা কে পাবে? চরটা ত চক্রবর্তী-বাড়িরই বলছে সবাই; তা ছোট রায় মশায়ের বাড়িতে—

ছোট রায় মশায়ই আজকাল ওদের কর্তা। উনি সব দেখাশুনা করছেন যে।

বার বার ঘাড় নাড়িয়া ঠিকাদার বলিল, বটে, আজ্ঞে বটে। তা দেখলাম কাল, এইখানেই চক্রবর্তী-বাড়ির ছোট্‌কা আর রায়মশায়ের ছেলে ব'সে ছিল অ্যানেকক্ষণ; খুব ভাব দেখলাম দুজনায়। অ্যানেক কথা হ'ল দুজনায়।

হুঁ। অচিন্ত্যবাবু খুব গম্ভীর হইয়া বলিলেন, হুঁ। আচ্ছা, কি কথা দুজনার হচ্ছিল বল তো? কথা? স্বদেশীর কথা? মানে, সায়েবদের তাড়াতে হবে, বন্দেমাতরম্, মহাত্মা গান্ধীকি জয়, এই সব কথা হচ্ছিল?

আজ্ঞে না। আমি তো দূরে ব'সে ছিলাম। খুব খানিক্ কান বাজিয়ে শুনলাম; কাল কথা হচ্ছিল আজ্ঞে, আমি আঁচে বুঝলাম, কথা হচ্ছিল আপনার, আচ্ছা উমা কার নাম বলেন তো? এই ছোট রায়ের ঝিউড়ী মেয়ে লয়?

হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি তাকে পড়াতাম যে! বলিতে বলিতেই অচিন্ত্যবাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, বলিলেন, মেয়েটাকে কলকাতায় পাঠিয়ে ধিঙ্গী ক'রে তুললে। ছোট রায় বাইরে বাঘ, আর ভেতরে একেবারে শেয়াল—বুঝলে কিনা, গিন্নীর কাছে একেবারে কেঁচো। মেয়েকে যে ভয় করে, তাকে আমি ঘেন্না করি, বুঝলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তা, কাল আপনার ছোট রায়ের ছেলে ওই চক্রবর্তী-বাড়ির ছোটকাকে ধরেছিল, বলে তোমাকে তাকে বিয়ে করতে হবে।

বল কি?—অচিন্ত্যবাবু একেবারে তীরের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। উপলব্ধি করার ভঙ্গিতে বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ঠিক কথা। ইন্দ্র রায়ের মতলব এতদিন ঠাওর করতে পারছিলাম না। হুঁ অহীন্দ্র ছেলেটি যে হীরের টুকরো ছেলে। এবারেও তোমার ফোর্থ হয়েছে ইউনিভার্সিটিতে। বটে! ঠিক শুনেছ তুমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বয়েসও হে অ্যানেকটা হ'ল। মানুষ হাঁ করলেই বুঝতে পারি, কি বলবে। তা ছাড়া আপনার, রায় মশায়ের মেয়ের বিয়েরও তো অ্যানেক হাঙ্গামা আছে গো। চক্রবর্তী-বাড়ির বউ আর রায় মশায়ের বুন। কুলের খুঁত ধরতে তো লোকে রায় মশায়েরই ধরবে।

ওরে বাপ রে বাপ রে! এই দেখ, কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। তুমি তো ভয়ানক বুদ্ধিমান লোক। দেখ, তুমি ব্যবসা কর, তোমার নিশ্চয় উন্নতি হবে! আমার কাছে যাবে তুমি, তোমাকে আমি সঙ্গে নেব। ব'লো না যেন কাউকে, এই খসখসের ব্যবসা। খসখস বোঝ তো? খসখস হ'ল বেনার মূল।

বেনার মূল?

হ্যাঁ। চুপ কর, সেজ-রায়-বাড়ির হরিশ আসছে।

হরিশ রায় সেজ-রায়-বাড়ির একজন অংশীদার। সমস্ত রায়-বংশের সিকি অংশের অধিকারী হইল সেজ তরফ, সেজ তরফের এক আনা অংশের অর্থাৎ ষোল আনা সম্পত্তির এক পয়সা রকমের মালিক হইলেন হরিশ রায়। এই এক পয়সা পরিমাণ জমিদারির অংশ লইয়া ভদ্রলোক অহরহই ব্যস্ত এবং কাজ লইয়া তাঁহার মাথা তুলিবারও অবসর থাকে না। কাগজের পর কাগজ তিনি তৈয়ারি করিয়া চলিয়াছেন। জমিদারির এককণা জমি যদি কেহ আত্মসাতের চেষ্টা করে, তবে তাঁহার আয়নার মত কাগজে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিম্ব পড়িবেই।

কানে পৈতা জড়াইয়া গাড়ু হাতে হরিশ রায় একটি দাঁতন-কাঠি চিবাইতে চিবাইতে নদীর ঘাটে আসিয়া নামিলেন। অচিন্ত্যবাবুকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কি রকম, আজ যে এদিকে ?

উদাসভাবে অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, এলাম।

না, মানে, এদিকে তো দেখি না বড়।

হ্যাঁ। বলিয়াই হঠাৎ যেন তিনি আসিবার কারণটা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন ; বলিলেন, চরের উপর কল বসছে কিনা, চিনির কল—সুগার মিল। তাই ভাবলাম, দেখে আসি ব্যাপারটা কি রকম হবে।

কল ? চিনির কল ?—হরিশ রায়ের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। চিনির কল করবে কে মশায় ? এত টাকা কার আছে ?

কাল রাত্রে কলকাতা থেকে মস্ত এক মহাজন এসেছে, সঙ্গে আপনার একটি বস্তা টাকা। আমি নিজের চোখে দেখেছি—ওন্ আইজ। ইন্দ্র রায় মহাশয়ের ওখানে কাল আমার নেমন্তন্ন ছিল কিনা।

ইন্দ্র ? তা, ইন্দ্র চর বন্দোবস্ত করছে নাকি ?

হ্যাঁ। উনিই তো এখন চক্রবর্তীর-বাড়ির সব দেখা-শুনো করছেন। তিনি ভুরু নাচাইয়া মুচকি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, হুঁ, কোন খোঁজই রাখেন না আপনারা ?

হরিশ রায় বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, এই দেখুন, এমন খোঁজ নাই যা হরিশ রায়ের কাগজে নাই। বুঝলেন, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকে 'থাক', নক্সা, জমাবন্দী, জরিপী খতিয়ান, জমাওয়াশীল-বাকি সব আমার কাছে। কি বলব, পয়সা তেমন নাই হাতে, তা নইলে 'চাকচান্দী' লাগিয়ে দিতাম আমি। আর অন্যায় অধর্মও করতে চাই না আমি! যদি একটি কলম আমি খুঁচি, সব ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে। দেখি না, হোক না বন্দোবস্ত। আমরা এতদিন চুপ ক'রেই ছিলাম,—বলি—চক্রবর্তীরা আমাদেরই দৌহিত্র, তা খাচ্ছে খাক। কিন্তু এ তো হবে না মশায়। উঁহু!

অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, সে আপনারা যা করবেন করুন গে মশাই। চর তো আজই বন্দোবস্ত হচ্ছে।

হাসিয়া হরিশ বলিলেন, দেখুন না, বেবাক কাগজ আজ বার করছি। একেবারে কড়া-ক্রান্তি, মায় ধুল পর্যন্ত মিলিয়ে দেখিয়ে দেব চর কার।

অচিন্ত্যবাবুর এত সব শুনিতে ভাল লাগিতেছিল না। তাঁহার মন তখন ভীষণ উত্তেজনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। উঃ, ভিতরে ভিতরে ইন্দ্র রায় কন্যাদায়ের ব্যবস্থা করিয়া বসিয়া আছে! হরিশ রায়কে এড়াইয়া চলিয়া যাইবার জন্য হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া ঠিকাদারকে বলিলেন, তা হ'লে, তুমি কখন যাবে বল তো—সন্ধ্যেবেলা, কেমন?

হরিশ জলের কুলকুচা ফেলিতে ফেলিতে আপন মনেই বলিলেন, কি আর বলব ইন্দ্রকে। লজ্জায় ঘাটে আর মুখ ধোয় নাই। ছি ছি ছি! এতবড় কাণ্ডটার পরেও আবার রামেশ্বর চক্রবর্তীর সম্পত্তির দেখাশোনা করছে! ছি!

অচিন্ত্যবাবু যাইতে যাইতে ফিরিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, সেই তো বলেছিলাম মশায়, কি খবর আর রাখেন, আপনি? মাটির খবর নিয়েই মেতে আছেন আপনি, মানুষের মনের খবর কিছু রাখেন? ইন্দ্র রায় পাকা ছেলে। লজ্জার ঘাটে মুখ ধুয়ে ব'সে থাকলে ইন্দ্র রায়ের কন্যাদায় উদ্ধার হবে? বলতে পারেন? রায় ওই রামেশ্বর চক্রবর্তীর ছোট ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবে।

বলেন কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই আমি বলি। চক্রবর্তী-বাড়িকে ইন্দ্র রায় বাঁধছে। রূপে গুণে এমন পাত্র পাবেন কোথায় মশায়?

আরে মশায়, ওঁদের আর আছে কি?

নাই, তাই মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে রায় নগর বসাচ্ছেন চরে।

হুঁ! কিন্তু রামেশ্বরের যে কুষ্ঠ হয়েছে শোনা যায়।

আজ্ঞে না। সে সব ওঁরা রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দেখিয়েছেন। ওটা হ'ল রামেশ্বরবাবুর পাগলামি। আচ্ছা, চলি আমি। অচিন্ত্যবাবু কথা কয়টা বলিয়া খুশি হইয়া উঠিলেন।

দাঁড়ান দাঁড়ান, আমিও যাব। দন্ত-মার্জনা অর্ধসমাপ্তভাবেই শেষ করিয়া হরিশ রায় উঠিয়া পড়িলেন। অচিন্ত্যবাবুর সঙ্গ ধরিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন, দেখুন না, আমি কি করি! তামাম কাগজ আমি এখুনি গিয়ে বের করে ক'রে ফেলব। সব শরিককে ডাকব। সকলে মিলে বলব, ইন্দ্রকেও বলব, মহাজনকে বলব। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব। শোনে ভাল, না শোনে কালই সদরে গিয়ে দেব এক নম্বর ঠুকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌জাংশান। করুক না, কি ক'রে কল করবে। কল বসাবে, নগর বসাবে!

অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, কল বসলে সর্বনাশ হবে মশায়। রাজ্যের লোক এসে জুটবে—কুলী-কামিন-গুণ্ডা-বদমায়েশ, চুরি-ডাকাতি-রোগ, সে এক বিশ্রী ব্যাপার হবে মশাই। তা ছাড়া সমস্ত জিনিস হয়ে যাবে অগ্নিমূল্য, গেরস্ত লোকেরই হবে বিপদ। তার চেয়ে অন্য উপায়ে উন্নতি কর না নিজের! কত ব্যবসা রয়েছে। এই ধরুন গাছগাছড়া চালান দাও, খসখস—। অচিন্ত্যবাবু সহসা চুপ করিয়া গেলেন।

হরিশ রায় তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, আসুন আপনি, আপনাকেই দেখাব আমি কাগজ। আপনি ইন্দ্রর বন্ধুলোক, কই,' আপনিই বলুন তো ন্যায্য কথা। আয়নার মত কাগজ, এক

নজরে বুঝতে পারবেন। ইন্দ্র না হয় বড় লোক, আমাদের না হয় পয়সা নাই। তাই ব'লে এই অধর্ম করতে হবে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিশ রায়ের বাড়িতে রায়-বংশের প্রায় সকল শরিকই আসিয়া জুটিয়া গেল। আস্ফালন ও কটূক্তিতে প্রসন্ন প্রভাত কদর্য তিক্ত হইয়া উঠিল। সঙ্গতিহীন এক নাবালক-পক্ষের অভিভাবিকা নাগিনীর মতই বিষোদ্গার করিয়া কেবলই অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, ধ্বংস হবে। ভোগ করতে পাবে না। অনাথা ছেলেকে আমার যে ফাঁকি দেবে, তার মেয়ে বাসরে বিধবা হবে। নিব্বংশ হবে। এই আমি ব'লে রাখলাম। রাঙা বর! রাঙা বর! রাঙা বর বাসরে মরবে।

* * * *

ইন্দ্র রায় ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। রায়-গোষ্ঠী দল বাঁধিয়া আসিয়া অধঃপতিত আভিজাত্যের স্বভাব-ধর্ম অনুযায়ী যে কদর্য দম্ভ ও কুটিল মনোবৃত্তির পরিচয় দিল, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বিশেষ করিয়া রায়বংশের গঞ্জিকাসেবী এক শরিক—শূলপাণি যখন ক্রোধে আত্মহারা হইয়া কদর্য ভঙ্গিতে হাত-পা নাড়িয়া বলিল, অ্যাঃ, বাবু আমার 'লগর' বসাবেন মেয়ে-জামায়ের লেগে! আর আমরা সব ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখবো, না কি?

ইন্দ্র রায় বলিলেন, শূলপাণি শূলপাণি, কি বলছ তুমি?

রায়ের মুখের কাছে দুই হাত নাড়িয়া শূলপাণি বলিল, আহা-হা, ন্যাকা আমার রে, ন্যাকা! বলি, আমরা কিছু বুঝি না, না কি? রামেশ্বরের বেটার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবার কথা আমরা বুঝি না বুঝি?

ইন্দ্র রায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল, পায়ের তলায় পৃথিবী বুঝি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে! সভয়ে তিনি চোখ বুজিলেন, তাঁহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—গত সন্ধ্যায় উপাসনার সময়ে মনশ্চক্ষে দেখা দৃশ্য।—চক্রবর্তী-বাড়ি ও রায়-বাড়ির জীবন-পথের সংযোগ-স্থলে ভাঙনের অতল অন্ধকূপ।

শূলপাণি কদর্য ভাষায় আপন মনে বকিতেছিল; অন্যান্য রায়েরা আপনাদের মধ্যে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করিতেছিল। হরিশ রায় বেশ বুঝাইয়া বলিবার ভঙ্গিতে বলিলেন, বেশ তো পাঁচজনের একসঙ্গে মজলিস ক'রে ব'সো; আমি ফেলে দিই-তামাম কাগজপত্র একটি একটি ক'রে একেবারে রুদ্রাক্ষের মালার মত গাঁথা! দেখ, বিচার ক'রে দেখ, যদি সকলের হয় সকলে নেবে। চক্রবর্তীদের একার হয়, একাই নেবে চক্রবর্তীরা। একা তোমার হয় তুমি নাও, তারপর তুমি দান কর মেয়ে-জামাইকে, নিজে রাখ, যা হয় কর। তখন বলতে আসি কান দুটো ধ'রে ম'লে দিও।

ইন্দ্র রায়ের কানে ইহার একটা কথাও প্রবেশ করিল না। ধীরে ধীরে তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া এতক্ষণে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তারা তারা মা! তারপর তিনি ডাকিলেন, গোবিন্দ! ওরে গোবিন্দ!

গোবিন্দ—রায়ের চাকর। চাকরের সাড়া না পাইয়া তিনি ডাকিলেন, ঘরের মধ্যে কে

রয়েছে ?

ঘরের মধ্যে ছিল অমল ও অহীন্দ্র। অহীন্দ্র বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্তম্ভিতের মত বসিয়া ছিল। আর অমল হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল, বলিতেছিল, কুরুকুল চীৎকার করছে পাণ্ডব-যাদবদের মিতালি দেখে। মাই গড্।

পিতার স্বর শুনিয়া সে হাসি থামাইয়া বাহিরে আসিতেই রায় বলিলেন, গোবিন্দ কোথায় ? এদের তামাক দিতে বল তো।

শূলপাণি বলিল, তামাক আমরা ঢের খেয়েছি, তামাক খেতে আমরা আসি নাই। আগে আমাদের কথার জবাব চাই।

কথার জবাব ? সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে রায়ের মাথা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। বিপুল ধৈর্যের সহিত আত্মসম্বরণ করিয়া কিছুক্ষণ পর বলিলেন, জবাব আমি এখনই দিতে পারলাম না। ও-বেলায় দু-একজন আসবেন, তখন জবাব দেব আমি !

শূলপাণি আবার লাফ দিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু হরিশ তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, থাম শূলপাণি। ইন্দ্র হ'ল এখন আমাদের রায়গুষ্টির প্রধান লোক, তার সঙ্গে এমন করে কথা কইতে নাই। আমি বলছি।

শূলপাণি সঙ্গে সঙ্গে হরিশের উপরেই ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, যা যা যাঃ, তোষামুদে কোথাকার। তোষামুদি করতে হয়, তুই করগে যা। আমি করব না। আচ্ছা আচ্ছা, কে যায় চরের ওপর দেখা যাবে।—বলিয়া সে হনহন করিয়া কাছারির বারান্দা হইতে নামিয়া চলিয়া গেল।

হরিশ বলিলেন, তা হ'লে মামলা-মকদ্দমাই স্থির ইন্দ্র ?

ইন্দ্র রায় বলিলেন, আপনারা আগে আগে গেলে আমাকে রামেশ্বরের হয়ে পেছনে পেছনে যেতে হবে বৈকি।

হরিশ বলিলেন, তুমি ঠকবে ইন্দ্র, আমার কাছে এমন কাগজ আছে—একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র।

ইন্দ্র রায় হাসিলেন ; কোন উত্তর দিলেন না। আবার একবার আস্ফালন করিয়া রায়েরা চলিয়া গেল। শূলপাণি কিন্তু তখনও চলিয়া যায় নাই, সে ইন্দ্র রায়ের দারোয়ানের নিকট হইতে খইনি লইয়া খাইতেছিল।

রায় আজ অসময়ে অন্দরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, হেম, আমার আহ্নিকের জায়গা কর তো।

অন্দর হইতে হেমাঙ্গিনী সমস্ত শুনিতেছিলেন, তিনিও আজ দিগ্‌ভ্রান্তের মত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। উমা—তাঁহার বড় আদরের উমা। অহীন্দ্রও সোনার অহীন্দ্র। কিন্তু এ তো কোনদিন তিনি কল্পনা করেন নাই।

স্নান-আহ্নিক শেষে রায় আহারে বসিলেন, হেমাঙ্গিনী বলিলেন, ওদের কথায় তুমি কান দিও না। কুৎসা করা ওদের স্বভাব।

রায় মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, আমি বিচলিত হই নি হেম।

*   *   *   *

সন্ধ্যায় তিনি বিমলবাবুকে লইয়া বসিলেন। বাধা-বিঘ্নের সম্ভাবনার কথা সমস্ত বলিয়া রায় বলিলেন, বাধা-বিঘ্ন হবে—এ আমি বিশ্বাস করি না। ওদের আমি জানি। তবে সমস্ত কথা আপনাকে আমার বলা দরকার, তাই বললাম। আপনি কাগজপত্র দেখুন, দেখলে সত্যিকার আইনের দিকটাও দেখতে পাবেন।

বিমলবাবু কাগজপত্রগুলি গভীর মনঃসংযোগ করিয়া দেখিলেন, তারপর বলিলেন, আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই, আজই দলিল হয়ে যাক।

টাকাকড়ির কথাবার্তা শেষ করিয়া তিনি অমলকে পাঠাইলেন সুনীতির নিকট। সুনীতির অনুমোদন লওয়া আবশ্যক। কিছুক্ষণ পর অমল ও অহীন্দ্র ফিরিয়া আসিল। অহীন্দ্র বলিল, মা বললেন, আপনি যা করবেন, তাই তাঁর শিরোধার্য। তবে একটা কথা তিনি বলছেন—

রায় বলিলেন, কি, বল ?

নবীন বাগ্দীর স্ত্রী তাঁর কাছে এসেছিল। অন্য বাগ্দীরাও এসেছিল সঙ্গে। তারা আমাদের পুরানো চাকর। তারা কিছু জমি চায়।

রায় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, ভাল, তাদের জন্যে পঁচিশ বিঘে জমি রেখেই বন্দোবস্ত হবে। কিন্তু চরটা তা হ'লে মাপ করা দরকার। আজ দলিলের খসড়া হয়ে থাক, কাল মাপ ক'রে দলিল লেখা হবে, কি বলেন, বিমলবাবু ?

বিমলবাবু বলিলেন, তাই হবে।

তা হ'লে আমি সন্ধ্যা সেরে আসি।

রায় উঠিলেন, কিন্তু যাওয়া হইল না। বারান্দার বাহির হইতে দেখিলেন, যোগেশ মজুমদার বাগানের রাস্তা ধরিয়া কাছারির দিকে আসিতেছে। আজ মজুমদারের সঙ্গে একজন চাপরাসী। মজুমদার এখন চক্রবর্তী-বাড়ির বিক্রীত সম্পত্তির মালিক, রায়েদের শরিক জমিদার। ইন্দ্র রায় ঈষৎ হাসিলেন, হাসিয়া সম্ভাষণ করিলেন, এস এস, মজুমদার এস। কি ব্যাপার ? হঠাৎ ?

স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের হাসি হাসিয়া মজুমদার বলিল, এলাম আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে।

রায় বলিলেন, শ্রী এখন বিগত হয়েছে মজুমদার, এখন শুধু চরণই অবশিষ্ট। সুতরাং কথাটা তোমার বিনয় ব'লেই ধ'রে নিলাম। এখন আসল কথাটা কি, বল তো ? সংক্ষিপ্ত হ'লে এখনই বলতে পার ; সময়ের দরকার হ'লে একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমার সন্ধ্যার সময় চ'লে যাচ্ছে।

মজুমদার বলিল, কথা অল্পই। মানে আপনি তো জানেন, চক্রবর্তী-বাড়ির সেই ঋণটা—সেটা বেনামীতে আমারই দেওয়া। নিলামে সম্পত্তি ডাকলাম, এখনও বাকি অনেক। আজ শুনছি চরটাও বন্দোবস্ত হয়ে যাচ্ছে। তা আমার কি ব্যবস্থা হবে ?

রায় অদ্ভুত হাসি হাসিয়া মজুমদারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কথাটার উত্তর কি আমারই কাছে শুনবে মজুমদার ? চক্রবর্তী-বাড়ি তো তোমার অচেনা নয়।

কথাটার সুরের মধ্যে সূচের মত তীক্ষ্ণতা ছিল, মজুমদার সে তীক্ষ্ণতার আঘাতে একেবারে

হিংস্র হইয়া উঠিল, বলিল, আপনিই যে এখন ও-বাড়ির মালিক রায় মশায়। চক্রবর্তীর সম্বন্ধী, আবার হবু বেয়াই—

রায় গম্ভীরভাবে নিশ্বাস টানিয়া অজগরের মত ফুলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, হ্যাঁ, রামেশ্বরের সম্বন্ধী আমি বটে, আর বেয়াই হবার কথাটাও ভাবছি। এখন উত্তরটাও আমার শোন, চাকরের কাছে ধার, জানি সে আমার টাকা চুরি ক'রেই আমাকে ধার ব'লে দিয়েছে, কিন্তু সে যখন ধার ব'লেই নিয়েছি—তখন আমার ভগ্নীপতি, কি আমার হবু বেয়াই, কখনও 'দেবে না' বলবেন না।

মজুমদার মুহূর্তে এতটুকু হইয়া গেল। রায় বলিলেন, কাল সকালে এস তোমার হ্যাণ্ডনোট নিয়ে। তারপর কণ্ঠস্বর মৃদু ও মিষ্ট করিয়া বলিলেন, ব'স, তামাক খাও। গোবিন্দ! মজুমদার মশায়কে তামাক দাও।

তিনি অন্দরে চলিয়া গেলেন; চলিতে চলিতেই গম্ভীর স্বরে তিনি ডাকিলেন, তারা, তারা, মা!

২৩

মাস ছয়েক পর।

শীত-জর্জর শেষ-হেমন্তের প্রভাতটি কুয়াশা ও ধোঁয়ায় অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। চরটার কিছুই দেখা যায় না। শেষরাত্রি হইতেই গাঢ় কুয়াশা নামিয়াছে। তাহার উপর লক্ষ লক্ষ ইঁট পুড়িতেছে, সেই সব ভাঁটার ধোঁয়া ঘন বায়ুস্তরের চাপে অবনমিত হইয়া সাদা কুয়াশার মধ্যে কালো কুণ্ডলী পাকাইয়া নিথর হইয়া ভাসিতেছে। বিপুলবিস্তার দুধে-ধোয়া পাতলা একখানি চাদরের উপর কে যেন খানিকটা কালি ফেলিয়া দিয়াছে। হিমশীতল কুয়াশার কণাগুলি মানুষের মুখে, চোখের পাতায়, চুলের উপর আসিয়া লাগিতেছে, তাহার সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম বালির মত কয়লার কুচি। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধে ভিজা বাতাস আরও যেন ভারী বোধ হইতেছে।

ইহার মধ্যেই বিমলবাবু, কলিকাতার কলওয়ালা মহাজন, চরের উপর একটি বাংলো তৈয়ারি করিয়া বাসা গাড়িয়া বসিয়াছেন। কল তৈয়ারি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কাজ খুব দ্রুতবেগে চলিতেছে। এখানকার লোকে কাজের গতি দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া পড়িয়াছে। এমন দ্রুতগতিতে যে কাজ হইতে পারে—এ ধারণাই তাহারা করিতে পারে না; এ যেন বিশ্বকর্মার কাণ্ড, এক রাত্রে প্রান্তরের উপর প্রকাণ্ড নগর গড়িয়া উঠার মত ব্যাপার।

বিমলবাবু বাংলোর বারান্দায় একখানা ঈজি-চেয়ারের উপর বসিয়া চা পান করিতেছিলেন এবং কুয়াশার দিকে চাহিয়া ছিলেন। কুয়াশার মধ্যে কোথা হইতে বাষ্পের জোরে বাজানো বয়লারের বাঁশী ভোঁ-ভোঁ শব্দে বাজিয়া উঠিল। একটি ভার্টিকাল বয়লারও ইহার মধ্যেই

বসানো হইয়াছে, বয়লারের জোরে নদীর গর্ভে একটা পাম্প চলিতেছে। সেই পাম্পে ইঁট তৈয়ারির কাজে প্রয়োজনমত জল সরবরাহ হইতেছে। জলের পাইপ বিমলবাবুর বাংলোয় চলিয়া আসিয়াছে এবং প্রয়োজনমত এখানে কলের মুখ লাগাইয়া যখন যেখানে ইচ্ছা জল লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাংলোর সম্মুখেই একটা পাকা ইঁদারাও হইয়া গিয়াছে। ইঁদারাটার চারিপাশে বাগানের নানা রকমের মরস্থমী ফুল ও তরিতরকারির গাছ। বারান্দার ধারেই একটা জলের কলের মুখ, সেখানে একটি প্রশস্ত সান-বাঁধানো চাতাল ও একটি চৌবাচ্চা। সেই চাতালে বসিয়া সারী, সাঁওতালদের সেই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি, বাসন মাজিতেছে। বিমলবাবুর বাসায় সারী এখন ঝিয়ের কাজ করে। কুয়াশা এত ঘন যে, বিমলবাবু সারীকেও স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন না। সাদা কাপড় পরিহিত সারীকে দেখিয়া মনে হয়, কুয়াশার একটা পুঞ্জ মেঘ ওখানে জমিয়া আছে। এই কুয়াশার মধ্যে কোথাও শূন্য-মার্গে অবিরাম কর্ণিকের ও ইঁটের ঠুংঠুং শব্দ উঠিতেছে। আর উঠিতেছে লোহার উপর লোহার প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ, চারিদিকের মুক্ত প্রান্তর বাহিয়া শব্দটা শনশন শব্দে ছুটিয়া চলিয়া দিগন্তে বিপুল শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা ধীরে ধীরে কাটিতেছিল। কয়লার ধোঁয়া মাটির বুক হইতে শূন্যমণ্ডলে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। বিমলবাবু সারীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন, সারীর মাথায় মরস্থমী ফুলের সারি, ইহারই মধ্যে সে কখন ফুল তুলিয়া চুলে পরিয়াছে। বিমলবাবু রাগের ছলনা করিয়া বলিলেন, আবার তুই ফুল তুলেছিস!

সারী শঙ্কিত মুখে বিমলবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সারীর মত উচ্ছল চঞ্চল বর্বররাও বিমলবাবুকে ভয় করে, অজগরের মুখের অদূরবর্তী জীবের মত যেন অসাড় হইয়া যায়। এই চর ব্যাপিয়া বিপুল এবং অতিকায় কর্মসমাবেশের সমগ্রটাই যেন বিমলবাবুর কায়ার মত, মানুষের দেহ লইয়া তিনি যেন তাহার জীবাত্মা। তাঁহার সম্পদ, কর্মক্ষমতা, গাম্ভীর্য, তৎপরতা সব লইয়া বিমলবাবুর একটা ভয়াল রূপ তাহারা মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করে এবং ভয়ে স্তব্ধ হইয়া যায়।

সারীর ভয় দেখিয়া বিমলবাবু একটু হাসিলেন, তারপর পাশের টিপয়ের উপর ফুলদানি হইতে এক গোছা মরস্থমী ফুল লইয়া সারীকে ছুঁড়িয়া মারিলেন, বলিলেন, এই নে।

সারী ফুলের গোছাটি কুড়াইয়া লইয়া শঙ্কার সহিতই একটু হাসিল, তারপর বলিল, সেই কাপড় তুমি কিনে দিবি না?

দেব, দেব।

কোবে দিবি গো?

আচ্ছা, আজই দেব। তুই এখন ভেতরে গিয়ে সব পরিষ্কার ক'রে, ফেল্, ওই সরকারবাবু আসছে।

কুয়াশা এখন প্রায় কাটিয়া আসিয়াছে; বাংলোর মুখ হইতে সোজা একটা পাকা প্রশস্ত রাস্তা কারখানার দিকে সোজা চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া আসিতেছিল শূলপাণি রায়,

রায়-বংশের সেই গঞ্জিকাসেবী উগ্রমেজাজী লোকটি। শূলপাণির সঙ্গে জনকয়েক চাপরাসী। শূলপাণি আস্ফালন করিতেছিল প্রচুর। শূলপাণিই বিমলবাবুর সরকার। তাহার উগ্র মেজাজ ও বিক্রম দেখিয়া তিনি তাহাকে 'লেবার-সুপারভাইজার'—বাংলা মতে কুলী-সরকার নিযুক্ত করিয়াছেন। শূলপাণি কুলীদের হাজরি রাখে, তাহাদের খাটায়, শাসন করে; মাসিক বেতন বারো টাকা।

শুধু শূলপাণিই নয়, রায়হাটের অনেকেই এখানে চাকরি পাইয়াছেন। ইন্দ্র রায় বিমলবাবুর কৌশল দেখিয়া হাসিয়াছিলেন, মুগ্ধ হইয়া হাসিয়াছিলেন। মামলা-মকর্দমার সমস্ত সম্ভাবনা চাকরির খাঁচায় বন্ধ করিয়া ফেলিলেন এই বিচক্ষণ ব্যবসায়ীটি। মজুমদার এখন বিমলবাবুর ম্যানেজার, অচিন্ত্যবাবু অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, হরিশ রায় গোমস্তা। আরও কয়েকজন রায়-বংশীয় এখানে কাজ পাইয়াছে। ইন্দ্র রায়ের নায়েব মিত্তিরের ছেলেও এখানে কাজ করিতেছিল, ইন্দ্র রায় নিজেই তাহার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি বিমলবাবু দুঃখের সহিত তাহাকে নোটিশ দিয়াছেন, কাজ তাহার সন্তোষজনক হইতেছে না।

শূলপাণি চীৎকার করিতে করিতেই আসিতেছিল, হারামজাদা বেটারা সব শূয়ারকি বাচ্ছা—

বিমলবাবুর কপালে বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন, আস্তে। তারা তো এখানে কেউ নেই।

শূলপাণি অর্ধদমিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে না। ওই বেটা সাঁওতালরা—

হ্যাঁ, বেটারা হারামজাদাই বটে। কিন্তু হয়েছে কি! ব্যাপারটা কি, আস্তে আস্তে বল!

শূলপাণি এবার সম্পূর্ণ দমিয়া গিয়া অনুযোগের স্বরে বলিল, আজ্ঞে, আজ কেউ আসে নাই।

আসে নি?

আজ্ঞে না।

হুঁ। বিমলবাবুর ভ্রূযুগল ও কপাল আবার কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

শূলপাণি উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল, হুকুম দেন, গলায় গামছা দিয়ে ধ'রে আনুক সব।

বিমলবাবু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিলেন, রায় সাহেব, এটা তোমার পৈতৃক জমিদারী নয়, এটা হ'ল ব্যবসা। এতে গলায় গামছা চলবে না। না এসেছে, নেই। কাজ আজ বন্ধ থাক। বিকেলবেলা সবাইকে ডাকবে এখানে—আমার কাছে। একবার শ্রীবাস দোকানীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে, জরুরী দরকার। আর হ্যাঁ, কাল রাত্রে লোহাগুলো সব এসে পৌঁছেছে?

আজ্ঞে না। এখনও দু বার লরি যাবে, তবে শেষ হবে। লরি তো জোরে যেতে পারছে না। ইস্টিশানের রাস্তায় ধুলো হয়েছে একহাঁটু আর মাঝে মাঝে এমন গর্ত—

মেরামত করাও নিজেদের লোক দিয়ে, জলদি মেরামত করিয়ে নাও। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের

মুখ চেয়ে থাকলে চলবে না। তাদের সেই বছরে একবার মেরামত, তাও হরির লুটের মত মাটি কাঁকর ছিটিয়ে দিয়ে। লরি যখন স্টেশনে যাবে, তখন ইঁটের কুচি বোঝাই দিয়ে দাও। যেখানে যেখানে গচকা পড়েছে ঢেলে দিক সেখানে। তারপর কয়েক লরি কাঁকর দিয়ে মেরামত করাও। বুঝলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আচ্ছা যাও তুমি এখন।

শূলপাণি একটি নমস্কার করিয়া শান্তশিষ্ট ব্যক্তির মতই চলিয়া গেল। তাহার মত গঞ্জিকাসেবীর আজন্ম-অভ্যস্ত উগ্র মেজাজের কড়া তারও কেমন করিয়া বিমলবাবুর সম্মুখে শিথিল মৃদু হইয়া যায়। আসে সে আস্ফালন করিতে করিতে, কিন্তু যায় যেন দম-দেওয়া যান্ত্রিক পুতুল-মানুষের মত।

বিমলবাবু ডাকিলেন, সারী!

সারী আসিয়া নীরবে চকিত দৃষ্টি তুলিয়া দাঁড়াইল। পরিপূর্ণ আলোকে দেখা যায়, সারীর নিটোল স্বাস্থ্যভরা দীর্ঘ দেহখানি আর সে তৈলাক্ত অতি মসৃণতায় প্রসাধিত নয়, রুক্ষ প্রসাধনের একটি ধূসর দীপ্তি সর্বাঙ্গে সুপরিস্ফুট। পরনে তাহার সাঁওতালী মোটা শাড়ি নাই, একখানা ফুলপাড় মিলের শাড়ি সে পরিয়া আছে। বর্বর আদিম জাতির দেহে অপরিচ্ছন্নতার একটা আরণ্য কটু গন্ধ থাকে, কিন্তু সারী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলেও আর সে গন্ধ পাওয়া গেল না।

বিমলবাবু বলিলেন, আবার সব তোদের পাড়ার লোক গোলমাল করছে নাকি?

সারী শঙ্কিত হইয়া উঠিল, বলিল, আমি সি জানি না গো! উয়ারা তো বললে না আমাকে!

তবে সব খাটতে এল না যে?

সারীর মুখে এবার সঙ্কুচিত একটি হাসি ফুটিয়া উঠিল, আশ্বস্ত কণ্ঠে সে বলিল, কাল আমাদের জমিদারবাবু, উই যি রাঙাবাবু, উয়ার শ্বশুর হবে যি ওই রায়বাবু, সিপাই পাঠালে যি। বুললে, জমিগুলা চষতে হবে, কলাই বুনবে, সরষা বুনবে, আলু লাগাবে, আর ধানগুলা কাটতে হবে।

বিমলবাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, আপন মনেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, ড্রোন্‌স অব্ দি কানট্রি! ইডিয়ট্‌স! দিজ্ জামিণ্ডার্‌স।

সারী শঙ্কিত হইয়া উঠিল, তাহার কালো মুখে সাদা চোখ দুইটিতে শঙ্কার ছায়া ঘনাইয়া আসিল, রাত্রির আকাশের চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়ার মত। বিমলবাবু কি বলিলেন, সে যে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না! তবু ভাল যে সম্মুখে এখন 'হাঁড়িয়া'র বোতলটা নাই।

বিমলবাবু বলিলেন, সকলে তো চাষ করে না, তারা এল না কেন?

উয়াদিকে ধান কাটতে লাগালে। সারীর কণ্ঠস্বর ভীত শিশুর মত।

ধান কাটতে লাগালে? পয়সা দেবে, না, দেবে না?

না, বেগার লিলে। উয়ারা যে জমিদার বটে, রাজা বটে।

হুঁ! বিমলবাবু গম্ভীর হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর উঠিয়া মোটা চেস্টারফিল্ড কোটটা গায়ে দিয়া বলিলেন, ছড়িটা নিয়ে আয়।

সারী তাড়াতাড়ি ছড়িটা আনিয়া বিমলবাবুর হাতে দিল, বিমলবাবু এবার প্রসন্ন হাসি হাসিয়া সারীর কপালে আঙুলের একটি টোকা দিয়া ক্ষিপ্রপদে রাস্তার উপর নামিয়া পড়িলেন।

কুয়াশা কাটিয়া এখন রৌদ্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। চরখানাকে এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সর্বাগ্রে চোখে পড়িল আকাশলোকের দিকে উদ্ধত ভঙ্গিমায় উত্থত একটা অর্ধসমাপ্ত ইটের গড়া চিমনি। সেইখানে কর্নিকের ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে। ও-দিকে আরও একখানা সুসমাপ্ত বাংলো। ওটা আপিস-ঘর। পাশে একটা লোহার-ফ্রেমে-গড়া আচ্ছাদনহীন শেড।

এতক্ষণে সারীর মুখখানি ঈষৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল; বিমলবাবু খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেলে সে স্বচ্ছন্দ সহজ হইয়া গ্রীষ্ম-সন্ধ্যার জলসিক্ত অঙ্কুরের মত জাগিয়া উঠিল। কাজ করিতে করিতে সে এবার গুন গুন করিয়া গান আরম্ভ করিল, নিজেদের ভাষায় গান—

"উঃ বাবা গো, এই জঙ্গলের ভিতর কি আঁধার আর কত গাছ! এখানে সাপও চলিতে পারে না। এই জঙ্গলের পরেই নাকি 'রামচারের', সেই সূর্যঠাকুরের শোবার ঘর পর্যন্ত লম্বা ডাঙা, সেখানে বসতি নাই, পাখী নাই। তুমি আমাকে এখানে ফেলিয়া যাইও না, ওগো ভালবাসার লোক!"

সারী এখন বিমলবাবুর বাংলোয় কাজ করে, এইখানেই সে বাসও করিতেছে। কয়টা মাসের মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে অনেক।

বিমলবাবু এখানে আসার কিছু দিনের মধ্যেই সারী অনুভব করিল, অজগরের সম্মুখস্থ শিকারের সর্বাঙ্গ যেমন অবশ হইয়া যায়, সেও যেন তেমনি অবশ হইয়া পড়িতেছে। চীৎকার করিয়া আপন জনকে ডাকিয়া সাহায্য চাহিবার শক্তি পর্যন্ত তাহার হইল না, সম্পদ গাম্ভীর্য কর্মক্ষমতা, প্রভুত্ববিস্তারের শক্তি, তৎপরতা প্রভৃতিতে বিচিত্র সুদীর্ঘকায় অজগরের মতই ভয়াল বিমলবাবু! অজগরের মুখের মধ্যে সারী অচেতন পশুর মত ধরা পড়িল। তাঁহার কঠিন দৃষ্টির সম্মুখে কাহারও প্রতিবাদ করিবার সাহসও হইল না। আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়া গেল, সাঁওতাল-পল্লীর সকলেই এক দিক হইয়া সর্দার কমল মাঝি ও সারীর স্বামীকে একঘরে করিল; অথচ তাহারাই রহিল বিমলবাবুর একান্ত অনুগত। কিছুদিনের মধ্যে সারীই নিজে পঞ্চজনের কাছে 'সামকচারী'র অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদের প্রার্থনা করিল। সামাজিক আইনমত তাহারই জরিমানা দিবার নিয়ম; চাহিবার পূর্বেই সে একশত টাকা 'পঞ্চে'র সম্মুখে নামাইয়া দিল।

কয়েক দিনের মধ্যেই একদিন সকালে দেখা গেল, বুড়া কমল মাঝি, তাহার বৃদ্ধা স্ত্রী এবং সারীর স্বামী রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

সাঁওতাল-পাড়ার সর্দার এখন চূড়া-মাঝি, সেই কাঠের পুতুলের ওস্তাদ। সর্দার মাঝির

জমি শ্রীবাস পাল দখল করিয়া লইল, তাহার নাকি বন্ধকী দলিল আছে।

সারী এখন বিমলবাবুর বাংলোয় কাজ করে, বাংলোর সীমানার মধ্যেই আউট-হাউসে থাকে। তাহার বেশভূষার প্রাচুর্য দেখিয়া সারীর সখীরা বিস্মিত হইয়া যায়।

এক-একদিন দেখা যায় গভীর রাত্রে সারী ভয়ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটিয়া পলাইতেছে, তাহার পিছনে ছুটিয়াছেন বিমলবাবু, হাতে একটা হাণ্টার।

গান গাহিতে গাহিতে সারী কাজ করিতেছিল; ঘরের দেওয়ালের গায়ে টাঙানো প্রকাণ্ড আয়নার কাছে আসিয়া সে কাজ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল, চুলটা একবার ঠিক করিয়া লইল, একবার হাসিল, তারপর দেহখানি দোলাইয়া হিল্লোল তুলিয়া সে নাচিতে আরম্ভ করিল। "জঙ্গলের ভিতর আঁধার, আর কি ঘন গাছ!...আমাকে ফেলিয়া যাইও না, ওগো ভালবাসার লোক!"

* * * *

বাংলোর সম্মুখ দিয়া পথটা সোজা চলিয়া গিয়াছে; সুগঠিত পথ, ইঁটের কুচি ও লাল কাঁকর দিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সরল রেখার মত সোজা, তেমনি প্রশস্ত, অন্তত তিনখানা গাড়ি পাশাপাশি চলিতে পারে। কুয়াশায় অল্প ভিজিয়া রাঙা পথখানির রক্তাভা আরও গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলো হইতে খানিকটা আসিয়াই পথের দুই পাশে আরম্ভ হইল সারি-সারি খড়ের তৈয়ারী কুঁড়েঘর। অনেক বিদেশী কুলী আনিতে হইয়াছে; বাক্স-ফর্মায় ইঁট পাড়া, ইঁটের ভাটি দেওয়া, কলের লোহা-লক্কড়ের কাজ এদেশের অনভিজ্ঞ অপটু মজুর দিয়া হয় না। ওই কুলীদেরই সাময়িক আশ্রয় হিসাবে ঘরগুলি তৈয়ারী হইয়াছে। ও পাশে ইহার মধ্যেই কুলীদের স্থায়ী বাসস্থান প্রায় তৈয়ারী হইয়া আসিল, পাকা ইঁটের লম্বা একটা ব্যারাক, ছোট ছোট খুপরি-ঘর, সামনে এক এক টুকরা বারান্দা।

কুলীদের কুটীরগুলি এখন জনবিরল, বয়লারের ভোঁ বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই প্রায় কাজে চলিয়া গিয়াছে, থাকিবার মধ্যে কয়েকটি প্রায়-অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আর উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ ছেলের পাল। বৃদ্ধ মাত্র কয়েকজন, তাহারা উবু হইয়া ঘোলাটে চোখে অলস অর্থহীন স্তিমিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধা কয়েকজন জটলা পাকাইয়া রৌদ্রের আশায় বসিয়া পরস্পরের অপরিচ্ছন্ন মাথা হইতে উকুন বাছিয়া নখের উপর রাখিয়া নখ দিয়া টিপিয়া মারিতেছে, আর মুখে করিতেছে, 'হুঁ'। ওই 'হুঁ' না করিলে নাকি উকুনের স্বর্গলাভ হয় না। মধ্যে মধ্যে দুর্দান্ত চীৎকার করিয়া ছেলের দলকে গাল দিয়া ধমকাইতেছে—

আরে বদমাশে হারামজাদে, তেরি কুচ না করে হাম—

ইঁ, হারামজাদী বুঢ়্ঢী, তেরি দাঁত তোড় দেঙ্গে হাম।—বলিয়া ছেলের দল দাঁত বাহির করিয়া ভেংচাইয়া দিতেছে। একটা বুড়ী একটি ক্রন্দমানা শিশুকন্যাকে আদর করিতেছে—

"এ আমার বেটি রানী, সাতপরানী, বেটা লাভাড়, পুতা কানি,—বেটি আমার ভাগ্‌মানী! এ—এ—এ।" অর্থাৎ ও আমার রানী মেয়ে, সংসারে তাহার সাতটি প্রাণী, তাহার মধ্যে

পুত্রটি খোঁড়া, পৌত্রটি কানা ; আহা'আমার বেটি বড় ভাগ্যবতী।

বিমলবাবু তাহার আদরের ছড়া শুনিয়া হাসিলেন। বৃদ্ধা মেয়েটিকে বলিল, আরে আরে চুপ হো যাও বিটিয়া, মালেক যাতা হ্যায়, মালেক। আরে বাপ্ রে!

বয়স্ক ছেলেগুলি বিমলবাবুকে দেখিয়া শান্ত হইয়া দাঁড়াইল, ছোটগুলি হাত তুলিয়া সেলাম করিয়া বলিল, সেলাম মালেক।

বিমলবাবু ছোট্ট একটি টুকরা হাসি হাসিয়া কেবল ঘাড় নাড়িলেন। কয়টা অল্পবয়স্কা শিশু পরম আনন্দভরে এ উহার মাথায় পায়ের ধূলা ঢালিয়াই চলিয়াছে। একটা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশু বিচিত্র খেয়ালে পথের ধূলার উপরে শুইয়া ধপধপ করিয়া ধূলার উপর পিঠ আছড়াইয়া ধূলার রাশি উড়াইয়া আপন মনে হাসিতেছিল। ধূলার জন্য বিরক্ত হইয়া হাতের ছড়িটা দিয়া বিমলবাবু তাহাকে একটা খোঁচা দিয়া বলিলেন, এই!

ছেলেটা তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিয়া বলিল, সেলাম মালেক।

হাসিয়া বিমলবাবু অগ্রসর হইয়া গেলেন। বিমলবাবু পিছন ফিরিতেই ছেলেটা জিভ কাটিয়া দাঁত বাহির করিয়া কদর্য ভঙ্গিতে তাঁহাকে ভেংচাইয়া উঠিল, তারপর আবার লাফ দিয়া পথের ধূলায় পড়িয়া ধূলার উপর পিঠ ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, আল্‌বাত করেঙ্গে, ইঁ—ইঁ—ইঁ—। —বলিয়া আবার একবার ভেংচাইয়া উঠিল।

কুলী-বস্তি পার হইয়াই কারখানার পত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

এ-দিকের চরটাকে আর সে চর বলিয়া চেনাই যায় না। সে বেনাঘাসের জঙ্গল আর নাই, চরের এ-দিকটা একেবারে খুঁড়িয়া ফেলিয়া আবার সমান করিয়া ফেলা হইয়াছে, লালচে পলিমাটি এখন তকতক করিতেছে, মধ্যে মধ্যে এখানে ওখানে দূর্বা ও মুথো ঘাসের পাতলা আস্তরণ টুকরা টুকরা সবুজ ছাপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারই মধ্যে বড় বড় চতুর্ভুজ ছকিয়া লাল কাঁকরের অনেকগুলি রাস্তা এদিক ওদিক চলিয়া গিয়াছে। বড় রাস্তাটা এখানে আসিয়া সুদীর্ঘ দেবদারুগাছের মত যেন চারিদিকে সোজা সোজা শাখা-প্রশাখা মেলিয়াছে।

এমনি একটা চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের উপর প্রকাণ্ড বড় টিনের শেডটা তৈয়ারি হইতেছে। মোটা মোটা লোহার কড়ি ও বরগায় ছাঁদিয়া বাঁধিয়া কঙ্কালটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। শেডের উপর কুলীরা কাজ করিতেছে। লোহার উপর প্রকাণ্ড হাতুড়ির ঘা দিতেছে সেই উপরে দাঁড়াইয়া অবলীলাক্রমে। লোহার উপর প্রকাণ্ড হাতুড়ির প্রচণ্ড শব্দ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া দুই-তিন দিক হইতে প্রতিধ্বনিতে আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

একটা লরি হইতে লোহার কড়ি-বরগা নামানো হইতেছিল। স্টেশন হইতে লোহালক্কড় এই লরিতেই আসিতেছে। লোহার একটা স্তূপ হইয়া উঠিয়াছে। যন্ত্রপাতিও অনেক আসিয়া গিয়াছে, নানা আকারের যন্ত্রাদি পৃথক পৃথক করিয়া রাখা হইতেছে। এক পাশে পড়িয়া আছে দুইটা বিপুলকায় ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লার—নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের মত। এই সব লোহালক্কড় ও যন্ত্রপাতিগুলিকে মুক্ত রোদ-বাতাসের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্যই ওই টিনের শেডটা তৈয়ারি

হইতেছে। একেবারে মধ্যস্থলে একটা বৃহৎ চতুষ্কোণ জমির উপর কলের বনিয়াদ খোঁড়া হইয়াছে। ঠিক তাহারই মধ্যস্থলে চিমনিটা উঠিতেছে। একেবারে ও-পাশে লাল ইঁটের লম্বা কুলী-ব্যারাক। ব্যারাকটার ছাদ পিটিতে পিটিতে এ দেশেরই কামিনেরা পিট্‌নে কোপার আঘাতে তাল রাখিয়া একসঙ্গে গান গাহিতেছে।

বিমলবাবু একের পর একটি করিয়া কাজের তদারক করিয়া ফিরিলেন। ফিরিবার পথে বাংলোয় না আসিয়া ও-দিকে শ্রীবাসের দোকানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীবাসের ছেলে গণেশকে আর সে-গণেশ বলিয়া চেনা যায় না। চৌকা ঘর-কাটা রঙিন লুঙ্গি পরিয়া, ঘাড় একেবারে কামাইয়া চৌদ্দআনা দুইআনা ফ্যাশানে চুল ছাঁটিয়া, গায়ে একটা পুল-ওভার চড়াইয়া গণেশ একেবারে ভোল পাল্‌টাইয়া ফেলিয়াছে। দোকানেরও আর সে চেহারা নাই। পাকা মেঝে, পাকা বারান্দা, দোকানে হরেক রকমের জিনিস। লোহার তারের বাণ্ডিল। পেরেক, গজাল, গরুর গাড়ির চাকার হালের জন্য লোহার পাটি, লোহার শলি, গরুর গলার দড়ির পরিবর্তে লোহার শিকল, জানালায় দিবার জন্য লোহার শিক, মোট কথা লোহার কারবারই বেশি। অদূরে একটা গাছের তলায় একজন পশ্চিম-দেশীয় মুসলমান একটা গরুকে দড়ি বাঁধিয়া ফেলিয়া পায়ে নাল বাঁধিয়া ঠুকিতেছে। কয়েকজন গাড়োয়ান তাহাদের গরুগুলি লইয়া অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তার ধারে এক একটা ইঁট পাতিয়া কয়েকজন পশ্চিম-দেশীয় নাপিত চুল ছাঁটিতে বসিয়াছে। গণেশ বেচিতেছিল লোহার তার, কিনিতেছে একটি সাঁওতাল মেয়ে। গণেশ বলিতেছে, আরে বাপু, আলনা করবার জন্যে যে নিবি, তা, ক হাত চাই সে-মাপ এনেছিস?

মেয়েটি বুঝিতে পারিতেছে না, বলিতেছে, মাপ কি বুলছিস গো?

কি বিপদ! ছোট হ'লে তখন করবি কি? এসে তখন আবার কাঁউমাউ করবি যে।

হুঁ। কি কাঁউমাউ করলম গো?

কি বিপদ! কাপড় টাঙাবার জন্যে আলনা করবি ত?

হুঁ।

ঠিক এই সময়েই বিমলবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন। গণেশ ব্যস্ত হইয়া তার ফেলিয়া আসিয়া নমস্কার করিল, বলিল, হুজুর! তাড়াতাড়ি সে একখানা লোহার চেয়ার আনিয়া পাতিয়া দিল; বিমলবাবু বসিলেন না, চেয়ারখানার উপর একটা পা তুলিয়া দিলেন, বলিলেন, শ্রীবাস কোথায়?

আজ্ঞে, বাবা এখনও আসেন নি। কাল ও-পারে বাড়ি—

হুঁ। তুমি শোন তা হ'লে। মাঝি বেটারা আবার গোলমাল করতে আরম্ভ করেছে। ভেতরের ব্যাপারটা একটু খোঁজ নাও দেখি। শুনছি, ইন্দ্র রায় নাকি সব বেগার ধরেছেন। আসল কথাটা আমাকে জানিয়ে আসবে।

বিমলবাবু ফিরিলেন।

আপিসে বসিয়া বিমলবাবু ডাকিলেন, যোগেশবাবু!

যোগেশ মজুমদার আসিয়া দাঁড়াইল, বিমলবাবু বলিলেন, শ্রীবাসের হ্যাণ্ডনোটটা—আপনার দরুন যেটা, সেটার বোধ হয় তিন বছর পূর্ণ হয়ে এল, না ?

যোগেশ মজুমদার ফৌজদারী মামলার সময় শ্রীবাসকে ঋণ দিয়াছিল, তাহার দরুন হ্যাণ্ড-নোটটা বিমলবাবু কিনিয়াছেন।

মজুমদার বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, এবার তামাদির সময় হয়ে এল। তা ছাড়া আপনার নিজেরও দুখানা হ্যাণ্ডনোট—

সে থাক। এখন এইটের জন্তেই একটা উকিলের নোটিশ দিয়ে দিন।

বিমলবাবু নিজেও শ্রীবাসকে ঋণ দিয়াছেন দুইবার। মজুমদার বলিল, ওকে ডেকে—

বাধা দিয়া বিমলবাবু বলিলেন, না। ঠিক প্রণালীমত কাজ ক'রে যান। এর পর যা কথা হবে, সে উকিলের মারফতেই হবে। উকিল আমাদের শর্তটা জানিয়ে দেবেন, চরের একশ বিঘে জমিটা ন্যায্য মূল্যেই আমি পেতে চাই।

মজুমদার বলিল, যে আজ্ঞে।

বিমলবাবু বলিলেন, আর এক কথা। একবার ইন্দ্র রায়ের কাছে আপনি যান। তাঁকে বলুন যে, আমার শরীর খারাপ ব'লেই আমি আসতে পারলাম না। কিন্তু তিনি যে জমিদার-স্বরূপে সাঁওতালদের বেগার ধরেছেন, এতে আমার আপত্তি আছে। ওরা আমাদের দাদন খেয়ে রেখেছে। আমার দাদন-দেওয়া কুলী বেগার ধরলে আমার কাজের ক্ষতি হয়। বুঝলেন ? সে আমি সহ্য করব না। আচ্ছা, তা হ'লে আপনি যান ওঁর কাছে।

মজুমদার চলিয়া গেল। বিমলবাবু কাগজ-কলম লইয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই এক-জন চাপরাসী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল, বলিল, এসেছে।

মুখ না তুলিয়াই বিমলবাবু বলিলেন, নিয়ে আয়।

আসিয়া প্রবেশ করিল যে ব্যক্তি, সে এখানকার নতুন মদের দোকানের ভেণ্ডার। লোকটি ঘরে ঢুকিয়া একটি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। বিমলবাবু চাপরাসীটাকে বলিলেন, যা তুই এখান থেকে।

চাপরাসীটা চলিয়া গেল। বিমলবাবু বলিলেন, দেখ আমার জন্তেই তোমার এ দোকান।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ে কৃতজ্ঞতায় শতমুখ হইয়া বলিয়া উঠিল, দেখেন দেখি, দেখেন দেখি, হুজুরই আমার মা-বাপ—

হ্যাঁ। বাধা দিয়া বিমলবাবু বলিলেন, হ্যাঁ। একটি কাজ তোমাকে করতে হচ্ছে। সাঁওতালদের মাথায় একটা কথা তোমাকে ঢুকিয়ে দিতে হবে—কৌশলে। বুঝেছ ? দরজাটা ভেজিয়ে দাও। জমিদার বেগার ধরলে ওরা যেন না যায়।

মজুমদার এই দৌত্য লইয়া ইন্দ্র রায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইবার কল্পনায় চঞ্চল হইয়া পড়িল। ইন্দ্র রায়ের দাম্ভিকতা-ভরা দৃষ্টি, হাসি, কথা সুতীক্ষ্ণ সায়কের মত আসিয়া তাহার মর্মস্থল যেন বিদ্ধ করে। আর তাহার নিজের বাক্যবাণগুলি যতই শান দিয়া শাণিত করিয়া সে নিক্ষেপ করুক, নিক্ষেপ ও শক্তির অভাবে সেগুলি কাঁপিতে কাঁপিতে নতশির হইয়া রায়ের সম্মুখে যেন প্রণত হইয়াই লুটাইয়া পড়ে। তবে এবার পৃষ্ঠদেশে আছেন সক্ষম রথী বিমলবাবু; বিমলবাবুর আজিকার এই বাক্য-শব্দটি শুধু সুতীক্ষ্ণই নয়, শক্তির বেগে তাহার গতি অকম্পিত এবং সোজা। মজুমদার একটা সভয় হিংস্রতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নানা কল্পনা করিতে করিতেই সে চর হইতে নদীর ঘাটে আসিয়া নামিল। চরের উপর নদীর মুখ পর্যন্ত রাস্তাটা এখন পাকা হইয়া গিয়াছে, কালীর বুকেও এখন গাড়ির চাকায় চাকায় বেশ একটি চিহ্নিত রাস্তা রায়হাটের খেয়াঘাটে গিয়া উঠিয়াছে। ও-পার হইতে মজুর-শ্রেণীর পুরুষ ও মেয়েরা দল বাঁধিয়া চরের দিকে আসিতেছে। কলের ইমারতের কাজেই ইহারা এখন খাটে, আগের চেয়ে মজুরিও কিছু বাড়িয়াছে। কতকগুলি চাষী বেগুন-মূলা-শাকসব্জি বোঝাই ঝুড়ি-মাথায় চরের দিকেই আসিতেছে। এখন রায়হাটের চেয়ে জিনিসপত্র চরেই কাট্তি হয় বেশী, চরে মিস্ত্রী-মজুরেরা দরদস্তর করে কম, কেনেও পরিমাণে বেশী। এ-পারে যাহারাই আসিতেছিল, তাহারা সকলেই মজুমদারকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইল, মজুমদার এখন কলের ম্যানেজার। রায়হাটের ঘাটে আসিয়া মজুমদার বিরক্ত হইয়া উঠিল, পথে একহাঁটু ধুলা হইয়াছে। চারিপাশে দীর্ঘকালের প্রাচীন গাছের ঘন ছায়ার মধ্যে হিম যেন জমাট বাঁধিয়া আছে। পথের উপর মানুষ-জনও নাই। মজুমদার চরের ম্যানেজারির গৌরবের গোপন অহঙ্কার নির্জনতার সুযোগে প্রকাশ করিয়া ফেলিল বেশ জোর গলাতেই, আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল, মা-লক্ষ্মী যখন ছাড়েন, তখন এই দশাই হয়। হুঁ, অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।

পথের দুই পাশে প্রাচীন কালের নৌকার মত বাঁকানো চালকাঠামোযুক্ত কোঠাঘরগুলির দিকে চাহিয়া তাহার ঘৃণা হইল। বলিল, হুঁ, কি সব জঘন্য চাল-কাঠামো! সেকালের কি সবই ছিল কিম্ভূত-কিমাকার! যত জবড়জং—হাতির শুঁড়, পরী, সিংহী—এই দিয়ে আবার বাহার করেছে। ঘর করবে বাংলো-চাল, সোজা একেবারে পাকা দালান-ঘরের মত।

মোট কথা রায়হাটের সমস্ত কিছুকে ঘৃণা করিয়া, ব্যঙ্গ করিয়া ইন্দ্র রায়ের সম্মুখীন হইবার মত মনোবৃত্তিকে সে নিজের অজ্ঞাতেই দৃঢ় করিয়া লইতেছিল।

নায়েব-সেরেস্তার সম্মুখে একখানা সেকেলে ভারী কাঠের চেয়ারে বসিয়া ইন্দ্র রায় জমিদারী কাজকর্মের তদারক করিতেছিলেন। নায়েব মিত্তির তক্তাপোশে বসিয়া একটি সেকেলে ডেস্কের উপর খাতা খুলিয়া দেখিয়া রায়ের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল। তাহার পাশে মিত্তিরের ভাইপো কতকগুলি খাতা লইয়া বসিয়া আছে। এই লোকটিকে রায় চক্রবর্তী-বাড়ির

কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। মনে গোপন ইচ্ছা, এইবার তিনি ধীরে ধীরে চক্রবর্তীদের সংস্রব হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন।

মজুমদার ঘরে ঢুকিয়াই নমস্কারের ভঙ্গিতে প্রণাম করিয়া বলিল, একবার মুখুজ্জে সায়েব আপনার কাছে পাঠালেন।

বিমলবাবু এখানে মুখার্জি সাহেব নামেই খ্যাত হইয়াছেন। বাবু নামটি তিনি অপছন্দ করেন, বলেন, ওটা গালাগালি। চরে কুলি কামিন ও রায়হাটের দরিদ্র জনসাধারণের কাছে তিনি মালিক, হুজুর। কর্মচারী ও অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সাধারণের নিকট তিনি মুখার্জি সাহেব।

ইন্দ্র রায়ের পাশে আরও খানতিনেক চেয়ার খালি পড়িয়া ছিল। মজুমদার তাহার কথার ভূমিকা শেষ করিয়া ওই চেয়ারগুলার দিকেই দৃষ্টি ফিরাইল ; ইন্দ্র রায় সাদরে সম্ভাষণ জানাইয়া মিত্তিরের তক্তাপোশের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া স্পষ্ট নির্দেশ দিয়া বলিলেন, ব’স ব’স।

মজুমদার একটু ইতস্তত করিয়া তক্তাপোশের উপরে বসিল। রায় তাঁহার অভ্যস্ত মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন, কি সংবাদ তোমার মুখার্জি সাহেবের, বল ?

আজ্ঞে। মাথা চুলকাইয়া যোগেশ মজুমদার বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, আজ্ঞে, আমাকে যেন অপরাধী করবেন না—

ইন্দ্র রায়ের ঠোঁটের প্রান্তে যে হাসির রেখাটুকু ফুটিয়া উঠে, সেটা অভিজাতসুলভ অভ্যাস-করা একটা ভঙ্গিমাত্র, হাসি নয় ; মজুমদারের বিনয়ের ভূমিকা দেখিয়া কিন্তু রায় এবার সত্য সত্যই একটু হাসিলেন। বুঝিলেন, অস্ত্র প্রয়োগের পূর্বে মজুমদারের এটি প্রণাম-বাণ প্রয়োগ। রায় হাসিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, দূত চিরকালই অবধ্য ; তোমার ভয় নেই, নির্ভয়ে তুমি মুখার্জি সাহেবের বক্তব্য ব্যক্ত কর।

রায়ের কথার সুরে অর্থে মজুমদার তাঁহার শক্তি অনুমান করিয়া আরও সংহত এবং সংযত হইয়া উঠিল, আরও খানিকটা বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, তিনি নিজেই আসতেন। তা তাঁর শরীরটা—। মজুমদার ভাবিতেছিল, কোন্ অসুখের কথা বলিবেন।

শরীরটায় আবার কি হ’ল তাঁর ? প্রশ্ন করিয়াই রায় হাসিলেন, বলিলেন, চালুনিতে যে-কালে সরষে রাখা চলছে যোগেশ, সে-কালে শরীরে যা হোক একটা কিছু হওয়ার আর আশ্চর্য কি ? তোমার শরীর কেমন ?

লজ্জার সহিত মজুমদার বলিল, আজ্ঞে, আমি ভালই আছি।

রায় বাঁ হাতে গোঁফে তা দিতে শুরু করিয়া বলিলেন, ভাল কথা, শরীর তো সুস্থই আছে, এইবার সরল অন্তঃকরণে স্পষ্ট ভাষায় বল তো, মুখার্জি সাহেবের কথাটা কি ?

বাঁ হাতে গোঁফে তা দেওয়াটা রায়ের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের একটা বহিঃপ্রকাশ।

মজুমদার প্রাণপণে আপনাকে দৃঢ় করিয়া বলিল, বেশ গাম্ভীর্যের সহিতই আরম্ভ করিল, কথাটা চরের সাঁওতালদের নিয়ে। মানে, উনি সাঁওতালদের সব দাদন দিয়ে রেখেছেন।

শ্রীবাসের কাছে ধানের বাকী বাবদ কারও বিশ, কারও ত্রিশ, দু'একজনের চল্লিশ টাকাও ধার ছিল। শ্রীবাসের প্যাঁচালো বুদ্ধি তো জানেন, সে আবার ডেমিতে টিপছাপ নিয়ে বন্ধকী দলিল পর্যন্ত করে নিয়েছিল। যোগেশ একটু থামিল।

রায়ের গোঁফে তা দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার মুখ-চোখ ধীরে ধীরে চিন্তাভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল।

মজুমদার কোন সাড়া না পাইয়া বলিল, মুখার্জি সাহেব সেটা জানতে পেরেই শ্রীবাসকে ডেকে ধমক দিয়ে তার টাকা দিয়ে খতগুলি কিনে নিলেন। সাঁওতালদের বললেন, তোরা খেটে আমাকে শোধ দিবি। মজুরি থেকে দৈনিক এক আনা হিসেবে কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন তিনি।

রায় নীরবে চিন্তাভারাতুর দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়া চাহিয়া ছিলেন অদৃষ্টলোকের সন্ধানে, কিছু কি দেখা যায়? দেখা কিছু যায় না, কিন্তু অনুভব করিলেন যে জীবন-পথ অতি উচ্চ পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়াছে, সঙ্কীর্ণ পথ, পাশ ফিরিয়া গতি পরিবর্তনের উপায় নাই। গতি পরিবর্তন করিতে গেলে, তাঁহারই হাত ধরিয়া যিনি চলিয়াছেন, পঙ্গু, রুগ্‌ণ রামেশ্বর—তাঁহাকেই পাশের খাদে ঠেলিয়া ফেলিতে হইবে। সে ফেলিতে গেলে তাঁহাকেও পড়িতে হইবে এ-পাশের অতল অন্ধকারে—অধোগতির তমোলোকে, কৃতঘ্নতার নরকে।

মজুমদার বলিয়াই গেল, এখন ধরুন, এই সব দাদনের কুলী যদি আপনি আটক করেন, তা হ'লে কি করে চলে বলুন?

চিন্তাকুলতার মধ্যেও রায় কথাগুলি শুনিতেছিলেন। তিনি এবার সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে মিত্তিরের ভাইপোর দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি ব্যাপার, রাধারমণ?

রমণ বলিল, আজ্ঞে, আটক কেন করতে যাব! তবে এখন ধান কাটার সময়, মাঝিরা আমাদের খাসের জমির ধান কাটছিল না, তাই তাদের কাটতে হুকুম দেওয়া হয়েছে। তারপর ধরুন, অগ্রাণের শেষ সপ্তাহ হয়ে গেল, এখনও রবি-ফসল বুনল না ওরা, কেবল কলেই খেটে যাচ্ছে; সেই জন্যেই বলা হয়েছে যে, আগে এসব কর, তারপর তোমরা যা করবে কর গে।

মজুমদার প্রতিবাদ করিয়া একটু চড়া সুরে এবার বলিয়া উঠিল, যারা ভাগীদার নয়, তাদেরও আপনারা বেগার ধরেছেন খাসের জমির ধান কাটবার জন্যে।

রায় রমণের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, বেগারও ধরা হয়েছে বুঝি?

রমণ উত্তর দিবার পূর্বেই মজুমদার বলিয়া উঠিল, ধরা হয়েছে এবং আপনার নাম দিয়ে ধরা হয়েছে। আপনার নাম না দিলে সাহেব আমাকে পাঠাতেন না, বেগার উঠিয়ে নিতেন। সাঁওতালপাড়ায় সকলেই বললে, আমাদের রাঙাবাবুর শ্বশুর, রায় হুজুর হুকুম দিলে, বেগার দিতে হবে। কথার সঙ্গে সঙ্গে একটি শ্লেষভরা হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

মুহূর্তে রায়ের মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চোখ বুজিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তারা, তারা মা! সে কণ্ঠস্বর ধীর এবং প্রশান্ত; সারা ঘরটা যেন থমথম করিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই রায় নড়িয়া-চড়িয়া

বসিলেন। সজাগ হইয়া বাঁ-হাতে আবার গোঁফে তা দিতে দিতে হাসিয়া বলিলেন, তারপর?

মজুমদার শঙ্কিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে?

হাসিয়াই রায় বলিলেন, এখন মুখার্জি সাহেবের বক্তব্যটা কি?

আজ্ঞে, বেগার নিতে গেলে আমাদের কি ক'রে চলে, বলুন? তা ছাড়া ভেবে দেখুন, বেগার প্রথাটাও হ'ল বে-আইনী।

ওঃ, আইন! আইনের কথাটা আমার স্মরণ ছিল না। তা আইনে কি বলছে শুনি?

মজুমদার কথাটার সম্যক্ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কিতভাবেই বলিল, আজ্ঞে?

তোমার মুখার্জি সাহেবকে ব'লো, তিনি বুঝবেন, তুমি বুঝবে না। ব'লো, আমাদের জমিদারির সনন্দ বাদশাহী আমলের,—বেগার ধরার অভ্যেস আমাদের অনেক দিনের। কেউ ছাড়তে বললেই কি ছাড়া যায়? বেগার আমরা চিরকাল ধ'রে আসছি, ধরবও।

তারপর হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, দরকার হ'লে তোমার মুখার্জি সাহেবকেও বেগার দিতে হবে হে। চক্রবর্তী-বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম হ'লে ওঁকেও আমরা কোন কাজে লাগিয়ে দেব। কাজ তো নানা ধারার আছে।

মজুমদার সুযোগ পাইয়া চট করিয়া বলিয়া উঠিল, কাজ তো হাতের কাছে, আপনি ইচ্ছা করলেই তো লেগে যায়। উমা-মায়ের সঙ্গে অহীনবাবুর বিয়েটা এইবার লাগিয়ে দিন।

রায় হাসিয়া এবার বলিলেন, ছেলেমেয়ে থাকলেই বিয়ের কল্পনা হয় মজুমদার, পাত্রপক্ষ-পাত্রীপক্ষ তো করেই নানা কল্পনা, আবার পাড়াপড়শীতেও পাঁচরকম ভাবে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ভগবানের হাতে, ভগবানের দয়া যদি হয় তবে হবে বৈকি। সে হ'লে তুমি জানতে পারবে সকলের আগে। যিনিই অহীন্দ্রের শ্বশুর হোন, তাঁকে আশীর্বাদের সময় তোমাকে একটা শিরোপা দিতেই হবে। চক্রবর্তী-বাড়ির প্রাচীন কর্মচারী তুমি, আপনার জন।

শব্দার্থে 'শিরোপা' 'প্রাচীন কর্মচারী' শব্দগুলি ক্ষুরধার, মজুমদারের মর্মস্থলে বিদ্ধ হইবার কথা। কিন্তু রায়ের কণ্ঠস্বরে সুরের গুণ ছিল আজ অন্যরূপ; আঘাত করিবার জন্য ব্যঙ্গ-শ্লেষের নিষ্ঠুর গুণ টানিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি ছিল না; অদৃষ্টবাদী মনের দৃষ্টি আপনার ইষ্টদেবীর চরণপ্রান্তে নিবদ্ধ রাখিয়া তিনি কথা বলিতেছিলেন। মজুমদার আজ আহত হইল না, বরং সে সুরের কোমল স্পর্শে বিচলিত এবং লজ্জিত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে এবার অকৃত্রিম সরলতার সহিতই বলিল, আজ্ঞে বাবু, এই চরের সাঁওতালদের ব্যাপারটা কি কোন রকমে আপোস করা যায় না?

রায় বলিলেন, কার সঙ্গে আপোস যোগেশ? বিমলবাবুর সঙ্গে? তিনি হাসিলেন।

মজুমদার বলিল, লোকটি বড় ভয়ানক বাবু। ধর্ম-অধর্ম কোন কিছু মানেন না। আর লোকটির কূটবুদ্ধিও অসাধারণ।

রায় আবার হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

মজুমদার বলিল, সর্দার মাঝির নাতনী ওই সারী মাঝিনের ব্যাপারে আমরা তো ভেবে-

ছিলাম, সাঁওতালরা একটা হাঙ্গামা বাধালে বুঝি। কিন্তু এমন খেলা খেললে মশায় যে, কমল আর সারীর স্বামীই হ'ল দেশত্যাগী, আর সমস্ত সাঁওতাল হ'ল বিমলবাবুর পক্ষ। তারা কথাটি কইলে না। আর কি জঘন্য রুচি লোকটার!

রায় বলিলেন, এতে আর ভয় পাবার কি আছে? ও-খেলা আমাদের পুরনো হয়ে গেছে। আগেকার কালে কর্তারা ও-দিকে ভয়ানক খেলা খেলে গেছেন। এ-খেলা ব্যবসায়ীর পক্ষে নতুন। মা-লক্ষ্মীর কপালই ওই, পেছনে পেছনে অলক্ষ্মী জুটবেই। বাণিজ্য-লক্ষ্মীর ঘরে সতীন ঢুকেছে অলক্ষ্মী। যাক গে, ও কথাটা বাদই দাও।

মজুমদার আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, ঝগড়া-বিবাদটা না হ'লেই ভাল হ'ত বাবু।

ঝগড়া-বিবাদ? রায় গোঁফে তা দিয়া হাসিয়া বলিলেন, ঝগড়া-বিবাদ করতে তা হ'লে মুখার্জি সাহেব বদ্ধপরিকর, কি বল?

হ্যাঁ, তা যে রকম মনে হ'ল, তাতে—। মজুমদার ইঙ্গিতে কথাটা শেষ করিয়া নীরব হইয়া গেল।

রায় বলিল, জান তো, আগেকার কালে যুদ্ধের আগে এক রাজা আর এক রাজার কাছে দূত পাঠাতেন; সোনার শেকল আর খোলা তলোয়ার নিয়ে আসত সে দূত। যেটা হোক একটা নিতে হ'ত। তা তোমার মুখার্জি সাহেবকে ব'লো, খোলা তলোয়ারখানাই নিলাম, শেকল নেওয়া আমাদের কুলধর্মে নিষিদ্ধ, বুঝেছ?

কথা বলিতে বলিতে রায়ের চেহারার একটা আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গেল; ব্যঙ্গহাস্যে মুখ ভরিয়া উঠিয়াছে, গোঁফের দুই প্রান্ত পাক খাইয়া উঠিয়াছে, চোখের দৃষ্টিই হইয়া উঠিয়াছে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। উৎফুল্ল উগ্র সে দৃষ্টির সম্মুখে সব কিছু যেন তুচ্ছ। কপালে সারি সারি তিনটি বলিরেখা অবরুদ্ধ ক্রোধের বাঁধের মত জাগিয়া উঠিয়াছে।

মজুমদার আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, একটি প্রণাম করিয়া সে বিদায় হইল।

রায় বলিলেন, মিত্তির, একখানা নতুন ফৌজদারী আইনের বইয়ের জন্যে কলকাতায় লেখ দেখি, আমাদের অমলের মামাকেই লেখ, সে যেন দেখে ভাল বই যা, তাই পাঠায়। আমাদের খানা পুরনো অনেক দিনের।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ঘরের মধ্যেই খানিকটা পায়চারি করিয়া বলিলেন, এক পা যদি বিরোধের দিকে এগোয়, সঙ্গে সঙ্গে কালীর বুকে বাঁধ দিয়ে যে পাম্প বসিয়েছে মুখুজ্জে, সেটা বন্ধ ক'রে দাও। চর-বন্দোবস্তির সঙ্গে নদীর কিছু নেই।

দ্বিপ্রহরে উপরের ঘরে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্র রায় ডাকিলেন, হেমাঙ্গিনী!

স্বামীর এমন কণ্ঠস্বর হেমাঙ্গিনী অনেক দিন শুনেন নাই, দ্রুতপদে তিনি উপরে আসিয়া রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এই বয়সে এতকাল পরে আবার অসময়ে আরম্ভ করলে? ছিঃ!

অর্থাৎ মদ। হেমাঙ্গিনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রতারিত হয় নাই। রায় চিন্তা করিতে করিতে দুই-এক পাত্র কারণ পান করিতেছেন। তাঁহার মুখ থমথমে রক্তাভ, সন্থ-ঘুমভাঙা ব্যক্তির মত।

রায় হাসিয়া বলিলেন, বড় চিন্তায় পড়েছি হেম। সামনে মনে হচ্ছে অগ্নিপরীক্ষা।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, মুখ দেখে তো তা মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন কোন সুখবর পেয়েছ।

না না হেম, চরের কলের মালিকের সঙ্গে দাঙ্গা বাধবে ব'লে মনে হচ্ছে। লোকটা আজ শাসিয়ে লোক পাঠিয়েছিল। তোমায় একবার সুনীতির কাছে যেতে হবে। ব্যাপারটা তাকে জানানো দরকার। বলবে, কোন ভয় নেই তার, পেছনে নয়, আমি এবার সামনে।

* * *

মজুমদার ভারাক্রান্ত মন লইয়াই সংবাদ দিতে চলিয়াছিল। নদীর ঘাটে আবার যখন সে নামিল, তখন ও-পারে বয়লারে বারোটার সিটি বাজিতেছে। কলরবে কোলাহলে চরটা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এ-পার হইতে চরটাকে বিচিত্র মনে হয়। কালিন্দীর কালো জল-ধারার কূলে সবুজ আস্তরণের মধ্যে রাঙা পথের ছক, নূতন ঘরবাড়ি, মানুষের চাঞ্চল্য কোলাহল, কুলীদের গান—অদ্ভুত! চরটা যেন এক চঞ্চলা কিশোরীর মত কালিন্দীর জলদর্পণের দিকে চাহিয়া অহরহ প্রসাধনে মত্ত।

এ-পারে রায়হাট নিস্তব্ধ; সমস্ত গ্রামখানা প্রাচীন কালের গাছে গাছে আচ্ছন্ন। গাছ-গুলির মাথায় রাশি রাশি ধূলা, কয়খানা প্রাচীন কালের দালানের বিবর্ণ জীর্ণ চিলে-কোঠা কেবল গাছের উপরে জাগিয়া আছে ধূলি-ধূসর জটার কুণ্ডলীর মত। ও-পারের চরটার তুলনায় মনে হয়, যেন কোন লোলচর্মা পলিতকেশা জরতী ঘোলাটে চোখের স্তিমিত অর্থহীন দৃষ্টি মেলিয়া পরপারের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে নিস্পন্দ নির্বাক।

মজুমদার প্রত্যক্ষভাবে এমন করিয়া না বুঝিলেও ভারাক্রান্ত মনে ব্যথা পাইল। সে যখন গিয়াছিল, তখন ইন্দ্র রায় ও চক্রবর্তীদের উপর ক্রোধবশত রায়হাটকেও ঘৃণা করিয়াছিল, কিন্তু ফিরিবার পথে ইন্দ্র রায়ের সহৃদয়তার উত্তাপে তাহার মন হইয়াছে অন্যরূপ, সে এবার রায়-হাটের জন্য বেদনা অনুভব করিল। মাথা নীচু করিয়াই নদীর বালি ভাঙিয়া সে চলিতেছিল; সহসা চিলের মত তীক্ষ্ণ গলায় কে তাহাকে বলিল, কি রকম? কি হ'ল মশায়? কি বললে চামচিকে পক্ষী, আড়াইহাজারী জমিদার?

মজুমদার মাথা তুলিল, সম্মুখে চর হইতে ফিরিতেছেন অচিন্ত্যবাবু, হরিশ রায়, শূলপাণি। প্রশ্নকর্তা তীক্ষ্ণকণ্ঠ অচিন্ত্যবাবু। বিমলবাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর হইতেই অচিন্ত্যবাবু ইন্দ্র রায়ের নামকরণ করিয়াছেন, চামচিকা পক্ষী, আড়াইহাজারী জমিদার।

মজুমদার বলিল, ছিঃ অচিন্ত্যবাবু, রায় মশায় আমাদের এখানকার মানী লোক—

শূলপাণি আসিবার পূর্বেই গাঁজা চড়াইয়াছিল, সে বাধা দিয়া হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল,

মানী লোক! কে হে? ইন্দ্র রায়? ম'রে যাই আর কি! বলি, আমরাও তো জমিদার হে, আমরাই বা কি কম?

মজুমদার বলিল, দেখ শূলপাণি, যা-তা বাজে ব'কো না। তুমি মুখার্জি সাহেবের তাঁবেদার, আর রায় মশায় হলেন তোমার সাহেবের জমিদার।

অচিন্ত্যবাবু এককালে চাকুরিজীবী ছিলেন, মজুমদার তাঁহার অপেক্ষা উচ্চপদস্থ কর্মচারী —এ-জ্ঞান তাঁহার টনটনে, তিনি ধাঁ করিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, কি বললেন রায় মশায়!

বললেন আর কি। যা বলবার তাই বললেন। বললেন, 'বেগার ধরা আমাদের অনেক কালের অভ্যেস, ছাড়তে বললেই কি ছাড়া যায়?' তারপর অবিশ্যি হাসতে হাসতেই বললেন যে, 'এ তো সাঁওতাল, চক্রবর্তী-বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম হ'লে তোমাদের সাহেবকেও বেগার ধরব হে। কাজ তো অনেক রকম আছে।'

অচিন্ত্যবাবু পরম বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে গম্ভীর ভাবে বলিলেন, লাগল তা হ'লে। এইবার কিন্তু রায় ঠকবেন। জমিদারী আর সাহেবী বুদ্ধিতে অনেক তফাত। মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে এইবার রায় অপমানিত হবেন।

মজুমদার বলিল, না না, ও-কথাটা ঠিক নয় হে।

মানে?

আজ যা বললেন, তাতে বুঝলাম, ও বিয়ের কথাটা ঠিক নয়। বললেন আমাকে, 'ও ছেলেমেয়ে থাকলেই কথা ওঠে যোগেশ, কিন্তু তা হ'লে কি তুমি জানতে পারতে না—চক্রবর্তী-বাড়ির পুরনো কর্মচারী তুমি! তবে ভগবানের ইচ্ছে হয়, হবে।'

আপনার মাথা! অচিন্ত্যবাবু প্রচণ্ড অবজ্ঞাভরে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, আপনার মাথা। আমি নিজে জানি, কথা উঠেছিল। রায়ের ছেলে অমল অহীন্দ্রকে পর্যন্ত ধরেছিল। এখন আসল ব্যাপার, রামেশ্বরবাবু আর ও বাড়ির মেয়ে ঘরে ঢোকাবেন না। এ যদি না হয়, আমার কান দুটো কেটে ফেলব আমি। ভগবানের ইচ্ছে হয়, হবে! শাক দিয়ে মাছ ঢাকা আর কি!—বলিয়া তিনি হেঁ-হেঁ করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিলেন—বিজ্ঞতার হাসি।

হরিশ রায়ের চোখ দুইটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ভ্রূ দুইটি ঘন ঘন নাচিতে আরম্ভ করিল, ঘাড়টি ঈষৎ দোলাইয়া বলিয়া উঠিলেন, অ্যাই ঠিক কথা। অচিন্ত্যবাবু ঠিক ধরেছেন।

শূলপাণি বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ-হুঁ, সে বাবা কঠিন ছেলে, রামেশ্বর চক্রবর্তী, আর কেউ নয়। তারপর হি-হি করিয়া হাসিয়া অদৃশ্য ইন্দ্র রায়কে সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গভরে বলিল, লাও বাবা, লাও, মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে চরের ওপর লগর বসাও!

কথাটা মজুমদারেরও মনে ধরিল। ইন্দ্র রায়ের সহৃদয়তায় যে সাময়িক কোমলতা তাহার মনে জাগিয়াছিল, কুয়াশার মত সেটা তখন মিলাইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

হরিশ রায় চুপিচুপি বলিলেন, এই দেখ আমাদের জ্ঞাতি হ'লে হবে কি, ছোট রায়-বাড়ির ওই কেলেঙ্কারি, যাকে বলে বংশগত, তাই। আমাদের কাছে রায়বংশের কুর্সীনামা আছে, দেখিয়ে দোব, প্রতি পুরুষে ওদের এই কেচ্ছা, বুঝেছ ?

সেই দু'পহরের রৌদ্র মাথায় করিয়া নদীর বালির উপরেই তাহাদের মজলিস জমিয়া উঠিল। সকলেরই মনোভাণ্ডে পরনিন্দার রস রৌদ্রতপ্ত তাড়ির মতই ফেনাইয়া গাঁজিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যা না হইতেই কথাটা গ্রামময় রটিয়া গেল।

ছোট রায়-বাড়ির কাছারি পর্যন্ত কথাটা আসিয়া পৌঁছিয়া গেল। ইন্দ্র রায় কাছারিতে ছিলেন না, অন্দরে নিয়মিত সন্ধ্যা-তর্পণে বসিয়াছিলেন ; কথাটা প্রথম শুনিলেন রায়ের নায়েব মিত্তির। পথের উপরে দাঁড়াইয়া অতিমাত্রায় ইতরতার সহিত রায়-বংশের নিঃস্ব নাবালকটির সেই অভিভাবিকা উচ্চকণ্ঠে কথাটা ঘোষণা করিতেছিল। মিত্তিরের সর্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরিয়া গেল, কিন্তু উপায় ছিল না, ঘোষণাকারিণী স্ত্রীলোক। রায়কে কথাটা শুনাইতেও তাহার সাহস হইল না। সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রায়ের সান্ধ্য-উপাসনা তখন অর্ধসমাপ্ত, দ্বিতীয় পাত্র কারণ পান করিয়া জপে বসিয়াছেন। গদ্‌গদস্বরে ইষ্টদেবীকে বার বার ডাকিতেছেন, মা আমার রণরঙ্গিনী মা ! ধনী মুখার্জির সহিত দ্বন্দ্বসম্ভাবনায় বহুকাল পরে গোপন উত্তেজনাবশে আজ ওই রূপ ওই নামটিই তাঁহার কেবল মনে পড়িতেছে।

সহসা বাড়ির উঠানে কাংস্যকণ্ঠে কে চীৎকার শুরু করিয়া দিল, হায় হায় গো ! ম'রে যাই, ম'রে যাই ! আহা গো ! 'পিড়ি পেতে করলাম ঠাঁই, বাড়া ভাতে পড়ল ছাই।' দিলে তো চক্রবর্তীরা নাকে ঝামা ঘ'ষে ? হয়েছে তো ? নাবালক শরিককে ফাঁকি দেওয়ার ফল ফলল তো ? ঈর্ষাতুরা মেয়েটির পথে পথে চীৎকার করিয়াও তৃপ্তি হয় নাই, সে রায়ের অন্দরে আসিয়া হেমাঙ্গিনীর সম্মুখে হাত নাড়িয়া কথাগুলি শুনাইতেছে।

রায়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই আপনাকে তিনি সংযত করিলেন, ধীর স্থির ভাবে ইষ্ট দেবীকে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

নীচে হেমাঙ্গিনীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া ভঙ্গি সহকারে নাবালকের অভিভাবিকাটি তখনও বলিতেছিল, তাই বলতে এলাম, বলি, একবার ব'লে আসি। আমার নাবালককে যে ফাঁকি দেবে, ভগবান তাকে ফাঁকি দেবে। আঃ, হায় হায় গো ! হায় হায় ! সে যেন নাচিতে আরম্ভ করিল।

হেমাঙ্গিনী ব্যাপারটার আকস্মিকতায় এবং রূঢ়তায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, শঙ্কায় বিস্ময়ে কম্পিত মৃদুকণ্ঠে তিনি বলিলেন, কি বলছ তুমি ?

ইতর ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ করিয়া বিধবাটি বলিল, আ ম'রে যাই ! কিছু জানেন না কেউ ! বলি, চক্রবর্তী-বাড়ির রাঙা বর জুটল না তো মেয়ের কপালে ? দিয়েছে তো চক্রবর্তীরা হাঁকিয়ে ?

বলি, কোন্ মুখে তোরা আবার গিয়েছিলি তাই শুনি? এই বাড়ির মেয়ে নাকি আবার চক্রবর্তীরা নেয়! বলে যে, সেই—'মিনসে নেয় না বসতে পাশে, মাগী বলে আমায় ভালবাসে' সেই বিত্তান্ত। আঃ হায় হায় গো! ফসকে গেল এমন সুযোগ! অকস্মাৎ তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত রূঢ় হইয়া উঠিল, যা চর ঢুকিয়ে দিগে চক্রবর্তীদের বাড়িতে! মেয়ে-জামায়ের জন্তে লগর বসালেন! আঃ হায় হায়! হায় হায় গো!

সে যেমন নাচিতে নাচিতে আসিয়াছিল, তেমনি নাচিতে নাচিতেই চলিয়া গেল। চৈতন্য-হারা হেমাঙ্গিনী মাটির পুতুলের মতই বসিয়া রহিলেন। উপর হইতে গভীর ধীর কণ্ঠের ধ্বনি ভাসিয়া আসিল, তারা, তারা মা। সমস্ত বাড়িটার মধ্যে সে ধ্বনি প্রতিধ্বনির ঝঙ্কারে সুগভীর হইয়া বাজিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পর সিঁড়ির উপরে খড়মের শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যা-উপাসনার পর বিশেষ প্রয়োজন না হইলে রায় নীচে নামেন না। আজ রায় নীচে নামিলেন, হেমাঙ্গিনী কিন্তু তবুও সচেতন হইয়া উঠিতে পারিলেন না। রায় নীচে নামিয়া ডাকিলেন, হেম! এ ডাক তাঁহার আদরের ডাক।

হেমাঙ্গিনী সাড়া দিতে পারিলেন না। রায় বলিলেন, উঠতে হবে যে হেম। উঠে একখানা ভাল কাপড় পর দেখি। আমার শালখানাও বের ক'রে দাও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হেমাঙ্গিনী এবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রায় বলিলেন, একটু শিগগির কর হেম, মাহেন্দ্রযোগ খুব বেশিক্ষণ নেই।

হেমাঙ্গিনী এতক্ষণে প্রশ্ন করিলেন, কোথায় যাবে?

হাসিয়া রায় বলিলেন, মা আমার আজ অনুমতি দিয়েছেন হেম। যাব রামেশ্বরের কাছে, উমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে। ভাল কাপড় পর একখানা, আমার শালখানাও দাও।

হেমাঙ্গিনীর মুখ এবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সোনার উমা, সোনার অহীন্দ্র তাঁহার। গোপন মনে এ-কথা তাঁহার কত বার মনে হইয়াছে।

চাকর চলিয়াছিল আলো লইয়া, চাপরাসী ছিল পিছনে।

সুদীর্ঘ কাল পরে ইন্দ্র রায় চক্রবর্তী-বাড়ির দুয়ারে আসিয়া ডাকিলেন, কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল, রামেশ্বর!

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির মতই একটা ধ্বনি ভাসিয়া আসিল, কে? বিচিত্র সে কণ্ঠস্বর!

রায় উত্তর দিলেন, আমি ইন্দ্র।

২৫

বিশীর্ণ ন্যুব্জদেহ, রক্তহীনের মত বিবর্ণ পাংশু, এক পলিতকেশ বৃদ্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া—দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। উত্তেজনার আতিশয্যে কঙ্কালসার বুকখানা হাপরের

মত উঠিতেছে নামিতেছে। হেমাঙ্গিনী সুনীতিকে বলিলেন, ধর, ধর সুনীতি, হয়তো প'ড়ে যাবেন উনি।

ইন্দ্র রায় বিস্ময়ে বেদনায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন,—এই রামেশ্বর! কৌতুকহাস্যে সমুজ্জ্বল, স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, বিলাসী রামেশ্বর এমন হইয়া গিয়াছে! সে রামেশ্বরের এতটুকু অবশেষও কি আর অবশিষ্ট নাই! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রায় দেখিলেন, আছে, কঠোর বাস্তব একটি মাত্র পরিচয়-চিহ্ন অবশেষ রাখিয়াছে, চোখের পিঙ্গল তারা দুইটি এখনও তেমনি আছে। কয়েক মুহূর্ত পর রায় দেখিলেন, না, তাও নাই, চোখের তারা তেমনি আছে, কিন্তু পিঙ্গল তারার সে দ্যুতি আর নাই। সুরহারা গানের মত অথবা রসহীন রূপের মতই সকরুণ তাহার অবস্থা।

ধীরে ধীরে রামেশ্বরের উত্তেজনা শান্ত হইয়া আসিতেছিল। খাটের বাজু ধরিয়া দেহের কম্পন তিনি রোধ করিয়াছিলেন; কেবল ঠোঁটের সঙ্গে চিবুক পর্যন্ত অংশটি এখনও থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, পিঙ্গল চোখে জল টলমল করিতেছে। হেমাঙ্গিনী সুনীতিকে বলিলেন, একটু বাতাস কর তুমি।

ইন্দ্র রায়েরও চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন, কেমন আছ?

চোখে জল এবং কম্পিত অধর লইয়াই রামেশ্বর হাসিলেন; ইন্দ্র রায়ের কথার উত্তর দিতে গিয়া অকস্মাৎ তাঁহার রঘুবংশের মহারাজ অজের শেষ অবস্থা মনে পড়িয়া গেল, সেই শ্লোকের একটা অংশ আবৃত্তি করিয়াই তিনি বলিলেন, 'পক্ষ প্ররোহ ইব সৌধতলং বিভেদ।' ব্যাধি বটবৃক্ষের মত দেহমন্দিরে ফাট ধরিয়ে মাথা তুলেছে ইন্দ্র। এখন ভূমিসাৎ হবার অপেক্ষা।

রায়ের চোখের জল এবার আর বাধা মানিল না, টপটপ করিয়া মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িল, অশ্রু-আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, না না রামেশ্বর, ও-কথা ব'লো না তুমি, তোমাকে সুস্থ হতে হবে। আর তোমার হয়েছেই বা কি?

রামেশ্বর ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, দেখতে পাচ্ছ না?—বলিয়া হাত দুইখানি আলোর সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন।

রায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আঙুলগুলির দিকে চাহিয়া দেখিলেন; প্রদীপের আলোকের আভায় শুভ্র, শীর্ণ, অকুণ্ঠিত-অবয়ব আঙুলগুলির ভিতরের রক্তধারা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। রায় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, না, তোমার কিছুই হয় নি, ও কেবল তোমার মনের ব্যাধি। মনকে তুমি শক্ত কর। তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ; তোমার ছেলের বিয়ে দাও, স্ত্রী পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে আনন্দ কর।

রামেশ্বর অকস্মাৎ যেন কেমন হইয়া গেলেন, অর্থহীন দৃষ্টিতে শূন্য-লোকের দিকে বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিলেন, ঠোঁট দুইটি ঈষৎ নড়িতে লাগিল, আপন মনেই তিনি যেন কিছু বলিতেছিলেন।

রায় রামেশ্বরের এই অসুস্থ অবস্থা দেখেন নাই, তিনি প্রথম দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া

পড়িলেন, শঙ্কিত হইয়াই তিনি ডাকিলেন, রামেশ্বর! রামেশ্বর!

ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরাইয়া রামেশ্বর রায়ের দিকে চাহিলেন ; রায় বলিলেন, কি বলছ ?

বলছি ? ডাকছি, ভগবানকে ডাকছি, বলছি, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ'। এ অন্ধকারের মধ্যে আর থাকতে পারছি না !

হেমাঙ্গিনী এবার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিলেন ; ইন্দ্র রায় ও রামেশ্বরের কথাবার্তার ভিতর দিয়া অবস্থাটা ক্রমশঃ যেন অসহনীয় বায়ুলেশহীন অন্ধকারলোকের দিকে চলিয়াছে। দীর্ঘকাল পরে দুই বন্ধু এবং পরম আত্মীয়ের দেখা হওয়ার ফলে উভয়েই আত্মসংযম হারাইয়া স্মৃতির বেদনার তীব্র আবর্তের মধ্যে অসহায়ের মতই আবর্তিত হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন। রামেশ্বরের পক্ষে এ অবস্থাটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু উচ্ছ্বাসই কথাবার্তাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, রায় কথাকে টানিয়া নিজের পথে চালিত করিতে পারিতেছেন না। এ ছাড়া, এই অবস্থাটাও আর সহ্য হইতেছে না। এই বেদনাদায়ক অবস্থাটিকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়া তাহার মধ্যে একটু আনন্দ সঞ্চার করিবার জন্যই তিনি সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, আমি কিন্তু এবার রাগ করব চক্রবর্তী মশায়, আপনি আমাকে এখনও একটি কথাও বলেন নি।

রামেশ্বর ঈষৎ চকিত হইয়া হেমাঙ্গিনীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে গভীর বিষণ্ণতার মধ্য হইতেও আনন্দে একটু চঞ্চল এবং সজীব হইয়া উঠিলেন। হেমাঙ্গিনীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং প্রীতির সীমা ছিল না। নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতার মধ্যে মৃদু বাতাসের আকস্মিক সঞ্চরণে সব যেমন স্নিগ্ধ সানন্দ চাঞ্চল্যে সজীব হইয়া উঠে, হেমাঙ্গিনীর সস্নেহ সরস কৌতুকে সমস্ত ঘরখানাই তেমনি চঞ্চল সজীব হইয়া উঠিল। রামেশ্বর সত্য সত্যই এতক্ষণ হেমাঙ্গিনীকে লক্ষ্য করেন নাই। দীর্ঘকাল পরে ইন্দ্র রায় ছাড়া অন্য সকল কিছু—স্থান কাল পাত্র—তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। হেমাঙ্গিনীর কথায় রামেশ্বর তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মুখ তাঁহার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সস্নেহে সম্ভ্রমের সহিত মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন,

'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু কপ্তং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যৈঃ।'

এ আমার স্বপ্ন, না মায়া, না মনের ভ্রম, কিংবা কোন পুণ্যফলের ক্ষণিক সৌভাগ্য, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি এসেছেন ?

হেমাঙ্গিনী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অকপট আনন্দে কৌতুক করিয়া বলিলেন, আমি কিন্তু স্বপ্নও নই, মায়াও নই, পুণ্যফলের সৌভাগ্য না কি বললেন, তাও নই। আমি আপনার কুটুম্বিনী। আপনি পণ্ডিত লোক, কবি মানুষ, কবিতা দিয়ে আসল কথা চাপা দিলেন। কথা তো আমিই যেচে কইলাম, আপনি তো কথা বলেন নি।

রামেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে বুঝতে পারছি, জীবনে সাগরতুল্য অপরাধের মধ্যেও কোথাও ক্ষুদ্রতম প্রবালদ্বীপের মত কোন একটি পুণ্যফল অক্ষয় হয়ে আছে, যার ফলে দেবীকে নিজে এসে দর্শন দিতে হ'ল এবং ভক্তের সঙ্গে যেচেই কথা কইতে হ'ল। ওর জন্যে আপনি নিজেও আক্ষেপ করবেন না, আমার প্রতিও অনুযোগ করবেন না ; কারণ আপনি দেবধর্ম

পালন করেছেন, আমিও ভক্তের অভিমান বজায় রেখেছি।

রামেশ্বরের কথা শুনিয়া রায় আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু বেদনা অনুভব না করিয়া পারিলেন না। স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক উত্তর শুনিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল, কল্পনায় ব্যাধির সৃষ্টি, রামেশ্বরের আপনাকে পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন করার এই প্রয়াস—এ শুধু রাধারাণীর অভাব। রাধারাণীকে হারাইয়াই আজ এই অবস্থা। একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিতে গিয়া সেটাকে তিনি রুদ্ধ করিলেন। রামেশ্বরের পাশে বসিয়া অবনত-মুখী সুনীতি ব্যথিত মুখেও হাসি মাখিয়া ধীরসঞ্চালনে পাখার বাতাস করিয়া চলিয়াছেন। সুনীতির দিকে চাহিয়া, তাঁহার কথা ভাবিয়া রায়ের বেদনার বাষ্প জমিয়া পাথর হইয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস রোধ করিয়াও একটি অসম্বৃত মুহূর্তে গম্ভীর স্বরে তিনি ডাকিয়া উঠিলেন, তারা, তারা মা!

ঘরখানা সে গম্ভীর স্বরের ডাকে মুহূর্তে আবার গম্ভীর হইয়া উঠিল। রামেশ্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, হেমাঙ্গিনী স্তব্ধ হইয়া গেলেন, সুনীতি উদাস হইয়া সকলের দিকে কোমল করুণ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন।

দেওয়ালে ব্র্যাকেটের উপর পুরানো আমলের মন্দিরের আকারের ক্লকঘড়িটার পেণ্ডুলামটা শুধু বাজিতেছিল—টক-টক, টক-টক।

* * *

ঘড়ির শব্দেই সহসা ইন্দ্র রায়ের খেয়াল হইল, মাহেন্দ্রযোগ পার হইয়া যাইতে আর বিলম্ব নাই। তিনি চঞ্চল হইয়া নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন, গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইলেন, তারপর প্রাণপণে সকল দ্বিধাকে অতিক্রম করিয়া বলিলেন, রামেশ্বর!

চক্রবর্তী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, উঠবে বলছ?

না, আমি তোমার কাছে আজ ভিক্ষে চাইতে এসেছি।

ভিক্ষে! রামেশ্বর চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, আমার কাছে?

সুনীতিও সচকিত হইয়া উঠিলেন, মাথার ঘোমটা বাড়াইয়া দিয়া বিস্মিতভাবে রায় ও হেমাঙ্গিনীর দিকে চাহিলেন। চোখে চোখ পড়িতেই হেমাঙ্গিনী হাসিলেন।

ইন্দ্র রায় বলিলেন, হ্যাঁ, তোমার কাছেই ভিক্ষে।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, ভিক্ষে বলতে হয় উনি বলুন, আমি বলছি ডাকাতি; না দিলে শুনব না, জোর ক'রে কেড়ে নেব।

রামেশ্বর প্রশান্ত গম্ভীর মুখে ধীরভাবে বলিলেন, রায়-গিন্নী ভাগ্যদেবতা যার বিমুখ হন, তার লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দরজা খুলে দিয়েই বেরিয়ে যান, ভাণ্ডারের দরজা আমার খোলা, হা-হা করছে। আপনি সে ভাণ্ডারে কিছু নেবার অছিলায় প্রবেশ করলে বুঝব, লক্ষ্মী আবার ফিরে আসছেন। কিন্তু, আমার লজ্জা কি জানেন, শূন্য ভাণ্ডারের ধুলোয় আপনার সর্বাঙ্গ ভ'রে যাবে।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, ও-কথা বলবেন না। যে ঘরে সুনীতির মত গিন্নী আছে, সে-ঘরে

ধুলোর পাপ কি থাকে, না থাকতে পারে ? আর সে-ঘর শূন্যও কখনও হয় না। ভাগ্য বিমুখ হয়, লক্ষ্মীও লুকিয়ে পড়েন, কিন্তু মানুষের পুণ্যের ফল, আঁধার ঘরের মানিক কোথাও যায় না। আমরা আপনার সেই মানিকের লোভে এসেছি। আমাদের ঘরে আছে এক টুকরো সোনা, সেই সোনা-টুকরোর মাথায় আপনার মানিকটি গেঁথে গয়না গড়াতে চাই। সুনীতি আর আমি, ভাগাভাগি ক'রে সে গয়না পরব।

ইন্দ্র রায় একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, এমন করিয়া গুছাইয়া বলিতে তিনি পারিতেন না। পুলকিত মৃদু হাসিতে তাঁহার মুখ ভরিয়া উঠিল। ও-দিকে সুনীতি বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে হেমাঙ্গিনীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাঁহার হাত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, মাথার অবগুণ্ঠন প্রায় খসিয়া পড়িয়াছে, বুকের ভিতরটা উত্তেজনার স্পন্দনে দুরদুর্ করিয়া কাঁপিতেছে। সোনা ও মানিকের অর্থ তিনি যে বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু সে কি সত্য !

গভীর চিন্তায় সারি সারি রেখায় রামেশ্বরের ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল ; অনন্ত আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত কোথায় তাঁহার কোন্ ঐশ্বর্য আছে, তিনি যেন তাহাই খুঁজিয়া ফিরিতে-ছিলেন ; কিছু বুঝিতে পারিলেন না, শঙ্কিতভাবে বলিলেন, রায়-গিন্নী, আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী যখন যান, তিনি তো শুধু বাইরের ঐশ্বর্যই নিয়ে যান না, মনকেও কাঙাল ক'রে দিয়ে যান। আমার বোধশক্তিও লোপ পেয়েছে। আমায় আরও বুঝিয়ে বলুন।

এবার হেমাঙ্গিনী কিছু বলিবার পূর্বেই ইন্দ্র রায় বলিলেন, রামেশ্বর, আমি কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করতে এসেছি, তোমার অহীন্দ্রের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করতে এসেছি।

মুহূর্তে রামেশ্বর পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া গেলেন। স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ইন্দ্র রায়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, আমার উমাকে আপনি দেখেছেন, সেই যে, যে আপনাকে কবিতা শুনিয়েছিল—বাংলা কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা।

তবু রামেশ্বর কোন উত্তর দিলেন না, তেমনি স্তব্ধভাবে বিস্ফারিত চোখে অর্থহীন দৃষ্টিতে রায়-দম্পতির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। এবার ইন্দ্র রায় ও হেমাঙ্গিনী উভয়েই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রামেশ্বরের পিছনে সুনীতি বসিয়াছিলেন, আনন্দের আবেগে তাঁহার দুই চোখ বাহিয়া অশ্রুর ধারা বিন্দু বিন্দু করিয়া কোলের কাপড়ের উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল। অকস্মাৎ সে ধারা জলের প্রাচুর্যে যেন উচ্ছ্বাসময়ী হইয়া উঠিল। ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেদিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না, হেমাঙ্গিনী ও ইন্দ্র রায় শঙ্কিত-ভাবে রামেশ্বরের মুখের দিকেই চাহিয়া ছিলেন।

রামেশ্বর মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আঃ, ছি ছি ছি ! ঘৃণিত রোগ, বীভৎস ব্যাধি ছড়িয়ে গেল, পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেল ! এঃ !

ইন্দ্র রায়ের আশঙ্কা এবার বাড়িয়া গেল, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, ডাকিলেন, রামেশ্বর ! রামেশ্বর !

কে ? কে ?—অপেক্ষাকৃত সহজ দৃষ্টিতে রায়ের দিকে চাহিয়া রামেশ্বর এবার বলিলেন, ও, ইন্দ্র ! রায়-গিন্নী !—বলিতে বলিতেই দারুণ বেদনায় তাঁহার মুখ চোখ আর্ত সকরুণ হইয়া উঠিল, বলিলেন, আঃ, ছি ছি ছি ! রায়-গিন্নী, আমার কুষ্ঠ হয়েছে, কুষ্ঠ। আমার সন্তানের দেহে আমারই রক্ত। শাপভ্রষ্টা স্বর্গের উমা—ইন্দ্র, ইন্দ্র, আঃ, ছি ছি ছি, এ তুমি কি বলছ ?

রায় পরম আন্তরিকতার সহিত গভীর স্বরে বলিলেন, ছি-ছি নয় রামেশ্বর, তোমার রোগ তোমার মনের ভ্রম। আর এ বিবাহ আমার ইষ্টদেবীর প্রত্যাদেশ। মা আমাকে আদেশ করেছেন।

রামেশ্বর আবার যেন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, এত বড় অভাবনীয় ঘটনার সংঘাতে তাঁহার দুর্বল রুগ্‌ণ মস্তিষ্ক ক্ষণে ক্ষণে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল ; তিনি বিহ্বলের মত বলিলেন, ইষ্টদেবী ? কিন্তু—কিন্তু—

আর কিন্তু কি হচ্ছে তোমার, বল ?

সে কি ! সে যদি !—সে না বললে—।

কে ? কার কথা তুমি বলছ ?

হেমাঙ্গিনী পিছন হইতে স্বামীকে আকর্ষণ করিয়া কথা বলিতে ইঙ্গিতে বারণ করিলেন, তারপর রামেশ্বরের আরও একটু কাছে আসিয়া বলিলেন, বলেছে, সেও বলেছে, হাসিমুখে বলেছে।

রামেশ্বরের চোখ হইতে টপটপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, চোখের জলের মধ্যে ম্লান হাসি হাসিয়া এবার তিনি বলিলেন, সে কি অনুমতি দিয়েছে ? আপনাকে বলেছে ?

হ্যাঁ। এ বিয়ে না হ'লে তার গতি হচ্ছে না, সে শান্তি পাচ্ছে না। হেমাঙ্গিনীও এবার কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ইন্দ্র রায় সজল চক্ষে উপরের দিকে মুখ তুলিয়া ডাকিলেন, তারা তারা মা !

দুর্বল রামেশ্বর আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না ; দরদর ধারায় চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, অধীর হবেন না চক্রবর্তী মশায়। —বলিয়া তিনি সুনীতির পরিত্যক্ত পাখাখানা তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ধীরে ধীরে আত্মসম্বরণ করিয়া রামেশ্বর হেমাঙ্গিনীকে বলিলেন, আপনি একটা কথা তাকে বলবেন ? একটি কবিতা। বলবেন—

"গিরৌ কলাপী গগনে চ মেঘো লক্ষান্তরেহর্ক সলিল চ পদ্মম্।
দ্বিলক্ষ দূরে কুমুদস্যনাথো যো যস্য মিত্র ন হি তস্য দূরম্॥"

হেমাঙ্গিনী অশ্রুসজল চোখে বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, বলব।

তারপর কিছুক্ষণের জন্য ঘরখানা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হেমাঙ্গিনীই আবার বলিলেন, তা হ'লে আমাদের কথার কি বলছেন, বলুন ?

রামেশ্বর বলিলেন, ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। উমা, উমা, পর্বতদুহিতা উমার মতই সে পুণ্যবতী। ইন্দ্র ইষ্টদেবীর আদেশ পেয়েছে, আপনি তার অনুমতি পেয়েছেন, এ যে আমারই মহাভাগ্য

রায়-গিন্নী। চক্রবর্তী-বাড়িতে লক্ষ্মীর প্রত্যাগমনের সময় হয়েছে। সুনীতি! কই, শাঁখ বাজাও—

রামেশ্বরের পিছনে আত্মগোপন করিয়া সুনীতি বিরামহীন ধারায় কাঁদিয়া চলিয়াছিলেন, স্বামীর শেষ কথা কয়টির পর আর তিনি থাকিতে পারিলেন না, অতি মৃদুস্বরে করুণতম বিলাপধ্বনিতে তাঁহার বুকের কথা মুখে ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিল, মহীন, আমার মহীন!

*　　　*　　　*

মুহূর্তে ঘরখানা স্তব্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, ঘরের মৃদু আলোটুকু পর্যন্ত কেমন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। হেমাঙ্গিনী, ইন্দ্র রায় অপরিসীম বেদনার আত্মগ্লানিতে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিলেন, রামেশ্বর আবার বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া নীরবে বসিয়া ছিলেন। সুনীতির কণ্ঠও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। মুখে দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া তিনি নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিলেন, যেন কত অপরাধ হইয়া গিয়াছে মুহূর্তের অসংযমে। এই স্তব্ধতার মধ্যে সুনীতির সেই মৃদু বিলাপের কয়টি কথার সকরুণ ধ্বনি যেন প্রতিধ্বনিত পুঞ্জীভূত হইয়া সমস্ত ঘরখানাকে পরিপূর্ণ করিয়া ভরিয়া দিয়াছে; নিশীথরাত্রির নীরবতার মধ্যে মাটির বুকে কীট-পতঙ্গের রব ধ্বনির নিরবচ্ছিন্ন একটি উদাস সুরে যেমন পৃথিবীর বুক হইতে অসীম শূন্য পর্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া দেয়।

কিছুক্ষণ পর রামেশ্বর বলিলেন, মহীন! হ্যাঁ হ্যাঁ, মহীন। আচ্ছা, দ্বীপান্তরে এক রকম পাতা পাকিয়ে দড়ি করতে দেয়, যাতে হাতে কুষ্ঠ হয়, না?

রায় বলিলেন, আঃ রামেশ্বর, তুমি মনকে একটু দৃঢ় কর ভাই। ও সব মিথ্যা কথা।

হেমাঙ্গিনী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিবর্ণ মুখে অতি কষ্টে একটি হাসির সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, বেশ তো, সম্বন্ধ হয়ে যাক।

রামেশ্বর বলিলেন, না না না। এ-বিয়ে না হ'লে সে যে শান্তি পাচ্ছে না, তার যে গতি হচ্ছে না। রায়-গিন্নী বলেছেন, রায়-গিন্নী—

রায় বলিলেন, না না। হবে, দু-দিন পরেই হবে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

সুনীতি অন্দরের মধ্যে নির্বাসিতার মত নিতান্ত একাকিনী বাস করিলেও বায়ুতরঙ্গ ধ্বনি বহন করিয়া আনিয়া কানে তুলিয়া দেয়। এই অপমানকর রটনার ধ্বনির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এখন হেমাঙ্গিনীর কথা—'এ বিবাহ না হইলে রাধারাণী শান্তি পাইতেছে না, তাঁহার গতি হইতেছে না', ইহার মধ্য হইতে সহজেই তিনি একটি গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করিলেন। রাধারাণীকে লইয়া রায়-বাড়ির লজ্জা সময়ক্ষেপের ক্ষয়ে ক্ষয়িত হইয়া ইন্দ্র রায়কে মাথা তুলিবার অধিকার দিয়াছিল, কিন্তু রায়-বাড়ির জীবন গণ্ডীর মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া তিনি এবং অহীন্দ্রই আবার সে ক্ষয়িত লজ্জাকে দ্বিগুণ করিয়া তুলিয়াছেন, পুরানো লজ্জা আরও নূতন হইয়া উঠিয়াছে। সে আত্মগ্লানি এবং লজ্জাতেই সুনীতি অপরাধিনীর মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ধীরে মৃদুস্বরে ইন্দ্র রায় এবং স্বামীর সমক্ষেই ডাকিলেন, দিদি!

হেমাঙ্গিনী সচকিত হইয়া সুনীতির মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, অনবদ্য প্রশান্তির একটি ক্ষীণ হাস্যরেখা সুনীতির মুখে নিশান্তের ক্ষীণ প্রসন্নতার মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুনীতি বলিলেন, না দিদি, হোক, বিয়ে হোক। আমি একা আর থাকতে পারছি না। মহীন যখন ফিরে আসবে, তখন তার বিয়ে দিয়ে আবার আনন্দ করব। সুখের মধ্যে হঠাৎ তাকে আমার মনে প'ড়ে গিয়েছিল। হোক, হোক, বিয়ে হোক।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া রায় বলিলেন, তোমার মঙ্গল হবে বোন, তুমি আমাকে সত্য-লজ্জা না হোক লোকলজ্জার হাত থেকে ত্রাণ করলে।

সুনীতি উঠিয়া বলিলেন, ঠাকুরের পূজোর টাকা তুলে আসি দিদি, আর মানদাকে বলি, শাঁক বাজাক, বাজাতে হয়। আপনি একটু বসুন দিদি, মিষ্টিমুখ ক'রে যেতে হবে।

২৬

হাউইয়ে আগুন ধরিলে সে যেমন আত্মহারা উন্মত্ত গতিতে ছুটিয়া চলে, ইন্দ্র রায়ও ইহার পর তেমনি দুরন্ত গতিতে ধাবমান হইলেন। রাধারাণীর নিরুদ্দেশের ফলে যে অপমান বারুদের মত সর্বনাশা ক্ষোভ লইয়া বুকের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, সে অপমানের বারুদ-স্তূপকে ভস্মীভূত করিয়া ইন্দ্র রায়ের বংশকে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া লইবার উপযুক্তমত নিষ্কলুষ অগ্নিকণা দিতে পারিত একমাত্র চক্রবর্তী-বংশই, সেই পরম বাঞ্ছিত অগ্নিকণার সংস্পর্শ পাইয়া ইন্দ্র রায়ের এমনি ভাবে অপূর্ব আনন্দে বহ্নিমান হইয়া দশ দিক প্রতিভাত করিয়া তোলাই স্বাভাবিক। সংসারে স্বভাবধর্মের বিপরীত কিছু কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে, ইন্দ্র রায় স্বভাবধর্মের আবেগেই ছুটিয়াছিলেন। অগ্রহায়ণের আর ছয়টা দিন মাত্র অবশিষ্ট ছিল, ইহারই মধ্যে তিনি পাত্র-কন্যা আশীর্বাদ-অনুষ্ঠান শেষ করিয়া ফেলিলেন। সুনীতির নাম দিয়া অহীন্দ্রকে টেলিগ্রাম করা হইল, ইন্দ্র রায় নিজে টেলিগ্রাম করিলেন অমলকে, "অবিলম্বে উমাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া এস।"

সেই দিনই গভীর রাত্রে অহীন্দ্র এবং উমাকে সঙ্গে করিয়া অমল আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই বাড়িই প্রতীক্ষমান হইয়া ছিল, অহীন্দ্র ডাকিবামাত্র মানদা ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া হাসিমুখে বলিল, দাদাবাবু!

অহীন্দ্র উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল, বাবা কেমন আছেন মানদা?

ভাল আছেন গো দাদাবাবু, সবাই ভাল আছে। মানদার মুখে কৌতুক-সরস হাসি ঝলমল করিতেছিল।

তবে? এমন ভাবে টেলিগ্রাম কেন করলে মানদা?

আপনার বিয়ে গো দাদাবাবু, উ-বাড়ির উমাদিদির সঙ্গে।

অহীন্দ্রের সর্বাঙ্গে একটা অদ্ভুত শিহরণ বহিয়া গেল, বুকের ভিতরটা এক অপূর্ব অনুভূতিতে

চঞ্চল অস্থির হইয়া উঠিল। মুহূর্তে অনুভব করিল, উমাকে সে ভালবাসে—হ্যাঁ, সত্যই সে ভালবাসে।

ঠিক এই সময়ে সুনীতি আসিয়া দাঁড়াইলেন, অতি মিষ্ট মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন, আয়, বাড়ির ভেতরে আয়, আমরা জেগেই ব'সে আছি তোর জন্যে।

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া অহীন্দ্রের মনে পড়িয়া গেল দাদাকে; সুনীতির সুন্দর মুখখানির উপর তাঁহার জীবনের মর্মন্তুদ দুর্ভাগ্যগুলি কেমন একটি পরিস্ফুট বেদনার্ত সকরুণ ভঙ্গির ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। সুনীতির মুখে বর্তমানের দীপ্ত আনন্দের উজ্জ্বলতা জ্বলজ্বল করিলেও তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেই অতীত দুঃখের স্মৃতিগুলি মুহূর্তে জাগিয়া উঠে। বেদনার আবেগে অহীন্দ্রের বুক ভরিয়া উঠিল, সে কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল, ছি ছি, এ করেছ কি মা? না না না, এ যে হয় না, হতে পারে না।

সুনীতি আশঙ্কায় চকিত হইয়া উঠিলেন, শঙ্কাতুর কণ্ঠে বলিলেন, কেন হয় না অহি? আমরা যে কথা দিয়েছি বাবা।

অহীন্দ্রের চোখ হইতে জল ঝরিয়া পড়িল, সে বলিল, দাদার কথা কি ভুলে গেলে মা?

সুনীতির মুখে একটি সকরুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল, গাঢ় শীতের জ্যোৎস্নার মত সে-হাসি—তীক্ষ্ণ কাতর স্পর্শময়ী অথচ উজ্জ্বল রূপ সে-হাসির, অহীন্দ্রের মাথাটি গভীর স্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, তবু তোকে বিয়ে করতে হবে, উপায় নেই। এ তোর বাপ-মায়ের আজ্ঞা-পালন; কোন অপরাধ তোকে স্পর্শ করবে না বাবা।

অহীন্দ্র মুখে কোন প্রশ্ন করিল না, কিন্তু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুনীতি বলিলেন, ঘরে আয়।

বাড়ির ভিতর উপরে অহীন্দ্রের ঘরে বসিয়া সুনীতি সমস্ত বুঝাইয়া বলিয়া বলিলেন, তোর বড় মা—আমার দিদি, আমি স্থির জানি অহিন, তিনি বেঁচে নেই। কোন দুরন্ত অভিমানে তিনি আত্মহত্যা পর্যন্ত গোপন ক'রেছেন, যার আঘাতে তোর বাপ এমন ক'রে পাগল হয়ে গেছেন অহি। কিন্তু কলুষের কালি এ ওর মুখে মাখিয়ে, মানুষ ভগবানের পৃথিবীকে ক'রে তুলছে সঙ-সার। সেখানে মানুষ তো রেয়াত কাউকে করে না, তারা তাঁর স্মৃতির ওপর কালি বুলিয়ে দিয়েছে বাবা। এ কালি তোমাকে আর উমাকেই ধুয়ে মুছে তুলতে হবে।

অহীন্দ্র স্তব্ধ হইয়া অভিভূতের মত মায়ের কথা শুনিতেছিল। সুনীতি আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, সেদিন উমার মা বললেন, তোর বড় মায়ের নাম ক'রে যে, এ বিয়ে না হ'লে তিনি শান্তি পাচ্ছেন না, তাঁর গতি হচ্ছে না; এত বড় সত্যি কথা আর হয় না।

প্রথমেই পাত্র-আশীর্বাদ শেষ হইল। ইন্দ্র রায় সমারোহ করিয়া অহীন্দ্রকে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন। তিনি রায়-বংশের প্রত্যেককে তাঁহার সঙ্গে পাত্র আশীর্বাদ করিতে চক্রবর্তী-বাড়ি যাইবার নিমন্ত্রণ জানাইলেন। চক্রবর্তী-বাড়িতে আহারের আয়োজন হইয়াছিল। ইন্দ্র রায়ের

নায়েবের ভাইপো চক্রবর্তী-বাড়ির নূতন নায়েব ; ইন্দ্র রায়েরই আদেশ অনুযায়ী সে সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছিল। সেই নায়েবই একদিন যোগেশ মজুমদারকে সুনীতির নাম করিয়া সাদর আহ্বান জানাইয়া আসিল, কর্তাবাবুর অবস্থা তো জানেন, গিন্নীমা বললেন, এ বাড়ির মর্যাদা জানেন এক আপনি, আপনি না গেলে এ-সব কাজ কি ক'রে হবে ?

মজুমদার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর বলিল, যাব আমি, বলবেন, আমার ক্ষমতায় যা হ'বে, তার কসুর আমি করব না।

আর ও-বাড়ির রায় মশায়ও একবার দেখা করবার জন্যে বার বার ক'রে বলেছেন।

কে, ছোট রায় মশায় ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি তাঁর ছেলেকেই পাঠাতেন, তা—

বাধা দিয়া মজুমদার বলিল, না না না, আমি নিজেই যাব।

মজুমদার আসিতেই সাদরে আহ্বান করিয়া রায় বলিলেন, তোমার মনটা সেদিন বড় পবিত্র ছিল যোগেশ, কথাটা মা তারা সত্যে পরিণত ক'রে দিলেন। তোমাকে আমি বলেছিলাম, সত্য হ'লে তুমিই জানবে সর্বাগ্রে, সেটা আমার মনে আছে। এখন তোমাকে কিছু ভার নিতে হচ্ছে ভাই, চক্রবর্তী-বাড়ি তোমার পুরানো বাড়ি। ওখানকার কাজকর্মের ভার তোমাকেই নিতে হবে। আর কন্যা-আশীর্বাদ করতে রামেশ্বর তো আসতে পারছেন না, আশীর্বাদ করবেন ও বাড়ির কুলগুরু, তা সেদিন তুমি আসবে ও-বাড়ির প্রতিনিধি হয়ে।

মজুমদার মুখে কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু রায়ের কথা প্রাণপণে পালন করিবার চেষ্টা করিল এবং অকপট অন্তরেই চেষ্টা করিল।

কলের মালিক বিমলবাবুকে সমাদর করিয়া আহ্বান করা হইয়াছিল। তিনিও পাত্র আশীর্বাদের আসরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র রায় অকস্মাৎ একটা কাজ করিয়া বসিলেন ; বিমলবাবুকে দেখিবামাত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কি ভাবিয়া লইলেন, তারপর ব্যস্তভাবে তাঁহার হাতে গোলাপজল-ভরা গোলাপপাশটি ধরাইয়া দিলেন এবং আতরদানবাহী চাকরটাকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া বলিলেন, আপনি হলেন চক্রবর্তী-বাড়ির লোক, আমরা আজ আপনাদের বাড়ি কুটুম্ব এসেছি। আপনি আজ আমাদের খাতির করুন, আপনার খাতির করব আমি আমার বাড়িতে।

বিমলবাবু প্রত্যাখ্যান করিলেন না, করিবার যেন উপায় ছিল না।

বাহিরে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সাঁওতালেরা মাদল বাজাইয়া মহা আনন্দে গান গাহিয়া নাচ জুড়িয়া দিয়াছিল। এই উপলক্ষে বাগ্দীপাড়ার লাঠিয়াল দলের প্রত্যেকে হাত দশেক লম্বা এক গজ চওড়া একফালি করিয়া লাল শালু ও একটি করিয়া ফতুয়া পাইয়াছিল ; নূতন ফতুয়া গায়ে লাল পাগড়ি মাথায় তাহারা লাঠি হাতে মোতায়েন ছিল। তাহারা এবং সাঁওতালেরা মদ খাইয়াছে প্রচুর। নবীন বাগ্দীর স্ত্রী মতি এখন বাগ্দীদের সর্দারনী, সে নূতন কাপড় পাইয়াছে, গাছ-কোমর বাঁধিয়া আঁট-সাঁট করিয়া কাপড় পরিয়া সে লাঠি হাতে অন্দরের দরজায় মোতায়েন থাকিয়া হাঁক-ডাক জাহির করিতেছে।

আশীর্বাদের অনুষ্ঠান শেষ হইতেই অহীন্দ্র অমলের সঙ্গে সাঁওতালদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরস্পরের কোমরে জড়াইয়া ধরিয়া সাদা ধবধবে কাপড়-পরা কালো মেয়েগুলি অর্ধ-চন্দ্রাকারে সারি বাঁধিয়া জলের ঢেউয়ের মত হিল্লোলিত ভঙ্গিতে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে, সম্মুখে পুরুষেরা মাদল, নাগরা, বাঁশী ও নিজেদের তৈয়ারী সারঙ্গ বাজাইয়া ঝড়ের দোলায় আন্দোলিত শালের মত দীর্ঘ আন্দোলিত ভঙ্গিতে দীর্ঘ দৃঢ় পদক্ষেপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। মেয়েরা গাহিতেছিল বড় মজার গান, উহাদেরই নিজেদের রচনা করা বাংলা ভাষার গান—

রাজা যাবে সোরানে সোরানে (পাকা রাস্তা)
রাণী আসছে ডুলির উপর চেপ্যে,
রাঙাবাবুর বিয়া হবে ;
লাল ফুলের মালা কুথা পাব গো—
পাল্‌তে পোলাশ জবাফুলের মালা গো !

গান শুনিয়া সকৌতুকে অমল হাসিয়া বলিল, বাঃ !

অহীন্দ্র হাসিমুখে দলটির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যেককে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। দেখিয়া মুখের হাসি তাহার মিলাইয়া গেল। কমলকে এবং সারিকে না দেখিয়া তাহার মন সপ্রশ্ন বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল। গানটি শেষ হইতেই মেয়েগুলি কলকল করিয়া অহীন্দ্র ও অমলের দিকে আঙুল দেখাইয়া কলরব জুড়িয়া দিল, কালো মুখের মধ্যে সাদা চোখগুলি উজ্জ্বলতর হইয়া অহীন্দ্রের মুখের উপর অসঙ্কোচে নিবদ্ধ হইল। চূড়া মাঝি মাদলটা গলায় ঝুলাইয়াই আসিয়া নত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, গড় করছি গো বাবাঠাকুর রাঙাবাবু! প্রণাম করিয়া উঠিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, আপনার বিয়াতেই গানটি আমি করলাম। আমি নিজে। আপনি শুধাও উয়াদিগে।

অমল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, বাঃ বাঃ, খুব ভাল গান হয়েছে।

চূড়া উৎসাহিত হইয়া বলিল,—আমি—বুঝলি বাবু, এই আমি।—বুকে হাত দিয়া সে নিজেকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেখাইয়া বলিল, আমি মন্তর জানি, ভূত তাড়াতে জানি, গান বানাতে জানি, বুঝলি বাবু, অ্যানেক জানি আমি। তা—তা—কি বুলব আর ? বলিয়া সে খানিকটা চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল, আমাদিগে আরও হাঁড়িয়া দিতে হবে বাবু, আপনারা যা দিলি, উই মেয়েগুলো সব বেশী খেয়ে লিলে ; দেখে কেনে, চুরচুর করছে সব।

মেয়েগুলি এবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। অহীন্দ্র একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, সে হবে। কিন্তু তোদের সর্দার কই ? কমল মাঝি ? আর সেই তীরন্দাজ শিকারী মাঝি, যে সাপ মারলে, কমলের নাতজামাই, সেই লম্বা মেয়েটির বর। তারা আসে নি কেন সব ?

সমস্ত সাঁওতালের দলটি এ প্রশ্নে এক মুহূর্তে নীরব হইয়া গেল। বার বার অকারণে গলা ঝাড়িয়া, চূড়া মাঝি হাতজোড় করিয়া অত্যন্ত বিনয় করিয়া বলিল, আপনাকে আমরা

বুলছি বাবাঠাকুর রাঙাবাবু, আপুনি আমাদের রাজা বট। সি রাঙাঠাকুরের লাতি বট আপুনি। তেমনি আগুনের পারা রং! বাবা রে! আপনাকে মিছা বুলতে নাই। হ'ল কি—উয়ারা করলে কি—উয়ারা—

অহীন্দ্র ভ্রূ কুঁচকাইয়া প্রশ্ন করিল, কি করলে ওরা?

চূড়া হাত তুলিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞভাবে বলিল, তাই থো বুলছি বাবু। উয়ারা—পাপ করলে। আমাদের 'পঞ্চ' বুললে, তুদের সাথে আমরা খাব না, তুদের সাথে করুন-কাম করব না, বিয়া শাদি দিব না। হুঁ, ভিন্নু ক'রে দিলে উয়াদিগে! ঘেন্না করলে। তাথেই বুড়ার শরম লাগল, ইখানে থাকতে লারলে। চ'লে গেল, পালিয়ে গেল। লাজের কথা কিনা।

অহীন্দ্র বলিল, তারা করেছিল কি?

অত্যন্ত লজ্জা প্রকাশ করিয়া চূড়া জিভ কাটিয়া বলিল, ছি! উটি লাজের কথা বটে, খারাপ কথা বটে। উ আপোনাকে শুনতে নাই। ছি! বাবা রে!

অহীন্দ্র আর প্রশ্ন করিতে পারিল না। কিন্তু ইহাদিগের কথাবার্তাগুলি অমলের বড় ভাল লাগিতেছিল, সে বলিল, তা হ'লে এখন সর্দার কে? তুমি?

চূড়া পরম বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, আপনি উয়াদিগে শুধাও, আমি বুলি নাই। উয়ারাই বুললে, আমি অনেক জানি কিনা, আমি লোকটি খুব বিদ্যে জানি। ওস্তাদ বেটে আমি। বোঙার পূজা জানি—মরং বোঙা, মরং বোঙা বুঝছ তো। ভগোবান। উয়ার মন্তর জানি আমি। ভূত তাড়াতে জানি, ওষুধ জানি। অ্যানেক বিদ্যে জানি, হুঁ। তা সোবাই বুললে, আমি বুলি নাই। ছি, লিজে থেকে বুলতে নাই। শরমের কথা, ছি! উয়াদিগে শুধান আপুনি।

অমল হাসিয়া বলিল, ব্যাপারটা একটু জটিল মনে হচ্ছে অহীন। এতখানি বিনয় তো ভাল নয়।

অহীন্দ্র বলিল, হুঁ। পরে জানতে হবে, ব্যাপারটা কি। এখন নাচগান করছে করুক।

তাহাদের মৃদু স্বরের কথা ভাল বুঝিতে না পারিলেও চূড়া এটুকু বুঝিয়াছিল যে, কথাটা তাহাদের সম্পর্কেই হইতেছে। সে আবার বিনয় করিয়া বলিল, উই চরাটোতে সিটল-পিণ্টি (সেটলমেণ্টের জরিপ) যখন হ'ল, রাঙাবাবু গেল, মোড়লেরা গেল, তখুনি আমি হিসাব করলম, মাপের দাঁড়া ধরলম। আমি সকুলই জানি কিনা। তাথেই আমাকে উয়ারা মোড়ল করলে।

অহীন্দ্র বলিল, বেশ বেশ। এখন তোরা নাচগান কর্। তুইও তো খুব ভাল লোক, তুই মোড়ল হয়েছিস, সেও বেশ ভালই হয়েছে।

চূড়া খুশী হইয়া মাদলটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া লাফ দিয়া মেয়েদের সম্মুখীন হইয়া মাদলে ঘা দিল ধি-তাং-তাং, ধি-তাং-তাং। বাঁশী, সারঙ্গ, নাগড়া আবার বাজিতে আরম্ভ করিল। মেয়েরা আবার সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল।

অহীন্দ্র সমস্ত দলটির দিকে চাহিয়া দেখিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না।

সেই সচল পাহাড়ের মত কমল মাঝি, বাবরি চুলওয়ালা সেই শিকারী বংশীবাদক তরুণটি না হইলে পুরুষের দলটি যেন মানায় না, আর মেয়েদের ওই শ্রেণীটির ঠিক মধ্যস্থলে থাকিত দীর্ঘাঙ্গিনী সারী; তাহার মাথাটা ঠিক মধ্যস্থলে সকলের চেয়ে উঁচু হইয়া থাকিত, মুকুটের মাঝখানের কালো পাখীর উজ্জ্বল পালকের মত।

পরদিন সন্ধ্যাতেই উমাকে আশীর্বাদ করিয়া আসিলেন চক্রবর্তী-বাড়ির কুলগুরু। ইন্দ্র রায় সমারোহ করিলেন প্রচুর; রায়-বংশের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। অনুষ্ঠানের শেষে তিনি যোগেশ মজুমদারকে ডাকিয়া একখানি দামী ধুতি ও গরদের চাদর হাতে দিয়া বলিলেন, তুমি আজ আমার বেয়াইয়ের তুল্য মাননীয় ব্যক্তি, কর্মচারী হ'লেও রামেশ্বর তোমাকে ভাইয়ের মতই স্নেহ করেন, অহীন্দ্র তোমাকে বলে—কাকা। বেয়াই-বাড়ির এ সম্মান তোমার প্রাপ্য।

বিমলবাবু আজ আর আসেন নাই। শরীর খারাপ বলিয়া সবিনয়ে মার্জনা ভিক্ষা করিয়া পাঠাইলেন। ইন্দ্র রায় তাঁহাকে গোলাপপাশ বহন করাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সামাজিক ভোজনে পংক্তির মধ্যেও পর্যন্ত বসিতে দেন নাই। তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। রায় চেয়ার-টেবিলের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। হাসিয়া টেবিলের উপর একটি বিলাতী মদের বোতল নামাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, আপনার জন্যেও হাঁড়িয়ার বন্দোবস্ত আমরা রেখেছি।

সাঁওতালী ভাষায় মদের নাম হাঁড়িয়া।

* * *

পরদিন অপরাহ্ণে হেমাঙ্গিনী উমাকে লইয়া রামেশ্বরের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। রামেশ্বরকে প্রণাম করাইবার জন্যই উমাকে লইয়া আসিলেন। উমা রামেশ্বরকে প্রণাম করিয়া সলজ্জভাবে সঙ্কুচিত হইয়া বসিল।

রামেশ্বর সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, প্রথমে যেদিন মাকে আমার দেখেছিলাম, সেদিন কুমার-সম্ভবের উমার বাল্যরূপের বর্ণনা মনে পড়েছিল; আজ মনে পড়ছে উমার ভাবী বধূরূপ। মহাকবি কালিদাস, তিনি বলেছেন—

সা সম্ভবদ্ভিঃ কুসুমৈর্লতেব জ্যোতির্ভিরুদ্যদ্ভিরিব ত্রিযামা।
সরিদ্বিহঙ্গৈরিব লীয়মানৈ রামুচ্যমানাভরণা চকাশে॥

অর্থাৎ উমা অলঙ্কার পরিধান করলে কেমন শোভা হ'ল, না—কুসুমিতা লতার মত, জ্যোতির্লোক উদ্ভাসিত রাত্রির মত, আশ্রয়ার্থী হংস-বলাকাশোভিত নদীর মত। তা হ্যাঁ মা উমা, তুমি আমার মা হতে পারবে তো? দেখছ তো আমি ব্যাধিগ্রস্ত, আমার পুত্রবধূ হতে তোমার কোন দ্বিধা নেই তো?

উমা মুখে কিছু বলিতে পারিল না, কেবল গভীর বেদনায় কাতর দৃষ্টিভরা চোখে রামেশ্বরের মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু সেও মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই লজ্জিত হইয়া দৃষ্টি নত করিল। হেমাঙ্গিনী কাতরভাবে বলিলেন, কেন আপনি বার বার ও-কথা বলেন চক্রবর্তী মশায়?

কোথায় আপনার ব্যাধি? এই সেদিনও তো আপনার রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে, তারাও তো বলেছে, আপনার কোন ব্যাধি নেই। ও আপনার মনের ভ্রম।

রামেশ্বর বলিলেন, রায়-গিন্নী, ভগবানের শাস্তি, মৃত্যু, ব্যাধি এগুলোর নির্ণয় হয় না, চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরও জ্ঞানের বাইরে এগুলো। কিন্তু ও তর্ক থাক। মা আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আমি ধন্য হয়েছি রায়-গিন্নী। হ্যাঁ, আর একটা কথা। মা উমা, আমি দরিদ্র, লক্ষ্মী আমাকে পরিত্যাগ করেছেন। আর তার জন্যে আমার দুঃখ নেই। জান মা, দারিদ্র্যকে প্রণাম ক'রে আমি বলি—

দারিদ্র্যায় নমস্তভ্যং সিদ্ধোঽহং তৎপ্রসাদতঃ।
জগৎ পশ্যামি যেনাহং ন মাং পশ্যন্তি কেচন॥

বলি হে দারিদ্র্য, তোমাকে নমস্কার, তোমার প্রসাদে আমি সিদ্ধ হয়েছি, যেহেতু কেউ আমার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে না, আমি জগৎকে দেখি, আমি দ্রষ্টা হতে পেরেছি। তবে মা, তোমার আগমনে লক্ষ্মীকে আবার ফিরতে হবে, তবু কথাটা তুমি জেনে রাখ।

উমা এবার চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, সে একে সপ্রতিভ মেয়ে, তার উপর কলিকাতার স্কুলে পড়াশুনা করিয়াছে এবং রামেশ্বর তাহার অপরিচিত তো নন-ই, বরং কাব্যালাপের মধ্য দিয়া একটি সূক্ষ্ম আত্মীয়তার স্মৃতিই তাহার মনে জাগরূক ছিল। সে মৃদু-স্বরে বলিল, কবিতাটি ভারী সুন্দর!

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন, নিন, এইবার বেটার বউকে সংস্কৃত শেখান।

পরম উৎসাহে রামেশ্বরের চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন, নিশ্চয় শেখাব। মা আমাকে প'ড়ে শোনাবেন, আমি শুনব। জান মা, তোমার সেই বাঙালী কবি, রবীন্দ্রনাথের বই আমাকে অহীন্দ্র এনে দিয়েছে, কিন্তু চোখের জন্যে পড়তে পারি না; তুমি আমায় শোনাবে মা? ওই দেখ, আন তো মা, তোমার কণ্ঠে কবির কাব্য স্বর লাভ ক'রে সঙ্গীত হয়ে উঠবে। শোনাও তো মা আমাকে কিছু। বহুদিন কিছু শুনিনি।

উমা দেখিল, সে আমলের পুরানো টেবিলের উপর একখানি 'চয়নিকা' সযত্নে রাখা রহিয়াছে; সে বইখানি আনিয়া বসিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, আমি নীচে সুনীতির কাছে যাচ্ছি চক্রবর্তী মশায়, আপনারা শ্বশুর-পুত্রবধূতে মিলে কাব্য করুন ব'সে ব'সে।

হেমাঙ্গিনী চলিয়া গেলেন। রামেশ্বর বলিলেন, পড় তো মা, মৃত্যু সম্বন্ধে তোমাদের কবির কোন কবিতা যদি থাকে, তবে তাই প'ড়ে আমায় শোনাও।

উমা বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিল—

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

প্রথমে লজ্জার সঙ্কোচে ঈষৎ মৃদু স্বরেই উমা আরম্ভ করিল, কিন্তু পড়িতে পড়িতে কাব্যের প্রভাবে অভিভূত হইয়া স্থানকালকে অতিক্রম করিয়া সে স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বরে সঙ্কোচের জড়তা রহিল না, আবেগপূর্ণ অকুণ্ঠিত কণ্ঠে ছন্দে ছন্দে তালে তালে সঙ্গীতের মাধুর্য

ফুটাইয়া তুলিয়া আবৃত্তি করিয়া চলিল—

তব পিঙ্গল ছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না।
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে-পিছে কেহ ববে না!
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরন
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ?

বিস্ফারিত চক্ষে রামেশ্বর স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন, আবেগে নাকের প্রান্তভাগ বার বার ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। কবিতা শেষ হইয়া গেল, উমা নীরব হইল। কিন্তু সমস্ত ঘরখানা তখনও যেন আবৃত্তির ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছিল। অকস্মাৎ রামেশ্বর বলিলেন, ওখানটা আর একবার পড় তো মা, ওই যে—তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ, তারপর কি মা?

উমা পড়িয়া বলিল—

তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,

সঙ্গে সঙ্গে রামেশ্বর আবৃত্তি করিলেন—

তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

ইহার পর রামেশ্বর যেন কাব্যের মোহে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, উমার উপস্থিতি পর্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর হাত দুইটি তুলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, তোমার শঙ্খনাদ আমি শুনতে পাচ্ছি, প্রলয়শ্বাসের ঢেউ আমার অঙ্গে এসে লাগছে। এঃ, একেবারে জীর্ণ ক'রে দিয়েছে আঙ্‌লগুলো!

উমা শঙ্কিত হইয়া উঠিল, সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য সন্তর্পণে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের প্রদীপের আলোয় তাহার ছায়াখানি দীর্ঘ হইয়া মেঝের উপর চঞ্চল হইয়া জাগিয়া উঠিল।

রামেশ্বর চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, কে?

উমা শঙ্কিত ও কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, আমি।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রামেশ্বর যেন স্মরণ করিয়া বলিলেন, ও, মা, আমার মা জননী। তোমাকে আশীর্বাদ করি মা—

আখণ্ডলো সমো ভর্তা জয়ন্ত প্রতিমঃ সুতঃ
আশীরণ্যা ন তে যোগ্যা পৌলমী মঙ্গলা ভব ॥

উমা আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া সন্তর্পণেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রামেশ্বরের ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্দর-মহলের দিকে টানাবারান্দা দিয়া উমা সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। খানদুয়েক ঘর পার হইয়াই সে দেখিল, অহীন্দ্র আপনার ঘরে খোলা জানালার ধারে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। এদিকে ওদিকে চাহিয়া উমা মৃদুস্বরে বলিল, গুড-আফ্‌টারনুন সায়েব।

অহীন্দ্র চকিত লইয়া হাসিমুখে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, নমস্কার শ্রীমতী উমা দেবী।

তাহাদের উভয়ের এই সম্বোধনের একটু ইতিহাস আছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে এই চক্রবর্তী-বাড়িতেই বালিকা উমা একদিন অহীন্দ্রকে বলিয়াছিল, আপনাকে দেখলেই লোকে চিনতে পারবে এ-ই স্কলারশিপ্ পেয়েছে। যে সায়েবদের মত ফরসা রং!

তারপর অহীন্দ্র কলিকাতায় গেলে অমল উমাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, কে বল্ দেখি?

উমার স্কুলের তখন বাস দাঁড়াইয়া, সে দীর্ঘ বেণীটি দোলাইয়া বলিয়াছিল, সায়েব। পরক্ষণেই খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, জিজ্ঞেস কর না সায়েবকে, রায়হাটে ওঁদের বাড়িতেই ওঁর নাম দিয়েছি সায়েব। গুড-মর্নিং সাহেব।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিয়াছিল, নমস্কার শ্রীমতী উমা দেবী। আমি কিন্তু তোমাকে বাঙালিনীই দেখতে চাই।

উমা মাথাটি ঈষৎ নত করিয়া বলিয়াছিল, বাঙালী কালো মেয়ের স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে, অতএব—। বলিয়াই বেণী দোলাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

আজ উমা বলিল, এমন ধ্যানমগ্নের মত ব'সে যে?

অহীন্দ্রের জানালা হইতে চরটা স্পষ্ট দেখা যায়, সে চরটার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, চরটাকে দেখছি। ইন্দ্রজালের মত ময়দানবের পুরী গ'ড়ে উঠল। এই এবার পূজোর সময়েও দেখেছি, সবুজ ঘাসে ঢাকা শান্ত এক টুকরো ভূখণ্ড, মধ্যে ছোট্ট একটি সাঁওতাল-পল্লী। একেবারে এক প্রান্তে ক'টা ইটের ভাটি।

উমা বলিল, চরটা তো তোমাদের?

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ তোমাদের।

উমার মুখ লাল হইয়া উঠিল, লজ্জায় এবার আর সে জবাব দিতে পারিল না। অহীন্দ্র বলিল, জান, ওই চরের ওপর আমার এক দল পূজারিণী আছে। তারা আমাকে দেখে লজ্জায় রাঙা হয় না, অসঙ্কোচ আনন্দে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে।

উমা বলিল, জানি, একটি মেয়ে আজ আমাকে দেখতে এসেছিল। আমাকে বললে—রাঙাঠাকরুন। বললে, বাবুকে বলি রাঙাবাবু, তোমাকে বলব—রাঙাঠাকরুন।

অহীন্দ্র একটু উচ্ছ্বসিত হইয়াই বলিল, চমৎকার নাম দিয়েছে।

উমা বলিল, তার নিজের নামটিও বেশ—সারী, সারী।

সবিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অহীন্দ্র বলিল, সারী? খুব লম্বামত মেয়েটি?

হ্যাঁ। একটু বেশী লম্বা। কিন্তু আর নয়, চললাম। মা-রা হয়তো এক্ষুনি ওপরে চ'লে আসবেন। পালাচ্ছি আমি। সে আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না, ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

কয়েক মিনিট পরেই অহীন্দ্র নীচে নামিয়া আসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া মানদাকে ডাকিয়া বলিল, আমি চরের দিকে বেড়াতে যাচ্ছি। অমল এলে বলিস, দাদাবাবু আপনাকে যেতে ব'লে গেছেন।

অহীন্দ্র চলিয়া যাইতেই মানদা উচ্ছ্বসিত হইয়া সুনীতি ও হেমাঙ্গিনীর নিকট আসিয়া বলিল, শাশুড়ীকে দেখে দাদাবাবুর লজ্জা হ'ল, আমাকে ডেকে চুপিচুপি—। বলিতে বলিতে সে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

২৭

চরের উপর কর্মকোলাহল তখনও স্তব্ধ হয় নাই। শেডটার লৌহকঙ্কাল তৈয়ারী ইহারই মধ্যে শেষ হইয়া গিয়াছে, আজ তাহার উপরে করোগেটেড শীট-পিটানো হইতেছে। বোল্টগুলির উপর হাতুড়ির ঘা পড়িতেছে। আকাশমুখী সুদীর্ঘ চিমনিটার আকার এইবার সরু হইতে আরম্ভ করিয়াছে; আজ আবার নূতন মাচান বাঁধা হইতেছে। নীচে কোথাও গাঁথনির কাজে কর্ণিকের শব্দের ধাতব ঝঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে। ছাদের উপর অসংখ্য পিটনের আঘাত একসঙ্গে পড়িয়া চলিয়াছে, মেয়েগুলি কিন্তু এখন আর গান গাহিতেছে না, আর বোধ হয় ভাল লাগে না। একটা লরির এঞ্জিন কোথায় দুর্দান্তভাবে গর্জন করিতেছে, বোধ হয়, কোন দুরন্ত বাধা ঠেলিয়া চলিতে হইতেছে। মাঝে মাঝে অবরুদ্ধ স্টীমে বয়লারটা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। এ সমস্তকে একটি ক্ষীণ আচ্ছাদনের মত আবরণে আবৃত করিয়া মানুষের কোলাহল-কলরবের উচ্চ গুঞ্জনরোল অবিরাম গুঞ্জিত হইয়া চলিয়াছে। অহীন্দ্র নদীর বুকে দাঁড়াইয়া এই অর্ধনির্মিত যন্ত্রপুরীটির দিকে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল; সে নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞানকে সে মনে মনে নমস্কার করিল।

নদী হইতে চরের ঘাটে উঠিয়াই সে দেখিল, বেনাঘাসের মধ্যে গরুর গাড়ির চাকার রেখায় চিহ্নিত সে কাঁচা পথটি আর নাই; রাঙা কাঁকর বিছানো প্রশস্ত সুগঠিত রাজপথের মত একটি পথ, ঘাটের মুখ হইতে গুণ-টানা ধনুকের মত দীর্ঘ ভঙ্গিতে বাঁকিয়া কারখানার দিকে চলিয়া গিয়াছে। কিছুদূর আসিয়া তাহাকে সে-পথ ছাড়িয়া ডান দিকে ফিরিতে হইল, এতক্ষণে সেই কাঁচা পথটির দেখা মিলিল। পথটি চলিয়া গিয়াছে সাঁওতাল-পল্লীর

দিকে। দুই পাশে সাঁওতালদের চাষের ক্ষেত। ক্ষেতগুলি সমস্তই অকর্ষিত, কোথাও ফসল নাই; সমস্ত ক্ষেত্রভূমিটাই একটা ধূসর উদাসীনতায় সন্ত-বিধবার মত বিষণ্ণ, রিক্ত। সে বিস্মিত হইয়া গেল, এ কি! সাঁওতালেরা জমিগুলিকে এমন অযত্নে একেবারে রিক্ত করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে! গত বৎসরে এই সময়ের ক্ষেত্রের ছবি তাহার মনে পড়িয়া গেল, বিচিত্রবর্ণের ফুলে ফসলে ভরা সে যেন একখানি সবুজ গালিচা। আলুর সতেজ সবুজ গাছে ভরা ক্ষেতগুলির চারিপাশে ফুলে ভরা কুসুমফুলের গাছ, পুষ্পিত মটরশুঁটির লতা-ভরা ক্ষেত; এক চাপ সবুজের মত ছোলা ও মসুরের ক্ষেত, তাহার ভিতর অসংখ্য বেগুনি রঙের কুচি কুচি মসিনার ফুল; সদ্যোদ্গত সবুজ কোমল শীষে ভরা গম ও যবের ক্ষেত। সকলের চেয়ে বাহার দিত সরিষার ক্ষেতগুলি, হলুদ রঙের ফুলগুলি চাপ বাঁধিয়া ফুটিয়া থাকিত গাঢ় সবুজের মাথায় একটি পীতাভ আস্তরণের মত। ক্ষেতের আইলে সাঁওতাল চাষীরা অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদের কালো মুখে সাদা চোখে আনন্দ প্রত্যাশার সে কি বিপুল ব্যগ্রতা! অহীন্দ্রের মনে পড়িয়া গেল সচল পাহাড়ের মত বিপুলদেহ কঠিনপেশী কমল মাঝিকে। শেষ সে তাহাকে দেখিয়াছে বর্ষার সময় জলে-ভরা এই ধানক্ষেতের মধ্যে, কর্দমাক্ত দেহে সে তখন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ধানক্ষেতের কাদানো জমি সমান করিয়া দিতেছিল। বন্য বরাহের মত হামা দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নরম মাটি যেন দলিয়া খুঁড়িয়া ফেলিতেছিল। কমল থাকিলে বোধ হয় ক্ষেতের চাষের এমন দুর্দশা হইত না। অহীন্দ্র বেশ বুঝিল, দৈনিক নগদ মজুরির আস্বাদ পাইয়া ইহারা এমন করিয়া চাষ পরিত্যাগ করিয়াছে। কমল বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও আড্ডা গাড়িয়াছে; নহিলে সারী কেমন করিয়া উমাকে দেখিতে আসিল? উমা তো বলিল, খুব লম্বামত মেয়েটি, নামটি বেশ—সারী। মাঠ পিছনে ফেলিয়া অহীন্দ্র সাঁওতাল-পল্লীর ছায়াঘন প্রান্তসীমায় প্রবেশ করিল। পল্লীটা নীরব নিস্তব্ধ; কেবল গোটাকয়েক কুকুর তাহাকে দেখিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। অহীন্দ্র শঙ্কিত না হইলেও সতর্ক না হইয়া পারিল না, সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই মুহূর্তেই নিকটতম বাড়ি হইতে একটি মেয়ে বোধ হয় ঘটনাটা কি দেখিবার জন্য বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং রাঙাবাবুকে দেখিয়া সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, রাঙাবাবু!

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ রে। কিন্তু তোদের কুকুরগুলো যে আমাকে যেতে দেবে না বলছে।

মেয়েটি বেশ একটু ত্রস্ত হইয়া কুকুরগুলাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য হাত তুলিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, হড়িচ্—হড়িচ্! কুকুরগুলা তবু গেল না, মেয়েটির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে চীৎকার আরম্ভ করিল, মেয়েটি এবার অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, ই—য়ে—কম্বড়ো সে—তা হড়িচ্—হড়িচ্! অর্থাৎ, ওরে চোর কুকুর, পালা বলছি, পালা বলছি, পালা। এবার কুকুরগুলা মাথা নীচু করিয়া মৃদু গর্জনে আপত্তি জানাইতে জানাইতে সরিয়া গেল।

অহীন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিল, তোরা সব কেমন আছিস ?

মেয়েটি একটু আশ্চর্য বোধ করিয়া বলিল, কেনে, ভাল আছি। সেই যি তুমার বিয়ার 'ল-সম্বন্ধিতে' (নব সম্বন্ধ উপলক্ষে) নেচ্যা এলম গো! হাঁড়িয়া খেলম, গান করলম।

অহীন্দ্র হাসিয়া ফেলিল, বলিল, তা বটে, নেচে যখন এলি, তখন খারাপ থাকবি কি ক'রে ; আর ভালই যদি না থাকবি তবে নেচেই বা এলি কি করে ? ঠিক কথা।

মেয়েটি সবিস্ময়ে অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই কথার অর্থ উপলব্ধি করিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, হেঁ। লইলে নেচ্যা এলম কি করে ?

রাঙাবাবু!

রাঙাবাবু! এ বাবা গো!

হালে—ভালা—রাঙাবাবু গো—

হাসির ধ্বনি শুনিতে পাইয়া আশপাশের বাড়িগুলি হইতে তিনচারটি মেয়ে উঁকি মারিয়া দেখিয়া বিস্ময়ে আনন্দে রাঙাবাবুর আগমনবার্তা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া অহীন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে দলবদ্ধ হইয়া তরুণীর দল তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। বয়স্কা মাঝিনেরা তাড়াতাড়ি ছোট্ট একটি চৌপায়া আনিয়া তাহাদের 'জহর সার্না' অর্থাৎ দেবতার কুঞ্জভবন কৃষ্ণচূড়াগাছের ছায়ায় পাতিয়া দিয়া সম্ভ্রমভরে বলিল, আপুনি বোস্ বাবু।

তরুণীগুলি পরস্পরের গলা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আপনাদের মধ্যেই নিজেদের ভাষায় অনর্গল কথা বলিতেছিল, তাহার সমস্তই অহীন্দ্রকে লইয়া। অহীন্দ্র বলিল, কি এত সব বলছিস তোরা ?

মেয়েগুলি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটি মধ্যবয়স্কা মেয়ে বলিল, উয়ারা বুলছে, রাঙাবাবুকে শুধা, বহুটি কেমন হ'ল ? কত বোড়ো বেটে বহুটি ? তাই ই উয়াকে বুলছে, তুই শুধা ; উ ইয়াকে বুলছে, তুই শুধা ; শরম লাগছে উয়াদের।

অহীন্দ্র বলিল, এই এদের মতই হবে।

এবার একটি মেয়ে বলিল, আমাদের পারা কালো বেটে, না গোরা বেটে ?

অহীন্দ্র বলিল, সে আমি বলব কেন ? তোরা গিয়ে দেখে আয়। সারী গিয়েছিল দেখতে, সে আমার বউয়ের নাম দিয়ে এসেছে—রাঙাঠাকরুন।

মেয়েগুলি একসঙ্গে অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে গম্ভীর মৃদু-স্বরে দুই-একজনের মধ্যে দুই-একটা বাদানুবাদের সুরে কথা আরম্ভ হইল। অহীন্দ্র বুঝিতে পারিল না এবং লক্ষ্যও করিল না তাহাদের এই আকস্মিক সুরবৈষম্য। সে অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে সপ্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, ভ্রূ এবং কপাল কুঞ্চিত করিয়া সে বলিল, ভাল কথা, সারীরা এখন কোথায় থাকে রে ? কমল মাঝিরা এখান থেকে উঠেই বা গেল কেন ?

মেয়েগুলি আবার স্তব্ধ হইয়া গেল, তাহাদের অপ্রসন্নতার গাম্ভীর্য অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রকট হইয়া উঠিল। অহীন্দ্র তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, কি, তোরা সব গুম্ মেরে গেলি যে ? তাহার সন্দেহ হইল যে, ইহারাই সকলে চূড়ার নেতৃত্বে দল

পাকাইয়া কমলকে তাড়াইয়াছে।

একটি তরুণী এবার বলিয়া উঠিল, উ মেয়েটার নাম তু করিস না রাঙাবাবু, ছি!

আরও বিস্মিত হইয়া অহীন্দ্র বলিল, কেন?

সকলের মুখে ঘৃণার অতি তীব্র অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিল, যে-মেয়েটি কথা বলিতেছিল সে বলিল, ছি, উ পাপী বেটে, পাপ করলে।

পাপ করলে?

হেঁ পাপ করলে; আপোন বরকে—মরদকে ছেড়ে উ ওই সাহেবটোর ঘরে থাকছে।

অহীন্দ্র চমকিয়া উঠিল, বাক্যের অর্থে অর্থে সম্পূর্ণভাবে কথাটা না বুঝিলেও অর্থের আভাস সে একটা বুঝিতে পারিতেছিল, তীক্ষ্ণ তির্যক দৃষ্টিতে চাহিয়া সে প্রশ্ন করিল, বরকে ছেড়ে সায়েবের ঘরে থাকছে? সায়েব কে?

ওই যি কল বানাইছে, উয়াকে আমরা সায়েব বলি।

হুঁ। ছোট একটি 'হুঁ' বলিয়াই অহীন্দ্র স্তব্ধ হইয়া গেল।

অপর একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল, উ এখুন ভাল কাপড় পরছে, গোন্দ মাখছে, উই সায়েব দিছে উকে।

অহীন্দ্র প্রশ্ন করিল, সেইজন্যে বুঝি কমল মাঝি আর সারীর বর এখান থেকে পালিয়ে গেছে?

হেঁ, শরম লাগল উয়াদের, আমরা সব উয়াদের সেঙ্গে খেলম নি, তাথেই উয়াদের শরম বেশি হ'ল, উয়ারা সব চ'লে গেল। হেঁ।

অন্যান্য মেয়েগুলি আপনাদের ভাষায় অনর্গল কিচির-মিচির করিয়া আলোচনা করিয়া চলিয়াছিল দলবদ্ধ সারিকা পাখীর মত। অকস্মাৎ একটি মেয়ে আপনাদের ভাষায় বলিয়া উঠিল, দেখ্ দেখ্, রাঙাবাবুর মুখখানা কেমন হইছে দেখ্!

সবিস্ময়ে আর একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল, জেঙ্গেৎ-আরা (অর্থাৎ টকটকে রাঙা)! উ বাবা রে!

অহীন্দ্র আবার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, দুঃখে ক্রোধে তাহার মনের মধ্যে একটা আলোড়ন জাগিয়া উঠিল। সেই দীর্ঘতনু মুখরা মেয়েটিকে তাহার বড় ভাল লাগিত, তাহার পরিণতি শেষে এই হইল? আর তাহাদেরই অধিকৃত ভূমির মধ্যে একজন আগন্তুক ধনের দর্পে এমনি করিয়া অত্যাচার করিল সরল নিরীহ জাতির নারীর উপর?

মাথার মধ্যে সে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিল, রক্তের চাপে মাথাটা যেন ভারী হইয়া উঠিতেছে।

একটি প্রৌঢ়া মেয়ে বলিল, হাঁ বাবু, কেনে তুরা ওই সায়েবটাকে ইখিনে কল বোসাতে দিলি? ওই মেয়েটাকে উ জোর ক'রে বশ করলে। উয়ার ভয়ে কেউ কিছু বলতে লারলে।

অহীন্দ্রের স্থিরদৃষ্টি একটি স্থানেই আবদ্ধ হইয়া ছিল, তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে ছবি ভাসিয়া যাইতেছিল, সবই ওই সারী ও কমল মাঝির স্মৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাহার মনে

পড়িল, ওই সম্মুখের উঠানে যেখানে তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া আছে, ওইখানেই প্রথম দিন সে আসিয়া বসিয়াছিল। তখন চারিপাশে ছিল কাশ ও বেনাবন। সম্মুখে উবু হইয়া একখানা বিরাট পাথরের মত বসিয়া ছিল কমল। আর সম্মুখেই পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল মেয়েগুলি, ঠিক মাঝখানে ছিল সারী।

বৃদ্ধা বলিয়াই চলিয়াছিল, আবার এই দেখ্, আমাদের জমিগুলি উ সব কেড়ে লিছে।

অহীন্দ্র যেন গর্জন করিয়া উঠিল, কেড়ে নিচ্ছে?

তাহার এই গর্জনে সমস্ত দলটি চমকিয়া উঠিল, অহীন্দ্রকে এমন রূপে তাহারা কখনও তো দেখেই নাই, এমন রূপের প্রকাশকেও তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। যে প্রৌঢ়াটি কথা বলিতেছিল, সেও ভয়ে চুপ করিয়া গেল। অহীন্দ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে আবার প্রশ্ন করিল, জমি কেড়ে নিচ্ছে কি মেঝেন?

ভয়ে ভয়ে প্রৌঢ়া বলিল, বুলছে, তোদের কাছে আমি টাকা পাব। জমিগুলা আমাকে দিতে হবে। লইলে লালিশ করব।

টাকা পাবে? কিসের টাকা?

ওই যি চিবাস মোড়ল, উয়ার কাছে আমরা সোব ধান খেতম বর্ষাতে, তাই চিবাস খত ক'রে লিলে ধানের দামে। উহার কাছ হ'তে উই সায়েব আবার কিনে লিলে খতগুলান। তাথেই বুলছে, জমিগুলা দে, তুদিকে আরও টাকা দিব, খতও শোধ ক'রে লিব। লইলে লালিশ করব।

করুক নালিশ, খবরদার তোরা জমি লিখে দিবি না! যে টাকা পাবে, সে আমরা শোধ করে দেব।

মেয়েটি হতভম্বের মত খানিকক্ষণ অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, জমি যে বাবু লিলে।

লিখে নিলে?

হেঁ বাবু। আজকে সোঁকালে মরদগুলাকে লিয়ে শহরে পাঠায়ে দিলে তুদের সেই মজুমদারের সোঙ্গে হাকিমের ছামুতে টিপছাপ লিবে, রেজস্টালি ক'রে লিবে।

অহীন্দ্র অনুশোচনায় অস্থির হইয়া উঠিয়া বলিল, ছি ছি ছি! তোরা দিলি কেন? আমাদের ওখানে গেলি না কেন?

মেয়েটি সকরুণ স্বরে বলিল, উ যি বলতে বারণ করলে রাঙাবাবু। উয়াকে দেখলে যে আমরা ডরে ম'রে যাই। পাহাড়ে চিতির ছামুতে ছাগল ভেড়ার মোতন আমরা লড়া-চড়া করতে লারি বাবু।

সমবেত সকলেই যেন এতক্ষণ উদ্বেগে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, প্রৌঢ়ার কথা শেষ হইতেই দুঃখে হতাশায় দীর্ঘ প্রক্ষেপে সে নিশ্বাস তাহারা ত্যাগ করিল। মৃদুস্বরে আক্ষেপ করিয়া দুই-চারিজন বলিয়া উঠিল, আঃ আঃ! হায় রে!

অহীন্দ্রের চোখের উপর চকিতে ভাসিয়া উঠিল, সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সম্মুখেই

একটা স্থানে একটা বিরাট অজগরের মৃতদেহ, নিস্পন্দ চিত্রিত মাংসস্তূপ। ঠিক ওইখানেই সেটা সেদিন পড়িয়া ছিল, তীরে তীরে বধ করিয়াছিল সেটাকে সারীর স্বামী। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়াই অনুভব করিল, সর্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। মাথাটা যেন অবরুদ্ধ ক্রোধে ফাটিয়া পড়িতেছে।

* * *

এমন দুর্দমনীয় ক্রোধের অস্থিরতা সে জীবনে অনুভব করে নাই ; দুই কান দিয়া আগুন বাহির হইতেছে, শীতের কনকনে বাতাসের স্পর্শেও আরাম বোধ হইতেছে না। রগের শিরা দুইটা দপদপ করিয়া স্পন্দিত হইতেছে। বার বার তার ইচ্ছা হইতেছিল, ওই কলের মালিকের সম্মুখে গিয়া মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইতে। একবার খানিকটা অগ্রসরও হইয়াছিল, কিন্তু পথ হইতেই ফিরিল ; এই অবস্থার মধ্যেও তাহার শৈশব হইতে মায়ের দৃষ্টান্তে অভ্যাস করা আত্ম-সংযম তাহাকে নিবৃত্ত করিল। আরও একটা চিন্তা তাহার পথ রোধ করিল, সে তাহাদের বংশপ্রচলিত মর্যাদা-রীতি। সে রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী অহীন্দ্রের এমন করিয়া বিমলবাবুর ওখানে যাওয়া চলে না। চক্রবর্তীদের আসনের সম্মুখেই ওই কলওয়ালাকে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরিল। শীতের কালিন্দীর বালুকাময় তটভূমি ধরিয়া একটা নির্জন স্থানে আসিয়া সে বসিল। সম্মুখেই পশ্চিম দিকে অপরাহ্নের সূর্য দিক্‌চক্ররেখার দিকে দ্রুত নামিয়া চলিয়াছে, ইহারই মধ্যে শুকতারাটি ক্ষীণ প্রভায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বসিয়া বসিয়া সে ভাবিতেছিল ওই কলওয়ালার অত্যাচারের কথা। নিরীহ সরল জাতির নারী কাড়িয়া লইয়াছে, ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে। আর তাহাদের পৃথিবীতে আছে কি ? আর কি অপদার্থ ভীরু জাতি এই সাঁওতালগুলা ! তীর ধনুক লইয়া কারবার করে, বুনো শূকর মারিয়া খায়। কুমীর মারে, বাঘও নিস্তার পায় না, অতি কদর্য ভয়াল অজগর, ওই সারীর স্বামীই সে অজগরটাকে বধ করিয়াছিল ; আর এটাকে পারিল না ! ওই সাঁওতাল রমণীটি তো মিথ্যা বলে নাই, অর্থের শক্তিতে, বুদ্ধির কুটিলতায় ও অজগরই বটে ; পাক দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া পেষণে পেষণে রক্তহীন হত্যা করিয়া ধীরে ধীরে গ্রাস করিতে থাকে। অজগরই বটে ! সারীর স্বামী এ অজগরটাকে বধ করিতে পারিল না ? এমনি ধারার অত্যন্ত নিষ্ঠুর কামনা তাহার মাথার মধ্যে যেন চিতাগ্নিশিখার মত পাক খাইয়া খাইয়া ফিরিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পর সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বালুরাশি ভাঙিয়া কালিন্দীর ক্ষীণ জলস্রোতের কিনারায় আসিয়া অঁাজলা অঁাজলা জল মাথায় মুখে দিয়া ধুইয়া ফেলিল। কনকনে ঠাণ্ডা জলের উপর শীতের বাতাসের স্পর্শে এবার একটু শীত বোধ করিল। মস্তিষ্ক যেন এতক্ষণে সুস্থ হইয়া আসিতেছে। বেশ পরিস্ফুট কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, আঃ !

ধীরে ধীরে সে বালির উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিল। উঃ, কি কঠিন ক্রোধই না তাহার হইয়াছিল ! ওই লোকটার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলে আজ একটা অঘটন ঘটিয়া যাইত। কিন্তু এই যে অন্যায় অত্যাচার, ধনদর্পিত স্বেচ্ছাচার—স্বেচ্ছাচার কেন, ব্যভিচার—ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। করিতে যে সে ধর্মত ন্যায়ত বাধ্য। ওই নিরীহ সাঁওতালগুলি তাহাদেরই

প্রজা, শুধু প্রজাই নয়, তাহার পিতামহ হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের বংশকে উহারা দেবতার মত মান্য করে। শুধু তাই বলিয়াই বা কেন? মানুষ হিসাবে তাহার কর্তব্য। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করার অধিকারই মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। সকল ব্যথিতের বেদনায় ব্যথিতা অশ্রুমুখী মায়ের মুখ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, তাহার মা ননী পালের মৃত্যুর জন্য কাঁদেন, অথচ পুত্রের দ্বীপান্তরের আদেশ অবিচলিত ধৈর্যের সহিত সহ্য করেন।

অকস্মাৎ পাশের বেনাবন আন্দোলিত হইয়া উঠিতেই সে ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল। চরের এই খানিকটা অংশের বেনাবন এখনও সাফ হয় নাই। বেনাবনের ও-পাশেই চরের উপর সারি সারি ইটের পাঁজা; ওগুলিই এখন সরীসৃপ ও বন্যজন্তুদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিয়া একটু সরিয়া অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আত্মরক্ষার্থে একটা পাথরের নুড়িও নদীর বালি হইতে কুড়াইয়া লইল। জানোয়ার নয়, মানুষ। বেনাবনের অন্তরালে একেবারে সম্মুখেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সাদা কাপড় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অহীন্দ্র হাতের ঢেলাটি ফেলিয়া দিয়া আবার ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইল। তাহার মনে পড়িল, রবীন্দ্রনাথের "গান্ধারীর আবেদনে"র কথা। পাপে আসক্ত পুত্রের প্রতি অভিশাপের বজ্র নিক্ষেপ করিতে করিতে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় চোখে তাঁহার জল আসিয়াছে। কৃষ্ণার লাঞ্ছনার চেয়ে কৃষ্ণাকায়া হতভাগিনী সারীর লাঞ্ছনা তো কম নয়।

রাঙাবাবু! পিছন হইতে মৃদুস্বরে কে ডাকিল, রাঙাবাবু!

অহীন্দ্র পিছন ফিরিয়া দেখিল, বেনাবনের পটভূমির গায়ে দাঁড়াইয়া সারী, হাতে দুইটি গাঢ় লাল রঙের ফুল। মুহূর্তে তীব্র কঠিন ক্রোধে আবার তাহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত স্নায়ুগুলি গুণ-দেওয়া ধনুকের ছিলার মত টান হইয়া টঙ্কার দিয়া উঠিল। দুর্নীতিপরায়ণা মেয়েটার উপর ক্রোধের তাহার সীমা রহিল না। তাহার চোখে পড়িল না, সারী কত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তাহার কালো রঙের উপরও চোখের কোলে গাঢ়তর কালির রেখায় আঁকা গভীর ক্লান্তির অতি স্পষ্ট ছাপটিও সে দেখিতে পাইল না।

সারী হাসিয়া ফেলিল; তাহার সেই হাসির মধ্যে একটি শঙ্কার আভাস, সে বলিল, আমি দেখলম আপোনাকে; নদীর বালিতে বালিতে রাঙা আগুনের পারা মানুষ, তখুনি চিনতে পারলম। ফুল লিয়ে এলম। কথা বলিতে বলিতেই কৃষ্ণাভ-রাঙা মখমলের রঙের গোলাপ ফুল দুইটি তাহার দিকে প্রসারিত করিয়া ধরিল। অহীন্দ্র সে-দিকে দৃষ্টিপাতই করিল না, ভ্রূকে স্পর্শ করিয়া প্রসারিত তাহার অতি তীব্র দৃষ্টি সারীর মুখের উপরেই স্থিরভাবে নিবদ্ধ ছিল। অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত লৌহশলাকার মত সে-দৃষ্টি মর্মঘাতী তীক্ষ্ণ। সারী সভয়ে হাতটি গুটাইয়া লইয়া চরমদণ্ডে দণ্ডিতা অপরাধিনীর মত নীরবে বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নিষ্করুণ কঠিন কণ্ঠে এতক্ষণে অহীন্দ্র বলিল, স'রে যা আমার সুমুখ থেকে। তোর লজ্জা করে না মানুষের সামনে দাঁড়াতে? যা এখান থেকে!

সারীর চোখ হইতে দুইটি অশ্রুর ধারা গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। ভয়ার্ত বিহ্বলতার মধ্যেও

সে অস্ফুট স্বরে বলিল, আমাকে ঘরের ভিতর এই এত বড় ছুরি দেখালেক বাবু, কাঁড়ার চাবুক ক'রে আমাকে মারে, ওগো রাঙাবাবু গো!

অহীন্দ্র অসহিষ্ণু হইয়া তীব্রস্বরে বলিল, যা যা, এখান থেকে যা বলছি!

সারী আর সাহস করিল না, ক্লান্ত বাহুবিক্ষেপে বেনাবন ঠেলিয়া তাহারই মধ্যে ডুবিয়া গেল।

* * *

সারী চলিয়া গেল। আরও কয়েক পা অগ্রসর হইয়া অহীন্দ্র আবার স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। বেড়াইতেও আর ভাল লাগিতেছে না; সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্য দিয়া বুকের আবেগ অনেকটা বাহির হইয়া আসিল কাঁপিতে কাঁপিতে, যেন কত অফুরন্ত কান্না সে কাঁদিয়াছে। সে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজিয়া ভাবিয়া লইয়া সে আবার কালিন্দীর জলস্রোতের কিনারায় আসিয়া চোখ-কান আর একবার ধুইয়া ফেলিল। ধুইয়া সেইখানেই সে বসিল, প্রয়োজন হইলে আবার একবার মাথা ধুইয়া ফেলিবে। মাথার মধ্যে ক্রোধের যে এমন যন্ত্রণা হয় সে তাহা জানিত না। জরোত্তপ্ত মস্তিষ্কের যন্ত্রণার চেয়ে এ-যন্ত্রণা তো কোন অংশে কম নয়! তাহার মনে পড়িল, আরও একদিন ক্রোধে তাহার মাথা ধরিয়াছিল। নবীন বাগদী ও রংলাল মোড়ল তাহাকে বলিয়াছিল, আইনে পান তো লেবেন সেলামী। তাহার মা সেদিন সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে যন্ত্রণার উপশম হইয়াছিল। সেদিনের যন্ত্রণা আজিকার যন্ত্রণার তুলনায় নগণ্য, তুচ্ছ। আজও সে মায়ের হাতের স্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। এমন কোমল শান্ত স্পর্শ মায়ের হাতের, আর এত শীতল সে হাত! সে বাড়ি যাইবার জন্যই উঠিয়া পড়িল।

কিছুদূর আসিতেই দেখা হইল অমলের সঙ্গে। অমল বলিল, বাঃ, বেশ! খুঁজে খুঁজে হয়রান তোমাকে—যাকে বলে গরু-খোঁজা তাই। পরমুহূর্তেই সে বিস্ময়মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বাঃ, আকাশের গোধূলি যে তোমার মুখে নেমেছে হে! ওঃ, সো বিউটিফুল ইউ লুক? মুখে যেন লাল রুজ মেখেছ মনে হচ্ছে। না, রক্তসন্ধ্যাই হবে আরও মিষ্টি—

অহীন্দ্র বলিল, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার অমল। অত্যন্ত রাগে আমার ভয়ঙ্কর মাথা ধ'রে উঠেছে।

রাগে? তুমি আবার রাগ করতে শিখলে কবে?

আজই। ব'স, বলি।

ধীরে ধীরে সমস্ত বলিয়া সে বলিল, এরই মধ্যে সাঁওতালদের অবস্থা যা হয়েছে, সে কি বলব। মাঠগুলো প'ড়ে ধু ধু করছে। তাদের পাড়াতে সে গান নেই, আনন্দ নেই। তাদের মুখের হাসি যেন ফুরিয়ে গেছে। অমল, তাদের মেয়েদের ওপর পর্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করেছে। এর প্রতিকার করতেই হবে।

অমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, আজই পড়ছিলাম গোল্ডস্মিথের Deserted Village। —বলিয়া সে আবৃত্তিও করিয়া গেল—

Ill fares the land, to hastening ills a prey
Where wealth accumulates, and men decay,
Princes and lords may flourish, or may fade
A breath can make them, as a breath has made,
But a bold Peasantry, their country's pride
When once destroyed, can never be supplied.

অহীন্দ্রেরও মনে পড়িয়া গেল। স্মৃতি-স্মরণের মধ্যে আবৃত্তি করিতে করিতে স্ফুটস্বরে আবৃত্তি করিয়া উঠিল—

His best companions, innocence and health,
And his best riches, ignorance of wealth.

ঠিক ওই সাঁওতালদের ছবি। ওদের বাঁচাতেই হবে অমল, bold Peasantryকে রক্ষা করতেই হবে।

অমল বলিল, চল, আজ বাবাকে গিয়ে বলি। বাবাও লোকটার উপর খুব চ'টে আছেন। কালিন্দীর ওই বাঁধটা, ওই যে পাম্পে ক'রে জল তুলছে, ওটা নিয়ে বোধ হয় শিগ্‌গিরই একটা গোলমাল হবে। ফৌজদারিই হবে ব'লে মনে হচ্ছে!

অহীন্দ্র বার বার ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল, নো নো অমল, নট্‌ অ্যাজ এ প্রিন্স অর এ লর্ড, জমিদার বা ধনী হিসেবে নয়। মানুষ হিসেবে মানুষের দুঃখ দূর করতে হবে। জমিদার আর কলওয়ালার তফাৎ কোথায়?

অমল বিস্মিত হইয়া অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকার পর নদীর বালির উপর অর্ধশায়িত হইয়া অহীন্দ্র যেন আপনাকে এলাইয়া দিল, এমন আকস্মিক উগ্র উত্তেজনার ফলে তাহার দেহ ও মন যেন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অমল বলিল, এ কি, শুয়ে পড়লে যে। চল, বাড়ি চল।

অহীন্দ্র ক্লান্তির একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, চল।

২৮

অমলের মুখে অহীন্দ্রের মাথা ধরার সংবাদ এবং অপরাহ্ণের সমস্ত ঘটনার কথা শুনিয়া হেমাঙ্গিনী মাত্রাতিরিক্তরূপে চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। রায় তর্পণের আসনে নীরবে জপে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে বসিয়াই কথা হইতেছিল, তাঁহার ধ্যানগম্ভীর মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল; বিশেষ একটি উপলব্ধির ভঙ্গিতেই হাসির মৃদুতার সহিত সমতা রাখিয়া মাথাটি বার কয়েক দুলিয়া উঠিল।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, অহীনের তো রাগ কখনও দেখি নি। ওর স্বভাব হ'ল ওর মায়ের মত।

অমল হাসিয়া বলিল, পূর্বে কখনও রাগ হয় নি ব'লে পরেও কখনও রাগ হতে পারে না, এ তোমার অদ্ভুত যুক্তি মা!

হেমাঙ্গিনী দৃঢ় স্বরে বলিলেন, না, রাগ করতে পারে না। এমন মায়ের ছেলে সে কারও ওপর রাগ করবে কেন? সুনীতির দয়ামায়ার কথা তোরা জানিস, গোটা পৃথিবীর ওপর তার মায়া ছড়ানো আছে। তার ছেলে—

মায়ের স্বভাব কন্যার প্রাপ্য, গিন্নী, ছেলে পাবে পৈতৃক স্বভাব। তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, অহীন্দ্র হ'ল শাক্ত জমিদার-বংশের সন্তান! তার স্বভাব হবে সিংহের মত। দুর্বলকে সে স্পর্শ করবে না, যুদ্ধ হবে তার সবলের সঙ্গে। অহীন্দ্রের তেজস্বিতায় আমি খুব খুশী হয়েছি। তারা, তারা মা!—রায়ের জপের এক পর্যায় শেষ হইয়াছিল, সেই অবসরে তিনি এই কথা কয়টি বলিয়া কারণ-পাত্র পুনরায় পূর্ণ করিয়া লইয়া ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন।

হেমাঙ্গিনী কিন্তু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন, স্বামীর কথাগুলি তাঁহার ভাল লাগিল না। বলিলেন, তোমাদের ওই এক ধারার কথা। শাক্ত জমিদার-বংশের ছেলে হ'লে তাকে রাগ ক'রে মাথা-ধরাতে হবে, কিংবা দাঙ্গাহাঙ্গামা করতে হবে কেন শুনি? এমন কিছু শাস্ত্রের নিয়ম আছে নাকি?

ক্রিয়ায় নিযুক্ত রায় কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কিন্তু মুখে তাঁহার মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, ওদের গুষ্টির রাগকে আমার বড় ভয় করে বাপু। ওর বাপের রাগের সে থমথমে মুখ মনে হ'লে হাত-পা যেন গুটিয়ে আসে।

রায়ের মুখও গম্ভীর হইয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী বলিয়াই চলিয়াছিলেন, অহীনের এখন থেকে এ-সব নিয়ে মাথা ঘামানোই বা কেন? সে এখন পড়ছে পড়ে যাক। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার, তুমি রয়েছ, যেমনই অসুস্থ হোন—তার বাপ রয়েছেন, সে-সব তাঁরা যা হয় করবেন।

বলিয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অমলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, চল্‌, তুই আমার সঙ্গে চল্‌, একবার দেখে আসি, আর ব'লে আসি। উমিটা কোথায় গেল? সেও চলুক।

* * *

অহীন্দ্র একখানা ডেক-চেয়ারে চোখ বুজিয়া ক্লান্তভাবে হেলান দিয়া শুইয়া ছিল। পদশব্দে চোখ খুলিয়া সে দেখিল; তাহার মা, এবং মায়ের পিছনে হেমাঙ্গিনী ও অমল। ব্যস্ত হইয়া সে উঠিবার উপক্রম করিল, হেমাঙ্গিনী বলিলেন, না, না, উঠতে হবে না। তোমার শরীর খারাপ হয়ে রয়েছে, শুয়ে থাক তুমি। তারপর, তুমি নাকি এত রাগ করেছিলে যে, তোমার মাথা ধ'রে উঠেছে? ছি বাবা, রাগ চণ্ডাল, তাকে এত প্রশ্রয় দিও না। যে-মায়ের ছেলে তুমি, তাতে রাগ তোমার শরীরে থাকাই উচিত নয়।

অহীন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আপনারা জানেন না, কি অমানুষিক অত্যাচার ওই কলওয়ালাটি করেছে ওই নিরীহ সাঁওতালদের ওপর।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বেশ তো, তার জন্তে তোমার বাবা রয়েছেন, তোমার—। বলিয়াই তিনি হাসিয়া ফেলিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মামা বলা তো আর চলবে না, শ্বশুর বলতে হবে; তাই বলি, তোমার শ্বশুর রয়েছেন, তাঁরা তার প্রতিকার নিশ্চয় করবেন। গরিব প্রজা, তাদের বাঁচাতে হবে বই কি। এটা জমিদারের ধর্ম। যত কিছু দোষ রায়-হাটের বাবুদের থাক, ও-ধর্ম তাঁরা কখনও অবহেলা করেন না। তোমার এখন পড়ার সময়, তুমি লেখাপড়া কর।

সুনীতি বলিলেন, আমি বলি কি অহীন, আমাদের খাসে যে জমিটা আছে, যেটা সাঁওতালরাই ভাগে চাষ করছে, ওইটে ওদের বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া হোক। তা হ'লে ওদের দুঃখও ঘুচবে, আর কলের মালিককে বুঝিয়ে ব'লে দিলেই হবে যে, ওটাতে যেন আর তিনি হাত না দেন।

অমল হাসিয়া এবার বলিল, পিসীমার ধর্মটি কিন্তু বড় ভাল। ও ধর্মের মহিমায় সকল সমস্যার সমাধান জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়।

সুনীতি লজ্জা পাইলেন, কিন্তু হেমাঙ্গিনী বলিলেন, 'পড়িলে ভেড়ার শিঙে ভাঙ্গে রে হীরার ধার!' গোঁ ধরা শাক্ত-তান্ত্রিকের বংশ তোমাদের, তোমরা আর এ ধর্মের মহিমা কি বুঝবে বল? ওরে, ও-ধর্ম যদি সকলে বুঝত, তবে কি পৃথিবীতে এত দুঃখ থাকত?

অমল হাসিয়াই উত্তর দিল, সে তো অস্বীকার করছি না মা, কিন্তু পিসীমার ধর্মে মুশকিল কি জান? মুশকিল হচ্ছে, নিঃসম্বল অবস্থায় আর ও-ধর্ম নিয়ে চলা যায় না। মানে, ব্রহ্মাণ্ড যাঁর উদরভাণ্ড, সেই তিনি যখন ননীগোপাল সেজে ননীলোলুপ হয়ে ওঠেন, তখন যশোদাকে মুশকিলে প'ড়ে ও- ধর্ম ছেড়ে বিপরীত ধর্ম গ্রহণ করতে হয়, দায়ে প'ড়ে তখন ননীগোপালকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধতে হয়। পৃথিবীতে মানুষ মাত্রেই যে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর বিষয়-গোপাল—বিপদ যে ওইখানে।

অমলের কথার ভঙ্গিতে সকলেই হাসিল, হাসিল না কেবল অহীন্দ্র, সে যেমন গম্ভীর মুখে অবসন্ন ভঙ্গিতে ডেক-চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া ছিল, তেমনি ভাবেই রহিল। হেমাঙ্গিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তুই কিন্তু ভারী জ্যাঠা হয়েছিস অমল।

অহীন্দ্র চোখ বুজিয়াই ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, তুমি ভুল বুঝেছ অমল, মায়ের ধর্ম যশোদার ধর্ম নয়, মায়ের ধর্ম গান্ধারীর ধর্ম। দাদার গুলিতে যখন ননী পাল ম'ল, তখন মা ননী পালের জন্ত কেঁদেছিলেন, কিন্তু দাদার দীপান্তরের হুকুম যেদিন হ'ল, এক ফোঁটা চোখের জল তিনি ফেলেন নি। শুধু পাথরের মূর্তির মত ব'সে রইলেন।

লজ্জা এবং দুঃখ দুইই একসঙ্গে সুনীতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, সেই তো বাবা, হাজার অপরাধ করলেও তোমার মা কখনও কারও ওপর রাগ করেন না। অন্যায় ক'রেও কেউ দণ্ড পেলে তোমার মা তাঁর জন্তে কাঁদেন। সেই মায়ের ছেলে তুমি, রাগ করা তো তোমার সাজে না।

অহীন্দ্র নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, হ্যাঁ, রাগ করাটা আমার অন্যায় হয়েছে। কিন্তু

রাগ তো আমি ইচ্ছে ক'রে করি নি, হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেলাম আমি। তা নইলে অত্যাচার অবিচার কোথায় বা নেই বলুন ? ধনী দরিদ্রও পৃথিবীতে সর্বত্র, অত্যাচার অবিচারও সর্বত্র। ক'জনের ওপর রাগ করব ?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, না না না, তা বললে চলবে কেন ? যতটুকু তোমার আয়ত্তের মধ্যে, তার ভেতর অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে বৈ কি। আর সে হবেও। লোকটিকে ভালমত শিক্ষা দেবার জন্যে উনি উঠে-পড়ে লেগেছেন। তবে আমাদের তরফ থেকে যাতে অন্যায় না হয়, সেজন্যে আমি বার বার ক'রে বলেছি। বলেছি, ও-লোকটি অন্যায় করেছে, তাকে শাস্তি দিতে হলে ন্যায়পথে চলে শাস্তি দিতে হবে, কৌশল অবলম্বন করতে পাবে না।

অহীন্দ্র এ কথার কোন জবাব দিল না, নীরবে চোখ বুজিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া শুইয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, মাথা কি এখনও ধ'রে রয়েছে তোমার ? এক কাজ কর, ওডিকলোনের একটা পটি দাও কপালে, না হয় পিপারমেণ্ট জলে গুলে কপালে বুলিয়ে নাও। তারপর সুনীতির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, চল, আমরা যাই, একবার চক্রবর্তী মশায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি চল।

সুনীতি গভীর চিন্তায় দিশাহারা হইয়া বলিলেন, আমার বড ভয় হয় দিদি। এই চরটা সর্বনাশা চর ; যখনই চর নিয়ে কোন হাঙ্গামা বাধে, আমার বুক থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে। অহি আবার চর নিয়ে যে কি করবে, ওর ভাবগতিক আমার ভাল লাগল না দিদি। কেমন উদাসী মন হয়ে গেছে দেখলেন !

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন, ও তুমি কিছু ভেবো না সুনীতি, ও সব ঠিক হয়ে যাবে। উমার আমার স্বামীভাগ্য খুব ভাল ; তাছাড়া উমা একালের লেখাপড়া জানা চালাক মেয়ে। বিয়ে হোক না, কেমন মন-উদাসী থাকে, দেখব। দেখবে ? এক্ষুনি বাবার মন ভাল করে দিচ্ছি। বলিয়াই তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, অমল !

অমল আসিতেই বলিলেন, একটা কাজ যে ভুলেছি বাবা ! এক্ষুনি তোকে বাড়ি যেতে হবে, গিয়ে স্যাকরাকে ব'লে পাঠাতে হবে যে, উমার রুলির প্যাটার্নটা অন্য রকম হবে ; আজই সেটা আরম্ভ করবার কথা, সেটা যেন আরম্ভ না করে। কাল সকালে আমার কাছে এলে আমি সব বুঝিয়ে দেব। তিনি ইচ্ছা করিয়াই অহীন্দ্রের নিকট হইতে সরাইয়া অমলকে বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন।

অমল চলিয়া গেল ; হেমাঙ্গিনী ওডিকলোনের জল তৈয়ারি করিয়া ডাকিলেন, উমা !

উমা মানদা ঝির পাল্লায় পড়িয়াছিল, ভাবী বউদিদিকে মানদা ছোটদাদাবাবুর বাল্যকালের কথা বলিয়া নিজের গুরুত্ব এবং প্রবীণত্বের দাবি প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। উমারও শুনিতে মন্দ লাগিতেছিল না। মায়ের আহ্বান শুনিয়া সে উপরে আসিয়া সুনীতি ও হেমাঙ্গিনীর সম্মুখে দাঁড়াইল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, এই ওডিকলোনের জলটা আর এই ন্যাকড়া ফালিটা দিয়ে আয় তো মা। আমরা দুজনে চক্রবর্তী মশায়ের ঘরে যাচ্ছি। তুই বরং ন্যাকড়াটা ভিজিয়ে কপালে একটা পটিই লাগিয়ে দিয়ে আসবি। বড্ড মাথা ধরেছে অহির।

উমা লজ্জায় স্থাণুর মত হইয়া না গেলেও সঙ্কুচিত অনেকটুকুই হইল। রক্তাভ মুখে সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, হেমাঙ্গিনী ওডিকলোনের পাত্রটি হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, তোমার তো লজ্জা করলে চলবে না মা ; বাড়িতে একটি ননদ-দেওর নেই যে, তাকে পাঠিয়ে দেবেন তোমার শাশুড়ী। যাও দিয়ে এস।

উমা পাত্রটি হাতে করিয়া চলিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী সুনীতির দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন, এ কি আর আমাদের কাল আছে ভাই ? সেকালে আর একালে অনেক তফাত।

সুনীতি অতি মৃদু ম্লান হাসি হাসিলেন, বলিলেন, ধরনটা কিন্তু খুব ভাল নয় দিদি।

মুহূর্ত পূর্বে হেমাঙ্গিনীর ইচ্ছা হইতেছিল, মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়েন, কিন্তু সুনীতির কথা শুনিয়া তিনি সংযত হইয়া বসিলেন, তারপর বলিলেন, ভাল আর মন্দ ভাই, যে কালের যে ধারা। এর পর আবার কত হবে, নাতি-নাতনীর আমলে বেঁচে থাকলে সেও দেখতে হবে। এ প্রসঙ্গ শেষ করিয়া ক্ষণিক স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন, চল, চক্রবর্তী মশায়কে একবার দেখে আসি। আজই একবার দেখা হয়েছে, তবু যখন এসেছি চল।

অহীন্দ্র চোখ বুজিয়াই শুইয়া ছিল, ঠিক ঘুমায় নাই—কিন্তু সজাগও ঠিক ছিল না। জাগ্রত পৃথিবীর সকল সংস্পর্শকে দূরে সরাইয়া দিয়া সে যেন আপন অন্তরের চিন্তালোকের গভীর-গর্ভ রুদ্ধদ্বার এক কক্ষের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। অকস্মাৎ কপালের উপর শীতল একটি স্পর্শ যেন করাঘাত করিয়া তাহাকে বাহির হইতে ডাকিল। উমা আসিয়া তাহাকে ঘুমন্তই মনে করিয়াছিল ; ডাকিয়া ঘুম না ভাঙাইয়া সন্তর্পণে ওডিকলোনের পটিটা কপালে বসাইয়া দিয়াছিল।

অহীন্দ্র যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ মেলিয়া উমার মুখের দিকে চাহিল।

উমা লজ্জা পাইল, আরক্তিম মুখে বলিল, ওডিকলোনের পটি! আমি ভেবেছিলাম, ঘুম আর ভাঙাব না।

স্মিত হাসিতে অহীন্দ্রের মুখ ঈষৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে বলিল, আমি ঘুমুই নি।

ঘুমোও নি ? তবে এমন ভাবে শুয়ে ছিলে যে ? মাথা বুঝি খুব ধরেছে ?

মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে ; কিন্তু মন যেন কেমন vacant হয়ে গেছে।

উমা মৃদু হাসিয়া এবার বলিল, সায়েবলোকের কিন্তু এ-রকম দুর্বল হওয়া উচিত নয়। রাগ দুর্বলচিত্তের একটি লক্ষণ।

অহীন্দ্রর মুখের হাসি এবার আরও একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, কথাটা তোমার মুখে শোভন হ'ল না, হে বাঙালিনী শ্রীমতী উমা দেবী। যেহেতু স্মরণ কর, পুরাকালে পর্বতদুহিতা উমার প্রিয়তম পরম যোগী শঙ্করেরও একদা ক্রোধ হয়েছিল, যে-ক্রোধের অগ্নিতে কাম হয়েছিল ভস্মীভূত।

উমা হাসিয়া বলিল, তুমি কি ওই কলওয়ালাটিকে ভস্মীভূত করতে চাও নাকি ?

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া অহীন্দ্র বলিল, তখন তাই চেয়েছিলাম। কিন্তু আর তা চাই

না। একটু আগে মনকে ওই চিন্তা থেকে মুক্ত করবার জন্যে পড়ছিলাম, রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন', তার ক'টা লাইন আমাকে যেন পথ দেখিয়ে দিলে। লাইন ক'টি মুখস্থ হ'য়ে গেছে আমার—

"দণ্ডিতের সাথে—
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে,
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যথা নাহি পায়—তারে দণ্ড দান
প্রবলের অত্যাচার।"

আমি লোকটাকে শাস্তি দিতে চাই, তার অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাই, কিন্তু তার ওপর কোন বিদ্বেষ আমি রাখতে চাই না।

অহীন্দ্রের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে উমার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে এ যুগের মেয়ে, তাহার তরুণ মন আদর্শের স্বপ্নে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; অহীন্দ্রের গৌরবে সে গরবিনী হইয়া উঠিয়াছে।

ও-দিকে রামেশ্বরের ঘর হইতে ফিরিয়া নীচে নামিবার পথে সিঁড়ির একটি গোপন স্থানে সুনীতি ও হেমাঙ্গিনী আপনা-আপনিই যেন দাঁড়াইয়া উমা ও অহীন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। হেমাঙ্গিনী আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, সুনীতিকে স্পর্শ করিয়া ফিসফিস করিয়া বলিলেন, দেখলে?

সুনীতি বলিলেন, ফাল্গুনের প্রথমেই দিন ঠিক করুন দিদি। আমার অদৃষ্টকে আমার সর্বদাই ভয় হয়। আমার সম্বলের মধ্যে অহি। উমার হাতে ওর ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে চাই।

* * *

হেমাঙ্গিনী উৎসাহে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, রণবাদ্যে উৎসাহিত যুদ্ধের ঘোড়ার মত। ফাল্গুনেই বিবাহ দিবার জন্য তিনিও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বিবাহের মধ্যে যেন একটা কল্পলোকের মাদকতা আছে, পাড়া-পড়শী পর্যন্ত নিদ্রা বিসর্জন দিয়া মাতিয়া উঠে, এ-ক্ষেত্রে তো মেয়ের মা এবং ছেলের মা। সুনীতিও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। রায়ের মনেও উৎসাহের সীমা ছিল না। রাধারাণীর অন্তর্ধানের লজ্জায় ক্ষোভে আগুন ধরিয়া পুড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহাতে পূর্ণাহুতি পড়ে নাই। কিন্তু তিনি পুরুষমানুষ; সাত-পাঁচ ভাবিয়া বৈশাখে বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ফাল্গুন ও চৈত্র দুই মাস জমিদারদের দারুণ ঝঞ্ঝাটের সময়। বাকি-বকেয়া আদায়, বৎসরান্তে আখেরী হিসাবনিকাশ লইয়া মাথা তুলিবার অবসর থাকে না। সেই সব ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া তিনি বৈশাখে বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

কিন্তু হেমাঙ্গিনী কিছুতেই শুনিবেন না, বলিলেন, বোশেখ মাস গরমের সময়, গা প্যাচ-প্যাচ করবে ঘামে—

বাধা দিয়া রায় হাসিয়া বলিলেন, আমি নিজে তোমার পাংখা-বরদার হব। পাখা নিয়ে

পেছনে পেছনে বাতাস ক'রে ফিরব, তা হ'লে হবে তো?

না। খেয়ে-দেয়ে কোথায় কার বদহজম হবে—

বাড়িতে একটা ডাক্তার আমি বসিয়ে রাখব, খাওয়ার পর প্রত্যেককে একদাগ হজমী ওষুধ দেওয়া হবে।

হেমাঙ্গিনী রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন, যাইবার সময় বলিলেন; ছেলের মায়ের মতটা তো মানতে হবে। যত খাতিরই তোমাকে সুনীতি করুক, তুমি মেয়ের বাপ, সে ছেলের মা।

রায় হাসিয়া পাঁজি খুলিয়া বসিলেন।

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহেই বিবাহের দিন পাওয়া গেল, শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। রায় উৎসব-আয়োজনের ত্রুটি রাখিলেন না; গ্রামস্থ লোক, প্রজা সজ্জন সমস্ত নিমন্ত্রিত হইল।

সাঁওতালদেরও সমস্ত দলটিকে বরযাত্রী যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইল। কিন্তু তাহারা কেহ আসিল না।

অচিন্ত্যবাবু আসিয়াছিলেন, তিনি ফিসফিস করিয়া বলিলেন, বারণ ক'রে দিয়েছে মশায়। যে আসবে, তার জরিমানা হবে।

চক্রবর্তী-বাড়ির নায়েব বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, বারণ ক'রে দিয়েছে! কে? জরি-মানাই বা কে করবে শুনি?

মুখার্জি সাহেব—মিস্টার মুখার্জি।

নায়েব গম্ভীরভাবে ডাকিল, কে রয়েছিস রে, বাগ্‌দী পাইকদের ডাক্ তো এখানে।

অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, ঠকবেন মশায়, ঠকবেন। এমন কাজটি করবেন না। সাঁওতালদের প্রজাই-স্বত্ব এখন মুখার্জি সায়েবের। তারা এখন মুখার্জি সায়েবের প্রজা। আপনাদের প্রজা হ'ল মুখার্জি সায়েব, সাঁওতালরা মুখার্জি সায়েবের প্রজা, মজুর, আশ্রিত, তিনিই এখন ওদের মা-বাপ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সব।

কথাটা অহীন্দ্রের কানেও উঠিল। বরবেশে চতুর্দোলে বসিয়া, কুঞ্চিত ললাটে সে জ্যোৎস্নার আলোকে আলোকিত চরখানির দিকে চাহিয়া দেখিয়া, গভীর বেদনা অনুভব করিল। দলিলের কৌশলে সাঁওতালদের বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল! জাল দলিলে মানুষ বিকাইয়া গেল।

রাঙা ইঁটের তৈয়ারী সুদীর্ঘ চিমনিটা শাসনরত তর্জনীর মত উদ্যত হইয়া আছে।

ও-দিকে সংবাদটা শুনিয়া ইন্দ্র রায় সারাদিনের উপবাসে পরিশ্রমে ক্লান্ত দেহখানিকে টানিয়া মুহূর্তে সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলিবার বা করিবার পূর্বেই হেমাঙ্গিনী আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, আজ তুমি কিছু করতে পাবে না, আজ আমার উমার বিয়ে।

ইন্দ্র রায় বউভাত উপলক্ষ করিয়া আবার সাঁওতালদের নিমন্ত্রণ করিলেন।

কিন্তু সে নিমন্ত্রণও সাঁওতালরা গ্রহণ করিতে সাহস করিল না। শুভার্থী সকলেই নিষেধ করিয়াছিল, হেমাঙ্গিনী বার বার বলিয়াছিলেন, দেখ, আমি বারণ করছি, ও তুমি ক'রো না। বিয়ের রাত্রে যখন আসতে দেয় নি ওদের, তখন আবার নেমন্তন্ন ক'রে বেচারাদের বিপদে ফেলা কেন? 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।'

সুনীতি সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, ঝগড়া বিবাদ ক'রে কাজ নেই দাদা।

ইন্দ্র রায় কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না, চোখ বুজিয়া গভীর চিন্তায় কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া অনুরোধ অস্বীকার করিলেন, বলিলেন, উলুখাগড়ার প্রাণ যায় ব'লে দুঃখ করছ, কিন্তু ও মিথ্যে দুঃখ। এমনি ভাবে মরবার জন্যেই উলুখাগড়ার সৃষ্টি। তিনি হাসিলেন।

হেমাঙ্গিনী সুনীতি দুইজনেই ইন্দ্র রায়ের হাসির ভঙ্গি দেখিয়া নীরব হইয়া রহিলেন; ক্ষুরের মতই ক্ষুদ্রপরিসর এবং মর্মান্তিক তীক্ষ্ণধার সে হাসি। ধীরে ধীরে সে হাসিটুকু রায়ের মুখ হইতে মিলাইয়া গেল। গম্ভীরভাবে আবার বলিলেন, এ-সংসারে যার ইজ্জত নেই, তার জাত নেই। এ হ'ল চক্রবর্তী-বাড়ি রায়-বাড়ির ইজ্জত নিয়ে কথা, এ ব্যাপারে তোমরা কথা ব'লো না।

তিনি ও-পারের চরে নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন, শুধু সাঁওতালদের নিকটই নয়, চরের সকলের নিকট—এমন কি বিমলবাবুর নিকট পর্যন্ত। নিমন্ত্রণ লইয়া গেল একজন গোমস্তা ও একজন পাইক। বিমলবাবু ব্যতীত সকলের নিকট মৌখিক নিমন্ত্রণই পাঠানো হইল, কেবল বিমলবাবুর নিকট পাঠানো হইল একখানি পত্র।

চূড়া মাঝি বিব্রত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; অন্যান্য সাঁওতালরা নীরবে চিন্তান্বিত মুখে চূড়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, মুখরা মেয়েগুলি শুধু মৃদুস্বরে আপনাদের মধ্যে দুই-চারিটা কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিল।

গোমস্তাটি বলিল, যাস যেন সব, বুঝলি?

এতক্ষণে চূড়া বলিল, কি ক'রে যাব গো বাবু? দু বেলা খাটতে হচ্ছে যি সাহেবের কলে।

গোমস্তা একটু হাসিয়া বলিল, ভাল। যাস নে তা হ'লে। আর কোন কথা না বলিয়া সে চলিয়া আসিল। কিছুদূর সে আসিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে চূড়া তাহাকে ডাকিল, বাবু মশায়! গোমস্তাবাবু!

কি?

বাবু মশায়, সায়েব যি রাগ করেছে গো, বুলছে—তুদের বাড়ি গেলে পরে ইখান থেকে খাঁড়িয়ে দিবে।

আচ্ছা, তাই বলব আমি কর্তাবাবুকে।

চূড়ার বুক ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, সে বলিল, না গো বাবু মশায়; তা বুলিস না গো;

সায়েব রাগ করবে গো।

গোমস্তা কোন উত্তর দিল না, অতি অবজ্ঞা ও ঘৃণার হাসি হাসিয়া সে চলিয়া গেল। চূড়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল, ভয়ে তাহার পা দুইটি ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে; আঃ, কেন এ-কথাটা সে উহাকে বলিল?

সাঁওতালরা আসিল না।

শুধু আসিল না নয়, সন্ধ্যা হইতেই চরের বুকে মাদল, করতাল ও বাঁশীর সমবেত ধ্বনিতে একটি উৎসবের বার্তা ঘোষণা করিয়া দিল। বিমলবাবু পাকা ব্যবসায়ী লোক; এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে সাঁওতালদের মনঃক্ষুণ্ণতার কথা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। তিনি অপরাহ্নে তাহাদের ডাকিয়া প্রচুর পরিমাণে মদের এবং দুইটা শূকরের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, বলিলেন, খুব নাচগান করতে হবে তোদের।

হাঁড়িয়ার কথা শুনিয়া প্রথমটা কেহ উৎসাহ প্রকাশ করিল না, চুপ করিয়া এ উহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিমলবাবু ব্যাপার বুঝিয়াও কোন কথা বলিলেন না, একেবারে অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট অচিন্ত্য-বাবুকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, একখানা দশ টাকার ভাউচার করুন তো। সাঁওতালদের বকশিশ। আর মদের দোকানের ভেণ্ডারকে একখানা স্লিপ লিখে দিন, সাঁওতালদের যে যত খেতে পারে মদ দেয় যেন—আপ-টু টেন রূপীজ।

টাকাটা হাতে পাইয়া সাঁওতালদের মন ঈষৎ চাঙ্গা হইয়া উঠিল। তারপর মদের দোকানে আসিয়া তাহারা পরস্পরের মধ্যে খানিকটা জোর তর্ক আরম্ভ করিয়া দিল; কেহ কাহারও কথার প্রতিবাদ করিতেছিল না, অথচ উত্তেজিত কলরবে তুমুল তর্ক। সকলেই বলিতেছিল।

রাঙাবাবু কি বুলবে?

উয়ার শ্বশুরটি? বাবা রে, বাঘের মতন তাকানি উয়ার। উ কি বুলবে?

রাগ করবে, ধ'রে লিয়ে যাবে। তখুন কি হবে?

ইধারে সায়েব রাগ করছে। বাবা রে, উ তো কম লয়। উয়ার আবার বন্দুক আছে, মেরে ফেলাবে গুলি দিয়ে।

এই তর্কের মধ্যেই মদ আসিয়া পৌঁছিল। কিছুক্ষণ পর তাহাদের তর্ক ভীষণাকার ধারণ করিল, উচ্চকণ্ঠে আস্ফালন করিয়া সকলেই বলিতেছিল, কি করবে রাঙাবাবুর শ্বশুর আমাদের? আমরা উয়াকে মানি না।

আমাদের সায়েব রইছে, উয়াকেই আমরা মানব, হেঁ!

অতঃপর মেয়েদের জন্য প্রকাণ্ড জালাতে করিয়া মদ লইয়া তাহারা পাড়ায় ফিরিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাদল-করতাল-বাঁশী বাজাইয়া প্রচণ্ড উৎসাহে নাচগান জুড়িয়া দিল।

*　　*　　*

ও-দিকে বউভাতের খাওয়ান-দাওয়ানের জের তখনও মেটে নাই, তবে প্রধান অংশ শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ইন্দ্র রায় এখন কেবল পরিবেশন-কারীর দল ও ঠাকুর-চাকরদের খাওয়ানোর তদারক করিতেছেন। মাদল-করতাল-বাঁশীর উচ্ছ্বসিত ধ্বনি আসিয়া কানে প্রবেশ করিতেই তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। মনে মনে ব্যাপারটা তিনি অনুমান করিয়া লইলেন।

অমল কর্মান্তরে ব্যস্ত ছিল, তাহাকে ডাকিয়া খাওয়ান-দাওয়ানের ভার দিয়া তিনি রামেশ্বরের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। রামেশ্বর খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া কৃষ্ণা-দ্বিতীয়ার প্রায়-পূর্ণচন্দ্রের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় আলোকিত উন্মত্ত সঙ্গীত-মুখর ওই চরটার দিকেই চাহিয়া ছিলেন।

রায় ডাকিলেন, রামেশ্বর!

রামেশ্বর চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কে?

আমি ইন্দ্র!

ইন্দ্র! এস, এস ভাই। খাওয়ান-দাওয়ান সব হয়ে গেল?

হ্যাঁ। আমি নিজে দাঁড়িয়ে সব শেষ ক'রে তোমার কাছে আসছি। যারা কাজকর্ম করেছে, তারাই খাচ্ছে এখন; অমল দাঁড়িয়ে দেখছে সেখানে।

রামেশ্বর অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ডাকিলেন, বউমা! বউমা!

রায় হাসিলেন, উমার শ্বশুর উমাকে ডাকিতেছেন! বধূবেশিনী উমা আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বাবাকে দেখিয়া একটু হাসিল, হাসিয়া সে শ্বশুরের কাছে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিল, আমাকে ডাকছিলেন?

রামেশ্বর বলিলেন, হ্যাঁ রে বেটী, হ্যাঁ। আমার মা হয়ে তোর কোন বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই! দেখছিস না, কে এসেছেন! সমস্ত দিন তোর বাড়িতে খাটলেন, এখনও মুখে জল দেন নি। দে, হাত-পা-মুখ ধোবার জল দে। খাবার জায়গা ক'রে দে। এ-ঘরে নয়, অন্য ঘরে—অন্য ঘরে। চকিতে তাঁহার দৃষ্টি একবার আপনার হাত দুইখানির দিকে নিবদ্ধ হইয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

রায় হাসিয়া বলিলেন, হাত-মুখ আমি ধুয়েছি; খাবার জায়গা করতে নেই, ও থাক!

চকিত হইয়া রামেশ্বর প্রশ্ন করিলেন, কেন, ইন্দ্র, খাবার জায়গা করতে নেই কেন?

তুমি একটি মূর্খ। রায় হাসিয়া বলিলেন, কাকে কোলে ক'রে খেতে বসব? দাঁড়াও, আমার দাদুভায়ের আগমন হোক, তবে তো!

বার বার ঘাড় নাড়িয়া রায়ের কথা স্বীকার করিয়া রামেশ্বর বলিলেন, বটে, বটে। তুমি যেদিন দাদুভাইকে কোলে নিয়ে খেতে বসবে ইন্দ্র, সেদিন যে আমার ঘরের কি শোভাই হবে হে, আমি সে কল্পনাই করতে পারছি না। কবি কালিদাসও এর উপমা দিয়ে যান নি। কুমার কার্তিকেয়কে গিরিরাজের কোলে দিয়ে তিনি দেখেন নি। সূর্যবংশের রাজারা তো পুত্র উপযুক্ত হ'লে আর গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকতেন না। আমাকেই একটা শ্লোক রচনা করতে হবে দেখছি।

উমা একালের মেয়ে হইলেও বাঙালীর মেয়ে—সে লজ্জায় ঘামিয়া উঠিতেছিল। লজ্জার রক্তোচ্ছ্বাসে তাহার সুন্দর মুখের প্রসাধন-শুভ্রতাও রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর সারাটা মুখ ভরিয়া বিন্দু বিন্দু ঘাম। ইন্দ্র রায় তাহাকে পরিত্রাণ দিলেন, তিনি বলিলেন, উমা, যা মা, তোর শাশুড়ীর খাওয়া-দাওয়া হ'ল কিনা দেখ্। তোর মাকেও বল্, একটু তাড়াতাড়ি সেরে নিতে।

উমা পলাইয়া আসিয়া যেন বাঁচিল, ঘর হইতে বাহির হইয়া দরদালানের নির্জনতায় আসিয়া পুলকিত সলজ্জ হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল।

বাড়িতে বাহিরের দিকের টানা বারান্দায় রেলিঙের উপর মাথা রাখিয়া সুনীতি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গেলে তিনি অবসর পাইয়া কাঁদিতে আসিয়া ছিলেন মহীনের জন্য।

তাঁহার মহীন—দীর্ঘদেহ, সবলপেশী, উদ্ধতদৃষ্টি, উন্নতশির মহীন্দ্র।

প্রথমে তো তাহারই বধূর কল্যাণঘট কাঁখে করিয়া এ-ঘরে প্রবেশ করিবার কথা। অহীন্দ্রের বিবাহে, তাহারই দৃপ্ত উচ্চ আদেশ-ধ্বনিতে এ-বাড়ির প্রতিটি কোণ মুখরিত হইয়া থাকিবার কথা।

এ সর্বনাশ না হইলে হতভাগ্য ননী পালও আজ এ-বাড়িতে খাইয়া হাসিমুখে বলিত, আঃ, খুব খেলাম বাপু।

বেচারা নবীন বাগ্দী আর তাহার সঙ্গী কয়েকজনকে তাহার মনে পড়িয়া গেল। সেই অজানা মুসলমান লাঠিয়ালটি যে নবীনের লাঠির আঘাতে মরিয়াছে, সে থাকিলে সেও আজ আসিয়া বকশিশ লইয়া যাইত, লুচি মিষ্টি খাইয়া যাইত!

একটি সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুনীতি চন্দ্রালোকিত চরটার দিকে চাহিলেন। আজও সাঁওতালরা খাইতে আসে নাই; কলের মালিকও খাইতে আসেন নাই; ও-বাড়ির দাদার মুখ থমথমে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর মাদল-করতাল-বাঁশী বাজাইয়া এ উহারা করিতেছে কি? না না না, এটা উহারা বিষম অন্যায় করিতেছে। স্তব্ধ হইয়া তিনি চরটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এত উচ্চ রূঢ় বাজনা কখনও বাজে না। বিরোধ বাধাইতে উহারা কি বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে? ডঙ্কা বাজাইয়া চরটা যেন যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে! আতঙ্কে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। পায়ের তলায় বাড়িটা যেন দুলিয়া উঠিল, চোখের সম্মুখে চরটা ঘুরিতেছে।

উমা আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল।

সুনীতি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন, উমা? বউমা?

অন্ধকারের মধ্যে মৃদু হাসিয়া উমা বলিল, আপনি খাবেন আসুন মা। পরক্ষণেই এই গিন্নীপনার জন্য লজ্জা অনুভব করিয়া সে বলিল, মা নীচে ডাকছেন আপনাকে। এই মা অর্থে তাহার মা হেমাঙ্গিনী।

সুনীতি যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিচলিত, মস্তিষ্কের রক্তের চাপে স্নায়ু-শিরায়

চাঞ্চল্যে চরটাকে তিনি ঘুরিতে দেখিয়াছেন! ওই মাদল ও করতালের উচ্চ ধ্বনির মধ্যে তিনি যুদ্ধোত্তমের ঘোষণা শুনিয়াছেন। তাঁহার ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু মনও আজ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। এই মুহূর্তেই সম্মুখে বধূকে দেখিয়া সে কম্পন-চাঞ্চল্য যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অহীন্দ্রের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কোনমতেই তাহাকে সঙ্ঘর্ষের সম্মুখীন হইতে তিনি দিবেন না। যেমন করিয়া হউক তিনি নিবারণ করিবেন। ও-বাড়ির দাদার পায়ে তিনি উমাকে ফেলিয়া দিবেন। অহীন্দ্রের গৃহদ্বারের দুই বাজুতে হাত দিয়া পথরোধ করিয়া তিনি নিজে দাঁড়াইবেন।

উমা আবার ডাকিল, মা?

উত্তরে সুনীতি প্রশ্ন করিলেন, অহীন কোথায় বউমা?

উমা লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। সুনীতি উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেলেন।

অহীন্দ্র পড়ার ঘরে বসিয়া ছিল। একখানা মোটা বইয়ের মধ্যে আঙুল পুরিয়া মানদার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে তাহার তিরস্কার শুনিতেছিল।

মানদা তাহাকে তিরস্কার করিতেছিল, না বাপু, এ কিন্তু আপনার ভাল কাজ নয় দাদাবাবু, সে আপনি যাই বলুন—হ্যাঁ। আজকে হ'ল মানুষের জীবনের একটা দিন। আজ পাঁচজনা মেয়েছেলে এসেছে, ঠাট্টা-তামাসা করবে, গান করবে, ছড়া কাটবে, আপনার গান শুনবে সব। ফুলশয্যের দিন। আর আপনি ইয়া মোটা একটা বইয়ের ভেতর মুখ গুঁজে ব'সে রয়েছেন।

অহীন্দ্র কোন উত্তর দিল না, মৃদু হাসিমুখেই তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। মানদা কোন উত্তর না পাইয়া আবার বলিল, বলি, উঠবেন কি না, বলুন? উঠে আসুন, কাপড় ছাড়বেন, মেয়েরা সব গজগজ ক'রছে।

সুনীতি আসিয়া প্রবেশ করিলেন, মানদা অভিযোগ করিয়া বলিল, এই দেখুন, আজকের দিনে একখানা মোটা বইয়ের ভেতর মুখ গুঁজে ব'সে রয়েছেন। এলাম যদি, তা মানুষের খেয়াল নাই। কি রস যে ওই কালির হিজিবিজির মধ্যে আছে, কে জানে বাপু!

সুনীতি বলিলেন, চল্ তুই মানদা, আমি নিয়ে যাচ্ছি ওকে।

মানদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, নাও, হ'ল। আপনি আবার ধর্মকথা আরম্ভ করুন এখন এক পহর! ও দিকে মেয়েরা সব চ'লে যাক।

না রে, না। চল্ তুই, আমি এলাম ব'লে ওকে নিয়ে। এই উদ্‌ভ্রান্ত মনেও সুনীতি মানদার স্নেহের শাসনে হাসিয়া আনুগত্য না জানাইয়া পারিলেন না।

অহীন্দ্রও মনে করিল সুনীতি তাহাকে ডাকিতেই আসিয়াছেন, সে বইখানার মধ্যে সুদৃশ্য কাগজের লম্বা একটি টুকরা দিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল, বলিল, যাচ্ছি মা আমি। তারপর মৃদু হাসিয়া বলিল, বইখানা বড় ভাল বই, পড়তে ব'সে আর ছাড়তে ইচ্ছে যায় না।

কি বই রে?

পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর লেখা মা, জাতিতে তিনি জার্মান, তাঁর নাম কার্ল মার্কস্। আমরা যাঁদের বলি ঋষি, তিনি তাই। পৃথিবীর এই যে ছোট-বড় ভেদাভেদ, কোটি কোটি লোকের দারিদ্র্য আর মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাস, রাজ্যসম্পদ নিয়ে এই যে হিংস্র পশুর মত মানুষের কাড়াকাড়ি, তিনি তার কারণ নির্ধারণ করেছেন এবং নিবারণের উপায়-পথ নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন।

সুনীতি মুগ্ধবিস্ময়ে ছেলের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। পৃথিবী জুড়িয়া সম্পদ লইয়া কাড়াকাড়ি মানুষে মানুষে হিংসা দ্বেষ, কোটি কোটি মানুষের দারিদ্র্য-নিবারণের উপায়। কয়েক মুহূর্ত পর তিনি অভিভূতের মত বলিলেন, সে-উপায় তবে কেন মানুষ নেয় না, অহী?

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, সে-পথে বাধার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে জমিদার আর ধনীর দল মা—আমরা, ওই বিমলবাবু। আমার এই প্রভুত্ব, এই পাকা বাড়ি, জমিদারী চাল, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তা হ'লে যে থাকবে না মা। সম্পত্তি নিয়ে কাড়াকাড়ি যা করি, আমরাই তো করি, নিরীহ গরীবের সম্পত্তি অর্থ কেড়ে নিয়ে আমরাই তো তাদের গরীব ক'রে দিই। ওই চরটার কথা ভাল ক'রে ভেবে দেখ, তা হ'লেই বুঝতে পারবে। চর উঠল নদীর বুকে, একেবারে নতুন এক টুকরা মাটি—

সুনীতি মধ্য পথেই বাধা দিয়া বলিলেন, আমি ওই চরের কথাই তোকে বলতে এসেছি অহি। চর নিয়ে যে আবার বিরোধ বেধে উঠল বাবা।

অহীন্দ্র হাসিল, স্বল্পায়তন তিক্ত হাসি! বলিল, বিরোধ তো বাধবেই মা। একদিকে জমিদার অন্যদিকে মহাজন। এ বিরোধ যে অবশ্যম্ভাবী।

সুনীতি আর্তভাবে বলিলেন, ওরে, ও-চরে আমাদের কাজ নেই, তুই বল্ তোর শ্বশুরকে, ওটা বিক্রি ক'রে দিন। ওই চর আমার সর্বনাশ করবে রে!

অহীন্দ্র বলিল, ও-কথাটা তোমার স্বীকার করতে পারলাম না। মা, অপরাধ চরের নয়, অপরাধ আমাদের।

তুই জানিস নে অহীন, সে তোরা বুঝতে পারিস নে, সে তোরা দেখতে পাস নে। আমি বুঝতে পারি, দেখতে পাই—সুনীতি বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, যেন সে দৃষ্টির সম্মুখে চরটার রহস্যময় রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া শূন্যলোকে ভাসিতেছে।

মায়ের সে ভয়কাতর বিবর্ণ মুখ দেখিয়া অহীন্দ্র স্নেহার্দ্র স্বরে বলিল, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন মা? কিসের ভয়?

ওরে তুই বল্, চরটা বিক্রি ক'রে দেওয়া হোক।—আর তুই যেন এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে যাস নে বাবা। ওরে, তোদের বংশের রাগকে আমি বড় ভয় করি রে! রাগের বশে মহীন কি সর্বনাশ করলে, বল দেখি?

অহীন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল ননী পালের রক্তাক্ত দেহ। তারপরই সে দেখিল, কাঠগড়ার মধ্যে তাহার দাদাকে, শীর্ণ কিন্তু দৃপ্ত মুখ, অনবনত ঋজু দেহ। একটা উন্মাদনা তাহাকে স্পর্শ করিল। ওই, কুটিলচক্রী কলওয়ালা, যাহাকে

সাঁওতাল-রমণীরা বলিয়াছে পাহাড়ে চিতি, নিষ্ঠুর অজগর, উহার দেহটা যদি সে এমনি ভাবে লুটাইয়া দিত।

সুনীতি কাতরস্বরে ডাকিলেন, অহীন!

অহীন্দ্র মায়ের মুখের দিকে চাহিল। সুনীতি বলিলেন, চল্ তুই একবার চল্, তোর বাপ ও-বাড়ির দাদা বোধ হয় ওই চরের কথাই বলছেন। তুই চল্।

* * * *

রামেশ্বরের ঘরে প্রবেশ করিয়া মাতাপুত্রে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। রামেশ্বরের সে মূর্তি অদ্ভুত! অহীন্দ্র জীবনে কখনও দেখে নাই, সুনীতি বহুপূর্বে দেখিয়াছিলেন; এ-কালে সে মূর্তি আর স্মরণেও আনিতে পারিতেন না। ম্যুজদেহ তিনি সোজা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছেন লোহার খুঁটির মত; শীর্ণ হাতের আঙুলগুলি বাঁকাইয়া তীক্ষ্ণ দৃঢ় বাঘনখের মত ভঙ্গি করিয়া রায়কে তিনি বলিতেছিলেন, মুণ্ডুটা তার ছিঁড়ে আনতে পারা যায় না ইন্দ্র, কিম্বা অমাবস্যার রাত্রে মা-সর্বরক্ষার কাছে বলি—?

রায় বলিলেন, না। সে-কাল আর নেই রামেশ্বর; এখন আমাদের আইনের পথ ধ'রেই চলতে হবে। আইন বাঁচিয়ে দাঙ্গা করতে গেলে পেছুব না। আমাদের খাসের জমি, সেগুলো সাঁওতালদের ভাগে দেওয়া আছে, কালই সেগুলো দখল করতে হবে। সাঁওতালদের রীতিমত শিক্ষা দেব আমি। আর ওই যে বললাম, কালিন্দীর বুকে কলওয়ালা যে বাঁধ দিয়ে পাম্প বসিয়েছে, ওটাকে তুলে দিতে হবে। বাধবে, দাঙ্গা ওইখানে বাধবে বলে বোধ হচ্ছে।

অহীন্দ্র বলিল, মা একটা কথা বলছেন। তিনি চান না যে, চর নিয়ে কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। তাঁর একটা অদ্ভুত সংস্কার রয়েছে যে, চরটা থেকে কেবল আমাদের অমঙ্গলই হচ্ছে! সেইজন্তেই তিনি বলেছেন, চরটাকে বিক্রি ক'রে দেওয়া হোক।

বজ্রগর্ভ স্বরে রামেশ্বর বলিলেন, না।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় দৈহিক দুর্বলতা মানসিক বিহ্বলতা বিলুপ্ত হইয়া রামেশ্বর অকস্মাৎ যেন পূর্ব-রামেশ্বর হইয়া উঠিয়াছেন।

রায় বলিলেন সুনীতিকে লক্ষ্য করিয়া, তোমার কাছে আমি এই কথাটা শুনব প্রত্যাশা করি নি বোন। যাক, তুমি কোন ভয় ক'রো না, যা করবার আমি করব।

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেই অমলের সঙ্গে অহীন্দ্রের দেখা হইল, অমল হাত-পা ধুইয়া তাহায় সন্ধানেই উপরে আসিয়াছিল। তাহার স্বাভাবিক মুখরতা আজ আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, বাপ রে বাপ রে, খুব খাটিয়ে নিলে যা হোক। আমার বিয়েতে আমি এর শোধ নেব, দাঁড়াও না।

অহীন্দ্র একটু হাসিল—অর্থহীন হাসি। অমলের কথাগুলি তাহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিতেই পায় নাই। সে বলিল, চর নিয়ে আবার দাঙ্গা বাধল— কাল সকালে।

অমল বলিল, দাঙ্গা-টাঙ্গা না ক'রে ওই লোকটাকে—ঝাট কলওয়ালাটাকে হুইপ

করা উচিত।

অহীন্দ্র আবার একটু হাসিল। অমল বলিল, বিয়েটা না চুকতেই এখনই দাঙ্গাটাঙ্গাগুলো না করলেই হ'ত। কিন্তু না ক'রেই বা উপায় কি? লোকটা যেন দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে উঠেছে।

অহীন্দ্র হাসিয়া এবার বলিল—

বণিকের মানদণ্ড দেখা 'দিবে,' পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে।

সুতরাং তার গতিরোধের চেষ্টা রাজকুলের স্বাভাবিক।

অমল হাসিয়া বলিল, তুমি যেন নিজেকে রাজকুল থেকে বাদ দিতে চাইছ মনে হচ্ছে। বুদ্ধদেব হয়ে উঠলে যে! ওরে উমা!

হাসিয়া বাধা দিয়া অহীন্দ্র বলিল, ভয় নেই, এ-যুগে গৌতমেরা সংসার ত্যাগ ক'রে নির্বাণের জন্যে বনে যান না। এ-যুগের নির্বাণ নিহিত আছে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে। ঘরে ব'সেই সে তপস্যা চলে; সুতরাং উমা নামধারিণী গোপাকে ডেকে সমাধান করার কোন প্রয়োজন নেই।

৩০

পরদিন প্রভাতেই জমিদার পক্ষ সাজিয়া চরের উপর হাজির হইল, সাঁওতালদের ভাগে বিলি করা জমি দখল করা হইবে।

জমিদার পক্ষকে মোটেই বেগ পাইতে হইল না। লোক জুটিয়া গেল বিস্তর। আদেশ অথবা অনুরোধ করিয়াও লোক ডাকিতে হইল না। আপনা হইতেই গ্রামের সমস্ত চাষী হাল-গরু লইয়া ছুটিয়া আসিল, দলের সর্বাগ্রে আসিল রংলাল। চরের উর্বর মাটির উপর লোভের নিবৃত্তি তাহাদের কোনদিনই হয় নাই। নিরুপায়ে সে কেবল নিরুদ্ধ হইয়া ছিল। সংবাদটা পাইবামাত্র তাহারা পুলকিত হইয়া সাঁওতালদের সযত্নে গড়িয়া তোলা জমিগুলি দখল করিতে উদ্যত হইল। বাগ্দীপাড়ার নবীনের দল এবং রায়দের লাঠিয়ালের দল লাঠি হাতে চক্রবর্তী-বাড়ির ভাগে-বিলি জমির সীমানার মাথায় খুঁটি পুতিয়া দাঁড়াইল। চাষীরা বিপুল উৎসাহে গরুগুলিকে প্রচণ্ড চীৎকারে তাড়না করিয়া জমিগুলির উপর লাঙল চালাইয়া দিল—হেৎ—তা-তা-তা-তা—তা-হেৎ—হেৎ!

সাঁওতালদের পুরুষের দল আপনাদের পাড়ার প্রান্তভাগে বসিয়া উদাস বিষণ্ণ দৃষ্টিতে শক্তিমত্ত দখলকারী জনতার দিকে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। পিছনে মেয়েদের দল শুধু ব্যাকুল হইয়া কাঁদিল। কেহ কেহ গালি পাড়িতেছিল আপনাদের পুরুষদের, কেন মিছামিছি রাঙাবাবুদের সহিত বিবাদ করিলি তোরা? এ তোদের উপযুক্ত হইয়াছে, ঠিক হইয়াছে।

সায়েব ওদিকে জমি কাড়িয়া লইয়াছে, এ-দিকে রাঙাবাবুরা জমি কাড়িয়া লইল, এইবার কি করিবি কর্! মরিতে হইবে, না খাইয়া শুকাইয়া মরিতে হইবে।

এক বৃদ্ধা আক্ষেপ করিয়া বলিল, আমি তখুনি বললাম গো, তুরা চিবাস মোড়লের কাছে লিস না, ধান ধার তুরা লিস না। 'কাই হড়' (পাপী লোক) বেটে উ! হিঁদু সাউয়েরা পুরানো বাঘ বেটে। হাড্ডি তাকাত চিবায়ে খাবে উ। লে ইবার হ'ল তো। আঃ হায় হায় গো!

একজন বলিল, উয়ার কি দোষ হ'ল? উ-কি করবে?

দোষটি কার হ'ল? উ নোকটি যদি সাহেবকে খতগুলান বেচে না দিথো, তবে সায়েব কি ক'রে জমিগুলান লিথো? কি ক'রে জমিদার হথো উ?

একটি তরুণী বলিল, হেঁ! তা' হলে রাঙাবাবুর বিয়েতে যেতে কি ক'রে মানা করত?

চুড়া মাঝির স্ত্রী এবং আর কয়েকজন মাতব্বর মাঝির স্ত্রী অঝোর ঝরে কাঁদিতেছিল, মৃদুস্বরে বিলাপ করিতেছিল, আঃ—আঃ, হায় হায় গো! সব জমিনজেরাত চ'লে গেল গো! এখুন যে পরের দুয়ারে চাকর খাটতে হবে গো! লইলে ভিখ মাগতে হবে গো! গুগা (বোবা) ভিখ্ করে গো! কাঁড়া (অন্ধ) ভিখ্ করে গো! লেঢ়া (খোঁড়া) ভিখ্ করে গো! উয়াদিগে যেমন লোকে থো (থুথু) দেয়, তেমনি ক'রে থো খেতে হবে, হায় হায় গো! হায় হায় গো!

বাগ্দী লাঠিয়ালেরা প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে শূন্যের সহিত লড়াই জুড়িয়া দিল। অকারণে লাঠি ঘুরাইয়া, হাঁক মারিয়া, কুক দিয়া তাহারা যেন তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিল। আসিয়াছিল তাহারা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনায় সতর্ক ধীরতার সহিত সংযত পদক্ষেপে; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে উচ্ছৃঙ্খল উল্লাস আত্মপ্রকাশ করিল বাঁধ-ভাঙা জলের মত। জমির উপরে লাঙলগুলাও এলোমেলো গতিতে যেন ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। চাষীর সব উন্মত্ত উল্লাসে গরুগুলিকে ছুটাইয়া যেন গরু-দৌড়-প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সমগ্র ভূমিখণ্ড-টাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তাহারা দখল সম্পূর্ণ করিল।

রায়-বাড়ি ও চক্রবর্তী-বাড়ির দুই নায়েবও উপস্থিত ছিল। এই মাতনের ছোঁয়া তাহাদিগকেও স্পর্শ করিয়াছিল। তাহারা দৃপ্ত উল্লাসে এইবার হুকুম দিল, কাট এইবার কালিন্দীর বাঁধ। পাইপ-টাইপ সব উথার দেও। উত্তেজনায় খানিকটা হিন্দীও বাহির হইয়া গেল।

লাঠিয়ালের দল গিয়া পড়িল বাঁধের উপর; এইবার তাহারা একটু সতর্ক এবং সংযত হইল। কলের কুলির দল অদূরে জটলা বাঁধিয়া বসিয়া আছে।

আশ্চর্যের কথা, তাহারা কেহ আগাইয়া আসিল না। ইহারা বাঁধ কাটিয়া পাইপ ছাড়াইয়া তছনছ করিয়া দিল, তাহারা দর্শকের মত দাঁড়াইয়া দেখিল মাত্র। জনতা হইতে দূরে একটি গাছতলায় একা দাঁড়াইয়া একটি দীর্ঘাঙ্গী কালো মেয়েও সমস্ত দেখিতেছিল। এ-সবের কোন কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিল না, এ-সমস্তের কোন অর্থই তাহার কাছে নাই।

মুখার্জি সাহেব কাল হইতে সারীকে বাংলোর আউটহাউস হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন; তাঁহার শখ মিটিয়া গিয়াছে। কুলী-ব্যারাকের মধ্যে সে এবার বসতি পাতিয়াছে। সরকার বাবু শূলপাণি রায় বাছিয়া বেশ একখানি ভাল ঘরই তাহাকে দিয়াছে। খুব তেজি পাকা হাঁড়িয়াও তাহাকে খাওয়াইয়াছে। তাহার মাথাটা এখনও কেমন করিতেছে। সে শুধু দেখিতেছিল, অনেক লোক; অনেক লোক, বাবা রে! রাঙাবাবু কই? না, সে নাই। সাহেব কই? লম্বা চোঙার মত বন্দুকটা লইয়া সে তো কই তাক্ করিয়া এখনও দাঁড়ায় নাই। বাবা বে!

* * *

সত্য সত্যই বিমলবাবু এত বড় উত্তেজিত আহ্বানের উত্তরেও একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কোন উদ্যমই তিনি প্রকাশ করিলেন না। তিনি যে প্রস্তুত ছিলেন না, তাহাও নয়। সংবাদ তিনি বেশ সময় থাকিতেই পাইয়াছিলেন। পূর্বদিন রাত্রির প্রথম প্রহরেই সংবাদটা তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

সংবাদ প্রথম আনিয়াছিলেন অচিন্ত্যবাবু। কথাটা কানে উঠিবামাত্র ভদ্রলোক ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রায় মহাশয় ও চক্রবর্তী-বাড়ির লাঠিয়ালরা তো সামান্য জীব নয়, উহারা প্রত্যেকেই ডাকাত। নবীন বাগ্দীর এক লাঠির ঘায়ে সেই মুসলমান লাঠিয়ালের মাথাটি ডিমের মত ফাটিয়া গিয়াছিল; ইহারা সব তাহারই সাকরেদ দোসর। ও-দিকে মিস্টার মুখার্জির হিন্দুস্থানী কুলীর দল সাক্ষাৎ যমদূতের দল। তাহার উপর সাহেবের বন্দুকগুলা একেবারে তৈয়ারী হইয়াই থাকে। কোন রকমে তাগ ফস্কাইয়া যদি একটা বিপথে ছোটে, তবে যে কাহাকে খতম করিবে, সে কে বলিতে পারে? হরেকে তাগ করিয়া শঙ্করাকে মারাই বাঙালীর অভ্যাস। আর বাগ্দী-লাঠিয়ালের দল যদি আপিস চড়াও করে, তবে তো ভীষণ বিপদ! কিন্তু তৎক্ষণাৎ পরদিন ছুটি লইবার সঙ্কল্প করিলেন এবং সেই রাত্রেই নগদ দুই আনা পয়সা দিয়া একজন ডোম রক্ষক লইয়া বিমলবাবুর বাংলোয় হাজির হইলেন।

বিমলবাবু তখন সারীকে বাংলো হইতে তাড়াইয়া দিয়া সবে পঞ্চম পেগ লইয়া বসিয়াছেন। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, কি ব্যাপার? রাত্রে?

একখানা দরখাস্ত আগাইয়া দিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, আজ্ঞে ছুটি সার।

ছুটি? কেন?

আজ্ঞে আমার স্ত্রী—সার—

ক'দিনের জন্যে?

দুদিনের আজ্ঞে, দু দিন সার।

এর জন্যে এই রাত্রে আপনি জ্বালাতে এসেছেন? ননসেন্স! দরখাস্তখানা তিনি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তারপর বলিলেন, আচ্ছা, আসবেন না দু দিন।

অচিন্ত্যবাবু সবিনয়ে বলিলেন, আজ্ঞে, আরও একটা খবর আছে, জমিদারেরা ফৌজদারী করবার জন্যে সাজছে সার।

ফৌজদারী? বিমলবাবু এবার সজাগ হইয়া বসিলেন।

সবিস্তারে সমস্ত বলিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, সেই জন্মেই আমার আরও আসা সার।

বিমলবাবু গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অচিন্ত্যবাবু সরিয়া আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

গভীর চিন্তা করিয়া বিমলবাবু কোন উত্তম প্রকাশ করিলেন না। সকাল হইতেই যোগেশ মজুমদার এবং জমিদারিবিদ্যা-বিশারদ হরিশ রায়কে লইয়া চার-পাঁচটি ফৌজদারী এবং দেওয়ানী মকদ্দমার আরজির খসড়া প্রস্তুত করাইতে বসিলেন।

* * *

ও-দিকে দীর্ঘকাল পরে চক্রবর্তী-বাবুদের কাছারী-বাড়ি গমগম করিয়া জাঁকিয়া উঠিল, চাষী-প্রজার দল ও বাগ্দী লাঠিয়ালেরা কাছারির বারান্দা পরিপূর্ণ করিয়া বসিল। নায়েব-গোমস্তারা ডেমিতে ভাগচাষের কবুলতি লিখিতেছে; ওই সব দখল-করা জমি চাষীদের ভাগচাগে বিলি হইবে। রায় প্রসন্ন তৃপ্ত মুখে বসিয়া আছেন, তাঁহার মনের গ্লানি অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছে। প্রসন্ন মনেই তিনি নূতন কোন দ্বন্দ্বের পরিকল্পনা চিন্তা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে ঘাড় হেঁট করিয়া চিন্তানিবিষ্ট মনে বোধ করি আপনার অজ্ঞাতসারেই মৃদু মৃদু দুলিতেছেন। সহসা একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের উচ্চ ধ্বনি কানে আসিয়া পৌঁছিল, মৃদু হাসিয়া তিনি সজাগ হইয়া উঠিলেন। কণ্ঠস্বরটি অচিন্ত্যবাবুর; কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি পথ দিয়া চলিয়াছেন; স্লো অ্যাণ্ড স্টেডি উইন্‌স্ দি রেস। ঈসপস্ ফেব্‌ল্ পড়েছ? দি হেয়ার অ্যাণ্ড দি টর্‌টয়েজের গল্প? ইংরেজের আইনে, নো লাঠি অ্যাণ্ড নো ফাটি। ব্রেন অ্যাণ্ড মানি এভ্‌রিথিং। পাঁচ-পাঁচখানি ফৌজদারী মকদ্দমা। অল বেস্ট প্লীডার্স এন্‌গেজ্‌ড্। সিরিয়াস চার্জ—রায়টিং, ট্রেসপাস, অ্যাণ্ড অনেক কিছু। এই চলল লোক লরিতে চ'ড়ে।

রায় হাসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, ও অচিন্ত্যবাবু! ও মশায়! তাঁহার কথাকে ঢাকিয়া দিয়াই অচিন্ত্যবাবুর ত্বরিত উত্তর ভাসিয়া আসিল, আই ডোণ্ট নো এনিথিং—আই ডোণ্ট নো।

আরও অনেক কিছু তিনি বলিলেন, কিন্তু ক্রমবর্ধমান দূরত্ব হেতু সেগুলি এত অস্পষ্ট যে, তাহার কিছুই বুঝা গেল না। ইন্দ্র রায় কিন্তু এইটুকুতেই অনেক বুঝিলেন এবং খাড়া হইয়া বসিয়া গোঁফে তা দিতে আরম্ভ করিলেন।

মুহূর্ত চিন্তা করিয়া তিনি পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, মিত্তির!

প্রবীণ মিত্তিরও কথাগুলির কিছু কিছু বুঝিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি কাজ ছাড়িয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রায় বলিলেন, সদরে যাবার পথে গ্রাম পেরিয়ে যে সাঁকোটা আছে—

পাকা নায়েব মুহূর্তে উত্তর দিল, আজ্ঞে, হ্যাঁ। তা হলে আর লরি যেতে পারবে না। আদ্ধেকখানা খসিয়ে দিলেই হবে। সে ব্যবস্থা আমি করছি। আমাদের চাষ-বাড়িতে গাঁইতি আছে, আধ ঘণ্টার কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

রায় বলিলেন, সকলের চেয়ে যে 'পাউড়ে', তাকে পাঠাও সদরে। মুখুজ্জে, সেন আর সিংহীকে ওকালতনামার বায়না পাঠিয়ে দাও। ওদের চেয়ে ফৌজদারী উকিল আর ভাল কেউ

নেই। আমাদের তরফ থেকে মামলা প্রথমে দায়ের হয়ে যাক।

নায়েব লঘু দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল।

রায় ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ঢুলিতে আরম্ভ করিলেন।

বাড়ির ভিতরে বিবাহের গোলযোগ তখনও প্রায় পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। বউভাত মিটিয়া গিয়াছে, আজ বাসি-ভোজ; পরিবেশক, ঠাকুর-চাকর আত্মীয়-বন্ধু-স্বজনবর্গকে ভাল করিয়া খাওয়ানো হইবে। তাহার সঙ্গে এই দাঙ্গার সমস্ত লোকগুলিকেও খাওয়ানোর ব্যবস্থা হইয়াছে। বিবাহের ভাণ্ডারে গ্রামেরই কয়েকজন পাকা দোকানদার ভাণ্ডারীর কাজ করিতেছে। তাহারা লোক হিসাব করিয়া জলখাবার মাপিতে ব্যস্ত। মানদা চীৎকার করিয়া ফিরিতেছে, বাড়ির মধ্যে দাঙ্গার উত্তেজনাটাকে সে একাই বজায় করিয়া রাখিয়াছে। হেমাঙ্গিনী সমস্ত দিনের তদ্বির-তদারক করিতেছেন। সুনীতি সমস্ত সকালটা প্রাণহীন প্রতিমার মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ওই চরটার কথাই তিনি ভাবিতেছিলেন। তিনি কল্পনা করিতে ছিলেন, চরের মাটি রক্তমাখা; দাঙ্গায় নিহত মানুষের হাত-পা দেহ-মাথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। বার বার তাঁহার অন্তরাত্মা তাঁহাকেই প্রশ্ন করিতেছে, এ পাপ কাহার? সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে তাঁহার চোখ আপনি যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

মানদা আসিয়া দর্পিত কণ্ঠে সংবাদ দিল, দাঙ্গায় আমরা জিতেছি মা। ওরা কেউ আসে নাই ভয়ে, ল্যাজ গুটিয়ে ঘরে ঢুকেছে সব।—বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া সে গড়াইয়া পড়িল।

পরম আশ্বাসের একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুনীতি যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলেন, তা হ'লে খুন-জখম কিছু হয়নি, না রে মানদা?

হেমাঙ্গিনী মানদার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি হাসিয়া কহিলেন, না ভাই। তুমি এবার ওঠ দেখি, উঠে ঠাকুর-জামাইয়ের স্নান-টানের ব্যবস্থা কর। উমা হাজার হ'লেও ছেলেমানুষ, তার ওপর জানাশোনাও তো নেই কিছু।

সুনীতি হাসিমুখে উঠিলেন, বলিলেন, আহা দিদি, মানুষের জীবন গেলে তো আর ফেরে না। সারা সকালটা আমার বুকে কে যেন পাষাণ চাপিয়ে দিয়েছিল।

নীচে ইন্দ্র রায়ের গভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কই রে, উমা কোথায় গেলি? তোর শ্বশুর কি করছেন রে?

উমার অপেক্ষা না করিয়াই তিনি উপরে আসিয়া রামেশ্বরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চ হাসির সঙ্গে শোনা গেল, ফৌজদারী মামলা করে কলওলা আমাদের জব্দ করবে!—বলিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হাসি—হা-হা-হা-হা।

সে-হাসির শব্দের সঙ্গে নীচে বাগ্দী লাঠিয়ালদের কলরোল মিশিয়া সমস্ত মহলটা যেন গমগম করিয়া উঠিল। ভাণ্ডারের দুয়ারে তাহারা জলখাবার লইতে আসিয়া গোলমাল করিতেছিল। মানদা রেলিঙের উপর বুক দিয়া ঝুঁকিয়া বলিল, খুব তো চেঁচাচ্ছিস সব! সেই বিভীষণ মজুমদারের একটা ঠ্যাং ভেঙে দিয়ে আসতিস, তবে বুঝতাম। কিংবা

একপাটি দাঁত—

বলিতে বলিতে সে সসম্ভ্রমে সঙ্কুচিত হইয়া চুপ হইয়া গেল।

ভারী গলায় কণ্ঠনালী পরিষ্কার করিয়া লওয়ার উচ্চ গম্ভীর শব্দ জানাইয়া দিল রায় বাহির হইয়া আসিতেছেন। রায় ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিলেন, উমা!

মানদা ত্রস্তপদে গিয়া উমাকে ডাকিয়া দিল। উমা আসিয়া বাপের সম্মুখে দাঁড়াইতেই সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া রায় বলিলেন, খুব যে বউ সেজে গেছিস মা! তোকে একেবারে দেখবারই জো নেই!—বলিয়া উমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি যুগপৎ বিস্মিত এবং শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। উমার মুখ নিশান্তের জ্যোৎস্নার মত সকরুণ পাণ্ডুর। পরমুহূর্তেই মনে পড়িল, কাল রাত্রে ফুলশয্যা গিয়াছে। হাসিয়া বলিলেন, তোর শাশুড়ীকে বল্ মা, রামেশ্বরের স্নান-আহ্নিকের ব্যবস্থা ক'রে দিন। দুর্বল শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তোরাও স্নান-টান ক'রে সব বিশ্রাম কর্।

উমাকে রামেশ্বরের পরিচর্যার জন্য বলিবেন সঙ্কল্প করিয়া ডাকিয়াছিলেন। কিন্তু উমার এমন ক্লান্ত ভঙ্গি দেখিয়া সুনীতিকে ডাকিবার জন্য বলিলেন। গত রাত্রির রামেশ্বর আজ আর নাই, রায়ের উচ্চ হাস্য, উল্লাস তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। রোগ যেন আজ বাড়িয়া গিয়াছে।

রায় সত্য দেখিয়াও ভ্রম করিলেন। উমার মুখ সত্যই সকরুণ পাণ্ডুর, কিন্তু সে ফুলশয্যার রজনীর আনন্দের অবসাদে নয়। গোপন অন্তরে নিরুদ্ধ সুগভীর অভিমান ও দুঃখের দাহে তাহার মুখের লাবণ্যের সজীবতা এমন শুকাইয়া গিয়াছে। জীবনের প্রথম মিলন-বাসরে অহীন্দ্রের মধ্যে সে পরম বাঞ্ছিত জনকে খুঁজিয়া পায় নাই, এমন কি এতদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু—অহীন্দ্রেরও দেখা পায় নাই। স্তব্ধ উদাসীন, এ যেন অস্বাভাবিক অপরিচিত এক অহীন্দ্র! দৃষ্টিপথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াও তাহার দৃষ্টিতে পড়া যায় না। সকাল হইতে এতটা বেলা পর্যন্ত বাহিরের বারান্দায় সে পায়চারি করিতেছে, কত বার তাহার দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিয়াছে, উমার দৃষ্টি সুস্পষ্ট অভিমানের বার্তা জানাইয়াছে, কিন্তু অহীন্দ্রের দৃষ্টি যেন বধির মূক হইয়া গিয়াছে; কোন বার্তা সে-দৃষ্টির গোচরে আসে নাই, কোন উত্তরও দিতে পারে নাই।

মানদা অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, রায় নীচে চলিয়া যাইতেই বলিল, চলুন বৌদিদি, চান করবেন চলুন। মুখ আপনার বড্ড শুকিয়ে গিয়েছে।

শুধু ইন্দ্র রায়ই নয়, হেমাঙ্গিনীও ভুল করিলেন।

ফুলশয্যার দিন-দুই পরেই বর ও কন্যার জোড়ে কন্যার পিত্রালয়ে আসার বিধি আছে, 'অষ্টমঙ্গলা'র যাহা কিছু আচার-পদ্ধতি সবই কন্যার পিত্রালয়েই পালনীয়; সুতরাং অহীন্দ্র ও উমা রায়-বাড়িতে আসিল। হেমাঙ্গিনী ও-বাড়িতে আসা-যাওয়া করিলেও উমাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই, সুযোগ তিনি ইচ্ছা করিয়াই গ্রহণ করেন নাই। হাজার হইলেও তিনি মেয়ের মা। নদীকূলের বাসিন্দার মত, নিন্দারূপ বন্যার ভয় যে মেয়ের মায়ের অহরহ। কঠোরভাবে তিনি কন্যার জননীর কর্তব্য পালন করিয়াছেন, উমার কাছে গিয়া একদিন বসেন নাই পর্যন্ত। মানুষের মনকে বিশ্বাস নাই, কে হয়তো এখনই বলিয়া বসিবে যে, মেয়েকে তিনি কোন গোপন পরামর্শ দিতে আসিয়াছেন।

আপন গৃহে কন্যাকে পাইয়া কন্যার মুখ দেখিয়া তিনি প্রথমটায় শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই হাসিলেন, স্বামীর কথাটা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। রায় সেদিন বাড়ি আসিয়াই হেমাঙ্গিনীকে কথাটা বলিয়াছিলেন। হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, ওদের তো আমাদের মত অজানা-অচেনাও নয়, পনেরো বছরের বর, দশ বছরের কনেও নয়।

রায় হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তা বটে।

হেমাঙ্গিনী মৃদু হাসিয়া, উমার কপালে খসিয়া-পড়া চুলগুলিকে আঙুলের ডগা দিয়া তুলিয়া দিলেন, বলিলেন, স্নান ক'রে খেয়ে-দেয়ে বেশ ভাল ক'রে একটু ঘুমো দেখি।

উমা নিতান্ত ছোট মেয়ে নয়, সে মায়ের মৃদু হাসি ও কথাগুলির অর্থ দুইই বেশ বুঝিতে পারিল। দুঃখে অভিমানে তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল কিন্তু প্রাণপণে আপনাকে সংহত করিয়া সে-আবেগ সে রোধ করিল। মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে সে উঠিয়া গেল। মা মনে করিলেন, কন্যার লজ্জা। তিনি আরও একটু হাসিয়া অহীন্দ্রকে জলখাবার দিতে উঠিলেন। বিবাহ উপলক্ষে সমাগতা তরুণী কুটুম্বিনীর দল উমার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গিয়াছিল, উমার আজ তাহাদের মধ্যেই থাকিবার কথা। ভাঁড়ারের দিকে চলিতে চলিতে হেমাঙ্গিনী আবার হাসিলেন।

অমল বাড়ি নাই, ইন্দ্র রায় তাহাকে সদরে পাঠাইয়াছেন। ওই চরের ব্যাপার লইয়াই সে খোদ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট এক দরবার করিতে গিয়াছে। চক্রবর্তী-বাড়ির প্রতিনিধি হইয়াই সে গিয়াছে। কলওয়ালার অত্যাচারে চরের প্রজা উৎখাত হইয়া যাইতেছে, জোর-পূর্বক নদীতে বাঁধ দিয়া পাম্প করিয়া জল তোলায় জলাভাবে চাষ নষ্ট হইয়া যাইতেছে; এমন কি গরীবদের গার্হস্থ্যজীবন পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়া গেল। যাওয়া উচিত ছিল অহীন্দ্রের। কিন্তু বিবাহের আচার-আচরণগুলির জন্য তাহার যাওয়া চলে না বলিয়াই অমল গিয়াছে চক্রবর্তী-বাড়ির প্রতিনিধিরূপে। শ্বশুর-জামাই দুইজনে উপরের ঘরে বসিয়া আলোচনা করিতেছে; আলোচনা অবশ্য একতরফা। রায় একাই কথা বলিতেছিলেন। অহীন্দ্রকে সমস্ত কথা ভাল

করিয়া বুঝাইতেছিলেন।

অহীন্দ্র নীরবে বসিয়া শুনিতেছিল। হেমাঙ্গিনী জলখাবার আনিয়া রায়কে বলিলেন, না, বাপু, তুমি কি অদ্ভুত মানুষ, জমিদারি, মকদ্দমা, দাঙ্গাহাঙ্গামা এই ছাড়া কি আর কথা নাই তোমাদের? অমলকে তো পাঠিয়ে দিলে সদরে, এইবার অহীনকে পার তো হাইকোর্টে পাঠাও।

রায় হাসিয়া বলিলেন, জান, আকবর-শা বাদশা বারো বছর বয়সে হিন্দুস্থানের বাদশা হয়েছিলেন। জমিদারের ছেলে জমিদারির কাজ না শিখলে হবে কেন? জেলার হাকিমদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখতে হবে, বিষয়-সম্পত্তির কোথায় কি আছে জানতে হবে; তবে তো! আর মোটামুটি আইন-কানুন—এগুলোও জেনে রাখতে হবে। আর দাঙ্গা-হাঙ্গমা—এগুলোও একটু-আধটু শিখতে হবে বৈকি। জান তো, 'মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের'? একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া রায় আবার বলিলেন, দাঙ্গাই বল, আর হাঙ্গামাই বল, আসলে হ'ল যুদ্ধ! রাজায় রাজায় হ'লেই হয় যুদ্ধ, আর জমিদারে জমিদারে হ'লেই হয় দাঙ্গা। আসলে হলাম আমরা রাজা। ছোট অবশ্য—গরুড় আর চামচিকে যেমন আর কি!—বলিয়া তিনি হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তারপর উঠিয়া বলিলেন, তা হ'লে তুমি ব'স বাবা। আমি একবার দেখি, সেরেস্তায় কাজ অনেক বাকি প'ড়ে আছে। অমল এই বেলাতেই এসে পড়বে।

অমল ফিরিল অপরাহ্ণে—অপরাহ্ণের প্রায় শেষভাগে। অহীন্দ্র তখন বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। স্বভাবধর্ম অনুযায়ী অমল শোরগোল তুলিয়া ফেলিল। সে উমাকে এক নূতন নামে চীৎকার করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল, উম্‌নী! উম্‌নী! এই উম্‌নী!

হেমাঙ্গিনী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ও কি? উম্‌নী আবার কি?

হাসিয়া অমল বলিল, উমার নূতন নাম বের করেছি আমি।

দাদার সাড়া পাইয়া উমা ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে হাসিমুখে আসিয়া অমলের কাছে দাঁড়াইল, অমল বলিল, তোর নূতন নাম দিয়েছি উম্‌নী; পছন্দ কি না, বল্? সে আপনার স্যুটকেসটি খুলিতে বসিল।

উমা কোন জবাব দিল না, হাসিতেছিল, হাসিতেই থাকিল। অমলকে পাইয়া তাহার মন যেন অনেকটা হাল্‌কা হইয়া উঠিয়াছে।

অমল স্যুটকেসের তালায় চাবিটা পরাইয়া বলিল, বল্ বল্, শিগগির বল্—yes or no?

উমা এবার বলিল, খারাপ নাম আবার কেউ পছন্দ করে নাকি?

ও সব আমি বুঝি না। Say, yes or no।

ঘাড় নাড়িয়া উমা বলিল, No।

No! আচ্ছা, তবে থাকল, পেলি না তুই। অমল স্যুটকেস হইতে হাত সরাইয়া লইল।

উমা উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল, কি?

সে জেনে তোর দরকার কি ?

অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উমা এবার বলিল, না না না, তবে no নয়, no নয়। Yes —yes।

অমল স্যুটকেস খুলিয়া বাহির করিল—সাঁওতাল-তাঁতীর বোনা মোটা সুতার একখানি সাঁওতালী কাপড়। সাদা ধবধবে দুধের মত জমি, প্রান্তে লাল কস্তার চওড়া সাঁওতালী মই-পাড় শাড়ি। দেখিয়া উমার চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অমল শাড়িখানি উমার হাতে দিয়া বলিল, Queen of the Santhalas—মহামহিমান্বিতা উম্‌নী ঠেকরুন। যা, প'রে আয়, এক্ষুণি প'রে আয়, দেখি কেমন মানায়। যা।

উমা গেল, কিন্তু উৎসাহিত চঞ্চল গমনে নয়; মন্থর গতিতেই চলিয়া গেল।

অমল হাসিয়া বলিল, তিন দিনে দেখছি, উম্‌নীর তেত্রিশ বছর বয়স বেড়ে গেছে। মেয়েটার লজ্জা এসে গেছে।

হেমাঙ্গিনী একটু ধমক দিয়া বলিলেন, তোব জ্ঞানবুদ্ধি কোন কালে হবে না অমল। নে, মুখ-হাত ধুয়ে নে। অহীন বেড়াতে গেছে, তুই বরং একটু বেড়িয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে আয়।

উত্তম কথা। উম্‌নী ঠেক্‌রুনকেও তা হ'লে সঙ্গে নিয়ে যাব। বলিয়াই সে হাঁকিতে আরম্ভ করিল, উম্‌নী! উম্‌নী!

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, না। গাঁয়ে শ্বশুর-বাড়ি; ও সব তোমার খেয়াল-খুশী মত হবে না। শ্বশুর-বাড়ির কথা ছেড়ে দিয়েও তোমার বাপই শুনলে বাগ করবেন।

উমা সাঁওতালী শাড়ি পবিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। অদ্ভুত রকম দেখইাতেছিল উমাকে। হেমাঙ্গিনী দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, যা যা, ছেড়ে ফেল্ গে। অমল বলিল, না না না, এক কাজ কর্ উম্‌নী, সাঁওতালদের মত চুলটা বাঁধ্ দেখি, কতকগুলো গাঁদাফুল পর্ খোঁপায়। একটা ফোটো তুলে নিই তা হ'লে।

ফোটোর নামে উমা আবার একটু দীপ্ত হইয়া উঠিল।

* * *

অমল আসিয়া উপস্থিত হইল কালিন্দীর ঘাটে। সে ঠিক জানে অহীন্দ্রকে কোথায় পাওয়া যাইবে। ঘাটের পাশে অল্প একটু দূরে একটা ভাঙনের মাথায় ঘাসের উপর অহীন্দ্র বসিয়া ছিল। ভাঙনটার ঠিক সম্মুখে ও-পারে চরের উপর সাঁওতাল-পল্লীটি দেখা যাইতেছে। পল্লীটি স্তব্ধ। চরের ও-পাশে কারখানার হিন্দুস্থানী শ্রমিক-পল্লীতে একটা ঢোল বাজিতেছে। পচুই মদের দোকান হইতে ভাসিয়া আসিতেছে উচ্ছৃঙ্খল কলরব। অহীন্দ্র স্থাণুর মত বসিয়া ও-পারের দিকে চাহিয়া ছিল। অমল পা টিপিয়া আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইল। কিন্তু তাহাতেও অহীন্দ্রের একাগ্রতা ক্ষুণ্ণ হইল না। অমল বিস্মিত হইয়া সশব্দে অগ্রসর হইয়া অহীন্দ্রের পাশে বসিয়া কহিল, ব্যাপার কি বল তো? ধ্যান করছ নাকি?

এ আকস্মিকতায় অহীন্দ্র কিন্তু চমকিয়া উঠিল না, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তিভরেই সে

অমলের আপাদমস্তক দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, তারপর মৃদু হাসিয়া বলিল, তুমি!

হাসিয়া অমল বলিল, হ্যাঁ, আমি। কিন্তু তোমার যে দেখি, ধ্যানী বুদ্ধের মত অবস্থা।

অহীন্দ্রও একটু হাসিল, তারপর বলিল, ভাবছি ওই চরটার কথা।

ওই চরটাই তোমাকে খেলে দেখছি। ও-সব ভাবনা ছাড়, ওর ব্যবস্থা আমি ক'রে এসেছি। কালেক্টার খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনলেন। ইমিডিয়েটলি এর ব্যবস্থা তিনি করবেন; আর্জেন্ট নোট দিয়ে তিনি আমার সামনে এস. ডি. ও-কে এন্‌কোয়ারির ভার দিলেন। সাঁওতালদের জমি সম্বন্ধে একটা স্পেশাল আইন আছে। তাতে ওদের জমি বিক্রি হয় না। সে আইন এখানে চালানো যায় কি না দেখবেন।

কথা বলিতে বলিতে অমল অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল কলওয়ালা বিমলবাবুর উপর। বলিল, স্কাউণ্ড্রেলটার সমস্ত কথা আমি বলেছি কালেক্টারকে। দ্যাট পুয়োর ইনোসেণ্ট গার্ল—ওই সারী ব'লে মেয়েটার কথা সুদ্ধ বলেছি আমি কালেক্টারকে।

অহীন্দ্রের মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি দেখিয়া অমল আহত ও বিরক্ত না হইয়া পারিল না, বলিল, হাসছ যে তুমি?

হাসছি, ওই লোকটার ওপর তোমার রাগ দেখে।

কেন, রাগের অপরাধটা কি?

অপরাধ নয়, অবিবেচনা। মানে, ও-লোকটা আর নতুন অন্যায় কি করেছে বল? চিরকাল পৃথিবীতে বুদ্ধিমান শক্তিশালীরা দুর্বল নির্বোধের ওপর যে আচরণ ক'রে এসেছে, তার বেশী কিছু করে নি ও বেচারী। সম্রাট বাদশা রাজা দিগ্বিজয়ী থেকে আরম্ভ ক'রে রায়হাটের জমিদার-বংশের পূর্বপুরুষেরা পর্যন্ত সকলেই এই একই আচরণ ক'রে এসেছেন; আপন আপন সাধ্য এবং সামর্থ্য অনুযায়ী। তুমি আমিও সুযোগ পেলে এবং সামর্থ্য থাকলে তাই করতাম; হয়তো ভবিষ্যতে করবও।

অমল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল, শুধু বিস্ময়েই নয়, অন্তরে অন্তরে সে একটা তীব্র জ্বালাও অনুভব করিল। সে ঈষৎ উষ্মাভরেই প্রশ্ন করিল, হোয়াট ডু ইউ মীন?

হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, বিশ্বচরাচরে আদিকাল থেকে যা ঘটে, ওই চরেও ঠিক তাই ঘটল বন্ধু। সাঁওতালগুলো ওই ভাবে বঞ্চিত হ'তেই বাধ্য, ওই মেয়েটার ওই দুর্দশাই স্বাভাবিক। চরটা এবং তোমার মধ্যেকার টাইম অ্যাণ্ড স্পেসের ডাইমেনশন বাড়িয়ে নাও না, দেখবে চরটা বেমালুম পৃথিবীর সঙ্গে মিশে গেছে, পার্থক্য নেই।

অমল এবার স্তব্ধ হইয়া গেল। অহীন্দ্রের কথা এবং তাহার কণ্ঠস্বরের সকরুণ আন্তরিকতা তাহাকে প্রতিবেশীর শোকের মত স্পর্শ করিল, আচ্ছন্ন করিল। অর্ধস্ফুট হাসিটুকু অহীন্দ্রের মুখে লাগিয়াই রহিল, সেই অবস্থাতেই সে গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পর অমল জোর করিয়া চিন্তাটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল, হ্যাং ইয়োর বিশ্বপ্রেম। ওঠ এখন, সন্ধ্যে হয়ে গেল।

অন্যমনস্কভাবে অহীন্দ্র বলিল, অ্যাঁ?

ওঠ ওঠ, সন্ধ্যে হয়ে গেল। যত সব উদ্ভট চিন্তা! চল, এখন বাড়ি চল। আচ্ছন্ন স্বপ্নাতুরের মতই অহীন্দ্র উঠিল এবং অমলের সঙ্গে রায়-বাড়ির পথ ধরিল। চলিতে চলিতে অমল বলিল, দিস ইজ ব্যাড, অহীন।

অহীন্দ্র কোন উত্তর দিল না।

অমল তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, ভো-ভো চিন্তাকুল মনুষ্য!

অ্যাঁ!

আরে রাম রাম, তুমি যে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাবে।

অহীন্দ্র এ কথারও কোন জবাব দিল না। তাহার কানে কোন কথাই যেন প্রবেশ করিতেছে না, শব্দ কর্ণপটহে আঘাত করিলেও অর্থ মন পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিতেছে না। তাহার মনের অবস্থা ঠিক যেন ভাটার সমুদ্রের মত; তাহার পরিচিত পৃথিবীর সুন্দর শ্যামল তটভূমি ক্রমশ যেন মিলাইয়া একাকার হইয়া যাইতেছে—দূর হইতে দূরান্তরের অস্পষ্টতার অপরিচয়ের মধ্যে। অথচ কোন্ গোপন অতল-পথে কেমন করিয়া যে জীবনের সকল ঊর্ধ্বমুখী জলোচ্ছ্বাস নিম্নমুখে নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে, সে-রহস্য তাহার অজ্ঞাত।

উমা তখন উত্তেজিত হইয়া একটা ড্রেসিং টেবিলের কোণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বেশ-ভূষা-প্রসাধন লইয়া প্রচণ্ড একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে ইহারই মধ্যে। সে কোনমতেই বেশভূষার পরিবর্তন করিবে না, যেমন আছে তেমনি থাকিবে। হেমাঙ্গিনী মেয়ের উপর ভীষণ চটিয়া গিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন, বলিয়াছেন, 'ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম না ছাড়েন আপন জাত', তোর দোষ কি বল্, তোদের বংশের ধারাই এই!

উমা কোন উত্তর করে নাই, কিন্তু তাহার কালো বড় চোখ দুইটি হইয়া উঠিয়াছিল বিদ্যুতালোকিত মেঘের মত। হেমাঙ্গিনী সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ভাজ—উমার মামীমা তাঁহাকে শান্ত করিয়া মৃদুস্বরে বলিয়াছেন, ঠাকুরঝি, ও-সব হচ্ছে আজকালের ফ্যাশান। তুমি রাগ করছ কেন? আমাদের চোখে খারাপ লাগলে কি হবে, ওদের চোখে এ-সব খুব ভাল লাগে।

উমা তখন হইতেই ড্রেসিং-টেবিলের কোণ ধরিয়া তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। সেই সাঁওতালদের মত সিঁথি বিলুপ্ত করিয়া চুল বাঁধা, খোঁপায় গাঁদাফুলের মালা, পরনে মোটা সুতার সাঁওতালী শাড়ি; এক নজরে উমাকে চিনিবার পর্যন্ত উপায় নাই। অকস্মাৎ উমা চকিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল, আয়নার মধ্যে ছায়া পড়িল অহীন্দ্র ও অমলের। অহীন্দ্র ও অমল ঘরে প্রবেশ করিতেই উমা বিব্রত হইয়া পড়িল, সাঁওতালী শাড়িটা অবগুণ্ঠন দিবার মত পর্যাপ্ত দীর্ঘ নয়। অমল হাসিয়া বলিল, লেট মি ইন্ট্রোডিউস, উম্নী ঠেকুরুণ অ্যাণ্ড রাঙাবাবু।

উমা দ্রুতপদে পাশ কাটাইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু অমল বলিল, ধ'স পোড়ারমুখী ধ'স। একেবারে যেন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির কনাঁয়ে!

অন্যমনস্ক অহীন্দ্র পর্যন্ত এই অভিনব সজ্জায় সজ্জিতা উমাকে দেখিয়া সমস্ত ভুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার চোখে প্রদীপ্ত মুগ্ধ দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। উজ্জ্বল মুগ্ধ হাসি হাসিয়া সে আবার বলিল, ব'স না উমা। ও, তুমি বুঝি ঘোমটা দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ? কিন্তু সাঁওতালরা তো কাপড়ের আঁচলে ঘোমটা দেয় না। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

আলনা হইতে উমার লাল ডুরে গামছাখানা টানিয়া লইয়া অহীন্দ্র বলিল, ওরা গামছায় ঘোমটা দেয় এমনি ক'রে। অগ্রসর হইয়া গামছা দিয়া সে উমার মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল।

অমল হাসিয়া বলিল, দাঁড়াও দাঁড়াও, চায়ের ব্যবস্থা করি। তারপর উমীকে আজ সাঁওতালের মেয়ের মত নাচতে হবে।—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

উমা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, অহীন্দ্র অকস্মাৎ অনুভব করিল উমা কাঁদিতেছে। সে সবিস্ময়ে চিবুক ধরিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া দেখিল অনর্গল ধারায় উমার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। অহীন্দ্র তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকে চাপিয়া ধরিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, তুমি কাঁদছ? কি হয়েছে উমা?

উমা জোর করিয়া চিবুক হইতে অহীন্দ্রের হাত সরাইয়া দিয়া তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। অহীন্দ্র সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, কি হয়েছে, বলবে না আমাকে? এইবার তাহার মনে হইল, সে উমাকে অবহেলা করিয়াছে। অনুতাপের উত্তাপে তাহার আবেগ গাঢ়তর হইয়া উঠিল।

উমা তাহার বুকের মধ্যেই সবেগে মাথা নাড়িল। অহীন্দ্র দুই হাতে তাহার মুখখানি আবার তুলিয়া ধরিল। উমা চোখ বন্ধ করিল, অকস্মাৎ অহীন্দ্র চুমায় চুমায় তাহার মুখখানি ভরিয়া দিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

আকাশে যেন পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, জীবনের রিক্ত বালুময় বেলাভূমি জলোচ্ছ্বাসের উল্লাসে আবৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা চিরপরিচিত তটভূমির বুকের কাছে অসীম আগ্রহে আবার আগাইয়া আসিতেছে।

* * *

পরদিন তখনও অন্ধকারের ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নাই। উমা এবং অহীন্দ্র উভয়েই সবিস্ময়ে দেখিল, কালো কালো ছায়ার মত সারিবদ্ধ কাহারা সম্মুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। সমস্ত রাত্রির মধ্যে উমা ও অহীন্দ্র ঘুমায় নাই। অহীন্দ্র উমাকে বলিয়াছে তাহার অন্তরের সকল চিন্তা সকল বেদনার কথা। উমা নিতান্ত অজ্ঞ পল্লীকন্যা নয়, সে শহরে বড় হইয়াছে, স্কুলে পড়িয়াছে। অহীন্দ্রের কথার প্রতিটি শব্দ না বুঝিলেও, আভাসে সে বুঝিয়াছে অনেক। তাহার তরুণ চিত্ত অহীন্দ্রের গৌরবে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

অহীন্দ্র ওই কালো ছায়ার সারি দেখিয়া সবিস্ময়ে উমাকে প্রশ্ন করিল, কারা বল দেখি?

উমা শঙ্কিত হইয়া বলিল, ডাকাত নয় তো?

অহীন্দ্র উঠিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। পুরুষ-নারী-শিশু, গরু-মহিষ-ছাগল সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে। পুরুষদের কাঁধে ভার, মেয়েদের

মাথায় বোঝা, গরু-মহিষের পিঠে ছালার বোঝাই জিনিসপত্র ; নীরবে তাহারা পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। কয়খানা গরুর গাড়িও আসিতেছে ধীর মন্থর গতিতে সকলের পিছনে। বোঝাগুলার মধ্যে নিশ্চয় কোথাও মুরগীর পাল আছে, আসন্ন নিশাবসানের আভাসে তাহাদের একটা চীৎকার করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা, তাহার পর আরও কয়েকটা।

উমাও অহীন্দ্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে অহীন্দ্রকে বলিল, সাঁওতাল ?

তাই মনে হচ্ছে। পরক্ষণেই সে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, কে ? কারা যাচ্ছ তোমরা ?

মেয়েদের কণ্ঠে মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিল, তাহার মধ্যে অহীন্দ্র ও উমা বুঝিল একটা শব্দ, রাঙাবাবু।

কে একজন পুরুষ উত্তর দিল, আমরা গো—মাঝিরা।

মাঝিরা ! কোথায় যাচ্ছিস সব ?

ইখান থেকে আমরা উঠে যাচ্ছি গো—হু-ই মৌরক্ষীর ধারে লতুন চরাতে !

উঠে যাচ্ছিস তোরা ? চ'লে যাচ্ছিস এখান থেকে ? এবারে ব্যথিত বিস্মিত কণ্ঠে উমা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল।

হেঁ গো। অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিকভাবে কথাটার উত্তর দিল, অন্য কথা শুনিবার বা উত্তর দিবার জন্য মুহূর্তের অপেক্ষাও করিল না।

সবাই চ'লে যাচ্ছিস তোরা ?—সকরুণ মমতায় উমা নিতান্ত শিশুর মতই অর্থহীন প্রশ্ন করিতেছিল। অহীন্দ্র নীরব, তাহার চোখে গভীর একাগ্র নিষ্পলক দৃষ্টি, মুখে ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ স্বল্পপরিসর হাসি। আবার জীবনের সকল উচ্ছ্বাস স্তিমিত হইয়া ভাটায় নামিয়া চলিয়াছে।

উমার প্রশ্নের উত্তরে একজন জবাব দিল, উই বজ্জাত চূড়া মাঝিটো আর ক-ঘর থাকলো গো। উয়ারা সায়েবের সঙ্গে সাঁট করলে, উয়ার কলে খাটবে।—বলিতে বলিতে দলটি অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। মানুষের ও পশুর পায়ে, গাড়ির চাকায় পথের ধূলা উড়িয়া শূন্যলোক আচ্ছন্ন করিয়া দিল। রহস্যময় প্রত্যুষালোকের মধ্যে ধূলার আবরণখানি যবনিকার মত কালো মানুষগুলির পিছনে প্রসারিত হইয়া ক্রমে তাহাদিগকে বিলুপ্ত করিয়া দিল।

ধীরে ধীরে আঁধার কাটিয়া আসিতেছিল। চরের উপর বয়লারের সিটি বাজিয়া উঠিল। প্রভাতের আলোকে লাল সুরকির পথ, সুদীর্ঘ চিমনি, নূতন মিল হাউস, কুলি-ব্যারাকের বাড়িঘর লইয়া চরখানা একটি নগরের মত ঝলমল করিতেছে।

৩২

ইহার পর বিরাট একটি মামলা-পর্ব।

সাঁওতালদের জমি এবং নদীর বাঁধ উপলক্ষ করিয়া কলওয়ালার সহিত ইন্দ্র রায় ও চক্রবর্তী-বাড়ির ছোট-বড় ফৌজদারী দেওয়ানী মামলা একটির পর একটি বাধিয়া চলিতে

আরম্ভ করিল।

সদর হইতে এস. ডি. ও. আসিয়া তদন্ত করিয়া গেলেন। অমলের আনীত অভিযোগ তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, সাঁওতালেরা ভূমিহীন হইয়া অধিকাংশই এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে, যাহারা আছে তাহাদেরও জমিজমা নাই। কিন্তু ইহার মধ্যেও তিনি বে-আইনী কিছু দেখিলেন না। বিমলবাবু ঋণের দায়ে জমিগুলি খরিদ করিয়াছেন, সাঁওতালরাও স্বেচ্ছায় বিক্রয় করিয়াছে। চূড়া মাঝি ও তাহার অনুগত মাঝি কয়জন—যাহারা এখানে থাকিয়া গিয়াছে, তাহারাই সে কথা স্বীকার করিল। সারী-সম্পর্কিত অভিযোগের তদন্ত করিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, সে কথা সত্যের খাতিরেও পুরাপুরি লেখা চলে না।—'বর্বর জীবনের সঙ্গে লোভ এবং নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খলতার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ; এক একটা জীবনে তাহা অত্যুগ্র হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাই হইয়াছে। বর্বর, লোভপরবশ, উচ্ছৃঙ্খল মেয়েটির এই পরিণতি ভয়াবহরূপে দুঃখজনক হইলেও ইহা স্বাভাবিক। তাহার বর্তমান অবস্থা হইতে তাহা প্রত্যক্ষ, কিন্তু সে অবস্থার কথা লেখা চলে না।'

'মোটামুটি অভিযোগের বিষয়গুলি বাহ্যত প্রত্যক্ষ হইলেও অন্তর্নিহিত সত্য ইহার মধ্যে কিছুই নাই ; ইহার অন্তর্নিহিত সত্য হইতেছে জমিদারের সহিত কলের মালিকের প্রতিপত্তি লইয়া বিরোধ। কলের মালিক এখানে কল স্থাপন করিয়া সমগ্র অঞ্চলের একটি বিশেষ উপকার করিয়াছেন। দীনদরিদ্রের মজুরির সুবিধা হইয়াছে, আখের চাষের উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে ; চারিদিকের পথঘাটের উন্নতি হইয়াছে, এবং এ-কথাও সত্য যে, জমিদারের প্রাপ্য ন্যায্য খাজনা বন্ধ করিয়া কলের মালিক আইন বাঁচাইয়াও যথেষ্ট অন্যায় করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, কোন স্থানের প্রজারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ধর্মঘট করিলে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিত, এ-ক্ষেত্রে একক তিনি কৌশলে সেই বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছেন।'

কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইল না।

উভয় পক্ষই একটির পর একটি নূতন বিবাদ বাধাইয়া চলিলেন। ইন্দ্র রায়ের স্বাভাবিক জীবন আর একরকম হইয়া উঠিল, তাঁহার গোঁফজোড়াটা পাক খাইয়া খাইয়া ভোজালির মত বাঁকা এবং তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া উঠিয়াছে। জমিদারী কাগজপত্র ও ফৌজদারী দেওয়ানী আইনের বইয়ের মধ্যে তিনি ডুবিয়া আছেন। অন্দরমহল পর্যন্ত এ উত্তেজনা সঞ্চারিত হইয়া পড়িয়াছে। নিত্য প্রভাতে আজ আবার নূতন কি ঘটিবে, তাহারই আশঙ্কায় চিন্তায় সকলে কল্পনা-মুখর মস্তিষ্কে শয্যাগত করিয়া থাকেন।

অহীন্দ্র অমল কলিকাতায়। অমল ভালভাবেই আই. এ. পাস করিয়া বি. এ. পড়িতেছে ; অহীন্দ্র পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সে নাকি খাড়া সোজা হইয়া বিদ্যা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়াছে। অমল ইহার মধ্যে বারদুয়েক বাড়ি আসিল, কিন্তু অহীন্দ্র আসিল না।

হেমাঙ্গিনী অভিযোগ করিয়া বলিলেন, তাকে ধ'রে নিয়ে এলি নে কেন তুই ?

অমল ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল, সে হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন—হীরের টুকরো ; আমরা হলাম কয়লার কুচো। সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হ'লেও তার স্থান হ'ল সোনার গহনায়, আর আমাদের স্থান

চুলোয়। তার নাগাল আমি পাব কেমন ক'রে, বল ?

হেমাঙ্গিনী একটু আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। একটু নীরব থাকিয়া অমল আবার বলিল, জান মা, অহীন আজকাল আমার সঙ্গে ভাল ক'রে মেশেই না। তার এখন সব নূতন সঙ্গী জুটেছে, অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে অহীনের।

হেমাঙ্গিনী দুঃখ অনুভব করিলেন, বলিলেন, অহীনের হয়তো দোষ আছে অমল, কিন্তু দোষ তোমারও আছে। ভগ্নিপতির সঙ্গে তোমাদের গুষ্টিরই কোনকালে বনে না। ভগ্নিপতির কাছে মাথা নীচু করতে তোমাদের যেন মাথা কাটা যায়।

অমলও একটু আহত হইল, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিল, মায়েরা দেখছি ছেলের চেয়ে জামাইকে ভালবাসে বেশী। বাসো তাতে হিংসে আমি করছি না। কারণ আমারও তো বিয়ে হবে। কিন্তু আমার ওপর তুমি অবিচার করছ, অহীনের কাছে মাথা নীচু করতে আমার লজ্জা নেই। মাথা নীচু করলেও সে আমাকে দেখতে পায় না। দুঃখ হয় আমার সেইখানে।

হেমাঙ্গিনী চুপ করিয়া রহিলেন। এমন কথার পর অমলকে তিনি দোষ দিতে পারিলেন না।

অমল আবার বলিল, অহীনের একটা ঘোর পরিবর্তন হয়ে গেছে। সঠিক কিছু বুঝতে পারি না, কিন্তু সে অহীন আর নেই। কেমন একটা মিষ্টি মিষ্টি ভাব ছিল অহীনের ; এখন সেটা যেন একেবারেই মুছে গিয়েছে। এখন তার সব তাতেই বাঁকা ধারালো ঠাট্টা, আর এমন একটা অদ্ভুত হাসি হাসে!

হেমাঙ্গিনী বিস্মিত হইলেন, একটু চিন্তিতও হইলেন।

ঠিক সেই সময়েই হেমাঙ্গিনীর ডাক পড়িল ; রায় মহাশয় নিজে ডাকিতেছিলেন।—একবার তোমার বেয়ানের কাছে যাও দেখি : ব'লে এস, পুরনো দলিলগুলো একবার দেখা দরকার। মানে, আমাদের রায়-বাড়ির মূল বণ্টননামায় চক্ আফজলপুরের কি চৌহদ্দি—

এত সব কথা তোমার আমিও বুঝি নে, সুনীতিও বুঝবে না। কি বলছ তাই বল। তোমাদের মামলা-মকদ্দমার হাঙ্গামায় আমাদের আহারনিদ্রা সুদ্ধ ঘুচে গেছে।

দলিলের বাক্সগুলো একবার দেখতে হবে। সেগুলো পাঠিয়ে—না থাক, বলে এস, আমিই যাব সন্ধ্যেবেলায়, সব দেখব। রামেশ্বরের ঘরেই যেন বাক্সগুলো বের করিয়ে রাখেন। হ্যাঁ, আরও ব'লো মঙ্গলবারে মা-সর্বরক্ষের পুজো হবে। কালিন্দীর বাঁধের মকদ্দমায় আমাদের একরকম জিতই হয়েছে। বাঁধ দিতে হ'লে বছর বছর একটা ক'রে খাজনা দিতে হবে কল-ওয়ালাকে ; তার অর্ধেক পাবে চক্রবর্তীরা—ওপারের চরের মালিক হিসাবে, আর অর্ধেক রায়হাটের মালিকেরা পাবে। বর্ষা পড়লেই বাঁধ কেটে দিতে হবে।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, যাব ; এখনই অমল এল, তাকে জল খাইয়ে তারপর যাব। ছেলে বাড়ি এল, তার খোঁজ করা নেই, মামলা নিয়েই মেতে আছ! ধন্য মানুষ তুমি!

রায় বলিলেন, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে অমলের। তিনি হাসলেন, সে হাসিটুকু

একান্তভাবে দোষক্ষালনের জন্য অপ্রতিভের হাসি। তারপর তিনি বলিলেন, কই অমল কই? একখানা আইনের বইয়ের জন্যে লিখেছিলাম—অমল! অমল!—বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন, পদক্ষেপে সিঁড়িটা যেন কাঁপিতেছিল।

হেমাঙ্গিনী সুনীতির কাছে আসিয়া উমার সহিত নির্জনে দেখা করিলেন। অমলের কথা শুনিয়া অবধি উমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

উমা একটু বিস্মিত হইল—এমন নির্জনে মা কি বলিবেন? হেমাঙ্গিনী বলিলেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব উমা। সত্যি বলবি তো? আমার কাছে লুকোবি নি তো?

কি মা?

হ্যাঁরে, অহীন তোকে চিঠিপত্র লেখে তো?

লজ্জিত হইয়া উমা সবিস্ময়ে বলিল, লেখেন বৈকি মা।

বেশ ভাল ক'রে লেখে তো?

উমা হাসিয়া ফেলিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, অমল বলছিল, অহীন নাকি তার সঙ্গে ভাল ক'রে মেশে না। তার নাকি অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

উমা গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, তিনি অনেক কথা ভাবেন মা। অনেক বড় বড় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সেই জন্য বোধ হয়—

কন্যার গৌরব-বোধ দেখিয়া মা তৃপ্ত হইলেন। আর কোন প্রশ্ন করিলেন না।

* * * *

হেমাঙ্গিনী তখনকার মত নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পূজার ছুটিতে অহীন্দ্র বাড়ী আসিলে তাহাকে দেখিয়া তিনি মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। অহীন্দ্রের দেহ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাথার চুল বিশৃঙ্খল, শরীরের প্রতি অমনোযোগের চিহ্ন সুপরিস্ফুট; অমনোযোগ না বলিয়া অত্যাচার বলিলেও অন্যায় হয় না। তাহার শীর্ণ দেহের মধ্যে চোখ দুইটি শুধু জলজল করিতেছে, কৃষ্ণপক্ষের আকাশের রক্তাভ যুগল মঙ্গল গ্রহের মত।

তিনি সস্নেহে অহীন্দ্রের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, শরীর তোমার এত খারাপ কেন বাবা?

অল্প একটু হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, শরীর? তারপর আবার একটু হাসিল, আর কোন উত্তর দিল না, যেন হাসির মধ্যেই উত্তর দেওয়া হইয়া গিয়াছে।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, হাসির কথা নয় বাবা, শরীর বাঁচিয়েই সকল কাজ করতে হয়। এই গোটা সংসারটি তোমার মুখপানে তাকিয়ে আছে।

অহীন আবারও একটু হাসিল।

হেমাঙ্গিনী যাইবার সময় কন্যাকে সতর্ক করিয়া দিলেন, উমা, তুই একটু যত্নটত্ন কর্ ভাল ক'রে।

উমা মাথা হেঁট করিয়া নীরব হইয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আমাদের কালের ঘোমটা দেওয়া কলাবৌ তো ন'স্। বেশ ক'রে রাশ একটু

বাগিয়ে ধরবি তবে তো।

হেমাঙ্গিনী চলিয়া গেলে উমা মৃদু মৃদু হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, অহীন্দ্র বলিল, সুস্বাগত বাঙালিনী!

গুড আফ্‌টারনুন সায়েব। চমৎকার শরীরের অবস্থা কিন্তু সায়েবের!

বাঙালিনীর অভাবে সায়েবের এই অবস্থা। এখন তো কাছে পেয়েছ, এইবার বেশ গ্র্যাম-ফেড মাটন ক'রে তোল।

উমা হাসিয়া বলিল, উঁহু, মাটন না, ওয়েল-ফেড হর্স। মা ব'লে গেলেন রাশ টেনে ধরতে। হাড়পাঁজরা ঝুরঝুরে আকাশে-ওড়া পক্ষিরাজকে মাটিতে নামতে হবে!

এবং নাদুসনুদুস হয়ে বাঙালিনীকে পিঠে নিয়ে থুপথুপ ক'রে চলতে হবে।

ঘর পরিষ্কার করিয়া বিছানা করিবার জন্য দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল মানদা। উমা একটু সরিয়া দাঁড়াইল। মানদা অহীন্দ্রকে দেখিয়া গালে হাত দিয়া বলিল, কি চেহারা হয়েছে দাদাবাবু!

সুনীতি কিছু বলিলেন না, কেবল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছেলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কয়েক দিন পরেই উমাও যেন কেমন শুষ্ক বিশীর্ণ হইয়া উঠিল। সেও সুনীতি দেখিলেন।

অবশেষে একদিন রাত্রির অন্ধকারে মা আসিয়া ছেলের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কোজাগরী পূর্ণিমা পার হইয়া গিয়াছে, সম্মুখে অমাবস্যা আগাইয়া আসিতেছে, সেই অন্ধকারের মধ্যে ছাদে অহীন্দ্র একা বসিয়া ছিল। এমনই করিয়া সে এখন একা অন্ধকারে বসিয়া থাকে। কাছারি-প্রাঙ্গণের নারিকেল-বৃক্ষশীর্ষগুলি ছাদের আলিসার অল্প দূরে শূন্যলোকে জটাজূটময় অশরীরীবৃন্দের মত স্তব্ধ হইয়া—যেন সভা করিয়া বসিয়া আছে; ঝাউগাছ দুইটার শীর্ণ দীর্ঘতনুময় শীর্ষদেশ হইতে ছেদহীন কাতর দীর্ঘশ্বাস ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহারই মধ্যে সুনীতি নিঃশব্দে অহীন্দ্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অহীন্দ্র জানিতে পারিল না।

সুনীতি ডাকিলেন, অহীন!

চমকিত হইয়া অহীন্দ্র মুখ ফিরাইয়া বলিল, মা?

হ্যাঁ, আমি।

এস মা, ব'স। কিছু বলছ?

বলব। অন্ধকারে অহীন্দ্র মায়ের মুখ দেখিতে পাইল না, কিন্তু কণ্ঠস্বরের সুরে সে বেশ অনুভব করিল যে, তাঁহার মুখে সেই বিচিত্র করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে হাসি তাহার মা ছাড়া বোধ হয় এ পৃথিবীতে কেহ হাসিতে পারে না।

সুনীতি ছেলের পাশে বসিলেন, তাহার মাথাটি আপনার কোলের উপর টানিয়া লইয়া রুক্ষ চুলগুলি সযত্নে বিন্যস্ত করিয়া দিয়া বলিলেন, তোর কি হয়েছে বাবা?

কিছুই তো হয় নি। অহীন্দ্রের কণ্ঠস্বরে কপটতার লেশ ছিল না।

তবে?

কি মা?

তুই আমাদের কাছ থেকে এমন দূরে চ'লে যাচ্ছিস কেন বাবা ?

দূরে চ'লে যাচ্ছি !—সবিস্ময়ে অহীন্দ্র প্রশ্ন করিল।

হ্যাঁ। মা বলিলেন, হ্যাঁ, দূরে চ'লে যাচ্ছিস, আমরা যেন তোর নাগাল পাচ্ছি নে।

অহীন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিল। মা আবার বলিলেন, প্রথমে ভেবেছিলাম, বুঝি তুই আমার কাছ থেকেই স'রে গেছিস। বৌমা—। কণ্ঠস্বরে তাঁহার লজ্জার রেশ ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন, বিয়ের পর বৌয়ের ওপর ছেলের একটা টান হয়, তখন মায়ের কাছ থেকে ছেলে একটু স'রে যায়। আমি ভেবেছিলাম তাই। কিন্তু বৌমার মুখ দেখে বুঝলাম, তাও তো নয়। মাঝে মাঝে তার হাসিমুখ দেখি, কিন্তু আবার দেখি তার মুখ শুকনো। আমি বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি অহীন, শুকনো মুখই তার বেশির ভাগ সময় চোখে পড়ে।

অহীন্দ্র যেমন স্তব্ধ হইয়া ছিল, তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিল। কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া মা বলিলেন, উমা তো অপছন্দের মেয়ে নয় অহীন!

না মা, না। উমাকে নিয়ে আমি অসুখী নই তো। অহীনের কণ্ঠস্বরে আন্তরিক শ্রদ্ধার আভাস ফুটিয়া উঠিল।

তবে ? মা প্রশ্ন করিলেন, তবে ?

তবে ? কি উত্তর আমি দেব মা ? কথা শেষ করিয়া মুহূর্ত পরে সে সচকিত হইয়া উঠিল, বলিল, তুমি কাঁদছ মা ? তাহার কপালের উপর অশ্রুবিন্দুর উষ্ণ স্পর্শে সে চমকিয়া উঠিল।

মা বলিলেন, নিরুচ্ছ্বসিত অথচ উদাস কণ্ঠস্বরে, জানি নে তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস কি না, কিন্তু তোর সমস্ত চেহারার মধ্যে এক নতুন মানুষ ফুটে উঠেছে অহীন। তুই কি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এর মধ্যে নিজেকে ভাল ক'রে দেখিস নি ? আমার সর্বশরীর শিউরে ওঠে মধ্যে মধ্যে তোর চোখের দৃষ্টি দেখে।

অহীন্দ্র বলিল, আমি আজকাল একটু বেশী চিন্তা করি, সে-কথা সত্যি। কিন্তু আমার দৃষ্টির কথা কিংবা আমি নাগালের বাইরে, এ-সব তোমার কল্পনা মা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, কি জানি! কিন্তু আমার মন কেন এমন হয়ে উঠছে অহীন ? যেন আমার কত দুঃখ কত শোক! দুঃখ আমার অনেক, কিন্তু যাদের জন্যে দুঃখ, তাদের মুখ তো মনে পড়ে না আমার! তোর মুখই কেন চোখের ওপর ভেসে ওঠে ?

জীবনে তুমি কঠিন আঘাত পেয়েছ মা, সে আঘাতের বেদনা এখনও তুমি সহ্য ক'রে উঠতে পার নি, ও-সব চিন্তা তারই ফল। তুমি কেঁদো না, তোমার কান্না আমি সইতে পারি নে।

কিন্তু তুই এত কি ভাবিস, আমায় বল্ দেখি ?

ভাবি ? অহীন্দ্র হাসিল, বলিল, তুমি যা ভাবতে শিখিয়েছ, তাই ভাবি। আর কি ভাবব ? ভাবি, মানুষের দুঃখকষ্টের কথা। মানুষ মানুষের ওপর অন্যায় অত্যাচার করে,

সেই কথা ভাবি।

সুনীতি নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। দুঃখ তাঁহার গেল না কিন্তু শোকের মধ্যে সান্ত্বনার স্নেহস্পর্শের মত সন্তানগর্বের একটি নিরুচ্ছ্বসিত আনন্দ তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর বলিলেন, আশীর্বাদ করি, তুই মানুষের দুঃখ দূর কর্।

আবার তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল; কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিয়া তিনি বলিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখিস বাবা, আমরা—আমি, উমা—

মা! মা রয়েছেন নাকি? আচ্ছা মানুষ বাপু আপনি! সুনীতির কথায় বাধা দিয়া মানদা ঝি ঝঙ্কার দিতে দিতে ছাদের দরজার মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; কথার সুর ও ভঙ্গির মধ্যে বক্তব্যের স্বরূপের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকে, মানদার কথায় সুনীতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, কি রে মানদা?

বাবা! এই অন্ধকারে মায়ে-পোয়ে ছাদে বসে রয়েছেন তা কি ক'রে জানব, বলুন? সারা বাড়ি খুঁজে হয়রান। দাদাবাবুর শ্বশুর এসেছেন, শাশুড়ী এসেছেন, খুঁজছেন আপনাকে। দাদাবাবুর সম্বন্ধী এসেছেন।

ব্যস্ত হইয়া সুনীতি বলিলেন, নীচে আয় অহীন;—বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, অহীন্দ্রও তাঁহার অনুসরণ করিল। কোথাও কিছু পড়িয়া আছে কি না দেখিতে দেখিতে মানদা আপন মনেই বলিল, কথায় বলে 'কাতির শিশিরে হাতী পড়ে'। কার্তিক মাসের শিশির মাথায় ক'রে এই অন্ধকারে—আচ্ছা মানুষ বাবা!

* * * *

রায় আসিয়াছিলেন বৈষয়িক প্রয়োজনে; মামলা পরিচালনা সম্পর্কে একটি বিশেষ পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। রামেশ্বরের ঘরে তিনি বসিয়া আছেন। ঘরের মধ্যে মৃদু প্রদীপের আলো তেমনি জ্বলিতেছে, রামেশ্বর খাটের উপর বসিয়া রহিয়াছেন। রায়ের অদূরে রামেশ্বরের খাটের সম্মুখে অতি নিকটেই বসিয়া আছেন হেমাঙ্গিনী; উমা ঘরের কোণে টেবিলের উপর বই গুছাইয়া রাখিতেছে। শ্বশুর ও পুত্রবধূতে মিলিয়া কাব্যালোচনা হইতেছিল। উমার কল্যাণে রামেশ্বর অল্প একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।

সুনীতি যখন ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন সদ্য কোন হাস্যপরিহাস শেষ হইয়াছে, সকলের মুখেই হাসির রেখা ফুটিয়া রহিয়াছে। হেমাঙ্গিনী অপ্রতিভ মুখে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, কথায় আপনার সঙ্গে কেউ পারবে না। আমি হার মানছি।

রামেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে আপনার কাছে আমার মিষ্টান্ন প্রাপ্য হ'ল।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, মিষ্টান্ন আমাকেই আপনার খাওয়ানো উচিত, কারণ আপনি জিতেছেন।

রামেশ্বর হাসিয়া একটি কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আপনার কথায় বড়ই দুঃখ পেলাম দেবী। রায় হ'ল রাজশব্দের অপভ্রংশ; রায়-গিন্নী আপনি, আপনি হলেন রাণী। মিষ্টান্ন বস্তুটা চিরদিন রাণী এবং রাজকুল কথায় পরাজিত হয়ে বয়স্যগণকে করস্বরূপ প্রদান

করে এসেছেন। আজ সেই বস্তুর দিকে যদি আপনার হস্ত প্রসারিত হয়, তবে সে হস্তকে রাজহস্তে সমর্পণ করা ছাড়া তো গত্যন্তর দেখি না।

হেমাঙ্গিনী ঘরের মধ্যে উমার অস্তিত্ব স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, তাহাকে সরাইয়া দিবার জন্যই বলিলেন, উমা, অমল বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখ্ তো মা।

উমা চলিয়া গেল, উহার নাম উচ্চারণে রামেশ্বরও সংযত হইয়া উঠিলেন।

রায় হাসিতেছিলেন, তিনিও অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া কাজের কথা পাড়িয়া বসিলেন, এমনি একটি সুযোগের প্রতীক্ষাই যেন তিনি করিতেছিলেন। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া গলা ঝাড়িয়া লইয়া তিনি বলিলেন, রামেশ্বর, তোমার সঙ্গে কয়েকটি জরুরী বিষয় আলোচনার জন্যে এসেছি।

গম্ভীরভাবেই রামেশ্বর হাসিলেন, বলিলেন, চক্ষুষ্মান পথভ্রান্ত হ'লে নিরুপায়ে অন্ধের কাছেও পথ জিজ্ঞাসা করে। কি বলছ, বল? দিক বলতে না পারি, সম্মুখ পশ্চাৎ দক্ষিণ বাম—এগুলো বলতে পারব। পথের পারিপার্শ্বিক চিহ্নের কথা বলতে পারব না, তবে বন্ধুরতার বিষয় বলতে পারব।

রায় বলিলেন, মানমর্যাদা নিয়ে মকদ্দমা, অথচ টাকার অভাব হয়ে পড়ল রামেশ্বর। আমার হাত পর্যন্ত শুকনো হয়ে এল। এ ক্ষেত্রে—

রামেশ্বর বলিলেন, অধর্মকে বর্জন ক'রে সাক্ষাৎ নারায়ণরূপী রামের শরণাপন্ন হয়েও বিভীষণ অমর হয়ে কলঙ্ক বহন করেছেন। মামলা শেষ পর্যন্ত লড়তেই হবে ইন্দ্র। টাকা না থাকে ঋণের ব্যবস্থা কর।

না। রায় গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। ঋণ করতে গেলে শেষ পর্যন্ত ওই কলওয়ালার কবলস্থ হ'তে হবে। লোকটা ধরাট দিয়েও সে-খত কিনবে। সুদখোরদের মত ধূর্ত এবং লোভী এ সংসারে আমি তো কাউকে দেখি না, তারা অর্থের লোভে সব করতে পারে; এ খত তো তারা বিক্রি করবেই!

রামেশ্বর স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রায় বলিলেন, মহলে যে-সব খাস জোত আছে, তারই কিছু বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়াই কি ভাল নয়?

রামেশ্বর কোন উত্তর দিলেন না। তিনি চিন্তা করিতেছিলেন, কিছুক্ষণ পরই তাঁহার দুর্বল মস্তিষ্কে সব যেন গোলমাল হইয়া গেল। শূন্য অর্থহীন স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন।

রায় তাঁহাকে ডাকিলেন, রামেশ্বর!

রামেশ্বর নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ইন্দ্র!

তা হ'লে তাই করি, কি বল?

অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাটা স্মরণ করিয়া সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হ্যাঁ, সেই ভাল। ঋণ—না, ভাল নয়। শেষ পর্যন্ত বডিওয়ারেণ্ট করে।

বাতাসেরও কান আছে। জমি বন্দোবস্তের কথা প্রকাশ করিয়া জানাইতে হইল না।

অথচ সমস্ত গ্রামময় কথাটা রটিয়া গেল।

দুই-তিন দিন পরেই গ্রামের চাষীরা ছুটিয়া আসিয়া পড়িল, 'জমি যখন বন্দোবস্তই করবেন, তখন চরের ওই ভাগে-বিলি-করা জমিটা আমাদের বন্দোবস্ত করিয়া দিন। এক-শ বিঘা জমির বিঘা-পিছু ত্রিশ টাকা হিসাবে সেলামী এবং দুই টাকা হারে খাজনা দিতে আমরা প্রস্তুত।' দলটির সর্বাগ্রে ছিল রংলাল।

রায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, এত টাকা তোরা পাবি কোথায়? রংলাল বলিল, আজ্ঞে, আমরা তিরিশ জনায় লোব। জনাহি এক-শ টাকা আমরা যোগাড় কোনরকমে করব।

গভীর ব্যগ্রতায় সে রায়ের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল, হেই হুজুর! নইলে এ চরণ আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।

রায় বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, এত বেশী টাকা অন্য মহলে জমি বন্দোবস্ত করিয়া পাওয়া যাইবে না। তা ছাড়া চাষীরাও গোলাম হইয়া থাকিবে।

যোগেশ মজুমদার আসিয়া পাঁচ হাজার টাকা সেলামী দিতে চাহিল, কিন্তু রায় হাসিয়া বলিলেন, না!

৩৩

আরও মাস তিনেক পর।

মাঘ মাসের প্রথমেই একদিন প্রাতঃকালে কলের মালিক অকস্মাৎ সমস্ত চরটাই দখল করিয়া বসিলেন, রংলাল-প্রমুখ চাষীরা যে-জমিটা অল্পদিন পূর্বে জমিদারের নিকট বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল, সে-অংশটা পর্যন্ত দখল করিয়া লইলেন।

মোটর-সংযুক্ত বিলাতী লাঙল চালাইয়া চরের সমস্ত আবাদী জমি এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত চষিয়া এক করিয়া দিল। সংবাদ পাইয়া সমগ্র রায়হাট গ্রামখানাই বিস্ময়ে কৌতূহলে উত্তেজনায় মাতিয়া উঠিল। চরের উপর কলের লাঙল আসিয়াছে। গরু নাই, মহিষ নাই, কোন লোক লাঙলের মুঠা ধরিয়া নাই, অথচ চাষ হইয়া চলিয়াছে। কেবল একজন লোক গাড়ির মত কলটার উপর বাবুর আরামে বসিয়া আছে, হাতে পায়ে দু-একটা কল ঘুরাইতেছে টিপিতেছে, আর গাড়িটা চলিতেছে, পিছনে ইয়া মোটা মোটা মাটির চাঁই উল্টাইয়া পড়িতেছে। ওটা নাকি মোটরের লাঙল, ঠিক মোটরের মত ধোঁয়া ছাড়ে শব্দ করে। ভট্‌ভট্‌ শব্দ করিয়া বুনো শূকরের মত এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছুটিয়া চলিয়াছে; বাধাবিঘ্ন বলিয়া কিছু নাই, উঁচু-নীচু খাল-ঢিপি সব উখড়াইয়া দিয়া চলিয়াছে।

গ্রামের আবালবৃদ্ধ কালিন্দীর ঘাট হইতে চর পর্যন্ত ভিড় জমাইয়া ছুটিয়া আসিল। বনিতারা সকলে না আসিলেও অনেক আসিয়াছিল। তাহারা কালিন্দীর এ-পারেই দাঁড়াইয়া ছিল। চাষীদের বউগুলি দাঁড়াইয়া ঘোমটার অন্তরালে কেবলই কাঁদিতেছিল। তাহারা কল দেখিতে

আসে নাই, তাহারা দেখিতেছিল, তাহাদের জমি চলিয়া যাইতেছে। দূরান্তর হইতে প্রিয়জনের মৃত্যুশয্যার শিয়রে যেমন মানুষ আসিয়া অঝোরঝরে কাঁদে, আর নির্নিমেষ নেত্রে মৃত্যুপথযাত্রীর দিকে চাহিয়া থাকে, এ দেখিতে আসা তাহাদের সেই দেখিতে আসা। তাহাদের চোখে সেই মমতাকাতর দৃষ্টি। চাষীরা কিন্তু আসে নাই। সমবেত জনতা প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করিতেছিল, চাষীদের সঙ্গে ছোট রায়-বাড়ি ও চক্রবর্তী-বাড়ির পাইকেরা রে রে করিয়া আসিয়া পড়িল বলিয়া। কিন্তু বহুক্ষণ চলিয়া গেল, তবু কেহ আসিল না। ও-দিকে চরটা সমস্তই চষিয়া ফেলিয়া কলটা স্তব্ধ হইল।

রায়-বাড়ির ও চক্রবর্তী-বাড়ির পাইকদের না আসিবার কারণ ছিল। তাহারা আর কোনদিন আসিবে না। চর লইয়া জমিদার ও কলের মালিকের দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। জমিদার-পক্ষ সমস্ত মামলায় হারিয়া গিয়াছেন। গত কাল অপরাহ্ণে বিচারকের রায় বাহির হইয়াছে, সংবাদটা এখনও সকলের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই।

মামলায় পরাজয়ের সংবাদ সুনীতিও জানিতেন না। ইন্দ্র রায় সে-সংবাদ এখনও তাঁহাকে জানাইতে পারেন নাই, সুনীতি কেন, হেমাঙ্গিনীকেও জানাইতে তাঁহার বাধিয়াছে। কলের মালিক কলের লাঙল চালাইয়া চর দখল করিতেছেন। সংবাদ পাইয়া সুনীতি নূতন দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশঙ্কায় উদ্বেগে অস্থির হইয়া উঠিলেন। ভাঁড়ার বাহির করিতে গিয়া তাঁহার হাত কাঁপিতেছিল। নীরবে নতমুখে বঁটির উপর বসিয়া উমা শ্বশুরের জন্য আনারস ছাড়াইয়া কুটিতেছিল। এমন সময় মানদা ছড়া কাটিয়া ভণিতা করিয়া বাড়ি ফিরিল; সেও কলের লাঙল দেখিতে গিয়াছিল। চোখ দুইটি বড় করিয়া গালে হাত দিয়া বলিল, 'যা দেখি নাই বাবার কালে, তাই দেখালে ছেলের পালে!' কালে কালে আরও কত হবে, বেঁচে থাকলে আরও কত দেখব।

সুনীতি ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিলেন, কোনও খুনখারাপি হয় নি তো রে?

না গো না। কেউ যায়ই নাই। দিব্যি কলের লাঙল চালিয়ে এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত চষে নিলে কলওয়ালা।

সুনীতি পরম স্বস্তিতে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। মানদার আসল বক্তব্য তখনও শেষ হয় নাই। সে বলিয়াই গেল, গরু নাই, মোষ নাই, চাষা নাই, লাঙলের ফাল নাই—এই একটা গাড়ির মতন, ফটফট শব্দ করে চলছে, আর জমি চাষ হয়ে যাচ্ছে। এক দণ্ডে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত চাষ হয়ে গেল।

উমা মৃদু হাসিয়া বলিল, ওটা হ'ল মোটরের লাঙল, মোটর গাড়ি তো আপনি চলে দেখেছ, এও তেমনি চলে। নীচে বড় বড় ধারালো ইস্পাতের ছুরি লাগানো আছে, মোটরটা চলবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো মাটি কেটে উল্টে দিয়ে যায়।

মানদা সবিস্ময়ে মৃদুস্বরে বলিল, তাই সবাই বলছে বৌদিদি। আর ধোঁয়া ছাড়ছে কলটা, তার গন্ধ নাকি অবিকল মোটরের ধোঁয়ার গন্ধের মত। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার সে বলিল, আঃ, অনাথা গরু-মোষের অন্নই মারা গেল, আর কি!

সকৌতুকে উমা মানদার দিকে চাহিল, মানদা বলিল, গরু-মোষ তো আর কেউ পালবে না বৌদিদি, না খেতে পেয়েই ওরা ম'রে যাবে!

উমা এবার বেশ একটু জোরেই হাসিয়া উঠিল। সুনীতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তা এতে এমন ক'রে হাসছ কেন বউমা? ও-বেচারার যেমন বুদ্ধি তেমনি বলছে।

মানদা এমন একটি সমর্থন পাইয়া বেশ ঝাঁকিয়া উঠিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু নবীন বাগ্দীর স্ত্রী মতি বাগ্দিনী হন্তদন্ত হইয়া বাড়ির মধ্যে আসিয়া পড়ায় সে-কথা তাহার বলা হইল না। মতির মুখে প্রচণ্ড উত্তেজনাভরা উচ্ছ্বাস; সে বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই ডাকিল, রাণীমা!

কি রে? কি হয়েছে বাগ্দীবৌ? সুনীতি শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন। চরে কি আবার—

চরে নয় মা; রংলাল মোড়লের এক-পাটি দাঁত লাথি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন রায়-হুজুর।

সে কি? কেন?

ওই চরের জমির লেগে মা। চরের জমি লিয়ে চাষীরা নাকি কলের সায়েবের সঙ্গে কি ষড় করেছিল! সায়েব আজ চর দখল করেছে কিনা! তাই জানতে পেরে—

সুনীতির মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। রংলালের মুখ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, নির্বোধ দৃষ্টি, ঘোলাটে চোখ, পুরু ঠোঁটে বিনীত তোষামোদ-ভরা হাসি; আহা, সেই মানুষকে—! টপ্‌টপ্‌ করিয়া চোখের জল মাটির উপর ঝরিয়া পড়িল।

উমা বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে জমিদার-কন্যা জমিদার-বধূ হইলেও নবীন যুগের মেয়ে, তাহার উপর মুহূর্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল অহীন্দ্রকে। মানুষের মুখে লাথি মারার কথা শুনিয়া সে যে কি বলিবে; হয়তো কিছু বলিবে না, কিন্তু অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে, ক্ষুরধার মৃদু হাসি হাসিবে। সে বলিল, আমি একবার ও-বাড়ি যাব মা।

সুনীতি বলিলেন, মানদা, সঙ্গে যা মা। তুমি দেখো বউমা, আর যেন কোন উৎপীড়ন না হয় গরীবের ওপর। বলো, ও-চর আমি চাই না, ও যাওয়াই ভাল।

উমা ও মানদা চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে মতিও গেল। মতি এখন সাধ্যমত প্রহরিণীর কাজ করিয়া স্বামীর কাজ বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। প্রয়োজন হইলে লাঠি হাতে লইতেও লজ্জিত হয় না।

সুনীতি স্তব্ধ উদাস হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সর্বনাশা চর! ওই চরের জন্যই এত। তাঁহার মনে পড়িল, এই চর লইয়া দ্বন্দ্বের প্রথম দিন হইতেই রংলাল জড়িত আছে। খানিকটা জমির জন্য বেচারা চাষীর কি লোলুপ আগ্রহ! নবীনদের দাঙ্গার মকদ্দমাতেও রংলাল জড়িত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুচ্চমকের মত মনে পড়িয়া গেল একদিনের কথা। নবীনদের মকদ্দমার সময়েই একদিন। তিনি চরটাকে যেন ঘুরিতে

দেখিয়াছিলেন ; এই বাড়িটাকেই কেন্দ্র করিয়া চক্রান্তের চক্র সৃষ্টি করিয়া ঘুরিতেছিল। সেটা কি আজও ঘুরিতেছে? নইলে ওই নিরীহ চাষীর মুখ দিয়া এমন করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িল কেন? সর্বনাশা চর!

তাঁহার ভাবপ্রবণ অনুভূতিকাতর মন শিহরিয়া উঠিল। না, ও-চরের সঙ্গে আর কোন সংস্রব তিনি রাখিবেন না। অহীন্দ্রকে তিনি আজই পত্র লিখিবেন, সে আসুক, চর বিক্রয় করিবার জন্য সে আসুক।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, সে আজ পনেরো দিনের উপর পত্র দেয় নাই। সে আজকাল কেমন যেন হইয়াছে!

* * *

প্রাতঃকাল হইতেই রায় গুম হইয়া বসিয়াছিল।

ভোর রাত্রে সদর হইতে মামলার সংবাদ লইয়া লোক ফিরিয়া আসিয়াছে। সমস্ত মামলাতেই জমিদার-পক্ষ পরাজিত হইয়াছেন। চর লইয়া সমস্ত দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। মাথা হেঁট করিয়া নিস্পন্দের মত তিনি বসিয়া রহিলেন। তাহার পরই সংবাদ আসিল, কলের মালিক মোটর-লাঙ্গল চালাইয়া চর দখল করিতেছে, এমন কি হালে বন্দোবস্ত করা চাষীদের জমিও দখল করিয়া লইতেছে। রায় সোজা হইয়া বসিলেন, আবার একটি সুযোগ মিলিয়াছে। চাষীদের সম্মুখে রাখিয়া আর একবার লড়িবেন তিনি! নায়েব মিত্তিরকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, জলদি বাগ্দীদের আর কাহারদের তলব দাও। আর চাষীদের ডাকাও দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে লোক ছুটিল। রায় আবার গোঁফে পাক দিতে আরম্ভ করিলেন। চেয়ার ছাড়িয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারের জন্য প্রতীক্ষমাণ গুহাচারী অস্থির বাঘের মত বারান্দায় পায়চারি আরম্ভ করিলেন। ঠিক এই সময়েই রংলাল আসিয়া তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, ডাকিবার পূর্বেই সে নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

রায় সস্নেহে বলিলেন, ওঠ্, ওঠ্, ভয় নেই। আমি লাঠিয়াল দিচ্ছি, তোদের কিছু করতে হবে না, তোরা কেবল দাঁড়িয়ে থাকবি, দেখবি। টাকা পয়সা সমস্ত খরচ আমার, কোনও ভয় নেই তোদের।

রংলাল ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আমরা যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি হুজুর!

রায় চমকিত হইয়া উঠিলেন, এই নির্বোধদের তিনি ভাল করিয়াই জানেন। ইহাদের সকলের চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা এই যে, ইহারা নিজেদের ভাবে অতি বুদ্ধিমান—ভীষণ চতুর। বৈষয়িক জটিল বুদ্ধির প্রতি, কুটিল চাতুরির প্রতি ইহাদের গভীর আসক্তি। সচকিত হইয়া রায় বলিলেন, কি করেছিস, সত্যি ক'রে বল্ দেখি? সত্য কথা বলবি। ছাড়্ পা—ছাড়্—। তিনি আবার চেয়ার টানিয়া বসিলেন।

হাতের তালুর উল্টা পিঠ দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে রংলাল বলিল, আজ্ঞে হুজুর, ওই

মজুমদারের ধাপ্পায় প'ড়ে—উনিই বললেন, হুজুর—

মজুমদার কি বললে ?

বললে টাকার ভাবনা কি ? আমি টাকা দেব।

কিসের টাকা ?

আজ্ঞে, সেলামীর টাকা। আমাদের টাকা ছিল না হুজুর। উনিই আমাদিগে টাকা দিয়েছিলেন। আমাদের 'বাপুতি' সম্পত্তি বন্ধক নিয়ে দলিল ক'রে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, চরের জমি বন্দোবস্ত হয়ে গেলে এ দলিল ফেরত দিয়ে চরের জমি বন্ধক দিয়ে দলিল ক'রে দিতে হবে। এখন নতুন দলিলে সই করিয়ে নিয়ে বলছে হুজুর, বন্ধক নয়, জমি তোদের বিক্রি হয়ে গেল, এ দলিল কবলা-দলিল।

অজগরের মত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রায় বলিলেন, হুঁ।

হুজুর, আমাদের কি হবে ?

দলিল তোরা রেজেস্ট্রি করিস নে।

দলিল যে রেজেস্টারী হয়ে গেল হুজুর। নইলে যে সাবেক বন্ধকী দলিল ফেরত দিচ্ছিল না।

রংলাল আবার ফোঁসফোঁস করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

রায় রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত বসিয়া রহিলেন। এই নির্বোধ অথচ কূটমতি অপদার্থ-গুলির উপর ক্রোধের তাঁহার আর সীমা রহিল না। তাঁহার জমিদার মন হতভাগ্যের নিরুপায় দিকটা দেখিতে পাইল না। হতভাগ্য অন্ধ বাঘের লেজে পা দিলে বাঘ তাহার অন্ধত্ব দেখিতে পায় না।

রংলাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, রায়ের কোন উত্তর না পাইয়া সে আবার তাঁহার পা দুইটি চাপিয়া ধরিল। আর রায়ের সহ্য হইল না, প্রচণ্ড ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন, রংলালের মুখে সজোরে লাথি মারিয়া আপনার পা ছাড়াইয়া লইলেন। সেই আঘাতে রংলালের সম্মুখের দুইটা দাঁত উপড়াইয়া গিয়া তাহার নির্বোধ মুখখানাকে রক্তাক্ত করিয়া দিল।

হেমাঙ্গিনী কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, কিন্তু উমা করিল। বাপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ছি ছি ছি, এ কি করলেন বাবা ? সে যাই হোক, সে তো মানুষ!

রায় নীরবে ঘরের মধ্যে একা পদচারণা করিতেছিলেন, তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, মেয়ের মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, পাপ করেছি মা। মানুষ আমি, মতিভ্রম হয়েছিল। কিন্তু রংলালের পায়ে ধ'রে প্রায়শ্চিত্ত তো করতে পারব না।

এ কথার উত্তরে উমা আর কিছু বলিতে পারিল না, সে যেন এতটুকু হইয়া গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রায় ডাকিলেন, তারা তারা মা!

উমা এবার লজ্জিত হইয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, আপনি একটু বসুন বাবা, আমি

বাতাস করি।

রায় হাসিলেন, কিন্তু কন্যার কথা উপেক্ষা করিলেন না, বসিলেন। বসিয়া বলিলেন, মানুষের দিন যখন শেষ হয়, তখন এমনি ক'রেই মতিভ্রম হয়। আমাদের দিন শেষ হয়েছে মা।

উমা শিহরিয়া উঠিল, বলিল, ও কি বলছেন বাবা ?

মরণের কথা বলছি না মা, আমাদের সুদিনের কথা বলছি। চাষীরা সব আমাদের বিপক্ষ হয়ে কলের মালিকের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অথচ একদিন খুন করলেও তারা আমাদের বিপক্ষে কথা বলে নি, বিচার ব'লে মেনে নিয়েছে।

উমা চুপ করিয়া রহিল।

রায় বলিলেন, আজ একটা কথা মুখ দিয়ে বের করতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে মা। অথচ তোর শ্বশুর-শাশুড়ীকে বলতেই হবে। তুই-ই সে কথাটা বলে দিবি মা।

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া উমা বলিল, বলুন।

চরের সমস্ত মকদ্দমায় আমাদের হার হয়েছে মা।

উমা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বলব।

আমার অনেক লজ্জা মা। জেদের বশে তোর শ্বশুরদের আমি অনেক অনিষ্ট ক'রে দিলাম। সম্পত্তি তো শুধু অহীন্দ্রের নয়, মহীন্দ্রও ফিরে আসবে। লজ্জা আমার তার কাছেই হবে বেশি। আমার ইচ্ছে কি জানিস ? আমার সম্পত্তির অর্ধেক আমি অহীন্দ্রকে উপলক্ষ ক'রে ওদের দুজনকেই দিই। অহীন্দ্রের শ্বশুর হিসাবে নয়, সুনীতির ভাই সম্বন্ধ নিয়েই দিতে চাই।

উমা বলিল, বেশ তো, বিবেচনা ক'রে যা হয় করবেন। কিন্তু কিছুদিন যাক, নইলে ওঁরা ভাববেন, আপনি ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন।

রায় হাসিয়া বলিলেন, কিছুদিন সময় আর আমার নেই মা। আমি আর সংসারে থাকব না, আমি কাশী যেতে চাই।

উমা মৃদুস্বরে বলিল, সংসারে হারজিত তো আছেই বাবা। তার জন্যে কাশী কেন যাবেন ?

হেমাঙ্গিনী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতে শরবতের গ্লাস। উমা আসিয়াছে —এই সুযোগে তিনি রায়কে শরবত খাওয়াইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

রায় বলিলেন, আজ আহ্নিকে ব'সে জপ ভুলে গেলাম, মায়ের রূপ ধ্যান করতে পারলাম না। শুধু বললাম, চর চর, মামলা মামলা ; আর ধ্যান করলাম, ওই রংলাল আর কলওয়ালার মুখ। আর নয়, আর সংসার নয় মা, আমি মন স্থির ক'রে ফেলেছি, আমি কাশী যাব।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বেশ তাই হবে। কিন্তু সে তো আর এখুনি নয়। এখন শরবতটা খাও দেখি।

* * *

চরের মামলায় পরাজয় হইয়াছে, চরটার সহিত সকল প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে—সংবাদটা শুনিয়া সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। দুঃখের দীর্ঘনিশ্বাস। অথচ এই কামনা তিনি কিছুক্ষণ পূর্বেই শুধু নয়, চর লইয়া দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইবার পর হইতেই অহরহ করিয়া আসিয়াছেন। বার বার তিনি মনে করিতে চেষ্টা করিলেন, ভালই হইয়াছে, ভাগ্য-বিধাতা নিষ্ঠুর চক্রান্ত হইতে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন। কিন্তু স্মৃতির মমতা তাঁহাকে তাহা ভাবিতে দিল না। তাঁহার মহীন্দ্র দ্বীপান্তরে গিয়াছে ওই চরের জন্য, তিনি নিজে প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়াইয়াছেন ওই চরের জন্য। সংসারে চরম দুঃখের বিনিময়ে যাহা পাওয়া যায়, তাহার এক পরম মূল্য আছে।

আজ অহরহ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল মহীন্দ্রকে। দিনান্তে সন্ধ্যার সময় তিনি আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। ও-পারের চরের উপর আজ বাজনা বাজিতেছে, আনন্দোন্মত্ত মানুষের কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে। হিন্দুস্থানীদের ঢোলক বাজিতেছে, আরও অনেক বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি যেন শোনা যাইতেছে। কলের মালিক বোধ হয় বিজয়োৎসব জুড়িয়া দিয়াছে। তিনি ছাদে গিয়া উঠিলেন, ছাদ হইতে চর, কালিন্দীর গর্ভ পরিষ্কার দেখা যায়। বাদ্যযন্ত্র ও কোলাহলের শব্দ স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল, দূরে চরের উপর আলো জ্বলিতেছে, আলোর ঘটা আজ অনেক বেশী। কালিন্দীর শুষ্ক গর্ভে বালির উপর একটা আলোর সমারোহ, মশালের আলোর মত দুই-তিনটা আলো জ্বলিতেছে—রক্তাভ আলো! আলোর চারিপাশে ক্ষুদ্র একটি জনতার মধ্যস্থলে একটি দীর্ঘাঙ্গী কালো মেয়ে হাত ঘুরাইয়া, দেহ বাঁকাইয়া নানা ভঙ্গিতে নাচিতেছে।

মা!

সুনীতি চমকিয়া উঠিলেন, কে? পরক্ষণেই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বউমা!

উমাই ডাকিতেছিল, সে বলিল, এই আলোয়ানখানা গায়ে দিন মা, বড় কনকনে হাওয়া দিচ্ছে।

সত্য, এবার শীতটা বেশ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সুনীতি আলোয়ানখানি গায়ে দিয়া সস্নেহে বধূর দিকে চাহিয়া রহিলেন। উমা আজ মনে মনে লজ্জিত হইয়া ছিল, তাহার বাবা আজ সকালে যে বলিয়াছিলেন, 'আমি জেদের বশে ওদের অনেক ক্ষতি ক'রে দিয়েছি,' সেই কথাটা তাহার মনের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছে। সে মাথা হেঁট করিল। অন্ধকারের মধ্যে সুনীতি উমার মুখ দেখিতে পাইলেন না বলিয়া কিছু বুঝিতে পারিলেন না। সস্নেহেই তিনি প্রশ্ন করিলেন, আর কিছু বলছ বউমা?

না।—বলিয়া সে মন্থর পদক্ষেপে সিঁড়ির দরজা অতিক্রম করিয়া নীচে নামিয়া গেল। এ-পাশে সুনীতির সম্মুখে চক্রবর্তী-বাড়ির কাছারির প্রাঙ্গণে নারিকেল গাছগুলির মাথা, অন্ধকারের মধ্যে জটাজুটধারী তমোলোকবাসীদের মত শূন্যলোকে সভা করিয়া বসিয়া আছে, দীর্ঘ পাতাগুলির মধ্যে কি যেন গোপন কথার কানাকানি চলিতেছে। সুদীর্ঘ ঝাউগাছ দুইটা

মর্মন্তুদ বেদনায় যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে।

সুনীতির মনে পড়িয়া গেল অহীন্দ্রের কথা। বেশী দিন নয়, অল্পদিন পূর্বেই, এই ছাদে এমনি অন্ধকারে এমনি আবেষ্টনের মধ্যে অহীন্দ্র একা শুইয়া ছিল; তিনি আসিয়া তাহার কাছে বসিয়া কাতর-ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেন তুই দূরে চ'লে যাচ্ছিস অহীন? আমরা যে তোর নাগাল পাচ্ছি নে বাবা?

তাঁহার আজিকার বিচলিত মন একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। অহীন্দ্র আজ পনেরো দিন পত্র দেয় নাই। পূজার ছুটির পর সেই গিয়াছে আর আসে নাই। যে-পত্র সে লেখে, সেও যেন কেমন-কেমন, মাত্র দুই-তিন ছত্র। উমা চলিয়া গেল, তাহার মন্থর গতি একটা অর্থ লইয়া তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। উমা শুকাইয়া গিয়াছে। তাহাকেও কি সে এমনি ভাবে পত্র লেখে? সেও কি তাঁহারই মত তাহার নাগাল পায় না? দ্রুত ছাদের সিঁড়ির মুখে আসিয়া তিনি ডাকিলেন, বউমা! বউমা! উমা!

মা!

উমা আবার আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

অহীন তো তোমাকে পত্র দেয় নি বউমা!

উমা নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

অহীন কেন এমন হ'ল? আমার মন যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠেছে!

আজ সমস্ত দিনটা উমার মনও বিচলিত হইয়া ছিল, সে আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। অন্ধকারের মধ্যে কম্পনত্রস্ত দেহ দেখিয়া উমার কান্না সুনীতি অনুমান করিলেন, বধূর মুখে হাত দিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কাঁদছ কেন বউমা? কি হয়েছে মা? আমাকে বলবে না।

উমা আর গোপন করিতে পারিল না; নূতন যুগের মেয়ে সে, আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার সহিত পরিচয়ের ফলে অহীন্দ্রের যে-কথা সে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কঠিন উদ্বেগ আশঙ্কা সহ্য করিয়াও এতদিন গোপন রাখিয়াছিল, আজিকার এই বিচলিত চরম মুহূর্তটিতে অহীন্দ্রের মায়ের কাছে তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। সবটা সে জানিত না, যতটুকু জানিত ধীরে ধীরে ততটুকুই বলিল।

সুনীতির সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সমস্ত ব্যাপারটা না বুঝিলেও তাহা যে ভয়ঙ্কর কিছু ইহা অনুভব করিলেন; ব্যাকুল আশঙ্কায় অধীর হইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, এরা কি চায় মা?

ঠিক তো জানি না মা। তবে মনে হয়, এরা চায়, মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন ভেদ থাকবে না; জমি ধন সব সমানভাবে ভাগ ক'রে নেবে। সেইজন্য তারা বিপ্লব ক'রে এ-রাজত্ব উল্‌টে দিতে চায়। সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

সুনীতির মনে পড়িল, অহীন্দ্র তাঁহাকে ইঙ্গিতে বলিয়াছিল, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর উমা বলিল—সে আজ আর কথাগুলি

গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না—বলিল, সাঁওতালদের চরের জমি কেড়ে নেওয়ার পর তারা একদিন ভোর-রাত্রে চর থেকে উঠে চ'লে গেল; তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলেন। সেদিন আমায় বলেছিলেন, এ-পাপ আমাদের পাপ। পুরুষ পুরুষ ধ'রে এই পাপ আমাদের জমা হয়ে আসছে, কলের মালিক একা এর জন্যে দায়ী নয়। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে হবে। আমি সেদিন বুঝতে পারি নি মা। এবার পূজোর সময় আমি বুঝতে পারলাম; সুটকেস খুলে কাপড় গোছাতে গিয়ে, ক'খানা চিঠি থেকে বুঝতে পারলাম। আর সে বলিতে পারিল না, অনর্গল ধারায় চোখের জল তাহার মুখ ভাসাইয়া ঝরিতে আরম্ভ করিল।

অনেকক্ষণ পর সুনীতি বলিলেন, চল, বউমা, দাদার কাছে যাই। তিনি ভিন্ন কে আর উপায় করবেন?

উমা অতিমাত্রায় ব্যগ্রতার সহিত কাতরভাবে বলিয়া উঠিল, না, না মা। তাতে তাঁকে বিশ্বাসঘাতক হ'তে হবে, সমস্ত দল ধরা প'ড়ে যাবে মা। না না।

সুনীতি পাথর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। উমাও নীরব।

ও পারের চরে বাজনার শব্দ উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খলতায় উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। নদীর চরের উপর লাল আলোর মধ্যে সেই দীর্ঘাঙ্গী কালো মেয়েটা উন্মত্ত আনন্দে যেন তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে। লম্বা ফালি সর্বনাশা চরটা যেন ঐ দীর্ঘাঙ্গী কালো মেয়েটার রূপ ধরিয়া সর্বনাশীর মত নাচিতেছে।

৩৪

নিতান্ত বিস্মৃতিবশতই খান-দুই ইস্তাহার এবং একখানা পত্র সুটকেসের নীচে পাতা কাগজের তলায় রহিয়া গিয়াছিল; ঝাড়িয়া মুছিয়া গুছাইতে গিয়া উমা সেগুলি পাইয়াছিল। লাল অক্ষরে ছাপা ইস্তাহারখানা পড়িয়াই উমা ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তারপর সেই পত্রখানা; তাহার মধ্যে সব সুস্পষ্ট—"মৃত্যু মাথায় করিয়া আমাদের এ অভিযান। প্রায় পৃথিবীব্যাপী বিরাট শক্তিগুলি ভরা রাইফেলের ব্যারেল উদ্যত করিয়া রাখিয়াছে। ফাঁসির মঞ্চে দড়ির নেকটাই প্রস্তুত হইয়া ঝুলিতেছে। অন্যদিকে মানুষের আত্মঅজ্ঞাত স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত বিধানের ফলে অসংখ্য কোটি মানুষের অপমৃত্যু যুগ যুগ ধরিয়া ঘটিয়া আসিতেছে।" শেষের কয়টি লাইনের পাশে অহীন্দ্র দাগ দিয়া লিখিয়াছে, "আবছা অন্ধকারের মধ্যে সাঁওতালেরা চর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমি চোখে দেখিয়াছি।"

উমা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে একে একে সমস্ত কথাই সুনীতিকে প্রকাশ করিয়া বলিল। বলিতে পারিল না কয়েকটি কথা; অহীন্দ্র ঠিক এই সময়েই আসিয়া পড়িয়াছিল, উমার হাতে কাগজ ও চিঠি দেখিয়া সে ছোঁ মারিয়া সেগুলি কাড়িয়া লইয়া বলিয়াছিল, এ তুমি কোথায় পেলে?

উমা যেমন ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া চিঠিখানা পড়িতেছিল, তেমনি ভঙ্গিতেই দাঁড়াইয়া ছিল, ঠোঁট দুইটি কেবল থরথর করিয়া কাঁপিয়াছিল, উত্তর দিতে পারে নাই। অহীন্দ্র হাসিয়াছিল, হাসিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া বলিয়াছিল, "না জাগিলে হায় ভারতললনা, ভারত স্বাধীন হ'ল না হ'ল না।" এই নব জাগরণের ক্ষণে তুমি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির লেখাপড়া জানা মেয়ে হয়ে কেঁদে ফেললে উমা? নাঃ, দেখছি তুমি নিতান্তই 'বাঙালিনী'! তারপর সে তাহাকে বলিয়াছিল লেনিনের সহধর্মিণীর কথা, রাশিয়ার বিপ্লবের যুগের মেয়েদের কথা।

উমার তরুণ রক্তে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। স্বামীর সাধনমন্ত্র নিজের ইষ্টমন্ত্রের মত এতদিন সে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ একটি বিচলিত মুহূর্তে স্বামীর বেদনা-বিচলিত মায়ের কাছে সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, সব প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

সুনীতি স্থির হইয়া শুনিলেন।

তিনি যেন পাথর হইয়া গেলেন। বজ্রগর্ভ মেঘের দিকে যে স্থির ভঙ্গিতে পাহাড়ের শৃঙ্গ চাহিয়া থাকে, সেই ভঙ্গিতে অপলক দৃষ্টিতে তিনি ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

* * *

মাস দুয়েক পর একদিন সে বজ্র নামিয়া আসিল।

উমার হাত ধরিয়া সুনীতি নিত্যই ইহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রতিকারের উপায় কিছু দেখিতে পান নাই। অহীন্দ্রকে বাড়ি আসিবার জন্য বার বার আদেশ অনুরোধ মিনতি জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, অহীন্দ্র আসে নাই, কোন উত্তর পর্যন্ত দেয় নাই। অমল জানাইয়াছে, অহীন্দ্র কোথায় যে হঠাৎ গিয়াছে সন্ধান করিয়াও সে জানিতে পারে নাই; ফিরিলেই সে খবর দিবে। কোন বন্ধুর সহিত সে কলিকাতার বাহিরে কোথাও গিয়াছে।

সুনীতি ও উমা নীরবে পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া অবশ্যম্ভাবীর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। হেমাঙ্গিনী বা ইন্দ্র রায়ের নিকটেও গোপন করিয়া রাখিলেন। ও-দিকে ইন্দ্র রায় কাশীযাত্রার আয়োজনে সম্পূর্ণ ব্যস্ত, দৃষ্টি ফিরাইয়া উমার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিবারও অবসর নাই। হেমাঙ্গিনী স্বামীর তাড়নায় ব্যস্ত, তাহা ছাড়া তিনি যেন বড় লজ্জিত, চক্রবর্তী-বাড়ির অনেক অনিষ্ট রায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি এ-বাড়ি বড় একটা আসেন না। মাঝে মাঝে আসেন, কিন্তু ম্লানমৌন সুনীতির সম্মুখে তিনি বসিয়া থাকিতে পারেন না। মনে হয় এই ম্লান মুখে সুনীতি যেন বৈষয়িক ক্ষতির জন্য তাঁহাকে নিঃশব্দে তিরস্কার করিতেছেন। উমার ম্লানমুখ দেখিয়া ভাবেন বাপের লজ্জায়ই উমা এমন নতশির, ম্লান হইয়া গিয়াছে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে।

সেদিন মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি; রাত্রি প্রথম প্রহর শেষ হইয়া আসিয়াছে। চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে একটা অকাল বর্ষা নামিয়াছিল; আকাশে সেই অকাল বর্ষার ঘন-ঘটাচ্ছন্ন মেঘ; চারিদিকে জমাট অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে সচল দীর্ঘাকৃতি অন্ধকার-পুঞ্জের মত কালিন্দীর বালি ভাঙিয়া আসিতেছিল অহীন্দ্র। গায়ে একটা বর্ষাতি জামা, মাথায় বর্ষাতি টুপি। গভীর অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া এই দুর্যোগ মাথায় করিয়া

সে মা ও উমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। পুলিস তাহাদের ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মহাযুদ্ধের পর তখন ভারতের গণআন্দোলনের প্রথম অধ্যায় শেষ হইয়াছে। নূতন অধ্যায়ের সূচনায় রাশিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজতন্ত্রবাদী যুবক-সম্প্রদায়ের এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। ভারতের নানা স্থানে খানাতল্লাসী এবং ধর-পাকড় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অহীন্দ্র ছিল ইউ. পি-র কোন একটা শহরে; সেখান হইতে আত্মগোপন করিয়া চলিয়া আসিতেছে। আবার আজই, রাত্রির অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। দৃঢ় দীর্ঘ পদক্ষেপে বালি ভাঙিয়া কূলে আসিয়া উঠিল।

এ কি? এ তো রায়হাটের ঘাট নয়, এ যে চরের ঘাট! পাকা বাঁধানো রাস্তা, ওই তো অন্ধকারের মধ্যেও সুদীর্ঘ চিমনিটা, ওই বোধ হয় বিমলবাবুর বাংলোয় একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। কুলীব্যারাকের সুদীর্ঘ ঘরখানার খুপরির মত ঘরে ঘরে স্তিমিত আলোর আভা, যেন স্তব্ধগতি ট্রেনের মত মনে হইতেছে। রায়হাট ও-পারে; ভুল করিয়া সে চরের উপর আসিয়া উঠিয়াছে। সে ফিরিল। কিন্তু আবার দাঁড়াইল। অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল।

কাশ ও বেনাঘাসের জঙ্গলে ভরা সেই চরখানি, জনমানবহীন, যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। কতদিন নদীর ও-পার হইতে দাঁড়াইয়া সে দেখিয়াছে। তারপর একদিন এইখানেই সরু একটি পথের উপর দিয়া সারিবদ্ধ কালো মেয়ের দলকে বাহির হইতে দেখিয়াছিল, মাটির ঢিপির ভিতর হইতে যেমন পিপীলিকার সারি বাহির হয় তেমনি ভাবে। সত্য সত্যই উহারা মাটির কীট। মাটিতেই উহাদের জন্ম, মাটি লইয়াই কারবার, মাটিই উহাদের সব। সেদিন সঙ্গে ছিল রংলাল। সেই দলটির মধ্যে সারীও ছিল নিশ্চয়, মুকুটের মধ্যস্থলের কালো পাখীর দীর্ঘ পালকের মত। এই পথ দিয়াই সে চরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল—আদিম বর্বর জাতির বসতি মাটির কীটদের গড়া বাসস্থান। সচল পাহাড়ের মত কমল মাঝি, বৃদ্ধা মাঝিন, কালো পাথরে গড়া প্রায় উলঙ্গ মানুষের দল। চিত্রিত বিপুলদেহ মৃত অজগরের মাংসস্তূপ। রাশীকৃত কুর্চির ফুল, দীর্ঘাঙ্গী মুখরা নারী; সাঁওতাল মেয়েদের নাচ। মাটির উপর রংলালের প্রলোভন। নবীন বাগ্দীর দলকেও মনে পড়িল। জমিদারদের অলস উদরের লোলুপ ক্ষুধা। মনে পড়িল তাহার দাদাকে। ননী পালের মৃত্যু। শ্রীবাস ও মজুমদারদের ষড়যন্ত্র। দাঙ্গা, নবীনের দ্বীপান্তর। কলওয়ালা বিমলবাবু; তাহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল, সরলা সাঁওতালদের মেয়ে সারীকে জোর করিয়া করায়ত্ত করিয়া তাহার সর্বনাশ করিয়াছে, সাঁওতালদের জমি আত্মসাৎ করিয়াছে। তাহারা নিজেরা—তাহার শ্বশুর, তাহার বাবা—বাকিটুকু কাড়িয়া লইয়াছেন। রাত্রিশেষের অস্পষ্ট আলোকময় অন্ধকারের মধ্যে কালো কালো মানুষের সারি, কাঁধে ভার, মাথায় বোঝা, সঙ্গে গরু ছাগল ভেড়ার পাল, বসতি ছাড়িয়া চলিয়া গেল, নিঃশেষে ভূমিহীন হইয়া চলিয়া গেল। যুগে যুগে এমনি করিয়াই উহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে হাঁটিয়া কাল-সমুদ্রের প্রায় কিনারার উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অহীন্দ্রের চোখ অন্ধকারের মধ্যে শ্বাপদের মত জ্বলিতেছিল। ওই বিমলবাবুটাকে—।

পকেট হইতে সে ছোট কালো ভারী একটা বস্তু বাহির করিল। ছয়টা চেম্বার বোঝাই-করা রিভলভার। বিকারগ্রস্ত রোগীর মত অস্থির অধীর হইয়া উঠিল সে। একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া লইল। আশেপাশে সম্মুখে চরখানা তেমনি, এখানে-ওখানে আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হইতেছে মাত্র, মানুষ দেখা যায় না; পিছনে কালিন্দীর গর্ভেও কেহ নাই। ও-পারে রায়হাট স্তব্ধ অন্ধকার, শুধু গাছপালার মাথার উপর একটা আলোর ছটা, একটা বাড়ির খোলা জানালায় আলো। এ যে তাহাদেরই বাড়ি—হ্যাঁ, তাহাদের বাড়ির জানালার আলো। আলোকিত ঘরের মধ্যে দুইটি মানুষ, স্ত্রীলোক—মা আর উমা! সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মা আসিয়া জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, স্পষ্ট মা। কিছুক্ষণ পর রিভলভারটি পকেটে পুরিয়া সে চরকে পিছনে ফেলিয়া রায়হাট অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইল। পুরনো গ্রামের বৃক্ষছায়াচ্ছন্ন পথ অতিবাহন করিয়া সে সেই আলোকিত জানালার তলে আসিয়া দাঁড়াইল, অনুচ্চ অথচ স্পষ্ট স্বরে ডাকিল, মা!

কে? কে?—শঙ্কিত ব্যগ্রকণ্ঠে সুনীতি প্রশ্ন করিলেন।

মা!

অহীন?···যাই যাই, দাঁড়া।

মাথার টুপিটা খুলিয়া ফেলিয়া রেন-কোটের বোতাম খুলিতে খুলিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া অহীন্দ্র মৃদু হাসিল, ছলনা করিয়া মাকে ভুলাইবার জন্যই সে হাসিল।

সুনীতি অপলক চক্ষে অহীন্দ্রের দিকে চাহিয়া ছিলেন; চোখে জল ছিল না, কিন্তু ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, অহীন্দ্রের হাসি দেখিয়া তাঁহার কম্পিত অধরেও একটি অস্পষ্ট বিচিত্র হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল, মৃদুস্বরে বলিলেন, আমি সব শুনেছি অহীন।

অহীন্দ্র চমকিয়া উঠিল।

সুনীতি বলিলেন, বউমা আমাকে সব বলেছে।

ও-বাড়ির ওঁরা? তা হ'লে কি তোমরাই—? তাহার সন্দেহ হইল, হয়তো প্রাচীন জমিদার-বংশ তাহাকে রক্ষার্থে রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পুলিসের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

না, আর কেউ জানে না। আমাকে না ব'লে বউমা বাঁচবে কি ক'রে বল্? এত দুঃখ সে কি লুকিয়ে রাখতে পারে? কিন্তু এ তুই কি করলি বাবা?

কোটের শেষ বোতামটা খুলিয়া অহীন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, আজই রাত্রে আমাকে চ'লে যেতে হবে মা, পুলিস আমাদের দলের সন্ধান পেয়ে গেছে।

সুনীতি সমস্ত শুনিয়াছেন জানিয়া সে আর ভূমিকা করিল না, সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল না। একেবারে কঠিনতম দুঃসংবাদটা শুনাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। একবার শুধু হাস্যমুখে মুখ ফিরাইয়া উমার দিকে চাহিল।• খাটের বাজু ধরিয়া উমা দাঁড়াইয়া আছে। সে তাহাকে বলিল, একটু চা খাওয়াও দেখি উমা। সঙ্গে কিছু খাবার—খিদে পেয়ে গেছে।

* * * *

সুনীতি শুধু বলিলেন, তুই যদি বিয়ে না করতিস অহীন, আমার কোন আক্ষেপ থাকত না।

অহীন্দ্র উত্তরে উমার দিকে চাহিল, উমার মুখে বেদনার্ত ম্লান হাসি; কিন্তু কোন অভিযোগ সেখানে ছিল না, তাহার জলভরা চোখে স্বচ্ছ জলতলে বাড়ববহ্নিদীপ্তির মত তরুণ প্রাণের আত্মত্যাগের বাসনা, জ্বলজ্বল করিতেছে। অহীন্দ্র মাকে বলিল, উমা কোনদিন সে-কথা বলবে না মা; উমা এ-যুগের মেয়ে।

সুনীতি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তারপর বলিলেন, একটু বিশ্রাম ক'রে নে বাবা, আমি ঠিক ভোরবেলা তোকে জাগিয়ে দেব। তিনি উঠিয়া গেলেন, বধূকে বলিলেন, দরজা বন্ধ ক'রে দাও বউমা।

উমা দরজা বন্ধ করিয়া অহীন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; অহীন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল, কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার ভয় হইতেছিল এখনই হয়তো উমা ভাঙিয়া পড়িবে।

কথা বলিল উমা নিজে; বলিল, শুয়ে পড়, এখন ঘুমিয়ে নাও।

অহীন্দ্র একান্ত অনুগতের মতই শুইয়া পড়িল। উমা তাহার মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালাইয়া যেন তাহাকে ঘুম পাড়াইতে বসিল।

ভোরবেলা, খানিকটা রাত্রি ছিল তখনও। সুনীতি আসিয়া ডাকিলেন, বউমা! বউমা!

উমা কখন ঘুমে ঢলিয়া অহীন্দ্রের পাশেই শুইয়া ঘুমাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঘুমের মধ্যেও তাহার উদ্বেগকাতর মন জাগিয়া ছিল, দুই বার ডাকিতেই তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল; তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে অহীন্দ্রকে ডাকিয়া তুলিল। অহীন্দ্র উঠিয়া জানালা খুলিয়া একবার বাহিরটা দেখিয়া লইল, তারপর একবার গভীর আবেগে উমাকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার কম্পিত অধরে প্রগাঢ় একটি চুম্বন করিল; কিন্তু সে ওই মুহূর্তের জন্য, সে জামা পরিয়া জুতার ফিতা বাঁধিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। উমা দরজা খুলিয়া দিল, সুনীতি আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, অহীন্দ্র আর কাহারও মুখের দিকে চাহিল না, হেঁট হইয়া মায়ের পায়ে একটি প্রণাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া দরজা খুলিয়া সে রাস্তায় বাহির হইয়া গেল, দরজায় দাঁড়াইয়া সুনীতি ও উমা দেখিলেন, রাত্রিশেষের তরল অন্ধকারের মধ্যে অহীন্দ্র যেন কোথায় মিশিয়া গেল।

বেলা দশটা হইতেই কিন্তু অহীন্দ্র আবার ফিরিয়া আসিল, তাহার সঙ্গে পুলিস। রেল-স্টেশনে পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইউ. পি. হইতে পুলিস জেলা-পুলিসকে টেলিগ্রাম করিয়াছিল। পুলিস এখন বাড়ি-ঘর খানাতল্লাস করিয়া দেখিবে।

অভিযোগ গুরুতর—রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং রাজকর্মচারী হত্যার ষড়যন্ত্র।

* * *

দশটা হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা তিনটা পর্যন্ত খানাতল্লাসি করিয়া পুলিসের কাজ শেষ হইল। ইন্দ্র রায়ের বাড়িও খানাতল্লাস হইয়া গেল। বাড়ির আশেপাশে লোকে লোকারণ্য

হইয়া উঠিয়াছিল। কাহারও চোখই শুষ্ক ছিল না, হ্যাণ্ডকাপ দিয়া কোমরে দড়ি বাঁধিয়া অহীন্দ্রকে লইয়া যাইতে দেখিয়া সকলেরই চোখ সজল হইয়া উঠিল। তাহার মধ্যে অঝোরঝরে কাঁদিতেছিল কয়েকজন; মানদা, মতি বাগ্দিনী প্রিয়জন-বিয়োগে শোকার্তের মতই কাঁদিতেছিল। আর কাঁদিতেছিল যোগেশ মজুমদার। লজ্জা এবং অনুতাপের তাহার আর সীমা ছিল না। সমস্ত কিছুর জন্য সে অকারণে আপনাকে দায়ী করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। এ-কান্না তাহার সাময়িক, হয়তো কালই সে কলের মালিকের ইঙ্গিতে চক্রবর্তী-বাড়ির অনিষ্ট সাধনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে, কিন্তু তবু সে আজ কাঁদিতেছিল। অচিন্ত্যবাবুও একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া বেশ স্ফুটভাবেই ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিলেন, এই মর্মন্তুদ দৃশ্য দুর্বল মানুষটি কোনমনেই সহ্য করিতে পারিতেছেন না। রংলালও কাঁদিতেছে। কেবল একটি মানুষ ক্রোধভরে আস্ফালন করিতেছিল, হুঁ হুঁ বাবা, এয়ারকি, গবরমেণ্টারের সঙ্গে চালাকি! সে শূলপাণি, সদ্য গাঁজা টানিয়া সে জ্ঞাতিশত্রু-নিপাতের তৃপ্তিতে আস্ফালন-মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

পুলিস অহীন্দ্রকে লইয়া চলিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী আছাড় খাইয়া পড়িলেন, উমা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, চোখভরা জল আঁচলে মুছিয়া সে মাকে ডাকিল, ওঠ মা। একদিন তো তিনি ফিরে আসবেন; কেঁদো না। হেমাঙ্গিনী মুখ তুলিয়া মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

ইন্দ্র রায় মাথা নীচু করিয়া পায়চারি করিতেছেন। রায়-বাড়ি ও চক্রবর্তী-বাড়ির মিলিত জীবন-পথ আবার ভাঙিয়া গেল। পরমুহূর্তেই মনে হইল, না না, ভাঙে নাই। বিপদ আসিয়াছে, আঘাত আসিয়াছে, সে-আঘাত দুই বাড়িকেই সমানভাবে বেদনা দিয়াছে; কিন্তু বিচ্ছেদ হয় নাই, দুই বাড়ির বন্ধন ছিন্ন হয় নাই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি ডাকিলেন ইষ্টদেবীকে, তারা, তারা মা! তারপর বলিলেন, ওঠ গিন্নী, ওঠ।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, ওগো, আর নয়, তুমি কাশী যাবে বলছিলে, কাশী চল।

যাব। অহীন্দ্রের বিচার শেষ হোক। মা যে বাধা দিলেন। উমা, তোর শাশুড়ী কোথায় গেলেন, দেখ্ মা।

রামেশ্বরের ঘরে সুনীতি মাটির উপর মুখ গুঁজিয়া মাটির প্রতিমার মতই পড়িয়াছিলেন, মৃদু নিশ্বাসের স্পন্দন ছাড়া একটুকু আক্ষেপ সর্বাঙ্গের মধ্যে কোথাও ছিল না; মহী যেদিন আত্মসমর্পণ করে সেদিনও ঠিক এমনি ভাবেই তিনি পড়িয়া ছিলেন।

খাটের উপর রামেশ্বর বসিয়াছিলেন পাথরের মত।

গভীর রাত্রি।

রামেশ্বর তেমনি পাথরের মূর্তির মত বসিয়া আছেন। তেমনি দৃষ্টি তেমনি ভঙ্গি। ঘরের মধ্যে তেমনি স্বল্প আলোক, আলোক-পরিধির চারিপাশে তেমনি নিথর অন্ধকার। সুনীতি তেমনি উপুড় হইয়া মাটিতে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছেন। উমাকে হেমাঙ্গিনী লইয়া গিয়াছেন। রায় লইয়া যাইতে চান নাই। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর কাতরতা দেখিয়া না বলিতেও পারেন নাই। অপরাধীর মত বলিয়াছিলেন, কাল সকালেই পাঠিয়ে দেব উমাকে।

একবার মাত্র মুখ তুলিয়া সুনীতি বলিয়াছেন, বেশ।

মানদা নীচে পড়িয়া কাঁদিতেছে।

শোকাচ্ছন্ন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রামেশ্বর বলিলেন, জল। শুষ্ক কণ্ঠস্বর দিয়া রব বাহির হইল না, কিন্তু ভাষা বোঝা গেল।

সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিলেন, মনে তাঁহার অনুতাপ হইল, আজ রামেশ্বরের খাওয়া পর্যন্ত হয় নাই। উঠিয়া তিনি দেখিলেন, উমা জলখাবার সাজাইয়া কোণের টেবিলের উপর নিয়মমত রাখিয়া গিয়াছে। জলখাবারের থালা ও গ্লাসটি আনিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, খাও কিছু। আমি ভুলে গেছি, মনে করতে পারি নি।

জলের গ্লাসটি শুধু তুলিয়া লইয়া নিঃশেষে পান করিয়া রামেশ্বর খাদ্য প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, না।

সুনীতি এতক্ষণে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রামেশ্বর মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন, অহীনের কি ফাঁসি হবে?

আর্তস্বরে সুনীতি বলিয়া উঠিলেন, না না, সে তো খুন করে নি, বিপ্লবের খুনের ষড়যন্ত্র করেছিল, খুন তো করে নি।

রামেশ্বর বলিলেন, তোমার পুণ্য, উমার ভাগ্য তাকে বাঁচিয়েছে।

সুনীতি চুপ করিয়া রহিলেন।

রামেশ্বর বলিলেন, আচ্ছা, ওরা আমাকে কেন সাজা দিক না। অহীন তো আমারই ছেলে। দোষ তো আমারই।

আবেগপীড়িত কণ্ঠে সুনীতি বলিলেন, না, না, আমার জন্যেই তোমার এত কষ্ট। তোমার দোষ নয়, আমার ভাগ্যের দোষ, আমার গর্ভের দোষ।

অতি ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া রামেশ্বর বলিলেন, না।

তারপর বহুক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন, জান না তুমি, কেউ জানে না। আমারই রক্তের দোষ। ছায়ামূর্তির মত মৃদু সঞ্চালনে হাত তুলিয়া অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওইখানে তোমার দিদিকে—রাধারাণীকে আর আমার প্রথম সন্তানকে গলা টিপে মেরেছিলাম।

সুনীতি আতঙ্কে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রামেশ্বর বলিতেছিলেন, একদিন দেখলাম, রায়-বাড়িতে রাধারাণী সুন্দর একটি ছেলের সঙ্গে হাসছে। সে তার পিসতুতো ভাই। আমার চরিত্র-দোষ ছিল কিনা, আমার সন্দেহ হ'ল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, সংসারে এই নিয়ম, 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ'। যে অন্ধ সে পৃথিবীকে অন্ধকারই দেখে, এ প্রকৃতির নিয়ম। রামেশ্বর নীরব হইলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, ছেলেটা হ'ল, তার চোখ চুল কালো হ'ল, আমাদের মত পিঙ্গল হ'ল না। আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। ঠিক মনে হ'ল, ছেলেটা তার মত দেখতে। একদিন শুয়ে ছিল ছেলেটা, গলা টিপে দিলাম।

সুনীতি থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, না না না। ব'লো না, ব'লো না।

রামেশ্বর নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পর আবার অকস্মাৎ বলিলেন, কিন্তু রাধারাণী বুঝতে পেরেছিল। হয়ত দেখেছিল। কিন্তু সে কাঁদলে না। শুধু বললে, যে চোখে তুমি এমন 'কু' দেখলে, ওই চোখ তোমার অন্ধ হয়ে যাবে।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, সে কাউকে কিছু বললে না, বাপের বাড়িও গেল না; একদিন কাশী যাবে ব'লে বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেল। সন্ধ্যেবেলা একাই চলে গেল। আমি সেই রাত্রেই স্টেশন থেকে তাকে ফিরিয়ে এনে, ওইখানে গলা টিপে—। যখন তার গলা টিপে ধরলাম, সে অভিশাপ দিলে, চোখ নয়, ওই দু হাতেও তোমার কুষ্ঠ হবে।

সুনীতির যে সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে। স্থান কাল পাত্র সব ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে তিনি স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন, নির্বোধের মত তিনি এবার বলিলেন, কই, তোমার তো কুষ্ঠ হ'ল না? চোখ তো অন্ধ হয় নি?

হয়েছিল; ভাল হয়ে গেল। মহীন আর অহীন ভাল ক'রে দিলে। একটি হাত ও চোখ দেখাইয়া বলিলেন, এইটে অহীন, আর এইটে মহীন। তারপর মৃদুস্বরে বলিলেন, তোমার গর্ভের দোষ নয়, আমার রক্তের দোষ। জান সুনীতি, আমাদের বংশ পাপের বংশ। নবাবরা দেওয়ালে পুঁতে মানুষ মারত। আমার কিন্তু সব পাপ নষ্ট হয়ে গেল। সব রোগ ভাল হয়ে গেল।

সুনীতি নীরবে বসিয়া রহিলেন, সুতা-কাটা ঘুড়ির মত তাঁহার মন জীবনকেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাকে আকর্ষণ করিতে আর কিছুতে পারিতেছেন না। বিহ্বল দিশাহারার মত উদাস তিনি।

কিছুক্ষণ পরেই বাহিরে পাখীরা কলরব করিয়া প্রত্যূষ ঘোষণা করিয়া দিল। রামেশ্বর চকিত হইয়া বলিলেন, ভোর হয়ে গেল? বলিতে বলিতে বিছানা হইতে নামিয়া তিনি জানালা খুলিয়া দিলেন। আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, সম্মুখে আকাশে মুক্তির বার্তা বহন করিয়া উদয়াচল হইতে মৃত্তিকার বুকে লক্ষ লক্ষ যোজনা অতিক্রম করিয়া ধারায় ধারায় আলোকের বন্যা ছুটিয়া আসিতেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে চারিদিক পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে, সমস্ত দেখা যাইতেছে—জীর্ণ রায়হাট, শীতের শীর্ণা কালিন্দী, ও-পারের চর, আকাশে উদ্ধত চিমনী, কলের সারি সারি অট্টালিকা, প্রশস্ত সুগঠিত পথ, লোকজনে ঐশ্বর্যময়ী চর।

চরটা চোখে পড়িতেই সুনীতি চমকিয়া উঠিলেন। সর্বনাশা চর। ব্যাকুলভাবে তিনি প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি—তুমি কি আমার সতীনের দেহ—ওই—ওই—ওই চরে পুঁতেছিলে?

সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া রামেশ্বর বলিলেন, না; বাড়িতে কুয়োর মধ্যে। সেটা বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

সুনীতি বিহ্বল বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, তবে? দিশাহারা বিহ্বল মনে উদ্ভট চিন্তা, উদ্ভট প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল। সতীনের কঙ্কালের উপর তো চরটা গড়িয়া উঠে নাই, তবে কেন এমন হইল?

রামেশ্বর সে কথায় কান দিলেন না, মুখ ফিরাইয়া আপনার দুইটি হাত শূন্যলোকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। তখন দিগন্তশিখরে সূর্য দেখা দিয়াছে; অতিরিক্ত আলোক অকৃপণ দীপ্তি ও উত্তাপ লইয়া রামেশ্বরের হাতের উপর ছড়াইয়া পড়িল। হাতের দিকে চাহিয়া রামেশ্বর বলিলেন, আঃ, কোন দাগ নেই, একেবারে সাদা হয়ে গেছে।

অস্থিচর্মসার রক্তহীন বিবর্ণ দুখানি হাত।

হাত দুইখানি যুক্ত করিয়া রামেশ্বর সূর্যকে প্রণাম করিলেন, জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

সুনীতি উদাস দৃষ্টিতে চরটার দিকে চাহিয়া ছিলেন, রামেশ্বরের কথা কানে যাইতেই তিনি আকাশের দিকে চাহিলেন; সম্মুখেই রক্তিম সূর্য, উদয়শিখর হইতে অস্তাচল পর্যন্ত মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ সর্ব-পাপঘ্ন দেবতার মহাদ্যুতিতে ঝলমল করিতেছে। তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে রায়হাটে, কালিন্দীর চরে, সর্বত্র—সর্বত্র।

ওই দূরে—নতুন ওঠা সর্বনাশা চরটার কোল ঘেঁষিয়া শীর্ণা কালিন্দীর বারোমেসে অগভীর অপরিসর জলধারা বহিয়া চলিয়াছে। মন্থর তাহার গতি এখন। কালের ভগ্নী কালিন্দী! কালিন্দীর জল-স্রোতের মধ্যে নূতন চরটার ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। গাছ-গাছালির মধ্যে চিনির কলের চিমনীটা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিমনীটার গায়ে প্রভাতসূর্যের রৌদ্র পড়িয়াছে—তাহাও ফুটিয়াছে প্রতিবিম্বের মধ্যে।

নিত্য প্রভাতে উঠিয়াই প্রথম এই চরটার ছবি ওই কালিন্দীর জলে দেখিয়া আসিতেছেন। চরটা যেন তাঁহার ভাগ্য, তাঁহার ঘর সংসারকে বেষ্টন করিয়া পাক দিয়া পাকেপাকে জড়াইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইত। আজ মনে হইল কালের ভগ্নী কালিন্দী মহাকালের নির্দেশকে প্রতিফলিত করিয়া চলিতেছে। আগে যেখানে কালিন্দীর জলে শুধু আকাশ ও নদীতীরের গাছ-গাছালি তৃণবনের ছায়া ভাসিত, আকাশে ওড়া বকের সারির ছবি ভাসিত —আজ সেখানে কালিন্দীর সেই স্রোতোধারায় উদয় সূর্যের আলোয় আলোকিত কলের চিমনী এবং চিমনীতে ওঠা ধোঁয়ার রাশি একটা অনির্দেশ্য শাসনের মত ভাসিতেছে বলিয়া মনে হইল। আরও ভবিষ্যৎ কালে এই চরের ভাঙা-গড়ার সঙ্গে আরও কত ছায়া আরও কত নবতর মূর্তি ওই স্রোতে ফুটিয়া উঠিবে, মানুষকে ভয় দেখাইবে, কে জানে। কিন্তু তাঁহার আর ভয় নাই। না। বরঞ্চ চরাচরব্যাপী আলোর মধ্যে যে আশ্চর্য অভয় আছে তাহারই স্পর্শ পাইয়া সুনীতি আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল।

পাষাণপুরী

এক

ঢং, ঢং, ঢং, ঢং—

ভোর চারিটার ঘড়ি পেটা শেষ হইয়া গেল। ওদিকে কোন একটা টাওয়ার ক্লকে শেষ দুইটা ঘণ্টা এখনও বাজিতেছে। চারি দিক্‌প্রান্তের অন্ধকার নিষ্প্রভ ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। সমস্ত ধরণী একটা তন্দ্রাতুর নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন। শুধু একটা সনসন শব্দ অবিশ্রান্ত স্রোতের মত বহিয়া চলিয়াছে—যেন ওই নিস্তব্ধ অন্ধকারের মাঝে কে মৃদু গুঞ্জনে বিলাপ করিতেছে।

হয়তো বা মা ধরণী,—

মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের লজ্জায়, বেদনায়, জীবধাত্রী বুঝি নিস্তব্ধ অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া লইতেছেন।

ঝাপসা অন্ধকার আর ওই সকরুণ সুর-শব্দের আচ্ছন্নতার মধ্যে বিশাল প্রাচীর-বেষ্টনীতে ঘেরা বন্দীশালা যেন একটা রহস্যপুরীর মত দাঁড়াইয়া আছে।

চারিদিকে পাষাণ-বেষ্টনী। সম্মুখে লোহার গরাদে ঘেরা বিশাল লৌহদ্বার মোটা লোহার শিকলের পাকে পাকে বাঁধা। লৌহদ্বারের সম্মুখে উদ্যতাস্ত্র জাগ্রত প্রহরী। তন্দ্রাতুর এলায়িত-তনু বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যেও শক্তিমানের শাসন সমান দৃঢ়, সমান রুক্ষ, সমান সজাগ রহিয়াছে। সে যেন শিথিল হইবার নয়।

বন্দীশালার ভিতরের রূপ তখন আরও ভয়াল।

চারি দিক্‌প্রান্তের স্বচ্ছতার মাঝে বন্দীশালার বুকে বুকে তখনও জমাট অন্ধকার জাগিয়া আছে। প্রভাতের অগ্রগামী ক্ষীণ প্রসন্নতা যেন ওই বিশাল প্রাচীর-বেষ্টনী লঙ্ঘন করিয়া আসিতে সাহস করে না।

ওই অন্ধকারের মধ্যে আলো ফেলিয়া সান্ত্রীর দল এধার হইতে ওধার পর্যন্ত পাহারা দিয়া চলিয়াছে।

'চার-ঘণ্টি' বাজিতেই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কয়েদীর দল উঠিয়া জাগিয়া বসিল। এইবার দ্বার খুলিবে, বাহির হইবার হুকুম আসিবে।

ভোরের একটা রহস্যভরা ঘুমঘোর প্রতি মুহূর্তেই তাহাদের অবসন্ন চোখের পাতায় পাতায় চাপিয়া বসে, সকলেই যেন ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতে চায়।

ঘরের বাহিরের বাঁধানো ফালি রাস্তাটায় শিথিল অবসন্ন পদের নাল-মারা বুটের আওয়াজ বাজিয়া গেল—খট্‌ আবার খট্‌। প্রহরীর পা-ও যেন আর চলে না। ওদিকে গুমটি হইতে হাঁক আসিল,—'আ—হো—চার নম্বর!'

নাল-মারা বুটের শব্দ ত্রস্ত ভাবে উচ্চতর হইয়া উঠিল; সিপাহী খাড়া হইয়া তালে তালে পা ফেলিয়া চলিল—খট্‌—খট্‌—খট্‌—খট্‌—

চার নম্বর ওয়ার্ডের ভিতরে কয়েদী, প্রহরী, মেট বিচিত্র সুরে গান করিয়া গণনা শুরু

করিয়া দিল—এক, দুই, তিন, চার,—

তন্দ্রাতুর বন্দীদল চকিতে সজাগ হইয়া বসিল। কি জানি কেন দীর্ঘশ্বাসও ফেলিল কেউ কেউ। হয়তো বা তাহাদের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—কত দিন না-দেখা প্রিয়ার মুখ, কচি শিশুটির মুখ, ওই রহস্যমাখা অন্ধকারে মিলাইয়া গেছে বুঝি।

সাইদ আলি দেখে তার হাতের উপর সদ্য-উষ্ণ কয় ফোঁটা জল। তবে তো তাহারা সত্যই আসিয়াছিল!

স্বপ্নেও তবে তো মানুষ আসে! নহিলে তার চোখে তো জল কখনও ঝরে না, সে তো জানে চোখের শিরায় তাহার জল নাই।

চোখ রগড়াইয়া সে ঘুম ছাড়াইতে চাহিল,—চোখের পাতা ভিজা।

চোখের কোণেও কয় ফোঁটা জল জমিয়াছিল। আঙ্গুলের চাপে সে জল গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

সাইদ নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল।

পাষাণের বুকের মধ্যে কোথায় থাকে নির্ঝরিণীধারা, পাষাণ আপনার সে পরিচয় জানে না,—খরমধ্যাহ্নে সে তৃষ্ণায় হা-হা করে।

অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকা হইয়া আসিল। লজ্জিতা জননীর মত আলোক-শিশুটিকে ধরণীর বুকে শোয়াইয়া দিয়া রজনী-মা ধীরে ধীরে বনান্তরালের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল।

আলোকের স্পর্শে চোখের ঘুম টুটিয়া গেল, সাইদ সজাগ হইয়া বসিল। মনটা তখন তাহার ধীরে ধীরে শক্ত হইয়া আসিতেছে। সে একটু হাসিল—আপনাকে ব্যঙ্গ করিয়াই হাসিল।

অন্ধকারে যে আসিয়াছিল—সে ওই অন্ধকারের মধ্যেই ম্লান মুখ লুকাইয়া কোথায় গেল!

ঢং ঢং করিয়া পাঁচটা ঘণ্টা বাজিল।

তখন চারিদিকে রক্ত-আলোর মধ্যে বিশাল প্রাচীর-বেষ্টনী সুস্পষ্টভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীরের রক্ত-রাঙা রং প্রভাত-আলোর আভায় উজ্জ্বল, দীপ্ত। মনে হয় ওই রক্ত-বর্ণটা কাঁচা, সদ্য মাখানো। হয়তো যুগ-যুগান্তর ধরিয়া কত বন্দীর আত্মা মাথা কুটিয়া ওর সমস্ত অঙ্গ রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে রং আজও বুঝি কাঁচা আছে, বন্দীর দল দৃষ্টি-মাত্রে শিহরিয়া উঠে।

ধীরে ধীরে প্রভাতালোক ঘরের মধ্যেও ফুটিয়া উঠিল। মোটা মোটা গরাদের ছায়া ক্ষীণ ম্লান রেখায় মেঝের উপর বাঁকা হইয়া জাগিয়া উঠিল।

বাহিরে খটাখট তালা খোলার শব্দ শুনিয়া এবার বন্দীর দল ত্রস্ত হইয়া সারি দিয়া বসিল।

নাল-মারা বুটের শব্দে ঘরখানা ভরিয়া দিয়া খাকী উর্দিপরা প্রহরীর দল কয়েদী গনিয়া গেল—এক, দো, তিন, চার—

গণনা শেষ হইলে বাহিরে ঘণ্টার শব্দ বাজিয়া উঠিল। এবার কয়েদীর দল সারিবন্দী

বাহির হইয়া আসিয়া মুক্ত আকাশের তলে সেই সারিবন্দী ভাবেই বসিয়া গেল—বগলে কম্বলের বাণ্ডিল, হাতে থালা বাটি। সিপাহী হাঁকিল,—'সরকার'—

এরা সব পুতুলের মত সেলাম বাজাইয়া গেল।

ততক্ষণে সাইদ আলি বেশ সামলাইয়া লইয়াছে।

সে তখন হাজতী আসামীদের প্রহরায় নিযুক্ত সিপাহীটার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে; কৌতুকে সে হাসি কত,—আর সে হাসির রূপই বা কি! বেদনার কণাও যার অন্তরে থাকে সে কখনও এমন হাসি হাসিতে পারে না। আর সে কৌতুক, রজনীর অন্ধকারে স্বপ্নাবরণের মধ্য দিয়া যে ম্লানমুখী নারীটি আসিয়াছিল তাহাকে লইয়াই হয়তো।

জীবনে বেদনাকে কি মানুষ এমনি করিয়া হত্যা করিতে পারে!

ওদিকে দশ নম্বর ওয়ার্ডে জানালার গরাদে ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল একটি সুকুমার কিশোর, পিছনে পিছনে আরও কয়জন,—প্রদীপ্ত শীর্ণ তনু, মুখে মিষ্ট হাসি। এতটুকু ম্লানিমা নাই কোথাও।

সেলাম বাজাইয়া কয়েদীর দল মুখ ধুইতে চলিল সেই সারিবন্দী ভাবে। চলিতে চলিতে ওই বহ্নিশিখার মত প্রোজ্জ্বল মূর্তি-কয়টির পানে ওরা একবার পরম বিস্ময়ে চাহিয়া গেল।

বিচারাধীন রাজদ্রোহীর দল। সম্মুখে দীর্ঘ কারাবাস, তবু ওরা এমন হাসি হাসে কি করিয়া!

বিস্ময় জাগিবারই কথা।

আবার এই নির্মম পাষাণপুরীকেই বলে—'মুক্তি-মন্দির'!

একজন কয়েদী হয়তো মৃদুস্বরে বলে,—আহা, দুধের ছেলে সব—

আর একজন প্রতিবাদ করে,—আরে ওসব গান্ধীজীর চেলা,—মহীরাবণের বেটা অহিরাবণ। ওরা মাটিতে পড়ে পড়েই লড়াই করে বাবা!

ওদের কণ্ঠস্বরে একটা সম্ভ্রমের আভাস পাওয়া যায়।

দশ নম্বরের ভিতরে তখন একটা হাসির কলরব উঠিয়াছে। ঘুমন্ত একজনকে কম্বলসুদ্ধ ঘরময় টানিয়া লইয়া পায়খানার দরজার গোড়ায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ওদেরই একজন কহিল,—আহা, ঘুমন্ত একজনকে—

যে টানিয়াছিল সে হাত নাড়িয়া বলিল,—উপায় নেই, আইন ইজ আইন। ওর মাঝে দয়ামায়া নেই। সত্যাগ্রহ জেল-আইনে ছ'টার পর ঘুমোলেই তার শাস্তি হচ্ছে কম্বল প্যারেড।

ঘুমন্ত-জন সেইখানে পড়িয়া পড়িয়াই বলিল,—সত্যাগ্রহ করলাম আমি, যতক্ষণ তোমরাই না সরিয়ে দেবে ততক্ষণ সরচি না। সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতার ভঙ্গীতে হাত পা নাড়িয়া শুরু করিল,—নড়িব না সূচ্যগ্র মেদিনী যতক্ষণ না সরাইবে তোমরা;—এই যাঃ, ছন্দ কেটে গেল!

বলিয়া এমন ভাবে হতাশা প্রকাশ করিল যে, সকলে কলরব করিয়া আবার হাসিয়া উঠিল।

ফাইল-বন্দী কয়েদীর দল চলিতে চলিতে ওদের পানে সবিস্ময়ে তাকায়। একজন আতঙ্কভরে কহে—সর্বনেশে হাসি—

অপর একজন মৃদুগুঞ্জনে সায় দেয়,—সর্বনাশী ঘাড়ে চেপেছে যে—

আর একজন, সত্যি, নইলে কি এমন হাসি মানুষে হাসতে পারে!

দশ নম্বরের ঘর হইতে ভারী গলায় কে কহিল,—উপাসনার সময় হয়েছে, এস তোমরা।

সমস্ত হাসি, চাপল্য এক মুহূর্তে নীরব, সংযত, সংহত হইয়া গেল। শান্ত-পদক্ষেপে ছেলেগুলি ধীরে ধীরে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। গেল না শুধু সেই ছোট ছেলেটি, প্রভাতের প্রথমালোকেই যে আসিয়া গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

শান্ত গম্ভীর সুরে উপাসনার গান ধ্বনিয়া উঠিল।

উপাসনা শেষ হইয়া গেল—এ ছেলেটি তখনও গরাদে ধরিয়া তেমনি দাঁড়াইয়া। আর একটি ছেলে আসিয়া তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিল,—নরু, একদিন উপাসনায় যোগ দিয়েই দেখ!

—না।

—কিন্তু সত্যাগ্রহী তুমি—

—ঠিক কথা সঞ্জীবদা, তাই আমি অননুভূত কিছুকে সত্য বলে মেনে মাথা নোয়াতে পারি না।

সঞ্জীব স্তব্ধ হইয়া গেল। নরু তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভাত-রাগরেখা তাহার রুক্ষ পিঙ্গলাভ চুলের উপর জ্বলজ্বল করিতেছিল। মন্দ বায়ে চুলগুলি মৃদু নাচিতেছিল—যেন ছোট ছোট আগুনের শিখা।

দিন আগাইয়া চলে,—

কয়েদীর দল আপন আপন নির্দিষ্ট কর্মে খাটিয়া যায়। জেলের কারখানার মধ্যে ঘানি ঘোরে, চাকি ঘোরে, ঢেঁকি চলে, ছাপাখানায় কাগজের পর কাগজে কালির হরফ উঠে, সতরঞ্চিতে ফুলের পর ফুল ফোটে, দড়ির দৈর্ঘ্য বাড়িয়াই চলে।

দশ নম্বরের সম্মুখে সেদিন একটা বুড়া কয়েদীকে ঘাস ছিঁড়িতে দেওয়া হইয়াছে। দারুণ রৌদ্রে সত্য সত্যই তার মাথার ঘাম পায়ের উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল। পাশেই একটা নিম গাছের ছায়া, বেচারী এদিক ওদিক চাহিয়া ওই ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইল। শীতল ছায়ার স্পর্শ যেন সান্ত্বনা মাখা, ঝলসানো দেহখানা তাহার জুড়াইয়া গেল। মুখ দিয়া আপনি বাহির হইয়া গেল—আঃ! সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের 'চাকি শেড' হইতে একটা কর্কশ কণ্ঠের বিশ্রী গালি শোনা গেল। বুড়া কয়েদীটা চমকাইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে গিয়া আবার ঘাস ছিঁড়িতে বসিল।

ততক্ষণে 'চাকি-শেড' হইতে সিপাহীটা তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বুড়া ভীত সন্ত্রস্তভাবে আড়চোখে পিছনপানে চাহিতেই সিপাহীর সহিত চোখোচোখি হইয়া গেল—নিষ্ঠুর নির্মম দৃষ্টি! বেচারীর বুকের রক্ত সেই দারুণ উত্তাপের মধ্যেও যেন হিম হইয়া গেল।

সিপাহীটা তাহার কোমরের চামড়ার পেটিটা দু'ভাঁজ করিয়া মুড়িয়া সজোরে বুড়ার পিঠের উপর চালাইয়া দিল—আর, দিল বেশ সহজ ধীরতার সহিত।

কয়েদীটার চোখের জলে, মুখের বিকৃত রেখায় বুকফাটা যাতনার কথা ব্যক্ত হইল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া এক বিন্দু আর্তনাদ বাহির হইল না। অন্তরের ও দেহের বেদনা গোপন করিতে বুড়া আরও ঝুঁকিয়া কাজে মন দিল।

দুরন্ত অগ্নিবর্ষণের মধ্যে সিপাহী আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সে 'চাকি-শেডে'র তলায় গিয়া মাথার পাগড়ি খুলিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিল।

এতক্ষণে বুড়া কয়েদীটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চোখের জল মুছিবার অবসর পাইল। চোখ মুছিতে মুছিতে সে আপন মনেই আক্রোশভরা নিম্নকণ্ঠে কহিল,—যায় জেলখানাগুলো একদিন ভূঁইকম্পে ভেঙে চুরমার হয়ে!

দশ নম্বরের জানালার ধারে দাঁড়াইয়া নরু কহিল,—কি নির্লজ্জ লোকটা!

জানালার ধারে দাঁড়াইয়া সে-ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তখনও পর্যন্ত তাহার গরাদে-ধরা হাতের মুঠি দুইটি লোহার মতই কঠিন হইয়া আছে।

পিছন হইতে সঞ্জীব কহিল,—অক্ষম দুর্বলের বিদ্রোহ এমনই হয় নরু। এই তার রূপ। দুর্বলের বিদ্রোহ শুধু অভিশাপ আর দীর্ঘশ্বাস!

নরু কিন্তু সঞ্জীবের কথা শোনে নাই, সে ওই বুড়াকেই লক্ষ্য করিতেছিল—

বুড়া ঘাস ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেপাইটাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—তোর আর দোষ কি! আমার পাপের সাজা, অদৃষ্টের ভোগ তো আমাকে ভুগতেই হবে।

নরু কহিল,—শুনচ সঞ্জীবদা?

সঞ্জীব কহিল,—সত্যি কথা ভাই। ওর পাপের সাজা ওকেই ভুগতে হবে।

নরু হাসিয়া কহিল,—পাপ-পুণ্যের একটা কল্পিত রেখা টেনে মানুষকে আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখবে সঞ্জীবদা? জুজুর ভয় দেখানো শিশুকেই ভাল, মানুষ তার শৈশব অবস্থা পার হয়ে এসেছে।

—তোমার কথা সত্য হোক, ধরণীর স্বপ্ন সার্থক হোক, কিন্তু নরু, তা হবার নয়। যারা শৈশব পার হয়ে এসেছে, তারাই অপরের শৈশব ঠেকিয়ে রেখেছে। নানা বিধানে, শৃঙ্খলে তারা দুনিয়ার শৈশবকে বেঁধে রেখেছে; নইলে যে তাদের বঞ্চনা করা চলে না। এ মানুষের প্রকৃতি, স্বার্থপরতা তার জীবনের ধর্ম। সাপের মুখে বিষ যে দিয়েছে, মানুষের বুকে স্বার্থপরতা সে-ই দিয়েছে। ভগবানের—

—ভগবানের কথা তুল না সঞ্জীবদা। আমি তাকে মানি না। সেই অন্ধ শক্তিকে মানুষ একদিন নিজের ইচ্ছায় পরিচালিত করবার স্বপ্ন দেখে।

নরুর চোখ দুটি দূর নীল আকাশের নীলিমায় নিবদ্ধ। যেন সে ভবিষ্যতের সেই অনাগত দিনটির দূরত্ব নির্ণয় করিতেছিল।

উত্তরে সঞ্জীব একটা কি বলিতে যাইতেছিল, হরেন আসিয়া সব উল্টাইয়া দিল। সে

দুইজনের মাঝে পড়িয়া হাত মুখ নাড়িয়া, ভঙ্গী করিয়া কহিল,—যাক্ যাক্, তর্ক করবার আবশ্যক নেই। প্যারাডাইস বুলেটীনের লেটেস্ট সংবাদ হচ্ছে কি জান? 'বিশ্বাসীর জ্বালায় এবং অবিশ্বাসীর ঠেলায় ভগবান ঠিক করিয়াছেন যে, 'বিশ্বাসীর কাছে তিনি থাকিবেন, এবং অবিশ্বাসীর কাছে তিনি থাকিবেন না।'

তাহার ভঙ্গী দেখিয়া নরু পর্যন্ত হাসিয়া উঠিল।

ভিতর হইতে কে গাহিয়া উঠিল,—"শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী চিরকাল কি রইবে খাড়া?"

হরেন চট্ করিয়া পাদপূরণ করিয়া গাহিয়া উঠিল,—চিরকাল কি খেতে হবে লপ্সি এবং পুঁইএর খাড়া? হায় রে কপাল!—বলিয়া সে হতাশভাবে সঞ্জীবের কপালে একটা করাঘাত বসাইয়া দিল।

আবার সেই সর্বনাশা হাসি!

বুড়া কয়েদীটা বিস্মিত হইয়া তাহার হাতের কাজ ভুলিয়া গেল।

নরু ধীরে ধীরে নিজের চরকায় গিয়া বসিল।

দুই

বেদে সাপকে ঝাঁপির ভিতর পুরিয়া রাখে, তার বিষদাঁত ভাঙে, বিষের থলি গালিয়া ফেলে; —কিন্তু বিষের উৎস তাহার নিঃশেষ হয় না। দিন দিন আবাব সে বিন্দু বিন্দু করিয়া সঞ্চয় করে।

দুনিয়ার প্রচলিত বিধানে পাষাণের অবরোধে পাপীকে আবদ্ধ করিয়া শিকলের পেষণে শাসক তাহার পাপকে বিনাশ করিতে চায়। কিন্তু তা হয় না। পাপীর পাপ শাসনে পেষণে নিঃশেষ হয় না, ভয়ে সাপের মত মনের কন্দরে গিয়া লুকায়। শুধু লুকায়ও না, কন্দরের মাঝে আহত সাপের মতই আক্রোশে গর্জায়। বিষকে অমৃতে পরিণত করিবার উপায় মানুষের বুঝি আজও জানা নাই। যদিবা জানা থাকে, তবে শক্তির মত্ততায় শাসন প্রয়োগের প্রলোভন সে ত্যাগ করিতে পারে না। তাই দাগী চোর জেল খাটিয়া ঘাগী হইয়া ফিরে।

পশ্চিম দিকের প্রাচীরের গায়ে নেবু বাগান। নেবু গাছের নিবিড়তার মধ্যখানে বেশ একটু গোপন স্থান। সেখানটিতে প্রাচীরের গায়ে সাইদ আলি উপুড় হইয়া ঝুঁকিয়া গলায় আঙুল দিয়া বমি করিতেছিল, আর এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছিল। গলায় আঙুল দিতেছিল কিন্তু এমন ভাবে যেন শব্দ না হয়। মুখ হইতে বাহির হইল সিকি, দু'আনি, হাফ গিনি কয়টা। গলায় ওর থলি আছে।

পাপের বোঝা গলায় বাঁধিয়া মানুষ মরণের বুকে ডুবিবে, তবু ত্যাগ করিতে পারিবে না।

একটা সিকি রাখিয়া বাকীগুলা সব আবার সে মুখে পুরিয়া বিচিত্র কৌশলে গলায় থলির মধ্যে রাখিয়া দিল।

হাসপাতালের ফটকে একটা কালা-পাগড়ি পাহারা দিতেছিল, তাহার কাছে আসিয়া সাইদ আলি কহিল,—মাল নিকালো—

কালা-পাগড়ি দশ-বিশ বছরের আসামী। এখন সে সিপাহী হইয়াছে। মাসে চার আনা তলপ। কালা-পাগড়ি পকেট চাপড়াইয়া হাত পাতিল।

সাইদ হাসিয়া সিকিটা দেখাইল, দিল না। কহিল,—একবার একটা সিকি মেরে দিয়েছে একজন। থো কড়ি খা পিঠে, বাবা, এক হাতে দাও—এক হাতে নাও।

দাঁত মেলিয়া কালা-পাগড়ি কহিল,—বহুত হুঁশিয়ার হো তু সাইদ আলি!

সাইদ আলি কহিল,—একবারকার রোগী ফেরবারকার ওঝা। দাদা, বের কর এক বাণ্ডিল বিড়ি, শিবের জটা চার পয়সা, একটা দেশলাই।

কালা-পাগড়ি হিসাব করে—তিন পয়সা বিড়ি, চার গো জটা, হুয়া সাত, আউর মাচিস এক পয়সা, আঠ, আঠ দোনা ষোলা পয়সা—চার আনা। ঠিক ঠিকসে নিকালকে লে আয়া! নিকাল না আওর একগো চৌ-নি, সাইদ আলি!

সাইদ আলি সরিয়া গিয়া তফাৎ হইতে কহিল,—বাবা, এক টাকার মাল দু' টাকায় বেচছ, আবার?

কালা-পাগড়ি হাসিয়া, পাগড়ি পকেট কোমর হইতে বাহির করিল গাঁজা, বিড়ি, দেশালাই। মুখে বলিল,—ই-তো জেলখানাকে রুল হায়,—দুনা দাম। জাস্তি তুম কেয়া দিয়া? হামকোভি তো দেনে হোগা!

জিনিসগুলা লইয়া সাইদ আলি বলিল,—হাতকে রুলকে গুঁতোর চোটে রুল তো বানায়া সব, আর হাম কিছু দানছত্র খুলা নেহি।

সাইদ আলি টুপি খুলিয়া মাথায় বিড়ি দেশলাই রাখিয়া টুপিটা চাপা দিল ও গাঁজার পুরিয়াটা রাখিল কোমরে, পেটির নীচে। সেও মেট—সৎ কয়েদী, সিপাহী হইয়াছে। চামড়ার পেটিও একটা মিলিয়াছে।

—সেলাম, কামমে যাতা, বলিয়া সে সরিয়া পড়িতে চাহিল।

কালা-পাগড়ি বলিল,—বৈঠ না থোড়া, তু তো মেট হো।

—তোমার কি বল? আসামীদের কাজ না হলে তখন তুমিই দেবে ঠাণ্ডা গারদ। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ও মাথায় নেবু গাছের তলা সাফ করিতেছিল একটা ছেলে; বছর পনের বয়স, মাথায় লম্বা চুল, কালো ঠোঁট, বসা চোখ, দীপ্তি তার ম্লান। শহরের চোয়াড়ে ছেলে। পকেট কাটায় চার মাস মেয়াদ হইয়াছে। আগে আরও বার তিনেক সে জেল ফিরিয়া গিয়াছে। কোন বিষণ্ণতা নাই, হেলিয়া দুলিয়া আবদারের ভঙ্গীতে ঘোরে ফেরে, আর বলে,—বেশ জায়গা

এ মাইরি, দিব্যি পাকা ঘর, তকতকে উঠোন। আর অভাবই-বা কিসের? দে মাইরি আমার পিঠটা চুলকে। একটা বিড়ি দে না ভাই—দিবি না, আচ্ছা! বলিয়া সে ঠোঁট ফুলায়।

সাইদ আলি ওর কাছে আসিয়া কহিল,—বিড়ি খাবি?

ছেলেটা যেন এলাইয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া দিল,—একটু কামও করে দে না মাইরি।

সাইদ আলি ওর কাজ করিতে বসিল। ছেলেটা বিড়ি টানিতে টানিতে ওর পিঠে চিমটি কাটিয়া দিল। সাইদ আলি চমকাইয়া কহিল,—উঃ!

ছেলেটা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সাইদ আলি কাজ ফেলিয়া ওর দিকে ফিরিয়া কহিল,—আচ্ছা, আয় গল্প করি দুটো। তোর কথা বল্। তোর বাপ মা—

—কে জানে তোর বাপ মা! মা বেটী রাস্তায় ফেলে সরেছে না মরেছে সে হারামজাদীই জানে। আর বাবা, দেখিইনি, তা তার নাম ধাম! বাবা আসত যেত গুলি খেত, মাথা দেখিনি। বলিয়া হাসে।

—পকেট-মারার দলে কদ্দিন আছিস?

ছেলেটা শুইয়া শুইয়া দিব্য বলিয়া যায়,—সে সাত বছর বয়সে। ওস্তাদজী বলে কি জানিস্? বলে, সোনায় তোর হাত বাঁধিয়ে দেব। দেখ্ দেখি হাতখানা ক্যায়সা পাতলা! শালা আঙ্গুল তো নয় যেন পালক, গায়ে হাত দিলে জানতেই পারবি না। বলিয়া ওর গায়ে হাত দিয়া যেন পরীক্ষা দিতে চাহিল।

সাইদ বলিল,—চারবার ধরা পড়লি কেন?

—তুই ধরা পড়লি কেন? ও ধরা পড়ে যায়,—বুঝলি? জানিস্, একবার সেপটী ক্ষুরের বেলেড দিয়ে চোরা পাকিট শালা এ্যাইসা চির দিলাম,—দু'হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল পাকা আমের মত হাতে এসে পড়ল। জানিস্, বুক চিরে তোর জান নিক্‌লে লোব, তুই জানতেও পারবি না। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

—দেখি তোর হাত,—পকেট মারতে কেমন পারিস? বলিয়া ওর হাতখানা সাইদ আপন মুঠোর মধ্যে পুরিয়া চাপ দেয়।

ছেলেটা হাসিয়া কহিল, ছাড়, লাগে! দূর—শুধু বিড়ি! এই লে তোর বিড়ি, বলিয়া পোড়া বিড়িটা সাইদের গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল।

সাইদ আলি কহিল,—দুধ খাবি? আয়, হাসপাতালের চৌকোয় চারটে বিড়ি দিলেই দুধ মিলবে।

ছোঁড়াটা উঠিয়া চলিতে চলিতে সাইদকে ঠেলা দিয়া কহিল,—একটা সিটি মারব মাইরি,—ভারী মন করচে।

—না না। জেলখানাতে যা করবি শালা চুপি চুপি। দেখিয়ে কিছু না,—চেঁচিয়ে কিছু না। জেলখানা—না গুমখানা।

—জানিস মাইরি, এ্যাসা সিটি মারব ভব্‌বুসে যে, সব শালা সেপাই ছুটে আসবে সত্যি সিটি ভেবে।

সাইদ আলি ছেলেটার হাতে আর একটা চাপ দিয়া কহিল,—তুই একটা জহরৎ রে!

ছোঁড়া কহিল,—গলায় ঝুলিয়ে রাখ্ তুই।

হাসপাতালের চৌকা হইতে ফিরিয়া সাইদ কহিল,—তুই বোস্ মাইরি, আমি একটা হাজতী আসামীর সাথে দেখা করে আসি। কবুল খাবে শালা।

—কোন্ বে রে? তোর দলের?

—না, কোন্ দলের কে জানে। তবু শালাকে দেখি যদি সামলাতে পারি।

—এখুনি সব আদালতে যাবে বুঝি?

—শুনলি না—দশটা বাজল!

—যা। বলবি শালাকে, জান যাবে কবুল করলে। আমাকে দেখাস তো শালাকে।

—দেখবি কি, কবুলী আসামী থাকে যে ডিগ্রীতে, পাছে কেউ বিগড়ে দেয়।

ওদিকে মোটরের হর্ন শোনা যাইতেছিল।

ছেলেটা বলিল,—ওই ভ্যাঁক্ ভ্যাঁক্ করচে, যা জলদি।

সাইদ আলি চলিল রান্নাশালায়। ছোঁড়াটা ঘাস ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে আপন মনে গান ধরিল,—মৃদুস্বরে।

গৌর দাস রান্নাশালের মেট, লম্বা মেয়াদের আসামী, পাকা লোক। সাইদ গিয়া কহিল,—ডাক্তার বাবু বলছিল এখানে ঘাস হয়েছে, মাছি হবে।

গৌর হাসিয়া কহিল,—ভয় নেই, সেপাই গেছে গুদমে।

সাইদও হাসিল, বলিল,—ডিগ্রীতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, ভাত দিয়ে এলাম। বলে এলাম শালাকে।

—সেপাই ঢোকেনি পিছু পিছু?

—ঢুকেছিল। আমি ঘরে ঢুকেই বললাম,—উঃ, কি গন্ধ ঘরে! শালা আর ঘরে ঢুকল না। ওকে বললাম,—দেখ্, কবুলই কর্ আর যাই কর্, তোকে জেলে দেবেই। কেন মিছামিছি কবুল করে দলসুদ্ধ ফাঁসাবি? দল বেঁচে থাকলে তোর মাগ ছেলের একটা হিল্লে হবে। বেরিয়ে একটা আশ্রয় পাবি।

—কি বললে?

—চুপ করে রইল। তখন শাসিয়ে দিলাম কি,—শালা কবুল করলেও তোমার জেল, খালাস হবে না। তখন এখানে আসতেই হবে। এসে পড়বে আমাদের হাতে—বুঝবে তখন। খাড়া-হাতকড়ি পরিয়ে রেখে দেব দুটি মাস। তখন বেটা বললে,—না না, আমি কবুল করব না। দাও—দাও, লোক দুটো লাগিয়ে দাও এখানে। ঘাস দেখে সাহেব চটে যাবে। বল না সিপাইজী, পরিষ্কার করে দিতে।

সিপাহী আসিয়া পড়িয়াছিল। গৌর দাসের কথা শুনিয়া কহিল,—দেও, দুটো আসামী হিয়া দে দেও।

ওদিকে মোটরের হর্ন বাজে ঘন ঘন।

দশ নম্বরের ছেলে কয়টিও চলিয়াছে, ওদেরও আজ বিচার হইবে। চারি-দিক-ঢাকা জেলের মোটরবাস। চালকের পাশে সশস্ত্র প্রহরী, দ্বারে প্রহরী, ভিতরে প্রহরী—উদ্যতাস্ত্র।

বাসে বসিয়াই সঞ্জীব আপন মনে গান ধরিয়াছে—

বেলা তিনটায় সকল কয়েদী আপন কাজের হিসাব লইয়া দাঁড়াইল। কেষ্ট দাস চুরির আসামী, দু'বছর মেয়াদ হইয়াছে। বাইশ-তেইশ বয়স—মুখখানি বেশ ডগডগে। কিন্তু বুকের পাঁজরা এক একখানি করিয়া গনা যায়। বেচারী বলে,—কি করব, রোজ জ্বর হয়।

গৌর উপদেশ দেয়,—হাসপাতালে যা।

—তা কি যাইনি! ওরা বিশ্বাস করে না।

—যা, তুই ফের যা।

কেষ্ট হয়তো ফের হাসপাতালে যায়।

—ডাক্তার বাবু, হুজুর হাতটা দেখুন।

ডাক্তার শাসাইয়া বলেন,—হাসপাতালে যাবার মতলব!

কেষ্ট দাস করুণ স্বরে উত্তর দেয়,—আজ্ঞে না, দেখুন—গা গরম।

—রোদ্দুরে গা গরম করেচ, এ্যা? ললিত, এরে এক দাগ দাও তো!

ললিত কম্পাউণ্ডার। সে ওর মুখে এক দাগ কুইনিন মিকশ্চার ঢালিয়া দেয়।

ডাক্তার ব্যবস্থা করেন,—কাল সাবু পাবি, আজ ভাত খাস্ গিয়ে। হিসেব আমি কাটতে নারি ফের।

বিকৃত মুখে কেষ্ট দাস ফিরিতে ফিরিতে বলে,—দড়ি একগাছা পাই তো গলায় দি।

আবার নিজের বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে,—মরব তো শীগগিরই। বুক হয়েছে দেখ না যেন ফুটো হাপর। তখন কি করবি শালারা! কাকে খাটাবি, চোখ রাঙাবি? মেথরে ফেলবে? তাই ফেলে যেন, আমার বয়েই যাবে।

তিন

কেষ্ট দাসের আজ কাজ পুরা হয় নাই, সে গম পিষিয়া শেষ করিতে পারে নাই। জমাদার কৈফিয়ৎ চাহিল,—রোজ তেরা এহি হাল?

কেষ্ট সভয়ে জবাব দিতে গেল,—আজ্ঞে, জ্বরে হুজুর—

জমাদার একটা পেটি কষিয়া বলিল,—জ্বর ভাগ যায়েগা। দোসরা রোজ হাম ছোড়বে

না, আপিসমে লিয়ে যাবে।

কেষ্ট দাস মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সরিয়া আসিল।

পেশী ফুলাইয়া সাইদ আলি দাঁত কস্ কস্ করিতে করিতে বলিল,—আমাকে মারুক তো! কি বলব, এটা জেলখানা, নইলে বেটা ছাতু—

একটু থামিয়া আবার বিরক্তিভরে কহে,—আরে ই-শালালোক যে ভয়ে পেছোয়, নেহি তো—

এ পাশ হইতে ছেলেটা বলিল,—আরে তু ভি তো ভাগচিস, তু সকৃবি?

—আলবৎ। আমাকে মারুক না দেখি? পরের জন্তে কে হাঙ্গামা করে?

গৌর বলিল,—রাক্ষস বেটারা একটা রোগা লোককে—

—চুপ কর্ ভাই, শুনলে আবার আমার বিপদ। যা বলেছিস সেই ঢের। আমাকে বেশী লাগেও নাই। বলিয়া কেষ্ট হাসিতে চেষ্টা করে। বলে,—দিন একদিন আসবে রে,—বেরুব তো একদিন!

ওই একটা দিনের আশাই এদের দুর্বহ জীবনকে সম্মুখের পথে টানিয়া লইয়া চলে। যখনই সুযোগ ও সময় মেলে ফটকটার ঘুলঘুলি দিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বুঝি দেখে—সেদিন আর কতদূর!

কেষ্ট কহে,—ফাঁক দিয়ে বাইরেটা দেখলে তবু মনে হয় একদিন বেরুবে।

গৌর বলে,—দূ-রো, ও আমি ভাবিই না। যখন মন হবে ওদের, তখন ছাড়বে।

সাইদ বসিয়া তখন মার্কার হিসাব করে, গৌরও বসিয়া যায়।

—বছরে তিন মাস। সাত বছরে তিন সাতে একুশ মাস। খাটা হল—এক বছর আট মাস।

মাটিতে খোলা দিয়া যোগ করে। একুশ আটে উনত্রিশ,—দু'বছর পাঁচ মাস—আর এক বছর, হল গিয়ে তিন বছর পাঁচ মাস। দূ-রো, ঢের বাকী।

কেষ্ট বলে,—আমার আর এক বছর দু'মাস ন'দিন।

সাইদ আপন হিসাবের অঙ্ক হাত দিয়া মুছিয়া একাকার করিয়া দেয়, ওর সেদিন হিসাব ধরা পড়ে না বুঝি।

বড় ফটক খুলিয়া নতুন আসামী আসিল ক'জন।

সাইদ জিজ্ঞাসা করিল,—কোন্ কেলাস ভাই?

দাঁত উঁচু কালো জোয়ানটি উত্তর দিল,—চওড়া আছে দাদা—"বি"।

আর ক'জন নতুন লোক, তাহারা এদের মুখপানে চাহিয়া রহিল। গৌর হাসিয়া বলিল,—এরা বুঝি নতুন লোক?

সাইদ তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করিল,—কি, ধান চুরি নাকি?

এতক্ষণে একটা ছোকরা ওপাশ হইতে দম্ভভরে উত্তর করিল,—ডাকাতি।

গৌর হাসিয়া কহিল,—বহুৎ আচ্ছা! মরদ হ্যায়!

সহসা সাইদ বলিয়া উঠিল,—আরে আরে, ও কে রে! ফের বেটা গুলি-খোর এসেচে,—ফুরুমিঞা এসেছে যে ফের।

ফুরুমিঞার মাথায় ফুলদার টুপি, পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা কোট। কটা চুল, কটা চোখ—রংটাও কটা ছিল, এখন তামাটে। মুখে ওর এক মুখ হাসি। ফটকের মুখ হইতেই ভুরু ঘন ঘন নাড়িতেছিল, ঘাড় দুলিতেছিল, ইশারায় ও সবার সাথে আলাপন সারিয়া লইয়াছে।

গুদামের জমাদারও ফুরুকে দেখিয়া হাসিয়া কহিল,—কেয়া, ফিন ঘুম্‌কে আয়া?

এক মুখ হাসির সাথে সেলাম জানাইয়া ফুরু উত্তর করিল,—জী হুজুর,—

—আরে, আভিতো পঁদরা রোজ নেহি হুয়া তুম নিক্‌লা হিঁয়াসে।

—হ্যাঁ হুজুর, রইতে নারলাম।

—কেয়া কিয়া ই-দফে?

—করব আর কি, পয়সা ছিল না, একজনদের বাসন ছিল ঘাটে, একটা বাটি তুলে নিয়েছিলাম। বলিয়া বেশ কৌতুকভরে হাসিতে লাগিল।

ওদিকে নতুন আসামীদের খবরদারকারী সিপাহী হাঁকিল,—এ শালা বদমাশ, আও আও।

—আসি হুজুর, দেখা তো হবেই, রইলামই তো।

ফুরুমিঞা ইশারায় ভুরু নাচাইয়া সবার সঙ্গে আবার কর্থ সারিয়া লইল। যাইতে যাইতে গুনগুন করিয়া গান ধরিল,—

'সইরে আমার—মনের কথা বলে আসা হ'ল না'-

বিরহ-কাতর আঁখি, ম্লানমুখী কোন সখীর স্মৃতি ওর বুকে জাগে কি?

দাঁত-উঁচু জোয়ানটি হাসিয়া ফুরুর হাতে একটা চিমটি কাটিয়া দিল। ফুরু গান ছাড়িয়া দিল,—উঃ!

দাঁত-উঁচু লোকটি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—বউয়ের জন্যে মন কেমন করচে?

ফুরু এবার সশব্দে হাসিয়া উঠিল,—হি—হি—হি; সিপাহী ধমক দিল,—এই উল্লু!

ফুরু সেলাম জানাইয়া বলিল,—সেলাম হুজুর, এ ব্যাটার বাড়ির জন্যে মন কেমন করচে,—তাই হেসে ফেলেচি।

জোয়ানটি চুপি চুপি কহিল,—তোর না আমার?

ফুরু বুড়া আঙুল নাড়িয়া জবাব দিল,—খট্ খট্ লবডঙ্কা। বউই নাই তা মন কিসের রে শালা? দোসরা দফে যখন দু'বছর মেয়াদ খাটি, তখনই সে পথ দেখেচে—নেকা করেচে। ওটা গানের গান। শোন্—শোন্, শেষটা শোন্—

'আমি তো-মায় ভুল-ব নাক, তু-মি যে-ন ভু-ল না'—

ডাকাতির নতুন আসামীটি আপন মনেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বিচারাধীন আসামী কয়টিও ফেলে।

কেমন যেন বিষণ্ণ ভাব। শুধু সেই ছেলেটি—নরু ছাড়া সকলে নীরবে রাঙা সুরকি বিছানো পথ বহিয়া চলিয়াছে। সকলের অঙ্গে কয়েদীর পোশাক।

মধ্যপথে একজন সিপাহী নরুকে বলিল,—আপ চলিয়ে ডিগ্রীমে।

ওদের বিচার হইয়া গেছে, বিচারে নরুর তিন বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। আবার জেল-গেটে আসিয়া জেল-পোশাক পরিবার সময় এক ঝগড়া বাধাইয়াছিল, তাহার জন্য ওকে পৃথক্ রাখার হুকুম হইয়াছে।

—আসি দাদা, বলিয়া নরু এদের কাছে বিদায় লইয়া চলিল ডিগ্রীতে।

এরা চলিল সব দশ নম্বরে।

চার

এদিকে কেষ্ট দাসের প্রহার লইয়া ওদের মধ্যে উষ্ণ আলোচনা তখনও শেষ হয় নাই। সবাই একটু প্রখর হইয়া নিজেদের মধ্যে তখনও জটলা পাকাইতেছে।

ওদিকে ঘণ্টা পড়িল,—ঢং ঢং ঢং—

সেই সঙ্গে ওদের ঐক্য ভাঙ্গিয়া গেল—অভ্যাস বশে সংকেতের আদেশে সবাই উঠিয়া পড়িল।

প্রতি মানব-মনে যে বিদ্রোহী বাস করে, সে বুঝি জাগিবার অবকাশ পায় না। একখানা শিকলে যেন সব গাঁথা, আর সে শিকলখানা অতি দ্রুত-আবর্তনে আবর্তিত হইতেছে, এতটুকুখানি পাশে সরিয়া যাইবার অবকাশ নাই, সারিবন্দী উঠা, সারিবন্দী বসা, সারিবন্দী চলা, সারিবন্দী খাওয়া। প্রত্যেক কর্মটি যন্ত্রের মত ঘণ্টার সংকেতে নিয়ন্ত্রিত। চিন্তা করিবার, বুক বাঁধিবার মুহূর্ত অবকাশ নাই। জীবনটা যেন যন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে।

সব আসিয়া জোড়া জোড়া সারিবন্দী বসিয়া গেল,—সম্মুখে থালা আর বাটি।

গৌর দাস পরিবেশন করে—রাঙা রাঙা ভাত এক বাটি, মসুরির ডাল এক ডাবুয়া, তরকারি এক ছটাক, আর খানিকটা নুন।

তাও এতটুকু পড়িয়া থাকে না; সকলে গো-গ্রাসে গিলিয়া চলে।

সাইদ আলি চৌকা হইতে চুরি-করা রুটি বাহির করিয়া ছেলেটাকে দিয়া কহিল,—শীগগির খেয়ে নে। আরও দিল এক টুকরা পেঁয়াজ, আধখানা লঙ্কা।

সম্মুখেই বসিয়া কেষ্ট দাস কাঙালীর মত ছেলেটার আহার্যের পানে তাকাইয়াছিল, এবার অসংকোচে বলিয়া ফেলিল,—খানিকটা লঙ্কা দে না ভাই, জ্বরমুখে কিছু ভাল লাগছে না।

সাইদ আলি অম্লান বদনে খাইয়া চলিল, ওর কথা যেন কানেই যায় নাই।

কেষ্ট আবার ডাকিল,—সাইদ মিঞা—

সাইদ স্বচ্ছন্দে ওর চোখে চোখ রাখিয়া রুটি চিবাইতে চিবাইতে বেশ বুঝাইয়া বলিল,—

জানিস্, এটা জেলখানা—

ছেলেটা খানিকটা পেঁয়াজ, লঙ্কা, আর আধখানা রুটি কেষ্টকে দিয়া সাইদ আলিকে বলিল,—আহা জ্বর হয়েচে, ভাত খেলে আরও বাড়বে।

সাইদ আলি জবাব দিল না, আপন মনে খাইয়াই চলিল।

কেষ্ট সভয়ে রুটি আর পেঁয়াজ ছেলেটাকে ফেরত দিতে গেল—না না, রুটি আমি খাব না, এই পেঁয়াজই আমার ঢের।

ছেলেটা বলিল,—আমার মাথার দিব্যি, তুই খা।

সাইদ আলির চোখের দৃষ্টিটা হইয়া উঠিল যেন সাপের দৃষ্টি, নিমেষহীন, ভাবলেশহীন।

কেষ্ট দাস যেন ভয়ে মরিয়া গেল।

খাওয়া হইয়া গেল, আবার ঘণ্টা পড়িল।

সিপাহী হাঁকিল,—সরকার—

ওরা আবার সেলাম বাজাইল।

আবার ঘণ্টা,—ওরা থালা বাটি তোলায় লাগিয়া গেল।

আবার ঘণ্টা। এবার ওরা সেই লাইনবন্দী চলে চৌবাচ্চায়—থালা বাটি পরিষ্কারে। সেখানেও তাই, ঘণ্টার সংকেতে বসে, ঘণ্টার সংকেতে জল তুলিয়া ধোয়, আবার ঘণ্টার সংকেতে উঠিয়া আসিয়া একে একে ঘরের সম্মুখে সেই ফাইলবন্দী বসিয়া যায়।

মেট গনিয়া যায়,—এক, দুই, তিন, চার। শেষে হাঁকে, চব্বিশ জোড়া, আটচল্লিশ আসামী।

এর পর জমাদার নাম ডাকে,—ওরা হাজির হাঁকে।

শেষ হইলে মেট আবার হাঁকে—সরকার—

ওরা সেলাম বাজায়।

তারপর সারিবন্দী পিপীলিকার মত ঘরে ঢুকিয়া যায়।

সিপাই দরজা বন্ধ করে, জমাদার চাবি বন্ধ করে, চীফ্‌হেড্‌ ওয়ার্ডার আসিয়া তালাগুলাকে সবলে টানিয়া দেখিয়া যায়; তখনও বাহিরে ঘোরে প্রহরী।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ওদের মূর্তি পালটাইয়া যায়। তুবড়িতে যেন আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ওদের ভিতরের গুপ্ত ফানুসটি যেন রং-বেরংএর ফুলঝুরির হর্‌রা ছুটাইয়া বাহির হইতে থাকে।

প্রথমেই এক দফা নৃত্য শুরু হইয়া যায়,—খেমটা, ঝুমুর, সাঁওতালী, আবার নাম না-দেওয়া কত নাচ। সবাই নাচে, দর্শক কেহ নাই। রোগা কেষ্টলাল, সেও মাথায় হাত দিয়া কোমর ঘুরাইয়া নাচিয়া বেড়ায়। নাচ থামিলে, সব আপন আপন বিছানা পাতিতে বসে। কম্বল ঝাড়ার একটা সাড়া পড়িয়া যায়।

আটচল্লিশখানা কম্বল একসঙ্গে বেতালা শব্দ করে—ফটাং ফটাং। প্রতিধ্বনিতে ঘর ভরিয়া যায়।

ঘরের মধ্যে চারিটা বড় বড় জানালা, একটা জানালায় ধার সাইদের, একটা গৌরের, একটা তহিদের, একটা জোবেদের।

তহিদ ডাকাতির আসামী। জোবেদও তাই।

সাইদ আলির পাশেই সেই ছেলেটা থাকে, সে বিছানায় বসিয়া বলিল,—বিড়ি দে।

সাইদ চুপ করিয়া রহিল, কথা বলিল না।

—রাগ করেছিস মাইরি?

সাইদ তথাপি চুপ, ছেলেটা হাসিতে লাগিল। সহসা সাইদ বলিয়া উঠিল,—দেব শালা রোগা পটকার জান একদিন মেরে,—তোর কাছ থেকে ফের যদি কিছু নেবে।

—আমি যে দিলাম—

—ও নেবে কেন? আমাকে চাইলেই তো দিতাম।

—তুই দিলি কই?

—না, দিলে না,—শালা পটল তুলবে এই রোগের ওপর খেয়ে।

ছেলেটা অনর্গল হাসিতে লাগিল। সাইদ আবার বলিল,—দেখিস আমি বললাম, বত্রিশটা দাঁত আমার,—আমার কথা ফলবেই। ও শালা এইখানেই থাকবে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি আর ওকে দেব না। তুই দিবি তো?

—জরুর! ও বেচারা রোগা! আমি কি পাথর যে, চাইলে দেব না! নে, বিড়ি নে। এই কেষ্টা শোন্।

কেষ্ট সভয়ে আগাইয়া আসিল। ওকেও একটা বিড়ি দিয়া সাইদ আলি বলিল,—বিড়ি খা। বোস্, একটান মালও পাবি—

ও কি বাহির করিয়া টিপিয়া বিড়ির মধ্যে পুরিল।

ওপাশে ঠিক তাই করে গৌরদাস। বিড়িটা খাইয়া গৌর কেমন ভাম হইয়া বসিল। সহসা সমাগত সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার ভেদিয়া ওর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল ঘর বাড়ি, একটি নারীর স্মিত হাসি, মনে পড়িল ছোট একটি ছেলের দুরন্তপনা, মনে পড়িল—

পাশের বুড়া সাঁওতালটাকে ডাকিয়া বলিল,—মাঝি!

মাঝির নয়নে তখন ঘুমঘোর চাপিয়াছে। সে শুধু উত্তর করিল,—উ!

ওই এতটুকু ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত উত্তর পাইয়াই গৌর বলিয়া চলিল,—আমার ছেলের কথা বলছিলাম মাঝি, এমন ছেলে আর হয় না! বুঝলি মাঝি! পথের পথিকে ডেকে কোলে করে। ফরসা নয়, তবু দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। ছেলেটারও কি, একেবারে কান্না নেই! যে হাত পাতবে তারই কোলে যাবে। তুই যখন বাড়ি যাবি তখন আমার বাড়ি হয়ে যাস। ওখানে খাবি, দেখবি আমার ছেলে কেমন, পরিবার কেমন লোক দেখবি। হাসি মুখে লেগেই আছে।

এইখানে সে একবার নীরব হইয়া গেল। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া চলিল, —তারা কি আর আছে রে, হয়তো শুকিয়ে আধখানা হয়ে গিয়েছে। তাও তুই যদি আমার

খবর নিয়ে যাস—কত যত্ন আত্তি করবে দেখবি তোকে।

মাঝি কোন উত্তর করিল না, গৌরও নীরবে জানালার বাহিরের পানে শূন্য মনে চাহিয়া রহিল।

অন্ধকার! শুধু জানালার ফাঁক দিয়া একটা ক্ষীণ দীর্ঘ আলোকের ধারা দিবসের বুকে ছায়ার মত লাগিয়া আছে। কালো আকাশে অগণ্য তারা ঝিকমিক করিতেছে। প্রাচীরের ওপারে বাগানের বড় বড় গাছগুলা নিবিড়তর পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মত মনে হয়। গরাদের ওপাশেও সবই অন্ধকার, প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ। যেন এই জেলখানা ছাড়া আর বিশ্বের কিছু নাই। এই গারদখানাটা বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, দুই এর মধ্যে এক বিরাট তমসা-প্রবাহের ব্যবধান।

মাঝে মাঝে আলোকের একটা রেশ জাগাইয়া এক জোড়া বুটের শব্দ একটার পর একটা শোনা যায়। সান্ত্রী পাহারা দেয়, এক পাশ হইতে আর এক পাশ পর্যন্ত বাতি হাতে অবিশ্রাম চলিয়াছে—খট্ খট্ খট্ খট্—একটা নিদিষ্ট সময় অন্তরে, নির্দিষ্ট তালে।

সান্ত্রী কাছে আসিতেই গৌরের চমক ভাঙ্গিল, সে কহিল,—মাঝি ঘুমোলি?

মাঝি উত্তর দিল,—হুঁ।

তার ঘুমে জাগরণে গৌরের কিছু আসে যায় না। সে বলিয়াই চলিল,—দেখবি আমার ঘর দোর, আর এক জোড়া বলদ যা আছে আমার—ইয়া হাত্তির মত। একটা সাদা, একটা কালো, গলায় আবার লাল রঙের বনাতের ওপর ঘুঙরে-ঘণ্টায় গাঁথা মালা। গাড়ি যখন চলে, তখন এ্যাসা তালে তালে বাজে যেন বাই নাচচে, ধর না গান তার সঙ্গে। আমার পরিবার তার সেবা করে নিজের হাতে। ভাতটি, মাড়টি, তরকারির খোসাটি দিচ্ছেই ডাবাতে—দিচ্ছেই। গরু দুটোও কি তার বশ! আমাকে মাথা নাড়ে, কালো রঙের কিছু দেখলে তো চার পায়ে লাফায়। কিন্তু যেই লালপেড়ে শাড়ির আঁচলটুকু দোয়ের গোড়ায় দেখতে পেয়েছে, অমনি মুখ তুলে দাঁড়াল। কিছু নাই তো সে শুধু হাতই বাড়িয়ে দেয়—তাই চেটেই ওদের সুখ।

গৌরের কথা আর চলিল না, ঘরে তখন কবিগান আরম্ভ হইয়া গেছে।

বিড়িটা টানিয়া কেষ্ট একটু চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। বলিল,—আমি আজ কবি গাইব সাইদ মিঞা।

—তুই পারবি?

—দেখ, জ্বরে কাবু হয়ে থাকি তাই। আমি খুব গাইতে পারি।

সাইদ বলিল,—বহুত আচ্ছা!

ছোকরাটা উঠিয়া মজলিস বানাইতে লাগিয়া গেল।

কেষ্ট বসিয়া বসিয়া গান ভাঁজিতে লাগিল।

ওপাশ হইতে উঠিল চৈতনা। সে বলিল,—আমি গাইব।

গণশা বলিল,—কেষ্টা জানে কি, –আমি গাইব।

সাইদ বলিল,—খবরদার, আজ কেষ্টা গাইবে—ও একটা হীরে। লাগ তোরা একে একে।

কবিগান আরম্ভ হইল। মাঝখানে গান—চারিদিকে সব ঘিরিয়া বসিয়াছে। বিচারক হইল সাইদ, গৌর, তহিদ আর জোবেদ।

কেষ্ট কোমরে হাত দিয়া নাচের সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় গান ধরিল—

জেলের মধ্যে কবিগান হয়ই বারো মাস,
গণশা শালার বদলে আজ গাবেন কেষ্টদাস,—
আপনারা দেবেন গো সাবাস্।

ছোকরা চেঁচাইয়া উঠিল,—সাবাস্—সাবাস্!

সাইদ বলিল,—বহুত আচ্ছা!

গৌরেরও উদাস ভাব কাটিয়া গেল, সে কহিল,—বেটা মানিক রে আমার!

গণশা রাগিয়া গেল, শ্রোতারা হাসিতে লাগিল—চুপি চুপি, সন্ত্রস্তভাবে।

সান্ত্রী পার হইয়া গেল, মেট বলিল,—ঠিক হ্যায়।

লালমারা জুতার শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল।

কেষ্ট আবার গান ধরিল—

আজকে আমি রাবণ রাজা চৈতনা আজ মন্দোদরী,
গোঁফ দুটো ভাই দাও কামিয়ে তবেই প্রেমের ছন্দ ধরি।

হাসির হর্‌রা বহিয়া গেল।

সহসা সাইদ হাঁকিল—চোপ, চোপ। আবার নিম্ন কণ্ঠে কহিল,—গান চালাও, ও নিয়মরক্ষে।

গান চলিল। কেষ্ট প্রশ্ন করিয়া যায়, চৈতন্য উঠিয়া গান ধরিয়া রসিকতার পাল্টা জবাব দেয়—

গোঁফ কামিয়ে মন্দোদরী ধরবে মুড়ো ঝাঁটা,
পরের নারী হরণ করার দেখাবে মজাটা।

সবাই হাসিতে লাগিল, গণশা খুব বেশী।

কেষ্টর প্রশ্নের জবাবটা কিন্তু ও ভাল করিয়া দিতে পারিল না, গোলমালে সারিয়া দিল।

কেষ্ট পালটা গাহিল—

কবি করতে আলি চৈতনা
তবু কি তোর গেয়ান হৈল না,
আপনকারা বিচার কর ও জবাব কেন কৈল না।

তারপর আবার ধরিল—

তোকে যেতে বল্লাম দুবরাজপুর, তুই চলে গেলি গুস্করা।
ওগো, তোরা বলে কয়ে মন্দোদরীর হুঁশ করা।

জুবরাজপুর পশ্চিমে গুস্করা দক্ষিণে। কাজেই এবার হাসিটা বিপুল বেগে পড়িয়া গেল।

ওদিকে ফটকে বাজিল নয়টা ঘণ্টা।

সমস্ত ঘরখানা আপনি নীরব হইয়া গেল। কবিগান ভাঙিয়া গেল। সব আপন আপন বিছানায় গিয়া শুইল।

কেষ্ট আপন বিছানায় গিয়া হাঁপায়, আর ছটফট করে। আবার জ্বর, যন্ত্রণা সব আসিয়া বুক চাপিয়া ধরে। জয়ের আনন্দ আর থাকে না।

চৈতন্য আর গণশা পাশাপাশি শুইয়া সকলের নিন্দা করে।

বাহিরে গুমটি হইতে হাঁকে,—এক নম্বর—

এক নম্বর মেট সাইদ গানের সুরে গণনা শুরু করিয়া দেয়,—এক, দুই, তিন, চার—

এক নম্বরের গণনা শেষ হইলে গুমটির জমাদার হাঁকে,—দো নম্বর।

পরের পর, পরের পর গানের সুরে গণনা চলে।

গৌর আসিয়া শুইয়া পড়িল, তার সে ঘোর তখন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে।

মাঝি কহিল,—দাস, আমি তোর বাড়ি—

ওর বুঝি এখন আর ঘুম আসিতেছিল না।

গৌর বিরক্তিভরে উত্তর করিল,—ভাগ, রাতদুপুরে ব্যাবুর ব্যাবুর। সান্ত্রী হাঁকিল,—এক নম্বর—

সাইদ হাঁকিয়া গেল,—এক, দুই, তিন, চার—

আর সব নিস্তব্ধ, যেন মরণ ঘুমে অচেতন।

পাঁচ

জেলের পূর্বধার ঘেঁষিয়া সেলের সারি। ছোট ছোট ঘর, ঘর বলিলে ভুল হয়,—পিঞ্জর, খাঁচা।

হিন্দুস্থানী সিপাই, কয়েদী সকলে এগুলিকে বলে—শের কা পিঁজরা। ওখানে থাকে খুনী, ডাকাত, দুর্দান্ত আসামী সব, যাহাদের বাহিরে রাখা নিরাপদ নয়। ওগুলিরই তিন নম্বর সেলে থাকে একজন সভ্য বাবু-চোর। মোটা টাকা ভাঙিয়া এখন জেলটাকেই বরণ করিয়া লইয়াছে।

ওর ব্যবস্থা সাধারণ কয়েদীর মত নয়, ও বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী। ওর ঘরে খাটের ব্যবস্থা, তাহার উপর তোশক, বালিশ। খাওয়া,—তাও উচ্চ শ্রেণীর, কারণ সাধারণ কয়েদী-জীবনে ও অভ্যস্ত নয়,—ওর ভাল খাওয়া, ভাল পরা অতীত জীবনে অভ্যাস ছিল।

মানুষটির ধরন অতি অদ্ভুত,—নিজের মত সগর্বে বলিয়া যায়, যুক্তিও বেশ বিচিত্র। সেদিন বিছানায় বসিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে বলিতেছিল,—আমি দুনিয়ায় ভোগ করতে এসেছি,

তার জন্য অর্থ আমার প্রয়োজন,—সে আমি যেমন করে হোক উপার্জন করেছি fair or foul! পাপ! কিসের পাপ? প্রায়শ্চিত্ত করলে পাপ মুছে যায়! সে প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রয়োজন টাকার। টাকা থাকলে সমাজে গো-বধ, ব্রহ্ম-বধ, সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যায়; কোর্টে জরিমানা দেওয়া যায়। সমাজের ঘৃণা!—সমাজ আবার কি? সমাজ তো একটা ভোগের জায়গা, বোধ হয় হাট বললেই মানেটা বেশী বোঝা যায়,—একটা মার্কেট। এখানেও সেই টাকাই হল বড় জিনিস। জান, দুনিয়াটা কার বশ? উত্তর ঐ কথাতেই পাবে, খুঁজে নাও। আর সার, সমাজ এই দুনিয়ার মধ্যেই!

তার কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলের মনে যেন একটা শঙ্কা বহিয়া গেল।

ও আরও হাসে আর বলে,—রাগ করো না দাদা! দেখ না, পয়সা ছিল আমার, তাই ভাল খেতে পরতে অভ্যাস করেছিলাম; তার ফলে দেখ জেলে এসেও তাতে বঞ্চিত হইনি। এ সেই পয়সার সম্মান। ছোট লোকের গায়ের গন্ধ সয় না, থাকি আলাদা সেলে; শুয়ে শুয়ে কারাদণ্ড ভোগ করি, ধূমপানে বাধা নাই। কিসের জন্য? ওই টাকা—money, দাদা, money is might, money is right, money is light.

ডেপুটি জেলার দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। রোষে তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, কহিলেন, —জানেন, এতে আমাদের সম্মানহানি হয়?

লোকটি তেমনি হাসিয়া উত্তর দিল,—আজকাল সম্মানহানির প্রতিকার কি জানেন তো? —মানহানির নালিশ। আর মানহানিরও বিনিময় হয় টাকায়। অবশ্য আমি তার জন্য মানুষকে দোষ দিই না; বরং তাদের বুদ্ধি অনেক উন্নত হয়েছে মনে করি। তারা যে আগের মত মানের জন্য প্রাণ পণ করে বসে না, তার জন্য congratulate করি তাদের।

ডেপুটিবাবুর মাথায় এর উত্তর যোগাইল না, হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা আসি। পাঁচ নম্বরে সেই সত্যাগ্রহী ছেলেটি আবার 'হাঙ্গার স্ট্রাইক' করে বসে আছে। বলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন।

বাবুটি একটি সিগারেট বাড়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —কেন?

ডেপুটিবাবু হাত পা নাড়িয়া যতদূর নিরাশা প্রকাশ করিতে পারা যায়, করিয়া বলিলেন,— আর বলেন কেন মশায়! সত্যি বলেন আপনি, সব fool-এর দল। কবে কোন্ সেপাই কোন্ বুড়ো কয়েদীকে পেটি মেরেছে, কাদের খাবার ভাল হয় না—যত সব পরের জন্যে ওদের মাথাব্যথা, আর আমাদের মরণ। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

বড় লোহার গেট যখন খোলে, মনে হয় একটা বিশাল দৈত্য হাঁ করে। তারই মাঝে শক্তির টানে প্রবেশ করে অপরাধীর দল। সেদিন আসিল একটা লোক—রুক্ষ শীর্ণ মূর্তি, লম্বা লম্বা পিঙ্গল চুলগুলি জটা বাঁধিয়া গেছে। ধূলি-ধূসরিত দেহ, তাম্রাভ রং, কোটরগত ছোট ছোট চোখ—তাহাতে পিঙ্গল তারা অস্থির ভাবে ঘুরিতেছে, দৃষ্টি অর্থশূন্য, কিন্তু যেন ভয়ার্ত। চারিদিকের সকল ছবিই যেন তাহার কাছে বিভীষণ ত্রাস-সঞ্চারী।

হাতে তার হাতকড়ি, কোমরে দড়ি, কপাল-জোড়া মস্ত একটা সদ্য-ক্ষতচিহ্ন,—সর্বাঙ্গে প্রহারের দাগ,—সেটা কালো কালো দাগগুলিতে অবরুদ্ধ রক্তধারা ভিতরে জমাট বাঁধিয়া গেছে।

পুলিসের দারোগা স্বয়ং জেলের আফিসে আসামীকে জমা দিতে লইয়া আসিয়াছে।

আহত আসামীটা গেটের রাস্তাতেই অবসন্ন ভাবে শুইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ দুইটা নিমীলিত হইয়া আসিল,—সমস্ত চৈতন্যশক্তি যেন তাহার নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়া গেছে।

দারোগা জেলারকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিল,—সাবধান, লোকটা কিন্তু বড় ভায়লেণ্ট।

জেলার জিজ্ঞাসা করিল,—কেসটা কি?

—খুন।

—ডাকাতি করতে গিয়ে খুন নাকি?

—না। লোকটা ছিল একঘরে। গ্রামের কারুকে মানত না, তাই গাঁয়ের লোক ওকে একঘরে করে। বেটা করলে কি, রাত্তিরে লাগাতে লাগল আগুন। নালিশ হল, ওয়ারেণ্ট বেরুল। ও হল ফেরার। ফেরার মানে নিরুদ্দেশ নয়—আজ এ-গ্রাম, কাল ও-গ্রাম এমনি আর কি। মোট কথা, ধরতে পারা যায় না। শেষ যেদিন, মানে দিন পাঁচেক আগে, আবার ও গ্রামে দিলে বেড়া-আগুন। সমস্ত গ্রাম পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। সেদিন গ্রামের সকল লোক ওর পেছনে করলে তাড়া; তিন দিন পেছনে লেগে লেগে ক'জনে ওকে এক জায়গায় ধরে ফেলে, কিন্তু তাদের মেরে ও আবার পালাল। ওই দেখচেন চিমড়ে চেহারা, কিন্তু দেহে সাংঘাতিক ক্ষমতা মশাই। তার ওপর জাত কামার, লোহা-পেটা হাত। বাগিয়ে ধরতে পারলে পিষে মেরে দেবে। হ্যাঁ,—সেখান থেকে পালিয়ে ও পাশের গ্রামের একখানা পড়ো-বাড়িতে গিয়ে ঢুকে পড়ে। বাড়িখানা কোঠাবাড়ি। সেই কোঠার ওপরে গিয়ে লুকোয়। গ্রামের লোক ধরতে গেল; ওর হাতে ছিল একখানা শাবল, সেই শাবলের ঘায়ে সামনের লোকটার মাথা একেবারে চুর করে দেয়। অথচ সে লোকটাও ছিল এরই বন্ধু, বদমাইশিতে দোসর—

জেলার শিহরিয়া কহিল,—Horrible!

দারোগা বলিয়া চলিল,—বীভৎস দৃশ্য সে মশাই। লোকটার মুখ চোখ ঘিলু রক্ত—উঃ, শরীর শিউরে উঠছে। লোকটাকে আর চেনবার উপায় নেই। আর সে লোকটা কি জোয়ানই ছিল! খুন হতেই গ্রামের সব লোক দে ছুট! তার পর আবার ও সেখান থেকে পালায়। শেষ সেখান থেকে আমরা তাড়া করে, তিন ক্রোশ দূরে আর একটা গ্রামে, মেরে ঘায়েল করে তবে ওকে ধরি। দেখুন না, কপালের ক্ষতটা আর—পিঠে মারার দাগ। তা-ও ভাগ্যিস্ তখন ওর হাতে কিছু ছিল না। আর খুন করে কতকটা অজ্ঞানের মতই হয়েছিল। হ্যাঁ, মারের ব্যাপারটা দেখবেন যেন টিকিটে—

জেলার জেল-টিকিটে ওর বিষয়ে লিখিতে লিখিতে একটু হাসিয়া কহিলেন,—আচ্ছা, টিকিট

লেখা শেষই হোক না ; তার পর কি লিখলাম দেখবেন।

দারোগা জেলারের দিকে একটা সিগারেট বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—নিন একটা সিগারেট খান।

কাজ শেষ করিয়া দারোগা চলিয়া গেল। একজন সান্ত্রী আসিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন আসামীটাকে একটা রূঢ় ঝাঁকানি দিয়া টানিয়া তুলিল।

ভয়ার্ত চিৎকার করিয়া লোকটা উঠিয়া বসিল। বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইয়া যেন সে দেখিতেছিল—কি এটা।

চারিদিকে অবরুদ্ধ প্রাচীর। লোহার ফটকের মাঝখানে সিক দেওয়া একটা খিলানের মধ্য দিয়া খানিকটা আলো আসে বটে, কিন্তু এতখানি অন্ধকারের মধ্যে সে কতটুকুই বা! তা-ও যেন ম্লান, ভীত সন্ত্রস্ত! ওই ম্লান আলোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেট-ওয়ার্ডার। মাথায় তাহার পাগড়ি, গায়ে খাকী উর্দি, বুকে পৈতার মত ঝুলান মোটা শিকল-বাঁধা চাবির থলে।

লোকটা আতঙ্কে ভয়ার্ত বন্য-পশুর মত দেহটা কুণ্ডলী পাকাইয়া বুকে হাঁটিয়া সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। গেট-ওয়ার্ডার গেটের তলায় চাবি ঘুরাইয়া ফটক খুলিয়া দিল।

ভিতরের ফটকটা খুলিতেই আলোকসম্পাতে রক্তবর্ণ দরজাটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আসামীর চোখ দুইটা আরও বিস্ফারিত হইয়া গেল।

জেলার বলিয়া দিল,—চার নম্বর ডিগ্রী।

একজন সিপাহী ওকে টানিয়া তুলিয়া কহিল,—আ-য়ো!

লোকটা চলিল, পার হইবার সময় ফটকটার গায়ে একবার সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া, চোখের সম্মুখে মেলিয়া অতি নিবিষ্ট চিত্তে দেখিল। তারপর নাকের কাছে লইয়া শুঁকিল। তাহাতেও যেন সে কিছু স্থির করিতে পারিল না।

আবার ঘন ঘন হাতটা মুঠি বাঁধিয়া ও খুলিয়া দেখিতে লাগিল। হাতটা যেন তাহার চটচট করিতেছে—আঠার মত!

সহসা ওর বিকৃত মুখ হইয়া উঠিল আরও বিকৃত, পাংশু, বিবর্ণ। সমস্ত দেহটা তাহার ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বিস্ফারিত দৃষ্টি তখনও পিছনের ওই রক্তবর্ণ দরজাটার দিকেই নিবদ্ধ।

জমাদার এবার ধমক দিয়া হাঁকিল,—আরে আ-য়ো—

লোকটা চমকিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সে যেন স্বপ্নে চলা। পথে দুই তিনবার ঠোক্কর খাইল। রাঙা কাঁকরের পথ ছাড়িয়া কে জানে কেন সে পাশের ঘাসের উপর দিয়া চলিতেছিল, সহসা বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা ওটা কি ফাঁসির আসামীর রক্ত?

খুনী আসামীর ভয়ার্ত বিস্ময়ে সিপাহী আশ্চর্য হইল না। খুনীদের এমন হয়। সে তাহাকে তাড়া দিয়া আদেশের টানে টানিয়া লইয়া চলিল।

এই বিশাল প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে চারিদিকে যেন মরণের এক কল্পিত ছবি মরীচিকার মত

কল্পিত ভয়ংকর হাসি হাসিতেছিল। চলিতে চলিতে শাসনের ত্রাস ভুলিয়া গিয়া বিহ্বল ভাবে আবার সে জিজ্ঞাসা করিল,—ওই যে ফটকের গায়ে মাখানো রক্ত, টকটকে লাল—

দয়া, স্নেহ, মায়া যেমন মানুষের একটা দিক, তেমনি নির্মমতা, নৃশংসতাও মানুষেরই আর এক দিক। শৈশব হইতেই সে প্রবৃত্তি মানুষ আপন বুকে পুষ্ট করিয়া তোলে। শিশু ফুল দেখিয়াও হাসে, আবার কীটকে কোমল হাতে দলিয়া মারিয়াও তাহার কম আনন্দ হয় না; তাই মানুষ অভ্যাসের বশে পশু, পাখি, মাছি শিকারের বস্তু করিয়া লইয়াছে। এটা তাহার খেলা। ইহাতেই তাহার আনন্দ। অভ্যাসের বশে কয়েদীকে শাসন করিয়া সিপাহীর কিছুমাত্র শোচনা হয় না, মানুষ মারিয়া সৈনিকের বুকে বাজে না। মানুষের বুক বিঁধিয়া বিজয়ী সৈনিক বাড়ি ফেরে সহজ আনন্দেই এবং আর একটি মানুষকে—হয়তো বা সে নারী—হয়তো বা সে শিশু—বুকে জড়াইয়া ধরে। এতটুকু বাধে না।

এর জন্যে সব চেয়ে বেশী দায়ী বোধ হয় সে-ই, যে দাগ টানিয়া টানিয়া এক মানুষের মাঝে শত জাতি, সহস্র শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে, শত লক্ষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছে।

বিহ্বলের ওই মৃত্যু-কাতরতা-ভরা প্রশ্নে তাই ওই সিপাহীটার মনে বিন্দুমাত্র দাগ পড়িল না। তাহার প্রশ্নের উত্তরে সে অতি স্বচ্ছন্দে একটা নির্মম ঝাঁকানি দিয়া কহিল,—কেয়া, পাগলা বন্‌তা হায়—না কেয়া?

আসামীটা ঝাঁকানিতে সচেতন হইয়া কহিল,—আজ্ঞে না, পাগল হইনি তো।

—তব, কেয়া বলছে তু?

—এটা তো জেলখানা?

পাশেই একটা কয়েদী বসিয়া ঘাস পরিষ্কার করিতেছিল, সে মুচকি হাসিয়া উত্তর করিল,—না, এটা তোর শ্বশুরবাড়ি। ন্যাকা রে!

লোকটা বিহ্বল দৃষ্টিতে শুধু তাহার পানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

কাপড়ের ঘর হইতে তাহার মিলিল দু'খানা কম্বল; গুদাম হইতে পাইল একখানা থালা, একটা বাটি।

সেখান হইতে তাহাকে লইয়া চলিল চার নম্বর সেলে।

পথে একটা পুরানো কয়েদী একে ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিসের মামলা?

পাগলা হয়তো সে কথাটা শুনিতেই পাইল না। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, ওই যে ফটকের গায়ে লাল টকটকে রং—ও রক্ত নয়? ফাঁসির আসামীর রক্ত বুঝি?

কয়েদীটা বিস্মিতভাবে তাহার মুখ-পানে চাহিয়া জিজ্ঞসা করিল,—খুন করেছিস?

সে পাংশুমুখে অতি ত্রস্ত হাত নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল,—না, না, খুন তো করি নাই—

ধমক দিয়া ওয়ার্ডার হাঁকিল,—এই—আ-য়ো, মারে থাপ্পড়!

পুরানো আসামীটা সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া পড়িল। এ লোকটা ত্রস্ত-পদে সিপাহীর অনুসরণ করিতে করিতে কহিল,—মনে নেই, আমার তো মনে নেই, মা কালীর দিব্যি, আমার মনে নেই। তখন—

ওয়ার্ডার আবার ধমক দিল বিরক্তিভরে—আরে !—

—আজ্ঞে, আমাকে চার দিন কুকুরের মত তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে। চারদিন কিছু খাইনি হুজুর,—চার দিন ঘুমোইনি।

সম্মুখে আসিয়া পড়িল এক নম্বর ডিগ্রী,—সেল।

সেলের প্রথমেই একটা অ্যান্টিসেল, তারপর সেল। অ্যান্টিসেলগুলি ঘরের বারান্দার মত। কিন্তু সেগুলিরও চারিদিক ঘেরা,—শুধু মাথার ওপরটুকু খোলা।

অ্যান্টিসেলের দরজাটা খোলা ছিল। ভিতরে লোহার গরাদে ঘেরা দরজা, তা-ও খোলা। ভিতরের কয়েদীটাকে একটু আলো বাতাস ভোগ করিবার অবসর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কয়েদীটার সে তৃষ্ণা যেন নাই। আপন বিছানার উপরে সে লম্বা হইয়া পড়িয়াই ছিল। লোকটা 'লালটুপি'।

ডাকাতি ও ব্যভিচারের অপরাধে উহার বারো বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। কিন্তু দুর্দান্ত লোকটা জেলের মধ্যে থাকিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই ; প্রথম বৎসরই একদিন সে জেল হইতে পলাইবার চেষ্টা করে। তারপর ধরা পড়িয়া মেয়াদ আরও বছর দুয়েক বাড়িয়া গেছে। তাই ওকে চিহ্নিত করিতে মাথায় উঠিয়াছে লাল টুপি, বাস হইয়াছে পিঞ্জরে—ওই সেলে।

লোকটা শুইয়া শুইয়া আপন মনে গান করিতেছিল—

'লাল গামছা ডুরে শাড়ি কিনতে হবে হাটে,
বউটি আমার দাঁড়িয়ে কাছে গাঁয়ের ধারে মাঠে।'

ছায়া-নিবিড় গ্রামপ্রান্তে পদচিহ্ন-আঁকা শীর্ণ একটি পথরেখার পাশে কোন্ প্রতীক্ষমাণা তরুণীর সতৃষ্ণ-নয়নের ছবিটিই বুঝি আজ হতভাগ্যের নিঃসঙ্গ নিঃস্ব-জীবনের একমাত্র সম্বল। তাই বারবার সে ওই গানটিই গায়। ওর বুকের ভিতরের কোমল মানুষটি ওই ছবিটির ছায়াতেই অতি কষ্টে বাঁচিয়া আছে। এত বড় বুকের আর সবখানা দখল করিয়া আছে নির্মম, নৃশংস-মানুষ।

বাহিরে সদ্য-আগত ধূলিধূসরিত ওই বিহ্বল মানুষটিকে দেখিয়া অকস্মাৎ তার ভিতরের কঠোর মানুষটি যেন কৌতুকভরে জাগিয়া উঠিল। গান ছাড়িয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—আরে, এ কে এল ?

খুনী আসামীটি তাহার দিকে তেমনি বিহ্বল-দৃষ্টিতে চাহিয়াই রহিল। 'লালটুপি' আবার জিজ্ঞাসা করিল,—ডাকাতি, না খুন ? কি সাঙ্গাত, কথা কইচ না যে ?

ওয়ার্ডার 'লালটুপি'কে একটা ধমক দিয়া কহিল,—চুপ রহো।

'লালটুপি' ধমকে ভয় পাইল না, ব্যঙ্গ করিয়া দাঁত মেলিয়া হাসিয়া উঠিল।

খুনী আসামীটা ধমক শুনিয়া ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিল,—কিছুই তো মনে নেই ! মা কালীর দিব্যি—

'লালটুপি' এবার উচ্চরোলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল,—সাক্ষাত বড় সেয়ানা। হোঃ-হোঃ-হোঃ—

এদিকে তাহারা দু'জন আসিয়া পড়িল দু'নম্বর সেলের সম্মুখে। তখনও 'লালটুপি'র নির্মম হাসিটা শোনা যাইতেছিল।

দু'নম্বরে একটা খিটখিটে রোগা লোক উর্ধ্ববাহু হইয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। উপরে দেওয়ালে-আবদ্ধ হাতকড়িতে তার হাত দুইটা আটকানো। জেলের আইন ভঙ্গ করার অপরাধে 'স্ট্যাণ্ডিং হ্যাণ্ডকাফ'—খাড়া-হাতকড়ি সাজা দেওয়া হইয়াছে।

লোকটার চোখ দুইটা যেন ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। বুকের প্রকট পঞ্জরগুলো অবশ পদের শিথিলতায় নীচের মাটির টানে ও উপরের হাতকড়ির টানে হাপরের মত প্রতি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে দুলিতেছে; মনে হয় এখনি ফাটিয়া যাইবে বুঝি।

ছবিটা দেখিয়া মনে হয়, জননীর বক্ষ হইতে যেন সন্তান কাড়িয়া লইতে চায় কোন বিজয়ী সৈনিক। নীচে বুক পাতিয়া টানে অনন্ত বাৎসল্যময়ী ধরিত্রী-জননী, আর উপরে টানে শক্তির লৌহ-শৃঙ্খল।

ওর ছবি দেখিয়া নতুন আসামীটা ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল। ওর মনে হইল, লোকটা বুঝি ফাঁসি কাঠে ঝুলিতেছে।

ওয়ার্ডারটির আর সহ্য হইল না। কোমরের পেটি ওর পিঠে সজোরে চালাইয়া শাসন করিয়া দিল।

তখনও চোখের সম্মুখে বোধ করি সে সেই ছবিই দেখিতেছিল; অতি আতঙ্কে স্থানকাল হারাইয়া সে ছুটিয়া পলাইতে চাহিল।

সিপাহী তাহার চুলের মুঠিতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল তিন নম্বর সেলের সম্মুখ দিয়া।

তিন নম্বরে থাকে সেই বাবু-চোরটি।

লোকটা তখনও অতি-আতঙ্কে তেমনি চিৎকার করিতেছিল। চিৎকারে বাবুটি বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করিল,—কে ?

একটু সম্ভ্রমের সহিতই সিপাহী জবাব দিল,—খুনী আসামী, বহুত বদমাশ! ভাগনেকো মতলব।

বাবুটি হাসিয়া কহিলেন,—ভয় নেহি দাদা, ছোড় দেও। জেলখানাকে পাঁচিল নিদ্ নেহি যাতা, হরদম খাড়া হ্যায়। ভাগেগা কাঁহা ?

সিপাহী রহস্যটা বুঝিয়া হাঁসিয়া ছাড়িয়া দিল। আসামীটা এতটুকু করুণা পাইয়াই আরও করুণার আশায় বাবুটির সেলটাতেই গিয়া ঢুকিয়া পড়িল। সিপাহী আবার তাহাকে ধরিতে যাইতেছিল, বাবুটি ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া নিজের হাতের সিগারেটটি আসামীটার দিকে

ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল,—নে, খা।

সিপাহী কহিল,—নেহি বাবু, এইস্তা রুল—

বাবুটি হাসিয়া কহিল,—আরে যানে দেও ভেইয়া! নে-নে, নে বেটা টেনে নে, গলায় রস হবে।

সিপাহীকে কহিল,—মিঠাই লে খাইও সিপাহীজী!

সভয়ে বাবুটির মুখপানে তাকাইতে তাকাইতে সন্তর্পণে আসামীটা আধপোড়া সিগারেটটায় ছুইটা টান দিল। শঙ্কিত দৃষ্টি, সর্বাঙ্গ তাহার কাঁপিতেছিল। একটা নির্যাতনের ভয়ে সর্বদাই সে যেন অস্থির।

বাবুটি জিজ্ঞাসা করিল,—কাকে খুন করেছ? বেটা বুঝি কৃপণ, বড়লোক ছিল? কত টাকা পেলে?

—দারোগা বাবু!

বাবুটি হাসিয়া বলিল,—আমিও চোর, দারোগা নই।

কথাটা যেন তাহার বিশ্বাস হইল না। পরম বিস্ময়ভরে নিজের মনেই কহিল,—চোর! চোর খাটে শোয়!

কথা শুনিয়া বাবুটি হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ওই বিহ্বল, বিস্ময়ভরা দৃষ্টি তাহার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। তাহার মনেও যেন ওর ওই দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতই একটি ব্যথিত আন্তরিকতা জাগিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাহার সহজাত লজ্জার সংস্কার মুহূর্তে খাড়া হইয়া আপন অস্তিত্বের সাড়া জানাইয়া দিল। বাবুটি মুখ কালো করিয়া ধমক দিয়া কহিল,—ভাগ্, ভাগ্ বেটা খুনী!

সিপাহীটা তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। কাতর ভাবে লোকটি বাবুটির মুখপানে চাহিয়া কহিল,—বাবু!

বাবু কহিল,—ভাগ্!

বলিয়া সে নিজেও উপুড় হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

এরা আসিয়া পড়িল চার নম্বরে।

পাঁচ নম্বর সেলে নরু কম্বলের উপর শুইয়া ছিল। সে অনশনব্রত লইয়া আহার পরিত্যাগ করিয়াছে। ডেপুটি জেলার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সাধ্যসাধনা করিয়া গেছেন। সে আহার গ্রহণ করে নাই।

একটা সিপাহী আপন বুদ্ধিমত সরল সত্য তাহাকে বুঝাইয়া গেছে,—ইসমে কেয়া ফায়দা বাবু! জান যায়গা আপকা, ছুনিয়া য্যায়সা চলতে রহা ঐসি মজেমে চলতে রহেগা।

নরু শুইয়া শুইয়া আপন মনে সেই কথাটাই ভাবিতেছিল। এত জনের এত কথার মধ্যে তাহার এই কথাটাই ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। রুদ্র দেবতার মরণ-খেলায় প্রতি মুহূর্তে লক্ষ কোটি জীবের অস্তিত্ব মমতাময়ী সুন্দরী ধরণীর বুক হইতে মুছিয়া

যাইতেছে। কে কাহার খোঁজ রাখে? এই মুহূর্তের শোকাশ্রু পর মুহূর্তের হাসির উচ্ছ্বাসে ডুবিয়া যায়।

ভাবিতে ভাবিতে নরু সহসা আপন মনেই হাসিয়া উঠিয়া বসিল।

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল,—পিপীলিকার একটা সারি। তাহারই অভুক্ত আহার্যের কয়টা কণা মেঝের উপর পড়িয়াছিল, তাই লইয়া তাহারা মহাব্যস্ত। আবার এই আহার্যের কণা লইয়াই তাহাদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধও বাধিয়া যাইতেছে। সারিটা চলিয়া গিয়াছে ওই দেওয়ালের মাথা পর্যন্ত। সেখানে আবার আর এক কৌতুক! একটা টিকটিকি ছাদ হইতে মধ্যে মধ্যে লাফ দিয়া আসিয়া উহাদের ধরিয়া ধরিয়া খাইতেছে। বহুক্ষণ একদৃষ্টে নরু এই কৌতুক দেখিল।

ও-ঘরের খুনী-আসামীটার মুহুর্মুহু আর্তচিৎকার তখনও ভাসিয়া আসিতেছে।

তিন নম্বরের বাবুটির গলাও শুনা গেল; অত্যন্ত বিরক্তিভরে কহিতেছে,—আজই ওকে ফাঁসি দেওয়া উচিত!

আবার সহসা উচ্চকণ্ঠে ধমক দিয়া উঠিল, Shut up you scoundrel!

ছাদ হইতে খসিয়া-পড়া পলেস্তারার একটা টুকরা দিয়া নরু মেঝের উপর দাগ দিতে দিতে লিখিতে লাগিল—

"মানুষের ভয়,—
সে তো কভু মরণকে নয়!
দুর্ভেদ্য তমসা-মাখা আবরণ তার
ভয় সেই; ভয় শুধু তারে অজানার।"

বাহিরে তালা বন্ধ করার শব্দ হইল। দিনের আলো বাহিরে ম্লান হইয়া আসিয়াছে। সেলের ভিতরে অন্ধকার ধীরে ধীরে আসন পাতিয়া বসিতেছে। নরুর সেদিকে দৃষ্টি নাই। সে আপন মনেই লিখিয়া চলিয়াছে,—

"কে,—কে,—কে দিবে সে রূপ পরিচয়,
মানুষেরে করিতে নির্ভয়?—

ছয়

খুনী আসামীটা সেলের এক কোণে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়াছিল।

স্বল্প-আলোকিত নির্জন সেলটার ভিতর একটা নিরাপদ আশ্রয় পাইয়াছে মনে করিয়া সে যেন বেশ একটু নিশ্চিন্ত বোধ করিল। কিন্তু দিনান্তের যে স্তিমিতপ্রায় আভাটুকু ঘরের অন্ধকাররাশিকে ঈষৎ স্বচ্ছ করিয়া রাখিয়াছিল, সেটুকুও ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতে শুরু করিল। মৃত্যু যেমন জীবের দেহে রুদ্র-রূপের কালো ছায়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে জীবনকে

তার নিঃশেষে গ্রাস করিয়া ফেলে—চারিদিক হইতে তেমনি একটা তরল অন্ধকারের স্রোত ক্ষণে ক্ষণে ওই আলোকাভাটুকুকে গ্রাস করিবার জন্যে সন্তর্পণে আগাইয়া আসিতে লাগিল।

বাহিরে সেলের পর সেলে তালা বন্ধ হইতে লাগিল। তালা চাবির খটাখট শব্দ, লৌহ-শৃঙ্খলের ঝনঝনা ওকে যেন স্থান কাল, বর্তমান ভবিষ্যৎ, সব স্মরণ করাইয়া দিল; ওর মনে পড়িয়া গেল এটা জেলখানা, সম্মুখে ওর—ফাঁসি, মৃত্যু।

সে বুক চাপড়াইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল,—হায় হায়, আমি এ কি করলাম গো! এ আমি কি করলাম!

সহসা ওর সেলের দরজায়ও শব্দ হইল; ওর করুণ আক্ষেপও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। কোনও আশায় নয়—একটা নির্যাতনের আশঙ্কায়।

সেলের দরজাটা খুলিয়া প্রবেশ করিল কয়েদী পাচক, আর তার পিছনে আলো লইয়া প্রহরী।

—থালা পাত—থালা। ভাত নে—

আসামীটা পাচকের পানে বিমূঢ়ভাবে তাকাইয়া রহিল, সে তাহার কথা কিছু বুঝিতেই পারে নাই যেন।

সঙ্গের সিপাহীটা ধমক দিল,—এই, থালি নিকালো!

থালাটা সম্মুখে পড়িয়া, অথচ লোকটা বিহ্বলের মত চারিপাশে খুঁজিতে লাগিল। ওর মনের মধ্যে হয়তো থালার ছবি জাগিতেছিল না, জাগিতেছিল ওই যমদূতাকৃতি সিপাহীর নির্মম মূর্তিটা।

সিপাহীটা অগত্যা কয়েদী পাচকটিকেই বলিল,—দেও, দেও, তুম্‌হি থালাটো লিয়ে দিয়ে দেও।

খাবার দিয়া পাচক ও সিপাহী চলিয়া গেল। বাহিরে তালা চাবি শিকলের ঝনঝন শব্দ ভিতরের বন্দীটিকে আবার শঙ্কাতুর করিয়া তুলিল। সন্তপিত দৃষ্টিতে ওই শব্দ লক্ষ্যে সম্মুখের বন্ধ-দ্বারের অন্ধকার পানে চাহিয়া আসামীটা ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল রাখিয়া-যাওয়া সম্মুখের ওই থালাটার উপর।

অস্থির চক্ষে তাহার একটা বিচিত্র দৃষ্টি খেলিয়া গেল। ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া সে থালাটা টানিয়া আনিল আপন বুকের তলায়। তার পর অতি ভীরু লোলুপ-বুভুক্ষায় ঘন ঘন গ্রাসে সমস্তটাই যেন ও একনিঃশ্বাসে শেষ করিয়া ফেলিতে চাহিল। শ্মশানচারী শৃগাল যেমন অপরের লুব্ধ দৃষ্টি বাঁচাইয়া সত্যলব্ধ শবদেহটাকে গ্রাসের পর গ্রাসে নিঃশেষে উদরস্থ করিয়া ফেলিতে চায়, ঠিক তেমনি ওর ভীরুতা, তেমনি লোলুপতা, তেমনি ব্যগ্রতা। সে গ্রাস করিতে চায় কিন্তু গিলিতে পারে না; রসনা রসহীন, লালাহীন জিহ্বাগ্র হইতে সমস্ত বুকটা যেন শুষ্ক মরুভূমি,—হু হু করিতেছে। ভুক্ত আহার্য সমস্তটা উগারিয়া ফেলিয়া দিয়া, বাটির জলটা ঢকঢক করিয়া নিঃশেষে পান করিয়া ও মাটির বুকের উপর এলাইয়া পড়িল। উদ্গিরীত উচ্ছিষ্ট গায়ে, হাতে, সর্বাঙ্গে লাগিয়া গেল; সেদিকে দৃষ্টি নাই, হাত মুখ পর্যন্ত ধুইবার খেয়াল নাই—বুঝি শক্তিও নাই।

ক্লান্তি—ক্লান্তি, দারুণ অবসাদ!

দেখিতে দেখিতে বিশ্বরাজ্যের ঘুম আসিয়া যেন ওকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

—ওঠো, ওঠো, ওগো, শীগগির ওঠো—

ও তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখে,—ভয়ত্রস্তা বাসিনী।

হ্যাঁ, সেই তো! সেই কালো পাথরে খোদা সেই সুন্দর রূপ, সেই বড় বড় চোখ, নাকে সেই তারই দেওয়া ওপেলের নাক-ছাবিটি, কানে লাল পাথরের সেই দুটি টিপ! সেই চলকো লালপেড়ে শাড়ি, সেই পানের রঙে রাঙা ঠোঁট! বাসিনীই তো!

ও বাসিনীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—বাসিনী, কেউ দেখেনি তো? তোর বাবা, দাদা—

বাসিনী অতি ত্রস্তভাবে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—না, আজ আমাদের বাগ্দী-পাড়ায় ভাসান-গান হচ্ছে। তুমি বেরিয়ে এস শীগগির।

—কেন?

—ঘরে শেকল দিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারবে তোমাকে।

—কে?

—আবার কে? সে মুখপোড়া রাখাল মজুমদার। আজ সে-ই আমাদের পাড়ায় ভাসান গানের পয়সা দিয়েছে। আমাদের বাড়ির পেছনে দু'দলে বসে সব পরামর্শ করছে, আমি শুনে এলাম। আর একটু বাদে তোমার ঘরে আগুন দেবে, আর আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

বাসিনী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নিজের বুকে বাসিনীর মুখখানি আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল,—কার সাধ্যি? কালী কামার বেঁচে থাকতে কোন শালার সে সাধ্যি নেই। বোস্ তুই এখানে।

—না না, তুমি বেরিয়ে এস, ওরা শেকল দিয়ে ঘরে আগুন দেবে।

একটা বিপুল সাহসের মৃদু হাসি হাসিয়া কালী কহিল,—আচ্ছা চল।

তখনও তারা বেশী দূর যায় নাই। বাসিনী পিছন ফিরিয়া সহসা আতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠিল,—ওই দেখ, আগুন দিয়েছে—

কালী ফিরিয়া দেখিল, হ্যাঁ আগুন! তাহারই ঘরখানা জ্বলিতেছে।

ভয়ে ভয়ে বাসিনী বলিল,—ওগো, আমি যাই, এখুনি লোক জমবে!

আর একবার আগুনটার পানে চাহিয়া ও বলিল—আচ্ছা যা, সাবধানে থাকিস।

বাসিনী চলিয়া গেল।

কালী নিজের প্রজ্বলিত বাড়িটার দিকেই আগাইয়া চলিল।

•

ওই যে, ওরই ঘরের আগুনে সমস্ত গ্রামখানা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে,—ওই যে শূন্য পথ বহুদূর আলোয় আলোময় হইয়া গিয়াছে, উপরে আকাশ নিবিড় কালো; নীচের অন্ধকার

আলোর ভয়ে উপরে গিয়া জমাট বাঁধিয়াছে।

ওই—কোলাহল!

হাঃ হাঃ হাঃ, চমৎকার,—পোড়াও, কালী কামারকে পুড়িয়ে মার! কেমন, তোমাদের দেওয়া আগুন তোমাদের বুকে কেমন ছড়িয়ে দিয়ে এসেছি!

জল, জল, জল!

হাঃ হাঃ, জল শুকিয়ে গিয়েছে; তোদের অধর্মে পাপে বোশেখের স্থয্যি জল শুষে নিয়েছে। কাঁদ, কাঁদ, চোখের জলে নেভে তো দেখ।

ওই, ওই, রাখাল মজুমদারের ঘর জলছে,—ওই উঁচু তেতলা ঘর। ওঃ আগুনটা যেন আকাশ ছোঁয় ছোঁয়! কি লাল! পাকা পাকা শাল কাঠ, রং দেওয়া দরজা,—শুধু কি তাই, কত গরিবের বুকের রক্ত—লাল হবে না! নিবি, শালা বুড়ো ষণ্ড, বাসিনীকে কেড়ে নিবি?—বামুন হয়ে বাগদীর মেয়ের উপর লোভ! খুব খাও বাবা ব্রহ্মদেব, খুব খাও।

ও কি? আগুনের আলোয় দেখা যায় নড়ে চড়ে—ও কি? মানুষ? হ্যাঁ মানুষই তো! গ্রাম ছেড়ে পালায় বুঝি!—

তাই, তাই ঠিক। আগুনের আঁচ সওয়া কি সোজা কথা! পাকা পাকা শাল-কাঠ পুড়ছে, রং পুড়ছে, কাঁসা—ভাল ভাল খাগড়াই বাসন গলে টলটল করছে, লোহা গলছে, বারান্দার রেলিং, লোহার সিন্দুক, তার ভেতরে টাকার কাঁড়ি, সোনার গয়না গলছে, গলে টগবগ করে ফুটছে; সে কি সোজা আঁচ! খানিকটা লোহার আঁচেই কালী কামারের বুকটা সদাই তপ্ত ঝাঁ ঝাঁ করে, বুকের রোঁয়াগুলো পুড়ে যায়,—আর, এ বাবা রাশি রাশি লোহা, পেতল, কাঁসা, তামা, রুপা, সোনা!

কেমন, যাও রাখাল মজুমদারের তাঁবেদারী করগে যাও,—কালী কামারকে একঘরে কর, তার ঘরে আগুন দাও, দাও! হাঃ হাঃ—

ওকি? ওরা যে এ দিকেই আসে! ধরতে আসে না-কি?

হ্যাঁ, ওই যে শোনা যায়—'ওই—ওই শালা কামার, ধর, পোড়াব শালাকে আজ; ওই জলন্ত ঘরে হাত পা বেঁধে ফেলে দেব! ধর—ধর'—

ওই যে লোকগুলা সত্যই ছুটিয়া আসিতেছে!

লোহার মত বুকখানাও ওর কাঁপিয়া উঠিল, অসম্ভব দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল; ও নিজেও যেন সে শব্দ শুনিতে পাইতেছিল। বেচারা পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু যেন পায়ে পায়ে বাঁধিয়া যায়; ছুটিতে পারিল না।

উদ্বেগে আশঙ্কায় ওর বুকটা আরও দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিন্তু আর দ্রুত চলিবার শক্তিও বুঝি সে যন্ত্রটার নাই, এইবার বুঝি একেবারে থামিয়া যাইবে!

সহসা তন্দ্রা টুটিয়া গেল, ও উঠিয়া বসিল, সর্বাঙ্গ ওর স্বেদাপ্লুত হইয়া গেছে, আকণ্ঠ তৃষ্ণা!

উঃ—জল, জল, জল!

অন্ধকারে বুকে হাঁটিয়া লোকটা মেঝেটা হাতড়াইয়া ফিরিতে লাগিল, জলের বাটিটা হাতে

লাগিয়া উলটাইয়া গেল, সামান্য যে জলটুকু ছিল সেইটুকুও মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িল।

ওর হাত পড়িল ওই স্বল্প সিক্ততাটুকুর উপর—আঃ, জল, এই যে জল!

পশুর মত মেঝের জলটুকু ও জিভ দিয়া চাটিয়া খাইতে শুরু করিল।

কতটুকু, কতটুকু,—আর নাই, আর নাই যে!

হতাশ ভাবে ওই সিক্ততাটুকুর উপরেই ও শুইয়া পড়িল।

আঃ, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা! জুড়াইয়া গেল, আগুনের আঁচে ঝলসানো দেহখানা ওর যেন জুড়াইয়া গেল!

আঃ, বাঁচিয়াছে সে, এমন ঠাণ্ডা জায়গা, আর এমন গোপন স্থান!—অন্ধকার, নিজেকেই নিজে ও দেখিতে পাইতেছে না, এখান হইতে কে খুঁজিয়া বাহির করিবে?—খোঁজ, খোঁজ, খুব খোঁজ শালারা—

বাহিরে ফটকের ঘণ্টায় বারোটা ঘা পড়ে।

এ সময় পাহারা বদল হয়—অনেক ক'টি তৎপর পদের বুটের আওয়াজে বাঁধানো ফালি-রাস্তাটা মুখর হইয়া উঠে, দরজার তালাগুলি ঘটাঘট শব্দে টানিয়া দেখা হয়। ভিতরের স্তব্ধ অন্ধকার ওই কঠিন শব্দধ্বনিতে যেন শিহরিয়া উঠে; বন্দিশালার ভিতরের বন্দীগুলার মতই যেন তাহারও তন্দ্রা টুটিয়া যায়।

ওই আওয়াজে জেলের খুনী আসামীটির সদ্য-আগত তন্দ্রাটুকু ছুটিয়া গেল। বেচারী জমাট অন্ধকারের মাঝে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া বিহ্বলের মত দেখিতে লাগিল—এ কোথায় সে!

অন্ধকার—শুধু অন্ধকার! সহসা অ্যাণ্টিসেলের দরজার ঘুলঘুলি দিয়া কে একটা আলোক-রশ্মি নিক্ষেপ করিল। ওই রশ্মিটুকুতে তার নজরে পড়িল—গরাদে-ঘেরা পিঞ্জর-দ্বারের মত সুকঠিন দরজাখানা আর চারি পাশের নির্মম পাষাণ-বেষ্টনী।

সব মনে পড়িয়া গেল। জেলখানা, ফাঁসি!

উঃ, গলায় দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া দিবে; গলাটা সরু, লম্বা হইয়া যাইবে, চোখ দু'টা বিস্ফারিত বীভৎস—হয়তো বা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবে; কত যন্ত্রণা—উঃ কত যন্ত্রণা!—হয়তো বা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কত ব্যর্থ চেষ্টাই তাহাকে করিতে হইবে।

সত্যই তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল যেন! নাসারন্ধ্রের লওয়া নিঃশ্বাসে আর কুলায় না,—মুখখানা আপনি হাঁ হইয়া যায়,—জিভটা বাহিরের দিকে টানে যে! বাঁকিয়াও যাইতেছে যে!—

কি বীভৎস,—কি ভয়াবহ!

বুক চাপড়াইয়া ও কাঁদিয়া উঠিল। বাহিরে সান্ত্রী হাঁকিল,—খবরদার!

তাহার আর কাঁদা হইল না। কিন্তু সে ভাবিতেও যেন আর পারে না। চুপ করিয়া আচ্ছন্নের মত মেঝের ওই সিক্ততাটুকুর উপরে ও পড়িয়া রহিল।

বাহিরে সব নিস্তব্ধ হইয়া গেছে, ক্ষণপূর্বের আলোকে শব্দে বিচ্ছিন্ন রহস্য আবার যেন

ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু রজনী প্রবাহের একটা ক্ষীণ অবিচ্ছিন্ন সুর আর মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ওয়ার্ডারের বুটের আওয়াজ বাজিয়া চলিয়াছে—খট্—খট্—খট্—খট্।

শ্রান্ত চোখ দুইটা তার আবার তন্দ্রায় মুদ্রিত হইয়া গেল, আবার বাস্তবের দুঃসহ স্মৃতি নিদ্রার প্রশান্তিটুকু তার বিভীষিকায় পূর্ণ করিয়া দিল।

—বিশ্রাম, বিশ্রাম, একটু বিশ্রাম—তা না হইলে আর প্রাণ যে বাঁচে না!

—এইখানে, হ্যাঁ, এইখানেই বেশ নির্জন, এই অন্ধকারে এই প'ড়ো-বাড়িটায় এই দোতলা কোঠাঘরে একটু বিশ্রাম। এখানে আর কে সন্ধান পাইবে?

চারি রাত্রি ঘুম নাই, চারি রাত্রি;—তিনটা দিন বিশ্রাম নাই, সোয়াস্তি নাই, ছুটিয়াছে, কেবল ছুটিয়াছে—প্রাণের জন্য শিয়াল কুকুরের মত ছুটিতে হইয়াছে। ঘুমে যে চোখ আপনি মুদিয়া আসে!

তাই হোক,—ঘুম আসে আসুক।

এই যে একটা শাবল;—থাক্ শাবলটা হাতের গোড়ায়।

—তোরা আমার ঘরে আগুন দিলি, আমি দেব না?

—আয় না সব দেখি—একা একা আয়, কে কেমন মরদ দেখা যাক! দেব শাবলের ঘায়ে পিণ্ডি পাকিয়ে!

—আমার জেল হলে তোদের হবে না? হাকিম যখন জিজ্ঞাসা করবে, তোদের ঘরে না হয় আগুন দিলে ও, কিন্তু প্রথমেই ওর ঘরে আগুন দিলে কে? নিজের ঘরে তো নিজে কেউ আগুন দেয় না! তখন?

—আমিও বলব, আগুন দিইনি হজুর, ঘরের আগুন ঘরে লেগেছে, কাউকে লাগাবার দরকার হয়নি। তোরাই যাবি জেলে, আমি খালাস!

—এবার বাসিনীকে নিয়ে গ্রাম ছেড়েই চলে যাব। যেখানে খাটব সেইখানে ভাত! বাসিনী! আঃ, সে কি সুন্দর কালো-পাথরে খোদাই করা চেহারাখানি, কি ঢলঢলে চোখ, কি চুল—

—ও কি? বাইরে ও-শব্দ কিসের?

চাপা গলায় বাহিরে যেন কারা কথা কয়!

—ঠিক তাই, ওই যে বলছে এই ঘরেই। আমি একটু তফাতে ছিলাম, ওপরের কোঠায় ঢুকছে।

উঃ, এখানেও? এ তো রামা গয়লা!

ওই আবার কে কয়,—'থাক, তোরা চারিপাশ ঘিরে থাক, যেন জানলা-টানলা দিয়ে না পালাতে পারে, আমি ওপরে উঠছি।'

এ যে ভূপতি মিস্ত্রী, মিতে ভূপতি!

উঃ—, সে সুদ্ধ ওদের সাথে জুটেছে! শয়তান, দুনিয়াসুদ্ধ সব শয়তান। বন্ধুত্বের দাম

নেই, কাউকে বিশ্বাস নেই। ওর পায় কাঁটা ফুটলে আমার সইতো না! আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই, আয়, আমিও কালী কামার; কই, এই যে শাবল। শালা হাতির মাথা চুর করে দেব।

নীচে তখনও যেন জল্পনা-কল্পনা চলে, 'না না, ভূপতি, ওপরে যেয়ো না, বে-কায়দায় কি জানি—'

'কিছু ভয় নাই।'

'তবু, কাজ কি? পুলিসে খবর তো গিয়েছে।'

'না, ওকে না মেরে আমার মনের জ্বালা মিটছে না। আমার সর্বনাশ করেছে ও, আমি ওর কি করেছিলাম? জান, সমস্ত গাঁয়ের কথাতেও ওকে আমি ছাড়িনি, তার ফল এই! দেখব আজ ওর কত হিম্মৎ!'

উপরে ও গর্জিয়া উঠিল,—হিম্মৎ? আও, চলা আও! ওঃ, হাতের শাবলটা নাচে যে! না, মিতে—মিতে—

ভূপতি বলিল, হুঁশিয়ার তোরা, আমি উঠছি, ভূপতি মিস্ত্রীর হিম্মৎটা দেখাব আজ।

—খবরদার ভূপতি! মেরে ফেলব, খুন করব, খবরদার—

—খবরদার কেলে! ধরা দে বলছি ভালোয় ভালোয়, নইলে জানে মেরে দেব। আর তোর পালাবার পথ নেই—

কালী ভাবিল, ধরবে! ওই জানলা দিয়ে পালাই, কিন্তু নীচেও যে লোক, তবে? ধরলে ওরা নিশ্চয় সেই আগুনে ফেলে দেবে। ওই এল, কি করি, কি করি? এই যে শাবল হাতে রয়েছে, মার—

ওই পড়েছে! কেমন? ইস, ওকি? মুণ্ডুটা চেপটে বসে গেল! ঘিলু, রক্ত,—ইঃ—ইঃ—এখনও নড়ছে, এখনও নড়ছে,—উঃ—উঃ—

দারুণ বিভীষিকায় তাহার স্বপ্নালু তন্দ্রা আবার টুটিয়া গেল, পাগলের মত ও উঠিয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু তার চোখের বিভীষিকার ঘোর তখনও কাটে নাই—

—এই যে, এই যে রক্ত! উঃ,—কত রক্ত!

কৃষ্ণা একাদশীর নিশাতে তখন আকাশে চাঁদ উঠি-উঠি করিতেছে, নিবিড় নিকষ-কালো অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে; ওই স্বচ্ছতায় মেঝের উপর জলের দাগটুকুকে ওর স্বপ্ন-বিভ্রম-ভরা চোখে রক্ত বলিয়া মনে হইল।

ও হাত দিয়া তাড়াতাড়ি ওই সিক্ততাটুকু মুছিতে শুরু করিয়া দিল। কিন্তু মুছে না, সিক্ততাটুকুর পরিমাপ ঘর্ষণে ঘর্ষণে আরও বাড়িয়াই গেল।

—ও কে? অন্ধকার কোণে দাঁড়াইয়া ও কে? চেপটা, বসে-যাওয়া বীভৎস মুণ্ড, ঘিলু রক্তে ওই অঙ্গ ভেসে যাচ্ছে। ও কে? ভূপতি? হ্যাঁ, ও-ই ত!

—এখনও মরে নাই! শাবল, কই শাবল?

—আচ্ছা আয়, নখে করে ওই বীভৎস মাথাটা ছিঁড়ে ফেলা যাক!

বাঘের মত অন্ধকার কোণে ওই অলীক ছায়া-ছবিটার ওপরে ও ঝাঁপাইয়া পড়িল।

—কোথায়—কোথায় ভূপতি?

দেওয়ালে ধাক্কা লাগিয়া দারুণ আঘাতে ও নিজেই নিস্পন্দের মত মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল।

তখন চাঁদ উঠিয়াছে। রাত্রি-শেষের হিমধারার সহিত ওই চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধতা গরাদের ফাঁক দিয়া সন্তর্পণে মেঝেয় প্রবেশ করিয়া ওর সর্বাঙ্গে যেন লঘু হস্তে শুশ্রূষার স্পর্শ বুলাইয়া দিল।

বাহিরে চারিদিক স্তব্ধ। শুধু সিপাহীর সেই অবিশ্রাম বুটের শব্দ;—তাও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, ঠিক তালে তালে আর পড়িতেছে না। ওদিকে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কয়েদীদের অবসন্ন আচ্ছন্ন কণ্ঠ এলাইয়া পড়িতেছে, মাঝে মাঝে শোনা যায়, আবার যায় না।

তিন নম্বরে বাবুটি বালিশে মুখ লুকাইয়া বোধ করি কাঁদিতেছে।

চার নম্বরে তরুণটি বোধ করি তখন স্বপ্ন দেখে, শ্যামল ধরণীর বুক হইতে ওই আকাশ অবধি ব্যাপ্ত তার মায়ের রূপ, মায়েরই দীপ্ত কপালে শোভা পায় ওই চন্দ্রকলা, সীমন্তে জলজ্বল করে ওই শুকতারা!

'লালটুপি'টাও তন্দ্রায় আচ্ছন্ন, মুখে ওর মৃদু হাসি,—হয়তো বা গৃহ-পরিত্যক্তা প্রতীক্ষমাণা তরুণী বধূটি ওর মনের বুকে গাঢ় আলিঙ্গনে শয়ন করিয়া কানে কানে কত কথাই বলিতেছে।

মূর্ছাহত আসামীটির আবার ধীরে ধীরে চেতনা ফিরিয়া আসিল, জাগিয়া বেচারা ওয়ার্ডের মত চারিপাশে তাকাইতে লাগিল।

চন্দ্রকলার ক্ষীণ রশ্মিতে ঘরটা তখন বেশ দেখা যায়। দরজার গরাদেগুলার ছায়া বাঁকা বাঁকা হইয়া ঘরের মেঝের উপর স্পষ্ট জাগিয়া উঠিয়াছে।

—এ কি! এই যে রক্ত এখন স্পষ্ট দেখা যায়। ওই যে দরজার শিকগুলাতেও রক্ত!

ত্রস্তভাবে আবার ও মুছিতে শুরু করিয়া দিল।

হায়, হায়—মুছে না যে!

চারি-পাশে খুঁজিতে খুঁজিতে এক কোণে রাত্রির অভুক্ত ভাত-তরকারিগুলি পাইল; তাহাই লইয়া ও জলের দাগের উপর লেপিতে শুরু করিয়া দিল।

—এগুলা কি? ঘিলু, ঘিলু, মাথার ঘিলু! ওরই চর্বিত উদ্গিরীত উচ্ছিষ্টগুলিকে ওর ঘিলু বলিয়া ভ্রম হইল। সেগুলা সে ত্রস্তভাবে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

—ওই যে গরাদেগুলাতেও রক্ত! কিন্তু আর তো কিছুই নাই; কি লেপিবে?

—ওই যে টুকরিতে কাদা!

টুকরির দুর্গন্ধ মল লইয়া উন্মাদটা দুয়ারে গরাদেগুলাতে দু'হাতে মাখাইতে লাগিয়া গেল।

আঃ, মুছেচে, অনেকটা মুছেচে। এইবার নিশ্চিন্ত। আর কেউ ধরতে পারবে না।

আর কাঁদা হইবে না ; ফুর্তি করিতে হইবে, হাসিতে হইবে,—

প্রাণপণে সে হাসিতে আরম্ভ করিল,—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং,—ভোর পাঁচটার ঘড়ি বাজিয়া গেল, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কয়েদী গুনিয়া দরজা খুলিয়া দিল। কয়েদীর দল বাহির হইয়া আসিল।

খুনী আসামীটার সেলের দুয়ার খুলিয়াই সিপাহীটা পিছাইয়া গেল।

ভিতরের দুয়ারে, আপনার সর্বাঙ্গে ওর ময়লা মাখানো। আর লোকটা প্রবল ভাবে হাসিতেছে—হি হি হি হি হি হি।

মেথর আসিয়া জল দিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিতে শুরু করিল।

কালীর সমস্ত বুকটা যেন ভয়ে কেমন করিয়া উঠিল,—ভিতরের রক্ত বাহির হইয়া পড়িবে যে!

ছুটিয়া সে মেথরটাকে ধরিতে গেল, মেথরটা ভয়ে পিছাইয়া আসিল। পাশের মেট গাছের ডাল ভাঙিয়া আনিয়া সপাং সপাং করিয়া ঘা কতক বসাইয়া দিল ওর পিঠে। পাগল চেঁচাইতে চেঁচাইতে এক কোণে গিয়া গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া পড়িল। বসিয়া বসিয়াও সে প্রাণপণে সর্বাঙ্গ দিয়া দেওয়ালটাকে ঠেলিতে লাগিল। কিন্তু পাষাণ বেষ্টনী নড়ে না।

এবার ওকে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে পাঠানো হইল,—স্থান হইল সিগ্রীগেশন সেলে।

ছয়

সেদিন সোমবার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েদীদের দেখিবেন,—ফাইলবন্দী কয়েদীর দল সারি সারি দাঁড়াইয়া গেছে।

মাথায় টুপি, গায়ে হাতকাটা জামা, কোমরে গামছা বাঁধা, পরনে জাঙ্গিয়া, এক হাতে থালা বাটি, এক হাতে টিকিট। ঐ টিকিটে প্রত্যেকের বন্দী-জীবনের ইতিহাস লেখা আছে। অপরাধ, শাস্তি, বন্দী-জীবনের পুরস্কার, রোগ, ওজন, কোথায় কোন দাগটি আছে সেটি পর্যন্ত, ওদের কর্ম আর চর্মের কোন বিবরণটি বাদ যায় নাই।

কেষ্ট দাসের থালা বাটি ময়লা, জামা জাঙ্গিয়াও তাই।

গণেশ বলিল,—আজ তোমার খাড়া-হাতকড়ি।

ভয়ে কেষ্টর মুখ শুকাইয়া গেল। পাঁকাটির মত সরু সরু পা দুইখানা তার ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বেচারী কহিল,—পারি নে, জ্বরে জ্বরে সেরে দিলে যে।

চৈতন্য হাসিতে হাসিতে কহিল,—কবি করতে তো খুব পার, কবি করা বেরুবে তোমার আজ।

এ পাশের কয়েদীটা সহসা কেষ্টর গা টিপিয়া কানে কানে বলিল,—ডাকছে তোকে।

ইশারার ইঙ্গিতে দৃষ্টি ফেলিয়া কেষ্ট দেখিল—পায়খানার ধারে দাঁড়াইয়া সেই ছোঁড়াটা।

ওদিকে যাইতে অজুহাতের অভাব হয় না। মিনিট কয় পরেই কেষ্ট ফিরিয়া আসিল। গায়ে ফরসা জামা, ফরসা জাঙ্গিয়া, থালা বাটি তা-ও যেন ঝকঝক করিতেছে।

ময়লা পোশাকে ছোঁড়াটা আসিয়া ওধারে দাঁড়াইল।

চৈতন্য কেষ্টকে শাসাইয়া দিল,—দাঁড়াও শালা, সাইদ আসুক আজ—

সাইদ সতরঞ্চি বোনে,—সে আছে কারখানায়।

ওধার হইতে জমাদার জোরসে হাঁকিয়া উঠিল,—সরকার—

মেট হাঁকিল,—সেলাম।

এরা সেলাম বাজাইল।

সাহেব সকলকে দেখিয়া দেখিয়া চলিয়াছেন,—পিছনে জেলার, জমাদার, ওয়ার্ডার।

বুড়া মাঝিটার সামনে আসিয়া সাহেব দাঁড়াইয়া গেলেন। লোকটার পোশাক যেমন ময়লা, থালা বাটিও তেমনি অপরিষ্কার—গত সন্ধ্যার খাবারের দাগও সম্পূর্ণ যায় নাই। সাহেবের ইঙ্গিতে জেলার জিজ্ঞাসা করিল,—থালা বাটি এত ময়লা কেন?

বুড়া মাঝি পরম ওদাস্যভরে উত্তর দিল,—আমারি তো এঁটো —

উত্তর শুনিয়া সাহেব ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন—নন্‌সেন্স।

তারপর ওর টিকিটখানা লইয়া খসখস করিয়া লিখিয়া গেলেন,—'পেনাল ডায়েট।'

ছোকরাটারও হইল তাই, কারও হইল হাতকড়ি, কারও রেমিশন কাটা গেল।

কেষ্ট দাসের রেমিশন মিলিল একদিন বেশী,—পরিচ্ছন্নতার পুরস্কার। টিকিট সই করিতে করিতে সাহেবের নজর পড়িল—ওজন ওর দশ পাউণ্ড কম। সাহেব বিস্মিতের মত কেষ্টর টসটসে মুখখানার পানে তাকাইয়া বলিলেন,—উর্দি উঠাও।

কেষ্ট গায়ের জামা উঠাইল,—ভিতরে শুধু চামড়া-ঢাকা একটা কঙ্কাল।

আবার সাহেব ওর টিকিটে হুকুম লিখিয়া দিলেন,—ওজন কমের জন্য হাসপাতালের খাবার।

জেলার বলিয়া দিল,—হাসপাতালের খাবার পাবি।

আনন্দে কেষ্টর টসটসে মুখখানা যেন জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

সাহেব চলিয়া যাইতেই কেষ্ট আসিয়া ছেলেটার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিল;—বেচারী কৃতজ্ঞতা জানাইতে চায়, কিন্তু ভাষা খুঁজিয়া পায় না যেন।

ছেলেটা হাসিয়া কহিল,—জোর বরাত তোর।

—আধখানা মাছ কিন্তু তোকে খেতে হবে।

—না না, খেয়ে-দেয়ে তুই একটু তাজা হয়ে নে, তার পর।

অতি ব্যগ্রতাভরে কেষ্ট বলিল,—না না, তোকে খেতেই হবে। না আমার দেওয়া খাবি নে?

—জানিস তো সাইদ আলিকে? ছেলেটা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

—আমি লুকিয়ে দেব।

—আচ্ছা দিস। কিন্তু তুই এত বোকা কেন?

—কেন?

—জেলখানায় কেউ কাউকে কিছুর ভাগ দেয়, জানিস? আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

—তবে তুই দিলি কেন?

—আমার কথা ছেড়ে দে,—আমার আবার অভাব কি? হাত পাতলেই হল। তা ছাড়া তুই রোগা, তোকে দেখে কেমন মায়া হয়।

কেষ্টর চোখ ছুইটা কেমন ছলছল করিয়া উঠিল। ছেলেটা লক্ষ্য করিয়াছিল, কহিল,—আয় বিড়ি খাবি, ওই নেবু গাছের আড়ে,—

নেবু গাছের তলায় গুঁড়ি মারিয়া ঢুকিয়া দু'জনে বিড়ি ধরাইল। কেষ্ট ভয়ে এদিক ওদিক তাকাইতেছিল, ধমক দিয়া ছোঁড়াটা বলিল,—দু-রো, এত ভয় কিসের?

কেষ্ট লজ্জা পাইল,—না, ভয় আমি কাউকে করি নে। তবে কি জানিস, রোগা শরীর, এখনই শালা পড়ে পড়ে মার খেতে হবে, হয়তো মরেই যাব।

কেষ্টর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ছেলেটা বলিল,—তোকে আমার বেশ লাগে জানিস?

কেষ্ট কহিল,—তোর মত আমার একটা ভাই আছে, মাইরি, ভারি ফূর্তি তার।

—ভাগ শালা, বলিয়া রাগ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

* * *

কারখানার ভিতর—

মানুষে ঘানি টানে। লোহার ডাণ্ডাটা চাপিয়া ধরিয়া মানুষগুলি ঘানির চারিপাশে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়াই চলিয়াছে—ঘুরিয়াই চলিয়াছে; ছাড়িয়া দিয়া বিশ্রামের উপায় নাই। এমন কৌশলে ঘানিগুলা তৈরী যে, ছাড়িয়া দিলেই ডাণ্ডাটা থামিয়া পড়িয়া যাইবে,—শুধু পড়িয়া যাইবে নয়, সমস্ত ঘানিটাই বিকল হইয়া যাইবে।

কিন্তু ওরাও কম চতুর নয়। এর উপায়ও ওরা আবিষ্কার করিয়াছে। পরিশ্রান্ত ঘর্মাক্ত বুকে লোহার ডাণ্ডাটা এমন কৌশলে ধরিয়া বিশ্রাম করে যে, পড়ে না। কখনও বুকে, কখনও পিঠের খাঁজে লাগাইয়া দাঁড়াইয়া স্বচ্ছন্দে হাঁপায়।

ঐ সোমবার দিনই—

ঘানি চলিতেছিল। ওপাশে সাইদ সতরঞ্চি বুনিতেছিল, গণশা কামারের কাজে, চৈতনা ছিল ঘানিতে। একটা নতুন আসামী ঘানি টানিতে টানিতেই গান ধরিল—

"মা আমায় ঘুরাবি কত?"

লোকটির বয়স হইয়াছে, অন্য জেল হইতে হালে চালান আসিয়াছে।

গান শুনিয়া আর এক জনেরও গানের নেশা পাইয়া বসিল, সে-ও গান ধরিয়া দিল—

"ঘানি টানি পানি পানি করে যে জান যায়,
কোথা রৈলি প্রাণ-প্রেয়সী কলসী কাঁখে আয়।"

লোকটা নতুন,—গানটা পুরানো; কোন কয়েদী-কবির রচনা।

চৈতনা হাসিয়া কহিল,—এরই মধ্যে কলসী? তবে ঢেঁকিতে করবে কি নাগর?

—ঢেঁকিতে খুব কষ্ট না-কি?

—চরম। পায়ের শিরগুলো ছিঁড়ে যায়, মনে হয় শালা সে-আও দড়ি—গলায় দিয়ে ঝুলে পড়ি।

গণশা হাতুড়ি পিটিতে পিটিতে কহিল,—ঘানিতে আবার কষ্ট কি? পাক কতক ঘুরেচি কি মেরে দিয়েচি।

চৈতনা বাঁ হাতে লোহার ডাণ্ডাটায় দুইটা চাপড় মারিয়া বলিল,—এর আবার ওজন কি? নামেই লোহা, কাজে কিছু নয়। প্রথম পাক চার কষ্ট, তারপর ঘুরণ-পাকের নেশাতেই চলে। কোন্ কোটালের মা ঘানিতে চেপে সগ্‌গে গিয়েছিল না?

ওপাশ হইতে একজন উত্তর করিল,—চেপেছিল,—এক চোর।

বেশ একটা হাসির কলরোল বহিয়া গেল।

নবাগত প্রৌঢ় লোকটি কহিল,—সে নিশ্চয় ভদ্দরলোক চোর?

গণশা কহিল,—কেন, ভদ্দর লোক কিসে বুঝলি?

নতুন ছোকরাটি কহিল,—তা নইলে এমন ফিচলেমি বুদ্ধি হয়? আমরা জানি রে রে রে করে কেবল ডাকাতি করতে।

—বেশ বলেছিস, ভদ্দরলোক না মানেই ফিচেল, আর সব শালাই চোর। কেউ করে কলমের ডগায় চুরি, কেউ করে পিঠে হাত বুলিয়ে চুরি, কেউ দরের মাথায় চুরি।

নবাগত প্রৌঢ় লোকটি কহিল,—আর দুনিয়াতে চোর নয় কে? কেউ চোর, কেউ ফাঁকিবাজ। দেখিয়ে চুরির সাজা নেই, লুকিয়ে চুরি করলেই ফাটক খাট।

গণশা হাতুড়িটি পাশে নামাইয়া রাখিয়া বলিল,—জানিস্ মাইরি, আমাকে যদি দুনিয়ার রাজা করে দেয়, তো আমি দুনিয়াটাকেই একটা জেলখানা করে দিই। সব বাবা খাট আর খাও, খাও আর খাট, পয়সা কেউ পাবে না।

প্রৌঢ় কয়েদীটা পরম দার্শনিকের মত গম্ভীর ভাবে কহিল,—আরে তা হলে কি কেউ চুরি করত রে? চুরি করে মানুষ অভাবে, হিংসেয়, লোভে। যদি বড় ছোট দুনিয়ায় না থাকে, তবে কে কার হিংসে করবে? কারও ঘরে যদি সোনাদানা বোঝাই হয়ে না থাকে, তো লোভ করবে কিসের, অভাবই-বা কিসের আর চুরিই-বা করবে কেন?

—তা হলেও করত। চোর চুরি না করে থাকতেই পারে না। এক সন্নেসী চোরের গল্প জান না? বেটা সন্নেসী হয়েও চুরি না করে থাকতে পারত না, সব্বার ঝোলা-ঝাপটা রাত্তিরে উলটে পালটে রেখে দিত।

নতুন কয়েদীটি বলিল,—জানি, সে শেষে নাকি সিদ্ধিও পেয়েছিল। তা হলেই বোঝ না,

নিশ্চয় সে শেষটায় সাধু হতে পেরেছিল। কিন্তু যদি তাকে জেলখানায় আসতে হত, তবে কি আর সাধু হতে পারত?

লোকটির দার্শনিকতায় মুগ্ধ হইয়া গণেশ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল,—ওস্তাদের বাড়ি কোথা?

ওস্তাদ আপন পরিচয় দিয়া কহিল,—ডাকাতি করলাম ঢের এই পঞ্চাশ বছরে, পঁচিশ বছরে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত গোটা ষাট-সত্তোর তো হবে। দেখলাম একটা একবার আরম্ভ করলে হয়, তারপর আর বাঁধ মানে না। তবে আমার ডাকাতি হিংসের, লোভে, অভাবে, এ আমি ঠিক বলতে পারি। কতবার চেষ্টা করেছি ভাল হয়ে থাকতে, তা শালারা থাকতে দিলে না। জেল থেকে বেরুলাম, শালারা ফের এক মামলায় জড়ালে,—মামলার খরচ যোগাতে ফের ডাকাতি, ফের জেল, জেলে আবার নতুন দল—তাদের সঙ্গে মিশে আবার। আর, পরের কেড়ে নেওয়াতে যেন কেমন একটা সুখ আছে। এ-সুখ একবার পেলে মানুষ আর তা ছাড়তে চায় না, যেমন বাঘের রক্তের স্বাদ আর কি।

এরপর কতক্ষণ সব নীরব; সবাই যেন ওস্তাদের কথাটা মনে মনে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছিল। প্রথম কথা কহিল চৈতনা,—যা বলেছ ওস্তাদ! পরের কেড়েকুড়ে নেওয়ায় সত্যি সুখ আছে।

সমর্থন পাইয়া দার্শনিক আবার উৎসাহভরে আরম্ভ করিল,—দেখ না, চোর, জোচ্চোর, ডাকাত, ঠগী, লুঠেরা, মায় রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, তা-ও ওই তাই। ভদ্দর লোকেরা বড় বড় মাথায় এসব বেশ ভাল বোঝে; তাই তো এত সব ফ্যাসাদ,—থানা, পুলিস, সেপাই, সাস্ত্রী। আর শালা মানুষ মারবার কলই কত রকম রোজ রোজ তৈরী হচ্ছে! লাঠি, সড়কি, তীর, ধনুক, বন্দুক, কামান, আজকাল না-কি কামানের মুখের ধোঁয়ায়ও মানুষ মরে। আচ্ছা বল দেখি, এসব তৈরী কিসের জন্যে? একটা কথা আছে জানিস্, সাধুর দৌলত মালা, ভিখারীর দৌলত ঝোলা, চাষার দৌলত মাটি, চোরের দৌলত সিঁধকাঠি—আর মানুষ-মারা কল বন্দুক কামান, সে-তো তোর লাঠিরও বাড়া। এ সব হল যুদ্ধের জন্য—যুদ্ধে হয় রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি।

গণেশ কহিল,—তাই তো বলছিলাম ওস্তাদ, দেয় ভগবান আমাকে দুনিয়ার রাজা করে, তো দেখি আমি একবার। সব জেলে ভরে দি।

চৈতনা বলিল,—তুই শালা ধর্মপুত্তুর থাকবি শুধু বাইরে?

কথাটার উত্তর দিল দার্শনিক,—সে তো নিয়মই। আইন বল, কানুন বল, সাজা বল, জেল বল, সব নিজেকে বাদ দিয়েই মানুষে করে, তারও ভয় হয়—

বাধা দিয়া গণেশ বলিল,—না ওস্তাদ, ও-কথাটা ঠিক হল না,—জোর যার আছে তার আবার ভয় কিসের? সে তো সব সোজাসুজিই করতে পারে।

প্রৌঢ় লোকটি কহিল,—কথাটা মিথ্যে বলনি; কিন্তু মানুষ যে মানুষেরই ভয়ে অস্থির! বাঘ ভালুককে মানুষ যত ভয় না করে—তার বেশী ভয় করে মানুষকে। আর মানুষের স্বভাব

কি জান ? ফাঁক পেলেই সে বর্তমানকে উলটে দেবে। সন্তুষ্ট কিছুতেই হয় না। সেই তো ভয়। রাজা বল, প্রজা বল, ভয় যে সব মানুষেরই আছে। ভয় নেই এমন মানুষ নেই,—ভীতু সবাই—

নতুন ছোকরাটিও গণেশ চৈতনের দেখাদেখি দার্শনিক কয়েদীটিকে ওস্তাদ বলিতে শুরু করিয়াছিল ; সে প্রতিবাদ করিয়া কহিল,—এ কথা তোমার মত লোকের মুখে সাজে না ওস্তাদ —আমরা সব ভীতু ? আমরা—

ওস্তাদ হাসিয়া কহিল,—জরুর, একশোবার। নইলে রাত্রের অন্ধকারে লুকিয়ে ডাকাতি করিস্ কেন ? লোকে চিনে ফেললে খুন করিস্ কেন ? ভয়, ও সব ভয়ের কাজ। আজকাল যে যুদ্ধ হয় জানিস্, তাও লুকিয়ে লুকিয়ে। এই যে আমাদেরই এমনি করে ধরে রেখেছে, শুধু কি আমরা পরের ক্ষতি করছি বলে ? আরে পরের ক্ষতি তো দিবা-রাত্রি হচ্ছে,—একজনের ক্ষতি না হলে আর একজনের লাভ হবে কি করে ? আর সে-সব শিক্ষিত লোকেরা এমন কলে কৌশলে করছে যে, চোখের ওপর দেখেও তা ধরবার ছোঁবার উপায় নেই। আমরা গায়ের জোরে ক্ষতি করেছি, কেবল এই আমাদের দোষ।

কথাগুলা নতুন ছোকরাটির বেশ বোধগম্য হইল না বোধ হয়,—আর ভীরুতার অপবাদে সে চটিয়াছিলও দারুণ। সে চট্ করিয়া কহিয়া বসিল,—ছাড়ান দাও কর্তা, তোমার ও-সব কারো মাথায় ঢুকছে না। যত সব উদ্ভট উদ্ভট কথা। আমাদের ভয় ? আমরা ভীতু, দূর দূর, যত সব, হুঁঃ—

ওস্তাদ একটু হাসিল, কোন প্রতিবাদ করিল না, আপন মনে ঘানি টানিয়া চলিল।

ওদিকে কথার মোড়টা তখন ফিরিয়া গিয়াছে। গণেশ চৈতনাকে কহিতেছে,—কেষ্ট শালার জামা বদলের কথা বলেছিস্ ?

চৈতনা হাসিয়া চুপি চুপি কহিল,—কোন কালে! দেখ না, সাইদের মুখখানা একবার দেখ না!

সত্যই সাইদের মুখখানা অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর। সতরঞ্চির টানার সুতায় প্রায়ই ঘর ভুল হইয়া যাইতেছে। গণশা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—যেন আষাঢ়ে-মেঘ নেমেছে, দেবে আজ ঘা-কতক, দেখিস তুই।

ওদিকে পিঠে লোহার ডাণ্ডাটা লাগাইয়া বেশ হেলান দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তখনও সেই ছোকরাটি ভয়শূন্যতার কথা প্রচার করিতেছিল,—ফুঃ, বলে বন্দুক, বন্দুককে কে কেয়ার করে রে বাপু! বন্দুক ছোঁড়া চাই তো ? বলে বিশ-পঁচিশ মরদে যখন আ-আ-আ হাঁক হাঁকে, তখন যাকে বলে সেই 'তোর হাতের ফাঁসি রইল হাতে, আমায় ধরতে পারলি না'। এই তোমার বেশী দিন নয়, রায়েদের বাড়িতে দু'-দুটো বন্দুক, বাড়ির মেজবাবু আর সেজবাবু,—ওরা পাখি বিঁধে পেড়ে ফেলে, বাবা, সেই সময় ওই হাতের বন্দুক রইল হাতে, হেঁ—হেঁ।

গর্বিতভাবে একটু হাসিয়া আবার বলিয়া চলিল,—আমরা যখন কাজটাজ সেরে গাঁয়ের বাইরে, তখন শালা ফটাং ফটাং ফটাং, যেন পাখি বাসাতে গিয়ে মরে থাকবে।

'কালাপাগড়ি' আসিয়া কহিল,—'চৈতন্য চরণ দাস', 'সাইদ আলি', পত্র আছে তোমাদের।

—পোস্টকার্ড?

—হা হা, ঘানি পড়ে যাবে চৈতন—ঘানি পড়ে যাবে। যা—যা, এইবার যা, আমি ধরেছি ঠিক।

সাইদ আলির হাতের সতরঞ্চির সুতার তলাটায় ফাঁস পাকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি মুক্ত করিবার জন্য নানাভাবে সে যত চেষ্টা করে, ফাঁসের পর নতুন ফাঁসে সেটা ততই যেন বাঁধা পড়িয়া যায়।

চৈতনা ডাকিল,—আরে সাইদ মিঞা, এস—

সাইদ ব্যস্তভাবে আর একবার ফাঁসটা খুলিবার চেষ্টা করিল, এবার আরও একটা নতুন ফাঁস লাগিয়া গেল। সাইদ পট্ করিয়া সুতার তালটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল।

প্রৌঢ় লোকটি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, চৈতনা ও সাইদ চলিয়া যাইতেই একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া একান্ত মনোযোগের সহিত আবার ঘানি টানিতে শুরু করিল।

গণশা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল কে জানে,—চিঠি না আসাই ভাল, চিঠি এলে আমার তো হাত পা কাঁপে! ওই-যে কালির হিজিবিজি, হাকিমের রায় শুনতেও বুক এত টিপটিপ করে না। হয়তো লেখা থাকবে, তোমার পুত্তরটি তিনদিনের জ্বরে—যাঃ শালা, ভেঙে গেল।

হাতুড়িটি এমন ভাবে সে মারিয়াছে যে, সাঁড়াশিতে-ধরা লোহাটা ফাটিয়া ভাঙিয়া গেছে।

চৈতনা ফিরিয়া আসিল নাচিতে নাচিতে, তাহার চিঠির খবর নাকি খুব ভাল—ধান খুব ভাল হইয়াছে, ছেলেটা হাল ধরিতে শিখিয়াছে,—এবার নাকি নিজেই বাড়িতে হাল গরু কিনিবে! সব চেয়ে ভাল খবর হইতেছে—হাইকোর্টে তাহার আপীল মঞ্জুর হইয়াছে, খালাসের সম্ভাবনাই নাকি আঠার আনা! তবে মা চামুণ্ডার মাথায় মানত করিয়া ফুল চাপানো হইয়াছিল,—সে ফুল মাথা হইতে টপ্ করিয়া পড়িয়া গিয়াছে। শেষ দিকটায় একটু হতাশা প্রকাশ করিয়া কহিল,—এর ওপর তো আর কারু হাত নাই! বাবা! এ হাইকোর্টের হাইকোর্ট! মায়ের মাথা হতে ফুল পড়ে না তো পড়েই না—আর যদি পড়লো তো একেবারে নিঘ্যাৎ—

ওস্তাদ একটু হাসিয়া কহিল,—মায়ের মাথা তো গোল?

চৈতনা একেবারে আগুন হইয়া উঠিল। কহিল,—হাঁ গোল, গোল তার হবে কি? গোল হলেই বুঝি ফুল পড়ে? কই চাপাও দেখি তুমি, পড়ুক তো একবার

দেখি। এ বাবা যে-সে নয়—মানুষের গড়া-পেটা দেবতা নয়,—সাক্ষাৎ শিলে-রূপ—পাষাণ! জান, একবার এক দল ডাকাত যেতে যেতে মায়ের থানে পেন্নাম করেনি,—তা দলকে দল একেবারে—

সহসা কেষ্ট হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় চৈতনার কথাটা মাঝপথেই বন্ধ হইয়া গেল। কেষ্ট কহিল,—গোসাঁইজী এসেছে—গোসাঁইজী।

গোসাঁইজী একজন 'কেষ্ট-বিষ্টু' ইহাদের কাছে। এইস্থান হইতেই অন্য জেলে চালান গিয়াছিলেন, আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। গোসাঁইজী সাধু-সন্ন্যাসী ব্যক্তি; ঝোলার ভিতর একটা খুনী মামলার মাল বাহির হইয়া পড়ায় সাত বৎসরের জন্য মেয়াদ খাটিতেছেন। গুণী লোক। হাত দেখিয়া অদৃষ্ট গণনা, শুধু হাতে সুগন্ধ আনা, ঘটির জলে হাত গুলিয়া সরবত বানানো ইত্যাদি হরেক রকম কসরত তাঁর জানা আছে। জেলে ওয়ার্ডার মহলে বেজায় খাতির! জেলার, ডেপুটী-জেলার পর্যন্ত বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। না দেখিয়া উপায় কি;—ডেপুটী-জেলারের কন্যার পেট-কামড়ানি তিন ফুঁকে গোসাঁই ভাল করিয়াছেন, জেলারের তিন সের দুধের গাইটির দুধ ডাইনীতে হরণ করিত, গায়ে হাত বুলাইয়া গোসাঁই সে দুধ ফিরাইয়াছেন। মোট কথা, চাণক্য পণ্ডিতের 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা' শ্লোকটি গোসাঁইজী সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

স্বদেশী বাবুদের ওয়ার্ডে গোসাঁইশুর নাম—'রাসপুটিন'!

চৈতনা গোসাঁইএর সংবাদ শুনিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল,—এই জিজ্ঞেস কর না গোসাঁইকে—ও যদি 'না' বলে, তখন আমাকে বলো, হ্যাঁ—

ঠিক এই সময় এগারটার ঘণ্টা বাজিয়া গেল। কয়েদীদের স্নান আহারের সময়,—এগারটা হইতে দুইটা পর্যন্ত বিরাম।

কাজ ছাড়িয়া সব হুটপাট করিয়া ওয়ার্ডের দিকে চলিল।

তিন নম্বর ওয়ার্ডের দরজায় ভিড় জমিয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর গোসাঁইকে ঘিরিয়া প্রকাণ্ড এক চক্র বসিয়াছে। গোসাঁই 'কালাপাগড়ি'র হাত দেখিতে দেখিতে কহিতেছেন,—এক বরিষ ছ' মাহিনা কি দো বরিষ—ইস্‌কো মধ্যে তোমার খালাস।

'কালাপাগড়ি' কহিল,—ই ক্যা বোল্‌তা হ্যায় আপ, হাম্‌রা তো ফর লাইফ মেয়াদ হুয়া—

গোসাঁই কহিলেন,—জরুর·হোগা—হোতে বাধ্য।

'কালাপাগড়ি'র মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ক্যায়সে হোগা?

—আরে ক্যায়সে হোগা! হোগা এ্যায়সেই! এই একঠো যুদ্ধ-টুদ্ধ হোগা, জিত হোগা ব্যাস, তোম মাপ পা যায়েগা।

ভিড়ের মধ্য হইতে কে একজন কহিল,—যুদ্ধ হোগা?

মুখ তুলিয়া গোসাঁই দড়ি বাঁধা চশমার ফাঁক পানে চাহিয়া কহিল,—হাঁ হাঁ, হোগা, আলবৎ হোগা, লাগলো বলে!

রোগা কেষ্ট উল্লাসে বুক চাপড়াইয়া কহিল,—যুদ্ধে তাহলে এবারও তো জেল থেকে লোক নেবে? হামি যায়েগা, জরুর যায়েগা!

চৈতনা কহিল,—তা হলেই হয়েছে, শালা বন্দুকের আওয়াজ শুনেই কুপোকাৎ!

কেষ্ট অসহিষ্ণু ভাবে কহিল,—হই হবো, জেল থেকে তো খালাস পাবো! এর নাম কি বাঁচা? এর চেয়ে বন্দুকের গুলিতে মরি সে-ও ভালো।

তহিদ কেষ্টর পিঠে হাত দিয়া কহিল,—না, তুই কি করতে যাবি? তোর তো আর এক বছর; আমি কিন্তু জরুর যাব।

—দু' মাস আগেও যদি বেরুতে পারি তাই কি কম রে? আমি যাবই, তুই দেখিস্।

ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে ভিড় ঠেলিয়া সাইদ আলি আসিয়া গোসাঁইএর সম্মুখে হাতটা মেলিয়া দিয়া কহিল,—দেখ তো গোসাঁই, ক'টা বিয়ে আমার?

চৈতনা গণশার কানে কানে কহিল—জানিস্? আজ খবর এসেছে সাইদের পরিবার নেকা করেছে।

গোসাঁই সাইদের হাত দেখিয়া হাসিয়া কহিল,—বিয়ে তো দেখি তোর তিনটে, আর—

সাইদ গোসাঁইকে আর হাত দেখিতে দিল না, রূঢ় ভাবে হাতটা টানিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে একটা 'হুঁ' বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

কয় পা গিয়া আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া সাইদ হাতটা প্রসারিত করিয়া কহিল,—দেখ তো মরণ আমার কিসে হবে, ফাঁসিতে না—কি?

গোসাঁই মৃদু হাস্যে সাইদের হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া কহিল,—মৃত্যুর কথা বলতে নাই, গুরুর মানা আছে। বলিয়া সে গুরুর উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকাইয়া একটা নমস্কার করিল।

সাইদ যেমন ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়াছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই চলিয়া গেল।

সাত

মাসখানেকের ভিতর জেলখানার আবহাওয়া যেন কেমন এক রকম হইয়া উঠিয়াছে।

নরুর অবস্থা অতি শোচনীয়। তিলে তিলে দীর্ঘ ত্রিশ দিনে তাহার দেহের উপর মরণ আপনার অশরীরী রূপের ছাপ সুপরিস্ফুট ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, যেন কোন সুদক্ষ চিত্রকর তুলিকার পর তুলিকা চালাইয়া পটভূমির উপর একটি মৃত্যুর চিত্র আঁকিয়া চলিয়াছে—পাণ্ডুর, স্থির, জীর্ণ সে রূপ, কঙ্কালসার মুখখানি, কিন্তু অপূর্ব আনন্দের জ্যোতিতে উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত; হয়তো-বা মরণ-ম্লান দেহখানির মধ্যে অবশিষ্ট জীবনের দীপ্তি সেটুকু।

জেলের অপর সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের অন্য অন্য জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সাধারণ কয়েদীদের উপর খুব কড়াকড়ি ; খাও দাও, কাম বাজাও, কথা কি গল্প করিবার হুকুম নাই। সন্ধ্যা হইতেই কম্বল চাপা দিতে হয়, ঘুম না আসে—আকাশ পাতাল ভাবনা ভাব, কারণ খিলানের ছাদে কড়িকাঠ নাই যে, গনিয়া সময় কাটিবে।

অপরাধ-সংস্কারগ্রস্ত জীবনগুলিও যেন কেমন হইয়া উঠিয়াছে! একটা সুগভীর বিষাদের কালিমায় যেন সব আচ্ছন্ন, চটুল হাসির তারল্য কে যেন সব নিঃশেষে শুষিয়া লইয়াছে। গৌর, তহিদ, কেষ্ট, গণেশ, সবারই যেন কেমন একটা থমথমে ভাব, অন্ধকার বাদল রাত্রির মত উদাস, বিষণ্ণ, স্তব্ধ। সাইদ পত্নীর বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদে কেমন উগ্র, অধীর হইয়া উঠিয়াছিল—এখন সে-ও যেন ও-কথাটা আর ভাবিতে পারে না, এই খেয়ালী অদ্ভুত ছেলেটির কথা তাহারও মন জুড়িয়া বসিয়াছে। ছোকরাটা আর লাফ দেয় না, তুবড়ির মত মুখ তাহার এই উদাস শীতল আবহাওয়ায় নিভিয়া গিয়াছে।

সুরেশবাবু, তিন নম্বরের সেই বাবু-চোরটি জেল পরিবর্তনের জন্য দরখাস্ত দিয়াছে ; ডেপুটি-জেলার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহিল,—দেখুন জীবনে এমনটি আমি কখনও ভাবিনি। আজ জেলখানাটাকে সত্যি আমার ভয় হচ্ছে। আমি এসেছি আজ কম দিন নয়, ফাঁসি—তা-ও দেখেছি, কিন্তু এমন হয়নি—ঘণ্টা কয়েক পরেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। কিন্তু এ কি ? মৃত্যু যেন চব্বিশ ঘণ্টা জেলখানার ভিতর পা টিপে টিপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানেন, পায়খানার মেথর ওই উমেশ ময়রা, লোকটা জেল খাটবে আরও কতবার সেই কল্পনায় মেথরের কাজটা করে,—তারও যেন কেমন একটা পরিবর্তন! দেখি বসে বসে একটা বই পড়ছে। একটা দপ্তর আছে ওর। একখানা অশ্লীল গানের বই আগে ওকে পড়তে দেখেছি। জিজ্ঞাসা করলাম,—কি গান শিখছ উমেশ ?

উমেশ বললে,—এটা গানের বই নয় বাবু—

জিজ্ঞাসা করলাম,—কি বই ওটা ?

দেখালে, দেখলাম ব্যাকরণ-কৌমুদী একখানা। আশ্চর্য হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—তুমি বুঝতে পার এ ?

ও বললে,—না, সংস্কৃত লেখা রয়েছে, মন্ত্র-টন্ত্র হবে। আরও বললে—আর ও-সব গানের বই ভাল লাগছে না বাবু ; জীবনে তো অনেক পাপই করেছি, এবার দু'-একখানা ভাল বই পড়ে যদি মতি-টতি ফেরে। সে পর্যন্ত পাপের ভয়ে মুষড়ে পড়েছে। আমার এক এক সময় কি মনে হয় জানেন ? যদি ছেলেটি আহার করব বলে, তবে হয়তো পাথরের পাঁচিলটা পর্যন্ত ওর পায়ে বিন্ধ্যগিরির মত মাথা লুটিয়ে ফেলবে।

কতক্ষণ সব নীরব, নিঃশ্বাসগুলি পর্যন্ত যেন সন্তর্পণে বহিতেছিল, সহসা সুরেশবাবু আবার কথা কহিল,—থাক্ গে! সেই লোকটা, সেই কালী কর্মকারের খবর কি ? সে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে, নয় ?

ডেপুটীবাবু কহিলেন,—হ্যাঁ, লোকটা সেরে উঠেছে,—লোয়ার কোর্টের বিচার শেষ হয়েছে—সেসনে গেছে কেস। সে বিচার আরম্ভ হতেও আর দেরি নাই।

—লোকটা আর সেই আর্তনাদ করে না?

—না, তবে কাঁদে, চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ে, ঠোঁট কাঁপে, কিন্তু চেঁচায় না। মনে হয় ফাঁসিও যদি হয়, তো সয়ে নিতে পারবে—prepared হয়ে যাবে।

সুরেশ কিছুক্ষণ বিস্মিতের মত ডেপুটীবাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তার পর অতি ধীরে ধীরে ঘাড় দোলাইয়া কহিল,—না, মনে হয় না, না ডেপুটীবাবু, এ অসম্ভব। ওই লোকটির জীবনের জন্য যে আর্তনাদ শুনেছি, তাতে কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারব না।

ডেপুটীবাবু হাসিয়া কহিলেন,—না সুরেশবাবু, এ অনেক দেখেছি। মৃত্যুদণ্ডের আদেশের পূর্ব পর্যন্ত যে-কান্না মানুষে কেঁদেছে, তাতে মনে হয়েছে ফাঁসিই যদি হয় এর, তবে আদেশ শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু দেখেছি ফাঁসির হুকুম নিয়ে সে ফিরে এল—ধীর স্থির, কোন চাঞ্চল্য নাই তার।

সুরেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল,—হয়তো-বা মৃত্যুর আদেশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আপনাকে, মানে selfকে চিনতে পারে, জীবনের চেয়েও বড় কেউ তার ভেতরে জেগে ওঠে। মানবের জাগরণ, এই হয়তো মানবের জাগরণ,—যা ওই ছেলেটি জন্ম থেকে নিয়ে এসেছে;—না, ওর সঙ্গে কিছুর তুলনা করা ঠিক নয়, ও আমাদের কল্পনার বাইরের বস্তু।

ডেপুটীবাবু কোন উত্তর করিলেন না, হয়তো-বা দিবার মত উত্তর তাঁহার মনে যোগাইল না। সুরেশও নীরব হইয়া কি একটা ভাবনায় যেন ডুবিয়া গিয়াছিল, সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আচ্ছা ডেপুটীবাবু, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, আমিও ওই ভাবে মরণের সম্মুখে দাঁড়াতে পারি?

ডেপুটীবাবু এবারও কথা কহিলেন না। তিনি এই খেয়ালী লোকটির মুখপানে চাহিয়া বোধকরি ভাবিতেছিলেন,—এ আবার কোন্ খেয়াল!

সুরেশ নিজেই আবার কহিল,—না, তা পারি না। রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র ভাবে কেটে যায়, তখন মনে হয় গলা টিপে ওই অবশিষ্ট জীবনটুকু শেষ করে দিয়ে আসি। পাপ বলে কোন বস্তুকে আমি বিশ্বাস করিনি, সমাজশৃঙ্খলার পরিপন্থী বলে, বেআইনী বলেই বিশ্বাস করে এসেছি। সেই পাপ যেন চোখের সম্মুখে আজ মূর্তি পরিগ্রহ করে উঠেছে। দোহাই আপনার—আমার ট্রান্সফারটা যাতে হয় তার ব্যবস্থা করুন; জীবনের সমস্ত সঙ্কল্প আমার কর্পূরের মত উপে যাচ্ছে। এতদিনের পথ-চলা যদি আমার আজ মিথ্যা হয়ে যায়, তবে যে আমার আত্মহত্যা বই উপায় থাকবে না!

সুরেশ যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল—চোখ দুইটায় অস্বাভাবিক দৃষ্টি, সমস্ত শরীর দিয়া বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে।

ডেপুটীবাবু কহিলেন,—এত চঞ্চল আপনি হবেন না। আপনি এ সেল থেকে সরে আসুন, আজই আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি দশ নম্বর ওয়ার্ডে—যেটা পলিটিক্যাল ওয়ার্ড ছিল। ওই ওয়ার্ডে আপনাকে যেতেও হবে, এখানকার পলিটিক্যাল ওয়ার্ড একেবারে উঠে গেল—গিয়ে এ, বি, ক্লাসের ওয়ার্ড হল। প্রিজনারস্-ও সব এসে পড়বে দু'চার দিনের ভেতর।

সুরেশবাবু তাড়াতাড়ি কহিল,—আজই—এখুনিই। ওর সান্নিধ্য আমার সহ্য হচ্ছে না,—আমায় বাঁচান জেলারবাবু।

দিন কয়েকের মধ্যেই ওই অস্বাভাবিক আবহাওয়াটা কতকটা যেন সহজ হইয়া উঠিল।

নরু সেই জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে। তিল তিল করিয়া যে-ক্ষয়, সে-ক্ষয় মানুষের চোখে পড়ে না; কাজেই সংবাদটা জেলময় রোজই একরূপ প্রচার হয় যে, সে সেই রকমই আছে।

এখানকার অধিবাসীগুলি তাহার প্রতি একটা দেবত্ব আরোপ করিয়া অনেকটা সুস্থ হইয়াছে—বুকের ভার, উৎকণ্ঠা যেন অনেকটা কমিয়াছে।

সুরেশ দশ নম্বরে বসিয়া সে কথাই কহিতেছিল, দশ নম্বর তখন গুলজার। বাঁড়ুজ্জে, চাটুজ্জে, মুখুজ্জে, ঘোষ, বোস, রায়, প্রভৃতি কুলীন-কয়েদীতে ঘরখানা একমত বোঝাই হইয়া গেছে। সুরেশ কহিতেছিল অমর রায়কে,—ওরা এতে উৎকণ্ঠা থেকে বেঁচে গেছে অমরবাবু। ওদের জীবনের দৈন্য, হীনতা ঢাকা পড়েছে। ওই ছেলেটিকে মানুষ ভাবলে কি নিজেদের মানুষ ভাবতে পারা যায়? যায় না। তাই সত্য-মানুষের যখনই যে-যুগে বিকাশ হয়েছে, তখনই সমাজ তাকে দেবত্ব দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। নিজের কাছে লজ্জার চেয়ে বড় লজ্জা আর কিছু নেই রায়; সে একটা প্রচণ্ড দাহ, তাতে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

অমর রায় কহিল,—তা হলে তুমিও পাপ-পুণ্যে বিশ্বাস কর সুরেশবাবু?

সুরেশ কহিল,—ধারণা ছিল বিশ্বাস করি না, মনে মনে ভাবতাম আমি আগামী যুগের মানুষ,—যে-যুগে মানুষের সেন্টিমেণ্ট বলে কিছু থাকবে না। প্রথম দিনই কি ভেবেছিলাম বা ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম জান? ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম he is a fool.

তারপর আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আজ কিন্তু তা ভাবতে পারছি না। আজ মনে হচ্ছে, বর্বরতার যুগে যখন মানুষ আপনাকে ছাড়া চিনত না, অবলীলাক্রমে হত্যা করে এক টুকরা ফল বা মাংস কেড়ে নিত, সেদিনও মানুষ এই ধর্মে মুগ্ধ হয়েছিল। নইলে লক্ষ লক্ষ বৎসর সাধনা করে এই আদর্শের দিকেই মানুষ চলে আসবে কেন! আরও একটা কথা কি জান? দুনিয়া যত বস্তুতন্ত্রবাদী হয়ে উঠুক না কেন, ফুল লোপ পেয়ে শুধু ফলে তার বুক ভরে উঠবে না—উঠতে পারে না।

ওপাশে বসিয়াছিল গিরীশ চাটুজ্জে, সে বলিয়া উঠিল,—তুমি বড় আবোল-তাবোল বক সুরেশবাবু, কি সব ভগবান মানি না—পাপ-পুণ্য মানি না—

রায় কহিল,—তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর নাকি চাটুজ্জে?

চাটুজ্জে যেন ফাটিয়া পড়িল,—মানি না? ভগবান মানি না? নাস্তিক কোথাকার! জান, পুলিসের সাব-ইনস্পেক্টারী করেও কখনও ত্রিসন্ধ্যা না করে জল খাইনি, মহামায়াকে প্রণাম না করে কোন কাজ করিনি? মায়ের পুষ্প পকেটে নিয়ে যেখানে গিয়েছি সেইখানেই সাক্সেস!

রায় হাসিয়া উঠিল।

চাটুজ্জে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল,—এ দম্ভ থাকবে না, রক্তের তেজ কমবে, মহামায়াকে অবহেলা—

রায় কহিল,—বিন্দুমাত্র অবহেলা আমরা করিনি চাটুজ্জে। তোমার মা মহামায়া চিরজীবিনী হোন, তাঁর ভক্তের সংখ্যা মা-ষষ্ঠীর কৃপায় সংখ্যাতীত হোক।

চাটুজ্জে আর দাঁড়াইল না। ভয়ানক রাগিয়া গালাগালি দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল।

সুরেশ ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—লোকটার মধ্যে পাপেরও একটা বিপুল নির্ভীকতা আছে। আমাদেরও আছে কিন্তু তার ভিত্তি হল যুক্তিতর্কের ওপর ; আর ওর সংস্কার, সহজাত—হয়তো সহজাতই ; এ ওর টলবার নয়। এঞ্জিনীয়ারে গড়া structure ভূমিকম্পে চুর হয়ে যায়, ও কিন্তু পাহাড়।

অল্প কিছুক্ষণ নীরবতার পর সহসা রায় কহিল,—বাড়িতে তোমার স্ত্রী আছেন সুরেশবাবু?

সুরেশ তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল,– হ্যাঁ আছে। কেন বল তো?

—তুমি তাঁকে চিঠিপত্র লেখ?

—লিখি।

—বেশ আবেগ-দিয়ে-ভরা প্রেমপত্র?

—না, তা পারি না। কেন পারি না জান? বোধ হয় এই জেল হওয়ার জন্যে কেমন একটা প্রচ্ছন্ন লজ্জা আছে আমার। স্ত্রীর কাছে মানুষ খাটো হতে চায় না। যত সবল যুক্তিই আমার কর্মের পেছনে থাক না রায়, তার সংস্কারের কাছে ঠেকে সে সব চুরমার হয়ে যায়। আমি বেশ অনুভব করি অমরবাবু, আমার কৃতকর্মের জন্য তার লজ্জার আর অবধি নাই! ঐ লজ্জার জন্যেই আমিও তার কাছে লজ্জা পাই।

অমর রায় কহিল,—চাটুজ্জে কিন্তু বেশ বড় বড় প্রেমপত্র লেখে—দু'-তিন পাতা। শুধু প্রেমপত্র নয়,—এইখানে আবদ্ধ থেকেও লোকটা আপনার বিষয়-সম্পত্তি বেশ নিপুণ ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। কোন্ খাতকের নামে নালিশ করতে হবে, কার কোন্ জমিটা নিতে হবে—এ সব ওর নখদর্পণে। আর সেই সমস্ত হুকুম ও চিঠি মারফৎ পাঠিয়ে থাকে।

সুরেশ কথা কহিল না। অমরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা আবার কহিল,—আমার বিয়ে হয়নি সুরেশবাবু।

সুরেশবাবু কহিল,—নিশ্চিন্ত আছ রায়—দুর্ভাগ্যের মধ্যেও সৌভাগ্য।

অমর তাহার কথা কাড়িয়া লইয়া কহিল—না, আমার মনে হয় সে আমার দুর্ভাগ্য! জান সুরেশবাবু, এক এক সময় একটি নারীর মুখ কল্পনা করবার জন্য অন্তরাত্মা লালায়িত হয়ে ওঠে।

ঠিক সেই সময়ে চাটুজ্জে আবার আসিয়া টেবিলে একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া কহিল,—ভগবানকে—মা মহামায়াকে না মানবার তোমাদের কারণ কি? কেন—

অমর রায় সবল মুষ্টিতে চাটুজ্জের কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল,—Shut up you

devil. Get out, get out. সেই সঙ্গে অঙ্গুলি সংকেতে বাহিরের রাস্তাটাও দেখাইয়া দিল।

অমরের চোখ দুইটা দপদপ করিয়া জ্বলিতেছিল। সুরেশ চট্ করিয়া রায়কে ধরিয়া বসাইয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিল,—বোস বোস অমরবাবু, আপনাকে হারিয়ে ফেলো না,—আপনাকে হারিয়ে ফেলো না!

চাটুজ্জের মুখ দেখিয়াই বোঝা গেল, সে রীতিমত ভয় পাইয়া গিয়াছে। রায়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবামাত্র একটু দূরে সরিয়া গিয়া মুখ ভেঙচাইয়া কহিল,—ওঃ, ভগবানকে তুই না মানলি তো আমার ভারী বয়েই গেল!

অল্পদূর গিয়া চাটুজ্জে আবার ফিরিল। এবার সুরেশের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া একেবারে আকর্ণ দন্ত বিস্তার করিয়া কহিল,—তুমি বেশ লোক মাইরি সুরেশবাবু, তোমাকে আমি ভালবাসি—

সহসা ভালবাসাটার হেতু না পাইয়া সুরেশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। চাটুজ্জে আবার হাসিতে হাসিতে কহিল, আমার বউএর চিঠি দেখবে সুরেশবাবু?

সুরেশ কহিল,—না।

চাটুজ্জে ব্যগ্রভাবে তাহার হাত দুইটা ধরিয়া কহিল,—না মাইরি, তোমাকে দেখতেই হবে, কালীর দিব্যি রইল।

সুরেশ বিরক্তভাবে কহিল,—আচ্ছা দেখব'খন।

চাটুজ্জে আবার কহিল,—তোমার চিঠি 'ডিউ' হয়নি সুরেশবাবু?

—আমি বড় একটা চিঠি লিখি না চাটুজ্জে, দু'মাস তিনমাস অন্তর একখানা।

—এবার তাহলে তোমার পাওনা চিঠিখানা আমায় লিখতে দেবে সুরেশবাবু? বউকে একটা চিঠি দেওয়া আমার বড্ড দরকার।

সুরেশ বিস্মিত ভাবে কহিল,—তা কেমন করে হয় চাটুজ্জে? তোমার বউকে চিঠি লিখবে—সে আমার নাম দিয়ে কেমন করে হবে? তলায় তো আমার নাম দিতে হবে!

সুরেশের জানুতে সোৎসাহে একটা চাপড় মারিয়া, সঙ্গে সঙ্গে একটা অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিয়া চাটুজ্জে কহিল,—তলায় লিখে দেব শুধু—'তোমার স্বামী।'

অমর উঠিয়া চাটুজ্জের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল,—আমি দেব এস।

সঙ্গে সঙ্গে চাটুজ্জে উঠিয়া পড়িয়া কহিল,—তাহলে তোমার খানাও দরকার হলে নেব কিন্তু সুরেশবাবু।

সমস্ত দিনে আর রায়কে দেখা গেল না। সুরেশ একা একা বসিয়া কত কথাই ভাবিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া ওই নরু ছেলেটির কথাই আসিয়া পড়ে। তাহ... ছিল সংস্কারকে সে জয় করিয়াছে, কিন্তু ননীর মত দেহ ঐ কিশোরটি তাহার সমস্ত শক্তি যেন চূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

ছেলেটার যদি পরাজয় হয়,—কোন রকমে যদি সে আহার গ্রহণ করে, তবে যেন শান্তি-সোয়াস্তি সে পায়। কতক কল্পনাও সঙ্গে সঙ্গে সে করিয়া যায়,—এই দারুণ রৌদ্র, আজ ক্ষীণ কণ্ঠে সে নিশ্চয় কহিবে—একটু জল! আর সে ক্ষীণ কণ্ঠের ধ্বনি দুন্দুভির মত এই বিরাট পুরীর পাষাণে পাষাণে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

কিন্তু তাহাতেও সুখ নাই, চিন্তার তীব্রতায় সমস্ত প্রাণটা যেন হাঁপাইয়া উঠে।

সুরেশ বারান্দাময় সঙ্গীর সন্ধানে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার নিজের স্থানটিতেই আসিয়া বসিয়া পড়িল।

বিনাশ্রম কারাদণ্ড আজ যেন তাহার পক্ষে অভিশাপ হইয়া উঠিয়াছে। পরিষ্কার আকাশ প্রদীপ্ত প্রখর সূর্যের আলোকে যেন জ্বালাময়, আকাশপানেও তাকাইয়া থাকিতে পারা যায় না। ঘরখানির প্রতি খুঁটিনাটি দেখিয়া দেখিয়া দৃষ্টি যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সুরেশ গামছাখানা ঘাড়ে করিয়া অগত্যা পাইখানার পানেই চলিল; সেখানে সেই যে ময়রাটা মেথরের কাজ করে, তার সঙ্গে তো কয়টা কথা কওয়া চলিবে!

লোকটি বেশ! অতীতের অভিজ্ঞতায় সে আপনার ভবিষ্যৎটা বেশ আঁচিয়া লইয়াছে। জেলে তাহাকে আবারও আসিতে হইবে—হয়তো জীবনটাই কাটাইতে হইবে, তাই নিজে যাচিয়া মেথরের কাজটা গ্রহণ করিয়াছে। কাজটা হালকা, তাড়া নাই বরং তোষামোদ পাওয়া যায়, আবার আহারও পাওয়া যায় ভাল।

খুশীর সময় সে অশ্লীল গানের বইখানা পড়ে, আবার মন খারাপ হইলে ছেঁড়া ব্যাকরণ-কৌমুদীখানা খুলিয়া বসে।

সুরেশ আসিয়া কহিল,—কি হচ্ছে? বই পড়ছ না আজ?

লোকটি পা দুইটা ছড়াইয়া, বসিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—জেলের পাঁচিলগুলো কি উঁচু আর কি শক্ত! আচ্ছা পাকা গাঁথুনি!

রায়কে দেখা গেল চারিটার পর—

বারান্দার ধারে সম্মুখের পানে চাহিয়া শূন্যমনে দাঁড়াইয়া ছিল, সুরেশ ডাকিল,—এস রায়—এস এস!

রায় আসিয়া বসিয়াই কহিল,—ও-বেলার কথাটাই মনের মধ্যে ঘুরছে সুরেশবাবু, তুমি আমায় ঘেন্না করছ বোধহয়?

সুরেশ কহিল,—ঘেন্না কেন করব অমরবাবু?

—আমার স্বরূপ দেখে—আমার রক্ত-মাংসের বুভুক্ষার তীব্রতা দেখে?

—না, রক্ত-মাংসের মানুষের ওটা জন্মগত প্রবৃত্তি—তার বিকাশ মানুষের জীবনে তো স্বাভাবিক!

—তারও মাত্রা আছে সুরেশবাবু, কিন্তু আমার এ যে কি তীব্রতা, তা তোমায় প্রকাশ করতে পারি না। এর জন্যে আমার শাস্তি হয়েছে জেলে এসেও,—আমার টিকিটে লেখা আছে,

তোমায় দেখাব।

সুরেশ কথাটার গতি ফিরাইতে কহিল,—তুমি কতদিন জেলে আছ রায় ?

—চার বছর।

সুরেশের ইচ্ছা হইল অপরাধের কথাটা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু পারিল না। রায় আপনা হইতেই কহিল,—কি করেছিলাম জিজ্ঞাসা করলে না সুরেশবাবু ?

সুরেশ লজ্জিত হইয়া কহিল,—সে ঠিক নয়।

রায় কহিল,—সবাই কিন্তু করে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার রায় কহিল,—তুমি বোধহয় বেশী দিন জেলে আস নাই, না ?

—না, এই মাস চারেক হল।

—তাই, তাই তোমার জীবনটা আজও সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়নি।

—তা নয় রায়, আমার জীবনে আমি কখনও কোন আবরণ রাখিনি কিন্তু হঠাৎ আজ আমি আপনাকে যেন হারিয়ে ফেলেছি।

অমর কি যেন ভাবিতেছিল, কথাটা বোধহয় সে শোনে নাই। সহসা কহিল,—বিনা অপরাধে শাস্তি হয়, এ তুমি বিশ্বাস কর সুরেশবাবু ?

সুরেশ অন্যমনস্ক ভাবেই সায় দিল,—করি।

আবার একটু নীরবতার পর রায় কহিল,—আমার বিনা অপরাধেই শাস্তি হয়েছে সুরেশ-বাবু। কণ্ঠস্বরে তাহার একটা বিষাদস্নিগ্ধ গাম্ভীর্য, সে স্বর মানুষের মনের এমন একটি তারে ঘা দেয় যে, মানুষ তাহা উপেক্ষা করিতে পারে না। সুরেশ মুখ তুলিয়া চাহিল।

রায় যেন আর সে মানুষটিই নয় ; ভঙ্গিমায়, স্বরে সহসা তাহার ভিতর যেন একটা আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গেছে। স্তিমিত চোখের বিষণ্ণ দৃষ্টি দূরে-সুদূরে ওই আকাশের বুকে নিবদ্ধ, যেন অতীতের কি একটা স্মৃতি তার চোখের ওপর সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রায় কহিল,—ওই নরু ছেলেটির শিক্ষা-দীক্ষা কল্পনা করতে পার,—ওই ধারারই আর একটি ছেলে, একটা বিরাট মনুষ্যত্বের আদর্শ সম্মুখে রেখে জীবনপথে চলা শুরু করেছিল। সমিতির পর সমিতি গড়ে উঠেছে তাকে কেন্দ্র করে, মহামারীকে সে দু'হাতে ঠেলে তার পল্লী থেকে বের করে দিয়েছে, দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, আগুন, জল, যখন যে সংহারমূর্তিতে মানুষকে আক্রমণ করেছে, তারই সঙ্গে বুক দিয়ে অমিতবীর্যে সে লড়াই করেছে।

গায়ের জামাটা তুলিয়া পিঠটা দেখাইয়া বলিল,—দেখছ সুরেশবাবু ?

প্রায় সমস্ত বুকটা জুড়িয়া একটা মস্ত ক্ষত-চিহ্ন।

—আগুন একবার তার জীবনকে গ্রাস করতে এসেছিল। জলন্ত ঘরে একটি মেয়ে,—তাকে বাঁচাতে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল সে, মুখের আহার কেড়ে নেওয়ার ভয়ে ক্রুদ্ধ অগ্নি-শিখা সহস্র হস্ত বাড়িয়ে তাকে আক্রমণ করল। বেরুবার মুখে জলন্ত দরজাখানা তার পিঠের ওপর চেপে পড়ল। কিন্তু এত অমৃত জীবনে তার সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল সুরেশবাবু যে, তার জীবনের

কণামাত্র পেয়ে আগুনের তৃপ্তি হয়ে গেল। সে বোধহয় বলতে পারতো সুরেশবাবু, অন্তত তার নিজের পল্লীখানিকে দেখিয়ে বলতে পারত—"আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ।" রায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইল।

কিছুক্ষণ পরে আবার কহিল,—একটা জিনিস সে জানতো না,—জানতো না যে, মনুষ্যত্বের বিকাশে মানুষের এত প্রচণ্ড হিংসা হয়, যে, মানুষ মানুষকে হত্যা করতে পারে। জমিদারের সে কোন অনিষ্ট করেনি, সে কমিউনিস্ট ছিল না সুরেশবাবু, তার ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করেনি, তবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল। এক দরিদ্র বিধবার গ্রাসাচ্ছাদনের অবলম্বন সামান্য কিছু সম্পত্তি—

এইখানে রায় একটু হাসিয়া কহিল,—কিন্তু, "বাবু কহিলেন, বুঝেছ উপেন, ও জমি লইব কিনে"। স্বামীর সম্পত্তি বিধবা ছাড়তে রাজী হয় না, শেষে জোর করে জমিদার তা কেড়ে নিলে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছেলেটি স্বেচ্ছায় মাথা তুলে দাঁড়াল। সম্পত্তি অবশ্য ফেরাতে পারল না;—ফেরাতে পারল না নয়, সম্পত্তি ফিরত, কিন্তু তার আগেই জমিদার টাকা দিয়ে মেয়েটাকে কিনে ফেললে সুরেশবাবু! যে মেয়ে খানিকটা মাটি দিতে চায়নি, সে শেষে তার দেহ পর্যন্ত তাকে বিক্রী করলে। যাক, টাকা দিতে হল জমিদারকে। তারপর হল কি জান? সংবাদ রটল, সেই টাকা নাকি সেই ছেলেটি ডাকাতি করে লুঠে নিয়েছে, তার মর্যাদাও নাকি হরণ করেছে; মেয়েটি তাকে নাকি খুব ভাল করে চিনতে পেরেছিল। আদালতেও সেই সাক্ষীই সে দিয়ে এল! ছেলেটির সাজা হল পাঁচ বৎসর জেল আর বিশ ঘা বেত। সুরেশবাবু, পিঠে যে দাগ দেখলে, উলঙ্গ হলে দেখতে ওই বেতের দাগও ঠিক এমনি অক্ষয় হয়ে গিয়েছে।

রায় নীরব হইল। সুরেশ রায়ের কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিল। তার মন যেন আরও স্তিমিত হইয়া গেল, একটা উত্তর, একটা সহানুভূতির কথা বলিবার ভাষাও যেন সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না; শুধু নীরবে সম্মুখের পানে উদাস নেত্রে চাহিয়া রহিল। দূরে আকাশের গা বাহিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার সরীসৃপের মত আগাইয়া আসিতেছে, পাখিগুলার কলরব তখনও শেষ হয় নাই, একটা পেঁচা কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে ডাকিয়া উঠিতেছে—চ্যাঁ—চ্যাঁ—

বারান্দার ওদিক হইতে চাটুজ্জের সাড়া পাওয়া গেল।

—রায়—রায়, এই শালা, অন্ধকার হয়ে এল যে, ঘর বন্ধ হয়ে যাবে যে—আরে এই—

রায় উঠিয়া পড়িয়া সুরেশকে কহিল,—মন কি তোমার খারাপ হয়েছে সুরেশবাবু?

সুরেশ কহিল,—হ্যাঁ—কেমন এক রকম—যেন,—

রায় কহিল,—আসবে আমার সঙ্গে?

—কোথায়?

—গাঁজা খাবে! ওই দেখ চাটুজ্জে ডাকছে। রাত্রে বেদম ঘুম হবে। আমরা রোজ খাই—ওই শালা আমাকে শিখিয়েছে।

সুরেশের বিস্ময়ের এবার আর অবধি রহিল না, সে রায়ের মুখপানে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া

রহিল। কথাটা যেন সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

রায় হাসিয়া কহিল,—তুমি কি আমাকে সেই ছেলেটি ভাবছ না-কি? He is dead—সে মরে গেছে সুরেশবাবু সে মরে গেছে।

সুরেশ কহিল,—মাপ কর অমরবাবু, মরালিটি আমি মানিনে কিন্তু নেশাও করিনে। জিনিসটাকে আমি ঘেন্না করি।

রায় চলিয়া গেল।

মিনিট বিশেক পরে আবার রায় আসিয়া কহিল,—চাটুজ্জে-শালা বেড়ে লোক মাইরি। সিগ্‌রেটের ভিতর মাল পুরে—হি-হি-হি—

সে হাসি আর ফুরায়ই না।

সুরেশের বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এ হাসি যে-কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছে, সেই-কণ্ঠ হইতেই একটু পূর্বেকার সেই স্বর বাহির হইয়াছিল।

সে হাসি থামিলে কিছুক্ষণ সব নীরব। আবার হঠাৎ রায় কহিল,—আচ্ছা, বি ইউ টি বাট্‌ হলে পি ইউ টি পাট্‌ হবে না কেন সুরেশবাবু? হি-হি-হি—

ওদিকে ঢং ঢং করিয়া ছ'টা ঘড়ি বাজিয়া গেল। বাহিরে তালার পর তালা বন্ধ হইতেছিল। মাঝে মাঝে হাঁক আসিতেছিল,—সরকার—

—সেলাম।

রায় উঠিয়া আপনার ঘরে যাইতে যাইতে আবার কহিয়া গেল,—বি ইউ টি বাট্‌ হলে পি ইউ টি পাট্‌ হবে না কেন?

সুরেশ তাহারই পানে চাহিয়া ছিল, সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—'বি ইউ টি বাট্‌ হলে পি ইউ টি পাট্‌ হবে না কেন'! খেলে মন্দ হয় না।

আট

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়া যাইতেছে—সুরেশের ঘুম আসে না, বিনিদ্র চোখে বিছানায় ছটফট করিতেছে।

বাহিরে রাত্রিটা জ্যোৎস্নাময়। দূরে কোন দরিদ্র-পল্লীতে মাদল, কাঁসি বাজিতেছে, একটা পরিপূর্ণ আনন্দের আমেজে বাতাসও যেন উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। এদিক দিয়া কোন কামারশালার একঘেয়ে ঠং ঠং শব্দ সময়ের সমতা রাখিয়া বেশ বাজিয়া চলিয়াছে। শব্দটা সুরেশের বেশ লাগিল। ঠং করিয়া ধ্বনিটা উঠিয়া দিক্‌-দিগন্তরে ছড়াইয়া ক্ষীণ হইয়া আসিতে আসিতে, আবার ধ্বনিয়া উঠে—ঠং, একটি সুন্দর সংগীতের রেশ ওর মধ্যে আছে।

মধ্য রাত্রে ভারী বুটের আওয়াজ যেন বাড়িয়া গেল, ত্রস্তভাবে যেন সব চলা-ফেরা

চলিতেছে। বড় ফটকটা খোলারও শব্দ পাওয়া গেল।

সুরেশ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

এদিক ওদিক ফিরিয়া কোন কিছু নির্ণয় করিতে না পারিয়া সে আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল। জ্যোৎস্নার ঝলক জাল-আঁটা জানালা দিয়া সিক ও জালের ছায়া ফেলিয়া মার্বেলের জাফরির মত দেওয়ালের গায় মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। ওদিকে তখনও সেই কামারশালের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে—ঠং ঠং।

সহসা সুরেশের মনে হইল, নরু বোধ হয় আহার গ্রহণে সম্মত হইয়াছে।

উৎসাহে উঠিয়া বসিয়া বিছানার উপর একটা চাপড় মারিয়া সে কহিল,—Fool, he was a fool.

তারপর একটা স্বস্তির আনন্দে অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

ঢং, ঢং, ঢং, ঢং, ঢং।

ভোর পাঁচটার ঘড়ি পেটা শেষ হইয়া গেল ; কয়েদীরা সব জাগিয়া সারিবন্দী বসিয়া গেল, —এখনি দরজা খুলিবে।

কিন্তু দরজা খুলিল ছয়টার সময়—এক ঘণ্টা পর।

হেড-ওয়ার্ডার কয়েদী গণনা করিয়া বলিয়া গেল,—আজ ছুটি হ্যায়। বাহারসে মু-হাত ধোকর—ঘরমে ঘুস্ যাও।

বাহিরে আসিয়াই সকলের সেদিন বুক কাঁপিয়া উঠিল। সশস্ত্র প্রহরীগুলি সব স্তব্ধ গাম্ভীর্যে পেট্রোল করিয়া ফিরিতেছে,—সমস্ত জেলখানাটা যেন একটা ধুমায়মান আগ্নেয়গিরি।

কেষ্ট ফিসফিস করিয়া পাশের কয়েদীটাকে জিজ্ঞাসা করিল,—কি ব্যাপার বল দেখি ?

—সেটা কামার বেটা বোধ হয়—

সিপাই হাঁকিয়া উঠিল,—চোপ !

পায়খানার দিকে যাইতে যাইতে গোসাঁই নাকে হাত দিয়া শুঁকিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, —জারমানী কলকাতার ধার পর্যন্ত এসে পড়েছে, শ্বাসা গুণে বুঝতে পারছি।

একটা অপ্রত্যাশিত আশায় ও আনন্দে সকলের চোখ যেন জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। গোসাঁই আবার একবার নাকে হাত দিয়া কহিল,—হুঁ—বাঁ-নাকে শ্বাসা বইছে, ঠিক।

সারিবন্দী পায়খানার ধারে বাঁধানো জায়গাটায় অভ্যস্ত ভাবে সকলে বসিয়া ছিল। গৌর ছেলেটাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল,—কি রে—এ সব কি ? তুই তো সব জায়গায় যাস।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল,—পাঁচ নম্বরের সেই বাবুটি—

বেচারী আর বলিতে পারিল না। বাহিরে একটা কলরোল উঠিতেছিল—সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে ইঙ্গিত করিয়া কহিল,—ওই শোন্।

বাহিরে সে কি কলরোল !

মরণের-রথে-জীবনের-জয়যাত্রায় মানুষের উল্লাস-কলরোল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

মরণ-ভীতু মানুষ দলে দলে কলরোল করিয়া এই শবের জ্ঞাতিত্ব দাবি করিতেছে ;—মুহূর্তের জন্য ওরাও যেন আজ মরণ জয় করিয়াছে।

কয়েদীর দল চঞ্চল হইয়া উঠিল মনে হইল, ঘাড উঁচু করিয়া ওরাও বাহিরের ওই জীবনোচ্ছ্বাস একবার দেখিয়া লয়, কিন্তু সম্মুখে বিশাল প্রাচীর-বেষ্টনী!

দুর্যোগের রাত্রে প্রান্তরে পথহারা-যাত্রিদল দূর গ্রামের জীবনের সাড়ায় উদ্‌গ্রীব উত্তেজনায় যেমন বলে, কোথায়, কোথায়, তোমরা কোথায়? তেমনি একটা উন্মাদ কোলাহল যেন বাহিরের জগৎটাকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে বাঁশির পর বাঁশির তীক্ষ্ণ শব্দে সমগ্র জেলখানাটা রোষে চিৎকার করিয়া উঠিল, —গুমটিতে 'পাগলা ঘণ্টি' বাজিয়া গেল—ঢনঢন ঢনঢন—

জীবন-সন্ধানী ব্যাকুল যাত্রিদলের সম্মুখে দুর্যোগের আকাশে যেন বাজ গর্জিয়া গেল।

জীবনের স্বাভাবিক চলমান স্রোতে বাধা পড়িয়া যে-আবর্তের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে খড়কুটার মত পাক খাইয়া খাইয়া বন্দিশালার অভাগা মানুষগুলি যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। একটা অতি চঞ্চল হাসির সংঘাতে ওই আবর্তে একটা স্বাভাবিক প্রবাহ আসিতে পারে—এটা সবাই জানে ; কিন্তু কারোই যেন হাসি আসে না। সময়ে সুযোগে ওই কথা, ওই ছেলেটিরই কথা আসিয়া পড়ে।

ঝড়ের মত অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া এই অদ্ভুত ছেলেটি যেন বন্দিশালায় একটা বিপর্যয় ঘটাইয়া দিয়া আবার অকস্মাৎই কোথায় মিলাইয়া গেছে!

মাঝে মাঝে কৌতুক উঠিতে উঠিতে মিলাইয়া যায়। বুড়ো মাঝিটা অতিষ্ঠ হইয়া সেদিন গৌরকে কহিল,—

—দূ-রো মোড়ল, এটা হলো কি?

—কি হল বল দেখি?

—ও মল তো আমাদের কি?

ওর ক্ষুদ্র জীবনও যেন এ ক'দিনেই বিষণ্ণতার চাপে পড়িয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছে।

গৌর কথাটার প্রতিবাদ করিতে পারিল না। মানুষের মরণজয়ে যে-আশ্বাস মানুষ পাইয়াছিল, সে-আশ্বাস দুর্বল মানুষ এই কয়দিনেই হারাইয়া আবার নিঃসম্বল হইয়াছে। কি লইয়া আজ সে বাঁচিয়া থাকিবে, পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে মরণ যে নিশ্চিত পদক্ষেপে আগাইয়া আসিতেছে—কোন্ অবলম্বনে তাহার পানে নিরন্তর পথ-চাওয়া সে ভুলিয়া থাকিবে!

মাঝি কহিল,—আজ আমি গায়েন করব মোড়ল।

গৌর সহসা সকলকে ডাকিয়া দুইটা হাত নাড়িয়া কহিল,—চোপ চোপ, আজ মাঝি গান করবে,—সাঁওতাল নাচ হবে আজ।

সবাই যেন এই চাহিতেছিল। সব সরিয়া সরিয়া বসিয়া গেল—মাঝি দুই হাতে দুইখানা থালা লইয়া বাজাইতে বাজাইতে গান ধরিল ; তাহার অর্থ এই—

কালো মেয়েটি চলিয়া যায়, মাথায় তাহার জবাফুলের গোছা, জবার শিষ কয়টি ওর দেহের দোলার সঙ্গে হেলিতেছে, দুলিতেছে ; ওই তালে তালে তোরাও পারিস তো;নাচ্।

গান শেষে থালা বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে বাজনার বোলটাও মুখে আওড়াইয়া গেল—

চিলাক চিলাক, চিলাক—দিপং, চিলাক—দিপং, হুরুর্—হুরুর্—হুরুর্—

গানখানির ভাবের সহিত ওর মনের কোন সম্বন্ধ নাই হয়তো, কিন্তু সুরের সহিত নাচের একটা সুষম সংগতি আছে ; সে নাচে শিল্পও আছে—নৈপুণ্যও আছে।

বাহিরে নূতন বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি—নিবিড় অন্ধকার, জানালার বাহিরে সমস্ত পৃথিবীটা যেন হারাইয়া গেছে ; ভিতরে স্বল্প আলোকে কতগুলি প্রাণী বাঁচিবার চেষ্টায় এমনি প্রাণপণ করিয়া আনন্দ সঞ্চয় করিতেছিল।

অমর রায় আপনার তার-ঘেরা জানালাটা দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল।

বাহিরে মৃদু বারিপাত হইতেছে—তার শব্দ বড় শোনা যায় না। বর্ষাভিষিক্ত গাছগুলির পাতা-ঝরা জল অনিবার টুপটুপ শব্দ করিয়া পড়িতেছে। ওর চোখে সব চেয়ে আজ সুন্দর লাগিতেছে জোনাকির মেলা! গাছে গাছে অসংখ্য অজস্র জোনাকি মুহুর্মুহু বিকশিত হইয়া গভীর কালোর বুকে আকাশ-জোড়া তারা-ফুলের আতস বাজি জ্বালাইয়াছে। এক নেভে, এক জ্বলে, এ-গাছ হইতে ও-গাছে আনাগোনা করে।—

অমর এর বিজ্ঞানসম্মত অর্থ জানে।—এ হইতেছে ওদের নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি অভিসারের আহ্বান। এ ওকে ডাকে, ও একে ডাকে। যেগুলা চলাফেরা করে সেগুলা পুরুষ। কিন্তু এ অর্থে রায়ের আজ মন উঠিল না—কালো অন্ধকারের বুকে আলোর ফুল ফোটার যে সৌন্দর্য, তাই যেন আজ তার বুকে বাসা গাড়িয়াছে ; চোখে তার রূপের অঞ্জন লাগিয়াছে। রায়ের মনে পড়িল সে কবিতা লিখিতে পারিত ; আজ আবার তাহার সাধ হইল কবিতা লেখে। সে একটা সিগারেট ধরাইয়া মনে মনে কবিতা রচনার চেষ্টা করিল।

দূর হইতে সেই কামারশালার উত্তপ্ত লোহার অবিশ্রাম ঠুং ঠাং শব্দ নিরন্ধ্র অন্ধকারের গা বাহিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। রায় বেশ বোধ করিল শব্দটা নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে না—দূরে-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে মাত্র।

এই দৃশ্যবৈচিত্র্য ও অনুভূতির মাঝে কতক্ষণ কাটিয়া গেল খেয়াল ছিল না, সহসা তাহার মনে হইল কে যেন বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে। সে কান্নায় উচ্ছ্বাস নাই, আবেগ নাই, ভাষা নাই, শোনা যায় শুধু—ধ্বনিতে বিলাপ।

কয়েক মিনিট পরেই পাশের ঘরে চাটুজ্জে বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল,—আঃ, জ্বালালে শালা কামার ; শালাকে তো লটকে দিলেই হয়!

অমর জানালায় মুখ রাখিয়া মৃদু-কণ্ঠে ডাকিল,—চাটুজ্জে।

চাটুজ্জে বেশ আমিরী কণ্ঠে কহিল,—কে অমরবাবু নাকি? দিলে শালা কামার ঘুমটা চটিয়ে, তুমি বুঝি পেত্নী মনে করেছ?

—ও কি সেই কামারটা ?

—হ্যাঁ, শালা এখন আর বেমক্কা চেঁচায় না, রাত্রে এমনি ধারা কাঁদে! শালা পাপী হে!

ওয়ার্ডার সাড়া দিয়া উঠিল,—চুপ রহো বাবু, নিদ যাও—নিদ যাও।

চাটুজ্জে মুখ ভেঙচাইয়া কহিল,—লে—লে বাবা, বলে লে যত পারিস। কথায় আছে সেই যে 'বে-কায়দায় পড়লে হাতি, চামচিকিতে মারে লাথি', নইলে আমি বাবা সাবইন্‌স্পেকটার—হুঃ! তারা—তারা, মা মহামায়া—

একবার নড়িয়া চড়িয়া শোওয়ার একটু শব্দ হইল, তারপর আর চাটুজ্জের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

অমর দাঁড়াইয়াই ছিল,—কবিতার এক লাইনও তার মাথায় আসিল না, কিন্তু সহসা মনে পড়িয়া গেল একটা বিখ্যাত কবিতার একটি পদ "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে"—

রায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল,—এ লোকটার জীবনের বেদনার গান-রচনা শুধু ওই বিলাপ—ওই কান্না; মানুষের ভাষা যেদিন হয়নি সেই-দিনের মানুষের কাব্য এ-ই; শ্রেষ্ঠ সত্য!

আরও দিন পনেরো পরে—ওদের জীবন তখন অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছে।

সে দিনটা রবিবার, কয়েদীদলের বিশ্রামের দিন। সেইদিন সকাল হইতে ওরা কামায়, কাপড় জামা সাফ করে, আপনার পরিচর্যার জন্য এই একটি দিন তাহাদের অবসর। এ দিনটা ওদের ছয় দিন ধরিয়া কামনা-করা দিন।

ছোঁড়াটার কিছু কাজ বাড়িয়াছে। ওকে এখন নাপিতের কাজ করিতে হয়। ছোঁড়াটা কাজ করিতেছিল, কেষ্টা আসিয়া পাশে মাটির উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। কেষ্টার শরীরটা একটু সারিয়াছে···দেখিলেই বোঝা যায় দেহ নীরোগ, সর্ব অবয়বে একটি মৃদু সজীবতা দেখা দিয়াছে।

ছোঁড়াটা কহিল,—আজ তোর চুল কাটব মাইরি।

কেষ্টা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—সাইদের ছেলেটা মারা গেছে রে, খবর এসেছে।

ছেলেটার হাতের মুখর কাঁচিখানা সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত থামিয়া গেল। সে অপলক নেত্রে কেষ্টর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কেষ্ট আবার কহিল,—সাপে খেয়ে মারা গেছে।

এ আকস্মিক দুঃসংবাদে উপস্থিত সব কয়টি লোকই যেন স্তম্ভিত, মূক হইয়া গেল।

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে ছেলেটা কহিল,—সাইদ কি করছে রে? খুব কাঁদছে?

—শুনেই ফিট হয়ে পড়ে গিয়েছিল, তারপর জ্ঞান হলে উঠে বসে চোখের জলে বুক ভেসে গেল; মুখে কিন্তু চেঁচায়নি।

যে লোকটির চুল কাটিতেছিল সেও মাথায় দু'হাত দিয়া কি ভাবিতেছিল। একটা

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ছেলেটি কহিল,—এস ভাই, তোমায় কামিয়েই আজ শেষ করে দেব, সাইদের কাছে যাব একবার।

চৈতনা বলিয়া উঠিল,—আমায় কামাতে হবে।

—তোকে ভাই বুধবার দিন দিয়ে দেব—নয় তো কাল; দশ নম্বরের জন্তে ক্ষুর কাঁচি সকালে আনতেই হবে।

চৈতনা কহিল,—না, আমার মাথা ভার হয়ে আছে, আমায় না দিলে আপিসে বলে দেব।

সেদিনের সেই ওস্তাদ বসিয়াছিল এ পাশে, সে কহিল,—বার পাঁচেক তোমার জেল ঘোরা হয়েছে, না চৈতনচরণ?

প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন বিষটুকু জালা ধরাইয়াছিল, চৈতনা উষ্ণভাবে কহিল,—তোমার তো ভারী চওড়া চওড়া কথা হে।

ওস্তাদ উঠিয়া যাইতে যাইতে কহিল,—দোষ দিই নাই ভাই, এ জেলখানা, গম্‌খানা—আপনা বাঁচানা।

চৈতনা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া যেন আঘাতের তীব্রতাটা অনুভব করিয়া লইল, তারপর গণেশকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—বটেই তো—'আপনা বাঁচানা' তো বটেই, উনি-ত ভারী আমার, ওঃ—

বলিয়া সে-ও উঠিয়া পড়িল।

কেষ্ট কহিল,—চুল কেটে যা, ও তো দেব না বলেনি!

—না, আর চুলই কাটব না, চুল রেখে দেব এইবার।

একদল লোক সাইকে ঘেরিয়া বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছে। ওস্তাদ ইতিপূর্বেই আসিয়াছে—চৈতনাও আসিয়া এক পাশে বসিয়া গেল, একটু সংকোচভরেই বসিল।

সাইদ হাঁটু দুইটাকে হাতের ছাঁদে ঘেরিয়া সেই অন্তরালে মুখ লুকাইয়া বসিয়া ছিল। বুঝি কাঁদিতেছিল।

এত বড় একটা নিষ্ঠুর মৃত্যুর মর্মান্তিক সংবাদে সব যেন মূক হইয়া গিয়াছে—সান্ত্বনার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছে না—

চৈতনাই প্রথম কথা কহিল। বলিল,—সপ্পাঘাতে মিত্যু আহা-হা! ও কিন্তু সাইদের পাপেই হয়েছে, সপ্পাঘাতের মিত্যু বেম্মশাপ ভিন্ন হয় না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার কহিল,—একেই বলে 'কে কল্লে বেম্মহত্যে কার প্রাণ যায়,' আহা-হা নির্দোষ শিশু! কি বল গোসাঁইজী!

গোসাঁইজীর মনেও যেন শোকের আঁচ লাগিয়াছে। ওপাশে বসিয়া একটা বিড়ি টানিতে টানিতে গোসাঁইজী বাহিরের পানে শূন্য মনে তাকাইয়া ছিল,—অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর করিল,—কৌন জানে-রে বাবা।

তারপর একটু নড়িয়া চড়িয়া আবার কহিল,—উস্‌কা নসীব—নিয়তি !

ওস্তাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—ছেলেটার নিয়তিই হয়তো বটে— কিংবা হয়তো ব্রহ্মশাপেই সে মরেছে, কিন্তু মনে হয় কি জান ? মনে হয়, আমার যদি জেল না হত, আমি যদি তার তদ্বির করতে পেতাম, তবে হয়তো এমনটা হতে পারত না। আমারও দুটো ছেলে গিয়েছে,—একটা জ্বরে, একটা কলেরায়। ছেলে দু'টোর মুখ আর এখন মনে পড়ে না, তবু সময় সময় মনে হয়, এমনি করে আমাকে যদি জেলে না থাকতে হত, আমি যদি তদ্বির করতে পেতাম, তবে হয়তো তারা,—কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে নীরব হইল।

সাইদ এবার মুখ তুলিল, চোখের জলে মুখখানা তাহার ভিজিয়া গেছে, কহিল, সত্যি কথা ওস্তাদ, আমি যদি থাকতাম তবে এমন হত না, কক্ষনো হত না; সাত-আট বছরের ছেলেকে আমি ঘাস কাটতে পাঠাতাম না, কেউই পাঠায় না। কিন্তু এ হয়েছিল পরের গল-গ্রহ। মা করেছে নেকা সে লোকের কোন্ দরদ ? পরের ছেলের ওপর কেন থাকবে বল ?

গৌর কহিল,—এমন পরিবারের গলায় পা দিয়ে আমি মারতাম। গৌরের মুখখানা ভীষণ হইয়া উঠিল—ও বেচারীও একটি শিশুকে একটি নারীর হাতে রাখিয়া আসিয়াছে।

সাইদ কহিল,—নাঃ, আর আমার সে ইচ্ছে হয় না। যখন তার নেকা করার খবর পেয়েছিলাম, তখন তাই ভাবতাম।'রাতের পর রাত আমি ঘুমুইনি, শুধু কেমন করে পালানো যায়, তাই ভেবেছি। এক টুকরো দড়ি, একটা লোহা সব জুগিয়েছি—পালাবার জন্যে। কালও রাতে তাই ভেবেছি আমি, কিন্তু আজ চিঠি পেয়ে সে ইচ্ছেই আর নেই। মনে হয় কি জান ? সে তো মা, মা হয়ে সে যে-দুঃখে ছেলের কষ্ট দেখেও নেকা করেছে, সে-দুঃখ তো কম দুঃখ নয় !

কথাটার উত্তর কেহ দিতে পারিল না। বোধ করি এই দুঃখবোধের মুহূর্তে সকলেই সেই অসহায়া নারীটির অসহ দুঃখের পরিমাণ অন্তরে অন্তরে কতক অনুভব করিতে পারিল;—শত দুঃখ কষ্টের বিনিময়েও পুরুষের আনুগত্য লঙ্ঘন করার অপরাধে একটি নারীকে অপরাধিনী ভাবিতে আজ তাহাদের মন চাহিল না। নারী ও পুরুষের পার্থক্য পার হইয়া মানুষের একটা পৃথক সত্তা আছে—সে নারীও নয়, পুরুষও নয়,—সে শুধু মানুষ। সমস্ত বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অতীতকে লঙ্ঘন করিয়া শুধু ওই বেদনার মুহূর্তটিতে অপরাধীর দলও মানুষ—সত্য তখন তাহাদের দৃষ্টির সম্মুখে।

এই সময় ছেলেটা আসিয়া দাঁড়াইল,—পেছনে কেষ্ট। সাইদ তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিল,—আয়, বোস্।

অনেক দিনের পর আজ সাইদ ছেলেটার সঙ্গে কথা কহিল। স্ত্রীর নেকার খবর যেদিন হইতে আসিয়াছে, সেদিন হইতে সে আর ছেলেটার সহিত কথা কহে নাই। ছেলেটা মুখ নামাইয়া বসিল।

সাইদ তাহার পানে চাহিয়া কহিল,—ওকি-রে তুই কাঁদছিস ?

সত্যই ছেলেটা কাঁদিতেছিল।

জেলের ফটকে এগারোটার ঘড়ি বাজিয়া গেল। এদিকে ঝনো ঝনো করিয়া কাপড়-চোপড় পরিষ্কারের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

চৈতনা কহিল,—চল সব। ছ'নম্বরে আজ তেল দেবে।

একে একে সব উঠিতে শুরু করিল; ছেলেটা সাইদকে কহিল,—তোর কাপড়গুলো দে, কেচে দেব।

সাইদ ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল,—না চল, আমারও তো বিছানা পেড়ে শুয়ে থাকলে চলবে না,—গায়ে কাদা মাখলে যমে ছাড়ে না।

চলিতে চলিতে সাইদ কহিল,—আমার সব চেয়ে দুঃখ কি হচ্ছে জানিস ? এক মুঠো মাটিও কবরে তার দিতে পেলাম না। একটু থামিয়া আবার কহিল,—কোন্ কষ্টটাই বা ছোট বলি! মনে হচ্ছে আমি থাকলে এমন হত না, সে এক কষ্ট; আবার কবরে মাটি দিতে পেলাম না, সেই এক কষ্ট; যখন তার মায়ের কথা ভাবি, তখন তারই তরে কষ্ট হয় বেশী—সে হয়তো প্রাণ খুলে কাঁদতেও পাচ্ছে না।

সম্মুখেই ছ'নম্বর ওয়ার্ড। তেল লইতে কয়েদী দলের ভিড় জমিয়া গিয়াছে। চাপা কলরোল, তার মধ্যে একজন আবার থালা বাজাইয়া গান ধরিয়াছে—

"ও সে মুচকি হেসে গেল চলে কিছু না বলে,—
বল গো সখি পাব তারে কোন্ দেশে গেলে।"

খোলা দরজাটা দিয়া দেখা গেল—গাহিতেছে চৈতনা। শুধু গান নয়, থালা বাজাইয়া কোমর ঘুরাইয়া নাচও জুড়িয়া দিয়াছে। গোসাঁই দাঁত মেলিয়া ঘন ঘন বাহবা দিতেছে।

সাইদ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিতে চলিতে কহিল,—এখানে কি চোখের জল ফেলা যায়-রে! পরের দুঃখ দেখবার এখানে কারু ফুরসত নাই। একটু থামিয়া আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—নিজের দুঃখেরই শেষ নাই, তার ওপর পরের দুঃখের বোঝা আর কত বইবেই বা? আমিও এমন কত করেছি। যার দুঃখ, তার কাছে। সম্মুখে যতক্ষণ ততক্ষণই দুঃখ, তারপর বেরিয়ে এলেই যা ছিল তাই,—যেন হাফ ছেড়ে বাঁচা যায়।

উত্তরের প্রত্যাশায় পিছু ফিরিয়া দেখিল ছেলেটা অনেক পিছনে—ওই ওয়ার্ডটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাহাকে ডাকিতেছে।

কেষ্ট কহিতেছে,—যাই যাই, চল্ না তুই।

সাইদের কয়দিন ছুটি মিলিয়াছে।

চৈতনা অন্তরালে কহিল,—বেশ আরাম মেরে দিলে বাবা!

গণশা কহিল,—যা বলেছিস মাইরি।

পীড়িত-জীবনের ঈর্ষা এমনই বটে; দুর্ভিক্ষ-পীড়িতা মাও সন্তানের মাংস খায়!

বন্দি-জীবনে ওই যে থানিকটা বিশ্রাম, বাধ্যতা-মূলক-পরিশ্রম লাঘবের ছুটি দিন অবসর, ওরই ঈর্ষায় ওরা জর্জর হইয়া ওঠে।

জানালার গরাদের ফাঁকে মুখ রাখিয়া সাইদ দাঁড়াইয়া ছিল। ছেলেটার মুখ এখন আর অহরহ ওর চোখের সম্মুখে নাচে না, তবু মনটা সর্বক্ষণ উদাস। চোখের জল শুকাইয়াছে, দীর্ঘশ্বাসগুলা এখন শুধু কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাহির হয়। একটা বিরাট শূন্যতা যেন তাহার বুকে বাসা বাঁধিয়াছে।

বাহিরে মোটরের হর্ন বাজিতেছিল। দশটার ঘড়ি বাজিয়া গিয়াছে, এগারোটা প্রায় বাজে, সাইদ বুঝিল,—সে কয়েদী গাড়ির হর্ন।

বিচারাধীন কয়েদীর দল ফটকটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এখনি ফটকটা খুলিবে, বাহিরটা একবার দেখা যাইবে—সাইদ অভ্যাসবশেই সেইদিকে তাকাইল।

কয় জোড়া বুটের শব্দে চমকিয়া সাইদ ঠিক পিছন দিকের জানালার বাহিরে রাস্তাটার পানে চাহিল। দেখিল দু'জন ওয়ার্ডার একটা লোককে লইয়া চলিয়াছে। সাইদ চিনিল, —সে সেই কামার আসামীটা। পিঙ্গল দাড়িতে লোকটার মুখ ভরিয়া উঠিয়াছে, চুলগুলো ছোট করিয়া ছাঁটা। আর তাহার সে অস্থিরতা নাই, উন্মত্ততা নাই, নতমুখে নীরবেই পথ বহিয়া চলিয়াছে।

সাইদকে জানালায় দেখিয়া একজন ওয়ার্ডার জিজ্ঞাসা করিল,—কেয়া, ছুটি মিলা হায়?

সাইদের মন ঠিক ওর পানে ছিল না, তবু সে ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—হ্যাঁ।

—ঘাবড়াও মাৎ ভাই, দুনিয়াকা এইসিই হাল; তেরা নসীব।

সিপাহীর কণ্ঠস্বরে আসামীটি মুখ তুলিয়া চাহিল,—পিঙ্গল চোখের দৃষ্টি আর তেমন অস্থির নয়, কিন্তু কাতর চোখের প্রতি পাতাটিতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু জমিয়া রহিয়াছে, শ্লথ-গতি, সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া যেন একটা কাতর বিবশতা। সাইদ লোকটির পানেই চাহিয়া রহিল।

ঠিক ওই সময়টিতেই রায় আপনাদের ওয়ার্ডের বারান্দায় রেলিংএ ঠেস দিয়া আকাশপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতির মধ্যে একটা সজল বিষণ্ণতা আছে, তাহারই প্রতিচ্ছবি কর্মহীন অবসরে মানুষকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ওই বিষণ্ণ আকাশের সজল ম্লানিমার মত, তখন যত অতীত বেদনার ইতিহাস, কবে কোন প্রিয়জন বুকটাকে রিক্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সব আসিয়া যেন মনের বুকে দর্শন দেয়।

বাপ-মা কবে কোন্ কালে চলিয়া গিয়াছেন, অমর তাঁহাদের মুখ আর স্মরণ করিতে পারে না। আজ তাহার মনে পড়িল, একটি শুভ্র আয়ত অপরিম্লান দৃষ্টি, একটি নির্ভীক হাস্যোজ্জল মুখ,—নিষ্ঠায়, পবিত্রতায় তাহার নিজেরই অতীত জীবনের প্রতিচ্ছবি।

তাহার সেই শুভ্র দীপ্ত চোখ আজ কেমন বিবর্ণ, পাংশু; যেন কে কালি মাড়িয়া দিয়াছে!

কে দিল?

এই বদ্ধ পাষাণপুরী—

এই নরকের মধ্যে যে-প্রেতগুলা কর্দমাক্ত পঙ্কলের মধ্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে সরীসৃপের মত কিলবিল করিয়া বেড়াইতেছে—তাহারাই। তাহারাই তাহার সর্বাঙ্গ এমন করিয়া কর্দমলিপ্ত করিয়া দিয়াছে।

এ কর্দম যে ধুইলে উঠিবে না; অক্ষয় হইয়া বাকীটা জীবনের মত তাহার শুভ্র জীবনকে অপবিত্র করিয়া রাখিবে!

সহসা বুটের শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল,—দুইজন প্রহরীর মধ্যে চলিয়াছে কালী। মানুষটির সর্বদেহ ব্যাপিয়া একটি শোকাচ্ছন্ন অবসন্নতা। সমস্ত জীবন যেন ক্ষয় হইতে হইতে আর তিলেকমাত্র অবশিষ্ট আছে—সেটুকু কোন্ মমতায় দেহ আঁকড়াইয়া রহিয়াছে কে জানে, কিন্তু ওটুকুও গেলেই যেন ভাল হইত। নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন অমর জিজ্ঞাসা করিল,—কাঁহা যায়েগা সিপাইজী?

একজন সিপাহী ঘুরিয়া কহিল,—সেশন শুরু হুয়া বাবু, কোর্টমে লে যাতা হ্যায়।

অমর আবার নির্বোধের মত প্রশ্ন করিয়া বসিল,—কেয়া হোগা ইসকা?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সিপাহীটা কহিল,—কেয়া জানে বাবু, উস্‌কা নসিব!

—উস্‌কা ফাঁসি হোগা।

অমর পেছন ফিরিয়া দেখে চাটুজ্জে হি হি করিয়া হাসিতেছে।

ধমক দিয়া উঠিল সিপাহীটি,—কেয়া বোলতা হ্যায় বাবু, তোমরা কলিজা কেয়া পাত্থলকে বনা হুয়া হ্যায়?

অমর লক্ষ্য করিল, আসামীটি কাঁদিতেছে, রব নাই, শুধু কয়ফোঁটা অশ্রু গাল বহিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ওই অশ্রুবিন্দুর মতই—ওর সব অস্তিত্ব অচিরেই হয়তো মাটির বুকে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে! তথাপি এই ধরণীকেই লোকে কহে—মা! রাক্ষসী, ও রাক্ষসী; আপন সন্তানের রক্ত, মাংস, মেদে আপনার দেহ পুষ্ট করে।

আসামী লইয়া সিপাহীরা তখন চলিতে শুরু করিয়াছে।

চাটুজ্জে পিছন হইতে ঠেলা দিয়া কহিল,—এই শালা, এই, আয়—আয়, এদিকে আয়।

অমর কোন কথা কহিল না, সুদৃঢ় ধীরতার সহিত তাহার হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া আপনার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

চাটুজ্জে ডাকিয়া কহিল,—এই এই শোন—শোন না, এই দেখ—এইস্তা খুবসুরতি চিজ—

অমর ফিরিয়া দাঁড়াইল। কে যেন তাহাকে পিছন হইতে টানিয়া ফিরাইয়া দিল।

চাটুজ্জে অশ্লীল ভঙ্গীতে ইঙ্গিত করিয়া কহিল,—আজ একঠো জেনানা আসামী কোর্ট যায়েগা, শালা খবর লিলাম—কি চিজ সে মাইরি, গোলাপ ফুলের রং, শালা চাউনি কি—যেন নেশা ধরে যায়।

অমর চাটুজ্জের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। কি বিশ্রী লোকটার ভঙ্গী আর কি এর চোখের দৃষ্টি! যেন আদিম কালের সেই সাপটা রক্তাভ ছোট ছোট গোল চোখের হিংস্র দৃষ্টি দিয়া অতি তীব্র আকর্ষণে আকর্ষণ করিতেছে, সমস্ত চেতনা যেন বিলুপ্ত হইয়া যায়!

অমর অভ্যাসবশে যন্ত্রচালিতের মত চাটুজ্জের দিকে কয়েক পা আগাইয়া গেল। চাটুজ্জে হি হি করিয়া হাসিতেছিলে, সেই হাসিতে অকস্মাৎ তাহার মোহ টুটিয়া গেল। সে যেন আত্ম-রক্ষার চেষ্টায় সবেগে ঘুরিয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। অতীতের সেই নিষ্কলঙ্ক কিশোরটির পবিত্র মুখচ্ছবি তখনও বুঝি তাহার চোখের সম্মুখে জাগিয়া ছিল।

অমরের এই অস্বাভাবিক আচরণে চাটুজ্জের মনটা যেন কেমন হইয়া গেল। সে কিছুক্ষণ রেলিংটায় ভর দিয়া রাস্তার পানে উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া রহিল; যত দূর দেখা যায়—কেহ কোথাও নাই—

সহসা পায়ের তলায় দৃষ্টি পড়িতে দেখিল, একটি পিপীলিকার সারি। বর্ষার আগমনে উচ্চ বাসস্থান অভিমুখে ডিম মুখে সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে। তাহার সহসা কোন্ খেয়াল হইল কে জানে,—পা দিয়া বেশ ধীর-ভাবে একটির পর একটিকে দলিয়া দলিয়া মারিতে লাগিল।

অমরকে কাজ করিতে হয় জেলের অফিসে—কয়েদীদের টিকিটের ফাইল রাখার কাজ। বেশ লাগে তাহার কাজটি। মানুষের পাপের হিসাব, তাহার দণ্ড—এ যেন চিত্রগুপ্তের খতিয়ান!

এক এক সময় আবার সমস্ত চিত্ত তাহার ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে—মানুষের স্পর্ধা দেখিয়া—

মানুষের পাপের বিচার করে মানুষ!

কত বড় তাহার শক্তি! এই শক্তিবলেই তো সে সমস্ত করিয়া যায়,—রাজা হইয়া বসে, ন্যায়ের বিধান করে, মানুষকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়!

সুরেশের কথাগুলি তাহার মনে পড়িয়া গেল,—শক্তিমানের শক্তির অধিকারের চেয়ে বড় অধিকার আর নাই! বিধাতা যে অধিকারে ধাতা—শক্তিমানও সেই অধিকারে দণ্ডদাতা—রাজা! সিংহ যে অধিকারে পশুরাজ—মানুষও সেই অধিকারে মানুষের ভাগ্যবিধাতা—প্রভু!

সুরেশ আরও বলে,—জান অমরবাবু, মানুষ এই নগ্ন সত্যটাকে কত কথার ভূষণে সাজিয়েই না মহিমান্বিত করে তুলেছে! কিন্তু সকলের চেয়ে হিন্দুরাই একে বেশী মহিমান্বিত করেছে—ওই 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' কথাটিতে। গোপন কিছু করেনি, কিন্তু এমন একটি মহিমা ওকে দিয়েছে যে, শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে নত না হয়ে উপায় নাই। ইংরাজীর might is right কথাটা নগ্ন—মহিমান্বিত নয়।

চেষ্টা করিয়া অমর যত বার কাজে মন বসায়—বাহিরের একটি না একটি বৈচিত্র্য আজ তাহাকে মুক্ত পৃথিবীর বুকে টানিয়া লয়। বাহিরের দিকে একটা জাল দেওয়া জানালা—তাহারই মধ্য দিয়া বিস্তৃত মুক্ত ধরণী—

সম্মুখে একটা পাকা বড় রাস্তা দূর বহুদূর দেশ-দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে—পথিকের সারি চলিয়াছে কোলাহল করিয়া; একটা গাছে বসিয়া কল-কণ্ঠ পাখি কল-কাকলিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। কয়টা ছোট পাখি উড়িয়া আসিয়া মাটিতে নামে আর কুটা কুড়াইয়া গাছের ছোট নীড়টিতে গিয়া বসে।

ও-ঘর হইতে জেলারের ডাক আসিল,—সাইদ আলির ফাইলটা আন তো হে,—চার হাজার পাঁচশো চল্লিশ নম্বর ফাইল।

অমর লইয়া গেল তিন হাজার পাঁচশো চল্লিশ নম্বর ফাইল।

জেলারবাবু তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিলেন,—এ হল কি তোমার? ইডিয়ট কোথাকার!

অমর চকিতে আত্মস্থ হইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া ভুলটা সংশোধন করিয়া আনিল।

ভিতরের দিকের জানালাটা দিয়া চোখে পড়ে গরাদে-ঘেরা সারি সারি জানালা, যেন পশু-শালার পিঞ্জর সব।

একটা জানালায় মুখ রাখিয়া সাইদ আলি তখনও দাঁড়াইয়া ছিল।

অমর ভাবিতেছিল—পশুর মত মানুষের হৃদয়াবেগ তত তরল নয়, তাই মানুষ পশুর চেয়ে উঁচু। পশু হইলে ওই অবস্থায় ওই জীবটি ওই লোহার গরাদের গায়ে মাথা কুটিয়া মরিত।

কিংবা হয়তো মানুষ পশুর চেয়ে কাপুরুষ, মরণের ভয়ে মুক্তির যুদ্ধে বীরের মত সে আগাইয়া যাইতে পারে না, পিঞ্জরের কোণে বসিয়া দীর্ঘ দিন-রজনী গোপনে কাঁদিয়া মরে।

বড় রাস্তাটা দিয়া পতাকা হস্তে একদল ছেলে গান গাহিতে গাহিতে কিসের শোভাযাত্রা লইয়া চলিয়াছে। অমরের সমস্ত ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় যেন একটা প্রবাহ বহিয়া গেল—

তাহারই সন্ধানে যেন ওরা গান গাহিয়া গাহিয়া পথে পথে ঘুরিয়া মরিতেছে। তাহাদের মধ্য হইতে সহসা একদিন সে হারাইয়া গিয়াছিল, তাহাকে খুঁজিতে এরা আজ পথে বাহির হইয়াছে—দিগ্-দিগন্তরে ডাকিয়া ফিরিতেছে।

ফটকে সেই মুহূর্তে ঢং ঢং করিয়া প্রহর ঘোষণা করিয়া জানাইয়া দিল, বেলা নাই—বেলা নাই।

অমর দুই হাতে মাথাটা টিপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল।

এপাশে জানালা দিয়া দেখা যাইতেছিল,—একটা লোক হাতুড়ি হাতে ক্রমাগত ওই মোটা গরাদেগুলায় ঠুকিয়া ঠুকিয়া চলিয়াছে আর লৌহ-পিঞ্জরের প্রতি অঙ্গটি বন্ধন-কঠিন কণ্ঠে যেন কহিতেছে,—'টুটি নাই—টুটি নাই—টুটিব না—'

বাহিরে শব্দ উঠিল মোটরের। জেলের ফটক খুলিয়া গেল, অমর বুঝিল বিচারাধীন আসামীর দল ফিরিয়াছে।

সহসা ও-বেলায় চাটুজ্জের সেই ইঙ্গিতটুকু মনে পড়ায় তাহার মন যেন চঞ্চল হইয়া

উঠিল। গোলাপ ফুলের মত বর্ণ-বিলাস, সুরা-পাত্রের মাদকতার মত বিভোল চাহনি তার,—সে-ও ফিরিবে।

অমর সামনের জাল-দেওয়া জানালাটার পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

ফটকের চার্জ-ওয়ার্ডার গনিয়া গনিয়া খাতায় জমা করিয়া ছোট ফটকটা দিয়া কয়েদীর দল ভিতরে ঢুকাইয়া দিতেছে—

এ লোকটা চেনা—কটা চোখ, কটা চুল, মুখে চটুল হাসি,—এ সেই গুলিখোর ফুরু মিঞা।

ফুরু আপনা হইতে একটা সেলাম ঠুকিয়া কহিল,—সেলাম হুজুর, হো গিয়া। দো বরিষ নিশ্চিন্তি।

গেট-ওয়ার্ডার একটা ধমক দিয়া খাতায় তাহাকে জমা করিতে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই ফুরু পিছন হইতে জিভ কাটিয়া ভেঙ্‌চাইয়া উঠিল। পিছনের কয়েদীগুলা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল…

অমরের কিন্তু হাসি আসিল না, তাহার সমস্ত চিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল সেই নারী-মূর্তিটি দেখিবার জন্য।

অভিসারগামীর মত আশায় আশঙ্কায় সে মুহুর্মুহু অস্থির হইয়া উঠিতেছিল

আবার কয়টা পুরুষ কয়েদী চলিয়া গেল ;—কই আর তো কেউ আসে না!

এবার শোনা গেল কয়টা ভারী বুটের শব্দ, সিপাহীরা কি-যেন বহিয়া আনিতেছে।

অমর বেশ একটু সরিয়া গিয়া ভাল করিয়া আত্মগোপন করিল।

এ সেই খুনী আসামীটা! দুই জন সিপাহী ধরিয়া আনিতেছে। লোকটা ওই বাহকের টানে কোনরূপে পা ফেলিয়া ফেলিয়া চলিয়াছে,—যেন বলির পশু! অমর বিচলিত হইয়া উঠিল—

মৃত্যুর হিম-শীতল নিস্পন্দতা যেন ওর জীবনে একটা সুস্পষ্ট ছায়া ফেলিয়াছে। জীবনের এত বড় দৈন্য আর অমর দেখে নাই। ও যা করিয়াছে সে হয়তো মুহূর্তের ভুল ; মুহূর্তের ভুলের জন্য এত বড় প্রায়শ্চিত্ত! অসহায় ভাবে অমর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

জেলারের গলা শোনা গেল,—এ বেটা তো জ্বালাতন করলে দেখি! যা হবার একটা হয়ে গেলে যে বাঁচি।

অপর একজন কে কহিল,—আদালতেও এমনি হুজুর, অসাড় হয়ে সমস্তক্ষণ শুধু জজ সাহেবের মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল, ওর উকিল কতবার কত কথা জিজ্ঞাসা করলে, তার হাঁ-ও নাই, না-ও নাই—যেন পক্ষাঘাত হয়েছে।

লোকটা কোর্টের কনস্টেবল।

সহসা কালী সকরুণ ভাবে কহিল,—আমার ফাঁসি হবে হুজুর—জজ সাহেব ক্ষণে ক্ষণে ভুরু কুঁচকে উঠছিল—

গেট- ওয়ার্ডার খাতায় কয়েদী জমা করিতেছিল। সান্ত্বনা দিয়া কহিল,—দূর পাগল, দেখবি

তুই খালাস পেয়ে যাবি—বেকসুর খালাস।

সান্ত্বনা অবশ্য দিল, কিন্তু কণ্ঠের সুর যেন কথার সঙ্গে সায় দিতে পারিল না—মেকী টাকার বাজনার মত তাতে মূল্যহীনতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সেটুকু বোধ করি ওই আশ্বাস-কাঙাল নিঃস্ব লোকটিরও অগোচর রহিল না, একটু ম্লান হাসি হাসিয়া আপনার কপালে হাত ঠেকাইয়া কহিল,—দ্বীপান্তরও যদি দেয় হুজুর—

অমরের সমস্ত চিত্তটা যেন বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল—মানুষের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া।

সহসা কে জানে কেন তাহার মনে হইল মানুষ অমর নয়, ওই বিচারকও একদিন মৃত্যুর কুক্ষিগত হইবে! ইহাতে যেন একটা দুর্বল সান্ত্বনা সে পাইল।

আবার পরমুহূর্তে এই অসংলগ্ন চিন্তার কথা ভাবিয়া সে মনে মনে নিজেই হাসিয়া ফেলিল।

আবার মোটরের শব্দ—

এবার একটি স্ত্রীলোক আসিয়া ভিতরের ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল। অমর ফিরিয়া তাকাইল কিন্তু সে দৃষ্টি তাহার অতি দুর্বল, মন হইতে লালসার সকল চিহ্ন মুছিয়া গেছে। উদাস চিত্তে কুৎসিত চিন্তা মাথা তুলিতে পারিল না।

তবে হ্যাঁ, মেয়েটির রূপ আছে বটে!

জেলার জিজ্ঞাসা করিল,—কি হল?

জেনানা ওয়ার্ডার কহিল,—সেসনে গেল। পুলিস যে এজাহার করলে জ্যান্ত ছেলের গলায় পা দিয়ে মেরেছে। দাইটিও কবুল খেলে যে, বললে—আমায় খালাস করতে ডেকেছিল, খালাস করে আমি দিলাম,—তারপর গলায় পা দিয়ে ছেলে ও আপনি মেরেছে।

জেলার আপন মনেই কহিল,—মা হয়ে সন্তান হত্যা করে—

ফিমেল ওয়ার্ডারটি কহিল,—কলঙ্ক যে বড় খারাপ জিনিস বাবু! সৎ জাতের মেয়ে—

মেয়েটি মুখ নত করিয়া রহিল।

খাওয়াদাওয়ার পর সুরেশ আসিয়া কহিল, কি রায়, ধ্যান করছ না-কি?

অমর চকিত হইয়া কহিল,—ধ্যান?

সুরেশ কহিল,—চাটুজ্জে বলছিল, তুমি ফটকে নিশ্চয় দেখেছ--আজকের জেনানা-আসামী, কেমন হে? চাটুজ্জে তো ঠোঁট চাটছে।

অমর শুধু কহিল,—হুঁ।

—শুধু 'হুঁ'? বলই না হে, তুমি তো কবিতা লিখতে—

সহসা অমর তাহাকে মধ্যপথে থামাইয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা সুরেশবাবু, দুর্ভিক্ষের মত অনাহারে মা যদি সন্তান হত্যা করে খায়, তবে তারও কি ফাঁসি হয়?

সুরেশ হাসিয়া কহিল,—অদ্ভুত মানুষ তুমি অমরবাবু, আর অদ্ভুত তোমার প্রশ্ন, কিন্তু কেন বল দেখি?

—এ মেয়েটি কি করেছে জান? সন্তান হত্যা। বিধবা হয়ে জারজ সন্তান হত্যা—নিজে

গলায় পা দিয়ে মেরেছে!

সুরেশ কহিল,—বিচারকের বিধানে কি আছে জানিনে অমরবাবু, তিনি বিধানমতে দণ্ড বিধান করবেন, তিনিও বিধানে বদ্ধ; আমি কি করতাম যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলি, আমি মেয়েটির ওই কৃত্রিম বৈধব্য ভেঙে দিয়ে ওর প্রণয়ীকে বিবাহ করতে বাধ্য করতাম। কিন্তু তুমি দুর্ভিক্ষপীড়িতা মা-এর সন্তান আহারের কথা কেন তুললে?

অমর কহিল,—আজ সমস্তটা দিন আমি 'অতীত-আমাকে' ফিরে পাবার জন্য সাধনা করেছি—তাই সুরেশবাবু, আজ কারও ওপর অবিচার আমি করতে পারিনি। প্রথমে যখন এই কথা শুনলাম, তখন মনে হল কি জান? মনে হল এর জন্য পৃথিবীর কঠোরতম দণ্ড একে দেওয়া উচিত। কিন্তু আমার 'অতীত-আমি' বললে—না, বিবেচনা করে দেখ, বঞ্চিত জীবনের কত বড় আকাঙ্ক্ষা ওকে পাগল করে তুলেছিল। বিধাতার দেওয়া রক্ত-মাংসের বুভুক্ষা ওকে সংযমের গণ্ডীতে বদ্ধ থাকতে দেয়নি। তারপর যা ঘটেছে, সে ঠিক লোহার-শেকলে-টানা চাকা যখন দাঁতে দাঁতে পড়ে ঘুরে যায়, তখন তারই মধ্যে পড়ে-যাওয়া জিনিসের মত; ও মুহূর্ত দাঁড়িয়ে বিবেচনা করতে পায়নি, ওর মাতৃত্ব, ওর বিবেক, মনুষ্যত্ব সব পিষে গিয়েছে—তবু সেই চাকায় চাকায় ওকে ঘুরে আসতে হয়েছে।

সুরেশ কহিল,—আমি তো তাই বললাম রায়, নারীর অন্তরের যে বেগবতী পুরুষ-সঙ্গ-কামনা, সেইটেই সংসারে পুরুষকে চিরদিন ধন্য করে, সেইটেই নারীকে পুরুষের একান্ত বিশ্বস্ত করে, আদর্শ পত্নী করে তোলে; তার কথা বিবেচনা করেই এ কথা আমি বললাম। ওই মেয়েটি যে-কোন পুরুষকে সেবায়, সৌন্দর্যে, প্রেমে অভিষিক্ত করে তুলতে পারত।

সহসা বুটের শব্দ শুনিয়া দু'জনেই চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল,—জেলার আর জন দুই ওয়ার্ডার।

একজন ওয়ার্ডার অমরকে দেখাইয়া কহিল,—এহি বাবু। এহি বাবু কো হাম হুঁয়া দেখা, আউর কোই নেই গিয়া।

অমরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

জেলার হাতের বেতটা দিয়া ওয়ার্ডারের হাতের কয়টা জিনিস দেখাইয়া কহিল, -তুমি সিগ্রিগেশন সেলের ওখানে গিয়েছিলে? এ সব তুমি দিয়েছ?

ওয়ার্ডারের হাতে এক টুকরা পাঁউরুটি আর একটা সিগারেট।

অমর ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—হাঁ।

জেলার কঠোর গম্ভীর কণ্ঠে কৈফিয়ৎ চাহিল,—Why? কেন, কেন দিলে তুমি?

হাতের বেতটা শূন্যে সজোর-আস্ফালনে যেন শিস দিয়া উঠিল।

তবু অমর কহিল,—বড় মায়া হল—

—মায়া! মায়া! এটা তীর্থক্ষেত্র, দয়া মায়া করবার স্থান,—নয়?

ঘা-কয় বেত অমরের পিঠে পড়িয়া গেল।

যাইবার সময় জেলার বলিয়া গেল,—এবার তোমায় কোন সাজা আমি দিলাম না, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান, বুঝেছ ?

সুরেশ বিস্ময়ে বেদনায় স্তব্ধ নির্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনি দাঁড়াইয়াই রহিল। চাটুজ্জে আসিয়া কহিল,—কতবার না বলেছি তোকে, বিশ্বপ্রেম ছাড়—ছাড়, তা না, শালা কেবল—হুঁঃ—

সুরেশ এতক্ষণে কহিল,—এর চেয়ে তোমার ফাঁসি হলেই ভাল হত রায়, এ তোমায় এরা আছড়ে মেরে ফেললে !

চাটুজ্জে বাধা দিয়া কহিল,—কি যে বাবা তোমরা বল, আমি বুঝতেও পারি না ছাই ! নেঃ, আয়,—একটু বেশী করে না খেলে রাত্রে ঘুমুতে পারবি নে।

অমর কহিল,—চল, সমুদ্রে পড়ে আর ব্যর্থ ভাসার চেষ্টা কেন—অতলের দিকে তলিয়ে যাওয়াই ভাল ! এস সুরেশবাবু।

সুরেশও চাটুজ্জের চেলা হইয়াছে।

•

সেদিন অন্ধকার রাত্রি, আকাশে মেঘ—কিন্তু বর্ষণ নাই, সেই জোনাকির খেলায় দীপালির ফুলঝুরি,—গভীর রাত্রে দূরে মাদল বাজিতেছে। এদিক হইতে শোনা যায় কামারশালার সেই দীর্ঘ একঘেয়ে শব্দ—ঠ—ন্, ঠ—ন্—

সমস্ত জেলখানাটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ; শুধু সেলের এক কোণে ঠেস দিয়া বিচারাধীন খুনী আসামী কালী আজ মৃদু গুঞ্জনে জীবনের জন্য বিলাপ করিয়া চলিয়াছে। সে বিলাপের ভাষা নাই, বিন্যাস নাই—গুনগুন করিয়া কান্না, কিন্তু অতি সকাতর, অতি সকরুণ !

আদিম ভাষাহীন মানব প্রথম শোকের আঘাত পাইয়া বোধ করি ঠিক এমনি করিয়াই কাঁদিয়াছিল।

বাঁচিবার কোন আশাই আর সে করিতে পারিতেছে না। ক্ষীণ আশা ও গভীর নিরাশার দ্বন্দ্বে ক্ষীণ আশা বারবার পরাজয় মানিয়া ওকে এমন শোকার্ত করিয়া তুলিয়াছে। মৃত্যুর এমন নিষ্ঠুররূপে আগমন সত্য-সত্যই মানুষের পক্ষে অসহনীয়।

ওর দৃষ্টির সম্মুখে সমস্ত ধরণী আজ অর্থহীন হইয়া উঠিয়াছে, সম্মুখের ভবিষ্যৎ একটি ভয়াল অন্ধকারের মধ্যে লুপ্ত হইয়া গেছে। সেই অন্ধকার পারাবারের কূলে গতিহীন হইয়া আজ আলো-রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধময়ী ধরণীর জন্য বিলাপ করা ছাড়া আর ও করিবে কি ?

জীবনকে সম্মুখের পথে টানে ভবিষ্যৎ, সেই ভবিষ্যৎ লুপ্ত হইয়া গেলে জীবন হইয়া উঠে বোঝা। সে বোঝা লইয়া পথ-চলা মানুষের শক্তির অতীত। জীবন দেহের বোঝা বহিতে পারে, কিন্তু জীবন বোঝা হইয়া উঠিলে সে বোঝা বহিবে কে ?

কালী এক কোণে মাথাটা হেলাইয়া ঊর্ধ্বমুখে বসিয়া ছিল,—নিমীলিত চোখ। বাহিরের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের মত চোখের পাতার ভিতরেও একটি সুনিবিড় অন্ধকার স্তর—কল্পনার রেখাতেও বুঝি কোন ছবি সেখানে জাগিয়া ওঠে না,—বাসিনীর মুখ পর্যন্ত না, সমস্ত

পৃথিবীই যেন একাকার হইয়া গেছে।

ছবির মধ্যে একখানি ছবি—একটা মানুষের মুখ মনের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে রক্তচক্ষু মেলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরবচ্ছিন্ন তাহার পানে চাহিয়া আছে—সে বিচারকের মুখ।

মানুষটির প্রতি ভ্রূকুটি ওর মনের মধ্যে অক্ষয় হইয়া বসিয়া গেছে। গভীর শঙ্কা ও শ্রদ্ধার সহিত বার বার ওই ভ্রূকুটিগুলির অর্থ ও বিচার করিয়া দেখিতে চায়। ওই লোকটিই যে আজ ওর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—ওর বিধাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিবারেই ওই ভ্রূকুটিগুলির অন্তরালে নির্মম দণ্ডলিপিই বেচারীর চোখের সম্মুখে জলজল করিয়া ওঠে। তাই সে এমন করিয়া কাঁদে, জীবনের জন্যে বিলাপ করিয়া যায়—চোখ হইতে ঝরে জল, তাও অবিরল ধারায় নয়, স্তিমিত গতিতে, ফোঁটায় ফোঁটায়। শঙ্কার আঘাতে ও যেন পঙ্গু হইয়া গেছে—

হাসপাতালের উঠানে জুঁই-এর ঝাড়গুলায় ফুলের সমারোহ পড়িয়াছে, বর্ষার বাতাসে জুঁই-এর সজল মৃদু গন্ধে চারিদিক সুরভিত,—ওর ওই সেলখানির মধ্যেও সে গন্ধ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওর বুকের অন্তস্তল পর্যন্ত যাওয়া আসা করে।

ও কিন্তু সে মিষ্টতা অনুভব করে না—মূর্ছাচ্ছন্নের মত শুধু বিলাপই করিয়া যায়।

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে বিলাপ হইয়া আসে মৃদু শিথিল। বাঁচিবার জন্য আজও ওর জীবন বিশ্রাম চায়, যে-কয়টা দিন বাঁচিতে পাইবে সেই কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকিতেও যে শক্তির প্রয়োজন!

আপনার অজ্ঞাতসারে ও কখন ঘুমাইয়া পড়ে, ঢলিয়া পড়ে—ধরণী মা হাত বাড়াইয়া যেন আপনার পাতা-কোলে টানিয়া লয়।

এ কোল ছাড়িয়া যাইতে মানুষের মন চায় না।

নয়

কয়দিন হইতেই সুরেশের সিগারেট কমিয়া যাইতেছিল। সেদিন পায়খানার ফেরত বারান্দায় উঠিতেই দেখে চাটুজ্জে তাহার বিছানা নাড়িয়া ঘাঁটিয়া উঠিয়া আসিতেছে, সুরেশের সহিত চোখোচোখি হইতেই চাটুজ্জে সপ্রতিভ ভাবেই একমুখ হাসিয়া কহিল,—খাবে নাকি, খাবে নাকি—আজ এক টুকরো বাড়তি হয়েছে।

—চাটুজ্জে তুমি চোর?

চাটুজ্জে প্রবল প্রতিবাদ করিয়া কহিল,—যা-তা বলো না বলছি, মাইরি ভাল হবে না,—হ্যাঁ। তুমি ব্যবহারে মানুষ চিনলে না—

সুরেশ গম্ভীর ভাবে কহিল,—খুব চিনেছি চাটুজ্জে, পা যেমন জুতো চেনে, তেমনি ভাবে তোমায় চিনে নিলুম। চোর তো তুমি বটেই—সে আমি-ও, কিন্তু তুমি যে এত বড় চোর তা জানতাম না।

চাটুজ্জে নিঃসংকোচে হাসিয়া উঠিল। কহিল,—সুরেশবাবু বেশ মাইরি, বলে কিনা জুতো যেমন পা চেনে, না-কি—পা যেমন জুতো চেনে, বেশ মাইরি—হাঃ হাঃ হাঃ—

চাটুজ্জে দিব্য হাসিতে হাসিতে আপনার ঘরে গিয়া উঠিল, আর সুরেশ তাহার গমনপথের পানে চাহিয়া নির্বাক্ দাঁড়াইয়া রহিল।

এই সময় অমর কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুরেশের ঘরে চেয়ারখানার উপর বসিয়া পড়িল। সে যেন কেমন এক রকম—সকরুণ উদাসীনতায় স্তব্ধ, মূক!

সুরেশ সহসা যেন বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,—এই এক মানুষ—sentimental fool! আজ আবার কি হল তোমার?

অমর সুরেশের কর্কশ উক্তিগুলা মনেই লইল না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—লোকটার আজ ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে।

—কার?

—সেই কামারটার।

এবার সুরেশও যেন কেমন স্তব্ধ হইয়া গেল, কোন উত্তর দিতে পারিল না।

একটু পরে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অমর কহিল,—মানুষ কি ভগবানের আসনে বসতে পারে সুরেশবাবু?

সুরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল,—আমি ভগবানকেই প্রশ্ন করি অমরবাবু—তারই প্রতিনিয়ত হত্যা করবার অধিকার আছে কি না?

অমর চুপ করিয়া রহিল, এই নাস্তিকতার বিরুদ্ধে কোন তর্ক তুলিতে আজ আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

সুরেশই আবার কহিল,—আমার অনেক expectation রয়েছে, আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির আশা রয়েছে, মরতে আমি চাই না অমরবাবু! কারও মৃত্যু দেখলে ভয় হয়—হয়তো আমিও জেলের মধ্যেই মরে যাব—জীবনটাকে ভোগ করতে পাব না।

অমর তবু কোন কথা কহিল না। সে ভাবিতেছিল ওই মানুষটির হতভাগ্যের কথা। যুদ্ধ করিয়া মানুষ মানুষকে মারে—মানুষ মরে, সে অন্যায় নিশ্চয়, কিন্তু তার মধ্যেও একটা সগৌরব সান্ত্বনা আছে। নির্ভীকতার সঙ্গে মৃত্যুবরণের গৌরব আছে, সান্ত্বনা—সেও আপন শক্তি প্রয়োগ করিবার সুযোগ পায়।

ক্রোধের বশে মানষ মানুষকে হত্যা করে—সে হয়তো মানুষের ভুল, তার মধ্যে গভীর আক্ষেপ আছে স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু এই যে মানুষ মানুষের বিচার করিয়া প্রাণদণ্ডের বিধান দেয়—এর মধ্যে যে চরম দীনতা, তার চেয়ে দুর্ভাগ্য বোধ করি মানুষের আর কিছুই নাই। সমান অন্যায় করিয়া অপরের কৃত অন্যায়ের প্রতিকার…তার নাম ন্যায়—এ অমর স্বীকার করিতে পারিল না।

সুরেশ আবার কহিল,—আমার ওপর বিরক্ত হলে অমরবাবু? কিন্তু আমি আমার অন্তরের কথাই বলছি, বিচার বিতর্ক করে কোন কথা বলিনি। সে বলতে হলে বলি কি জান?

মানুষকে তুমি যতখানি দায়ী করছ, যতখানি অন্যায়ের বোঝা তার ঘাড়ে চাপাচ্ছ, ততখানি দোষ সে সত্যিই করেনি। রাষ্ট্রশক্তি, সুপ্রতিষ্ঠিত প্রবল শক্তি স্বভাবতঃই চেষ্টা করে আপনার অধিকার অবাধ রাখবার—কিন্তু তার বিপক্ষে মানুষের প্রতিবাদেরও অন্ত নাই। ওই প্রতিবাদ শুনে শুনে রাষ্ট্রশক্তি আপন অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে, মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দিচ্ছে; সে মহত্বকে তার অস্বীকার করার উপায় নাই। হয়তো হয়তো কেন—নিশ্চয় একদিন দেখবে, মানুষকে প্রাণদণ্ড দেবার অধিকার সে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু তোমার ভগবান অমরবাবু,—সে অতি নিষ্ঠুর হত্যালীলা প্রতিনিয়ত অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিবাদ মানুষ কি করতে পারে না, না মনে মনে করে না? নিশ্চয় করে, কিন্তু অসীম তার শক্তি, প্রতিবাদে কোন ফল হবে না জেনেই মুখ ফুটে সে বলে না,—এ অধিকার তার স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু যদি কোন দিন মানুষের সাধনা বিধাতার শক্তির পরিমাণ নিরূপণ করতে পারে, সেদিন জেনো সে প্রতিবাদ নিশ্চয় করবে, তার সঙ্গে সে যুদ্ধ করবে।— একি—একি, তুমি কাঁদছ রায়?

সুরেশ তাহার হাত ধরিয়া টানিল।

অমরের চোখ দিয়া সত্য সত্যই জল পড়িতেছিল। সুরেশের এত কথার একটাও তাহার কানে যায় নাই, সে শুধু ওই লোকটির জীবনের দীনতার কথাই ভাবিতেছিল। সুরেশের আকর্ষণে অমর আপনার দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে হাতখানি টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে নিজের সেলটার দিকে চলিয়া গেল।

সুরেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিল।

খাবারের ঘণ্টা পড়িতে সুরেশ আপনার থালা-বাটি লইয়া অমরের পাশেই গিয়া বসিল।

অমর একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল,—সেন্টিমেণ্ট আমার আর গেল না সুরেশবাবু, ওইটেই আমার দুর্বলতা।

সুরেশ কহিল,—দুর্বলতা কি-না জানিনে রায়, কিন্তু মানুষের জীবনে এটা একটা দুর্ভাগ্য, তাতে সন্দেহ নাই।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া সুরেশ আবার কহিল,—ওর ফাঁসির চেয়ে তোমার হত্যায় বেশী দুঃখ হয় রায়, এমন পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকার চেয়ে তোমার ফাঁসি হলে ভাল হতো। একটু থামিয়া আবার কহিল, চুলোয় যাক, এস—বরং ফুর্তির কথা বলা যাক।

চাটুজ্জে ঠিক পাশেই বসিয়া ছিল কিন্তু এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই—সুরেশের দিকে আড়ে আড়ে চাহিতেছিল। এবার সে অতি আগ্রহে প্রস্তাবটাকে সমর্থন করিয়া কহিল,—যা বলেছ মাইরি সুরেশ, কি তোমরা God God কর বাবু, ও hang your God, God is nothing but botheration—বলিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর সুরেশের গা টিপিয়া কহিল,—বউ-এর চিঠি দেখবে? এইস্তা চিঠি—

সুরেশ সহসা উগ্র হইয়া কহিল,—তোমাকে খুন করে ফেলব আমি!

খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরিয়া সুরেশ ঘরে ফিরিতেছিল। ওদিকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে তালা বন্ধ করার শব্দে অন্ধকার যেন সচকিত হইয়া উঠিয়াছে। গাছের পাখিগুলা সন্ধ্যার কাকলি শেষ করিয়াও ওই শব্দে চকিত হইয়া মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিতেছে…

পিছনে শব্দ শুনিয়া সুরেশ মুখ ফিরাইয়া দেখিল…অমর।

সুরেশ অমরকেই খুঁজিতেছিল। এই তরুণটির প্রতি একটি মমতা কেমন যেন তাহাকে বিচলিত করিয়াছে।

—এই যে, কোথায় ছিলে রায়, বেড়াবার সময় তোমায় পেলাম না যে?

ম্লান মুখে অমর কহিল,—একটু সেলের দিকে গিয়েছিলাম—

সুরেশ তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল,—লোকটা কি করছে?

অমর কহিল,—ঘুমুচ্ছে।

কয় পা চলিয়া অমর আপন মনেই কহিল, আজ যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে!

সুরেশ কহিল,—না, আমার বোধ হয় কি জান? আমার বোধ হয় ও মরে গেছে। একটু থামিয়া কি ভাবিয়া লইয়া সহসা আবার কহিল,—ভীরুর মৃত্যুর মত করুণ, ভীতিপ্রদ আর কিছুই নাই অমরবাবু! তাদের মৃত্যুভীতি সংক্রামক ব্যাধির মত, মানুষকে বিচলিত করে তোলে। Cowards die many times before their death—কথাটা মানুষের ইতিহাসে অতি-বড় লজ্জাকর সত্য। নরু স্বেচ্ছায় সগৌরব-নির্ভীকতায় মৃত্যু বরণ করেছিল,—আজ মনে হয় সেদিন মৃত্যুভয়ে বিচলিত হইনি—বিচলিত হয়েছিলাম ওর তুলনায় নিজের দীনতা উপলব্ধি করে, আর আজ মৃত্যুকে মনে পড়ছে, প্রচণ্ড একটা ভয় যেন অস্থির করে তুলতে চাচ্ছে!

জেলের ফটকের আসিয়া দাঁড়াইল একটি কালো মেয়ে,—নিকষের মত কালো বর্ণ কিন্তু তেমন কালোতেও একটি সুষমা আছে। বড় বড় চোখ, দীঘল পরিপুষ্ট দেহ, যেন পাথরে খোদাই একটি শ্রীমতী নারীমূর্তি। এই মেয়েটিই বাসিনী—ওই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কালী কামারের প্রণয়াস্পদা! প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত লোকটি কাহাকে শেষ-দেখা দেখিতে চায় জিজ্ঞাসা করিলে, সে এই সর্বনাশীর নামই করিয়াছিল।

সর্বনাশী বই-কি! ওই নারীটিকে লইয়াই তো বিবাদে কালীর এমন সর্বনাশ হইয়া গেল!

তা যাক, কালী কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তাহাকে দায়ী করে নাই।

এ নতুন নয়, জগতে নারীকে লইয়া পুরুষে পুরুষে, জাতিতে জাতিতে বহু ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়া গেছে, তবু কেহ কখনও নারীকে দায়ী করে নাই,—সর্বনাশী বলে নাই!

ছোট একটি ঘরের মধ্যে বাসিনীকে বসানো হইল। শৃঙ্খল-জড়ানো লোহার গরাদে-ঘেরা বিশাল দরজা, রক্ত-বর্ণ প্রাচীরবেষ্টনী-বেষ্টিত পরিপার্শ্ব মেয়েটিকে যেন কেমন অভিভূত করিয়া তুলিল।

সমস্ত ঘর জুড়িয়া ম্লান অন্ধকার তন্দ্রাচ্ছন্নের মত এলাইয়া পড়িয়া আছে; বাহিরের আলোকের ভয়ে সে যেন বাছিয়া বাছিয়া এই প্রাচীর-ঘেরা বন্দিশালাটায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। দুনিয়া জুড়িয়াই তো এমন অন্ধকার কিন্তু এমন অনুভূতিটি তো সেখানে আসে না! বোধ করি বন্দিশালার নামের মধ্যে যে বিভীষিকা লুকাইয়া আছে, সেই বিভীষিকাই এমন একটি ভয়াল অর্থ ঐ জড় উপাদানগুলিতে জড়াইয়া দিয়াছে।

বাসিনী সশঙ্ক অভিভূত দৃষ্টিতে ঘরখানির রুদ্ধ-চতুষ্পার্শ্ব, রুদ্ধ-উর্ধ্বের সর্বাঙ্গ দেখিয়া লইল। পিছনের পানে চাহিল, দেখিল বাহিরে গরাদে-ঘেরা ফটক,—রুদ্ধ-প্রতি-অঙ্গে তাহার নির্মম বন্ধন, যেন নিষ্ঠুর ভঙ্গীতে নির্দয় হাসি হাসিতেছে। তাহার পা দুইটা ঠকঠক করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

ভিতরের ফটক খুলিয়া একটি পাংশু, শীর্ণ লোককে বাহির করিয়া আনিল। রুক্ষ, দীর্ঘ দাড়ি গোঁফে মুখখানা ভরিয়া গিয়াছে; যেটুকু দেখা যায় তাহাতেও যেন কে কালি মাড়িয়া দিয়াছে। নিষ্প্রভ ঘোলাটে চোখ, তাহাতে দুটি পিঙ্গল তারা। তথাপি দেখিয়াই বাসিনী তাহাকে চিনিল—এ সে-ই!

দু'জনে মুখোমুখি যখন দাঁড়াইল তখনকার ছবি বোধ করি ছায়াচিত্রেও ফোটে না—ফুটিবার নয়। বাসিনীর ছল ছল চোখের করুণ ব্যথাতুর দৃষ্টি, কালীর মুখের সে বিমুগ্ধ অতি তৃপ্ত হাসি, —তাহার আকার হয়তো ছায়াচিত্রে ফুটিবে কিন্তু সে আবেগ—জীবনের স্পন্দন তো ফুটিবে না!

বাসিনী ছল ছল চোখে কালীর মুখপানে চাহিয়া ছিল,—ধীরে ধীরে দীর্ঘ রেখায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু চোখের কোণ হইতে চিবুক পর্যন্ত গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কালী অতি তৃপ্ত হাসি হাসিয়া বাসিনীর একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া ডাকিল,—বাসিনী!

একাগ্র দৃষ্টি তার ওই নারীটির মুখের উপরে নিবদ্ধ, ওষ্ঠের বেড় ঘেরিয়া নীরব তৃপ্ত হাসি—সে যেন কৃতার্থ হইয়া গেছে।

ঘরের দেয়ালের গায়ে ঘড়িটা অবিশ্রান্ত টিক্ টিক্ করিয়া সময় গনিয়া চলিয়াছে। চির-বিচ্ছেদের মুখে দুটি প্রাণী শেষ-মিলনের আনন্দে নির্বাক্। দু'জনে যেন দু'জনের ছবি অন্তরে অন্তরে অক্ষয় করিয়া লইতেছে, কিংবা হয়তো শুধু শুধুই দু'জনে দু'জনের মুখপানে চাহিয়া আছে।

সহসা বাসিনী যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, রোদন-রুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল,—ওগো কিছু বল তুমি!

কালী চকিতভাবে কহিল,—ভাল আছিস্ বাসিনী?

বাসিনী বিস্মিত নেত্রে লোকটির পানে চাহিল,—এই কি বলিয়া যাওয়ার কথা!

কালী তেমনি পরিতৃপ্ত হাসি হাসিতেছিল। রব নাই, শুধু অধরের রেখায়-রেখায় সে হাসির লেখা পূর্ণ-বিকশিত।

বাসিনী আবার কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা দরজার মাথায় দাঁড়াইয়া জেলার কহিল,—

যাও, তুমি বাইরে যাও, সময় হয়ে গেছে।

বাসিনী মুখ ফিরাইয়া জেলারের মুখপানে চাহিল, দুটি দীর্ঘ জলধারা তার চোখের কোণ হইতে চিবুক পর্যন্ত ছলছল করিতেছে।

জেলার কহিল,—এস।

বাসিনী নতমুখে চলিয়া আসিল। পিছনে তাহার জেলখানার গরাদে-ঘেরা ফটক সশব্দে রুদ্ধ হইয়া গেল। কিছু আর দেখা যায় না—শোনা যায় শুধু পাষাণপুরীর অভ্যন্তরের কর্মপ্রবাহের বিচিত্র শব্দ।

বাসিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া প্রাচীরের পাশের রাস্তাটা বহিয়া চলিতেছিল, সহসা তাহার মনে হইল কে যেন আর্তকণ্ঠে প্রাণ ফাটাইয়া ডাকিয়া উঠিল,—বাসিনী—

থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে কান পাতিয়া রহিল, কিন্তু কই আর তো শোনা যায় না! হয়তো ভ্রম!

টলিতে টলিতে আবার সে চলিতে শুরু করিল,—কিন্তু অন্তর তাহার বার বার তারস্বরে কহিতেছিল,—না না, ভ্রম নয়, এ ভ্রম নয়, সত্য, সত্য, এ ডাক তাহারই—সে-ই নিয়ত তাহাকে এমনি করিয়া ডাকিতেছে। শুধু সে নয়—সকল বন্দীই বুঝি এমনি করিয়া নিয়ত প্রিয়জনকে ডাকিয়া ডাকিয়া মরে।

বাসিনী সশঙ্ক বিস্ময়ে সুদীর্ঘ সুউচ্চ পাষাণ-বেষ্টনীর পানে একবার তাকাইল—একবার তার গায়ে হাত বুলাইয়া দেখিল;—কি কঠিন! কি বিশাল! কি ভয়াবহ!

আপন অজ্ঞাতসারেই তাহার কণ্ঠ হইতে সহসা একটা আর্তস্বর বাহির হইয়া আসিল,—বাবা গো!

প্রাচীরের গায়ে আছাড় খাইয়া প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল—বাবা গো!

ভিতরের ধ্বনিটিও তো তবে এমনি ভাবেই ফিরিয়া যায়!

সহসা সাইদ আলি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ঘুসঘুসে জ্বর, কাসি—দেহ শীর্ণ! জেলার একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—এমন শরীর কেন রে তোর?

সাইদ সেলাম করিয়া কহিল,—কি জানি হুজুর! অসুখ-বিসুখ তো কিছু নাই।

সাইদের আপাদমস্তকে দৃষ্টি বুলাইয়া জেলার কহিল,—হাসপাতালে যাবি, ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে আসবি।

ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া কহিল,—ও কিছু নয়।

সাইদ একটু হাসিল।

দিনকয় পরে সকাল বেলায় গৌর, তহিদ, কেষ্ট জেলারের কাছে সেলাম জানাইয়া কহিল,—সাইদের মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে হুজুর, ওকে আমাদের সঙ্গে রাখলে—

জেলার চমকিয়া কহিলেন,—রক্ত উঠছে?

—হ্যাঁ হুজুর।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব নিজে এবার সাইদকে দেখিলেন—সন্দেহজনক একটা কিছু ঘটিয়াছে!

ওর অবস্থা লক্ষ্য করিবার জন্য ওকে সিগ্রিগেশন সেলে পাঠাইবার হুকুম হইল।

কালী গেল ফাঁসি-ঘরে,—ফাঁসির আসামীর জন্য নির্দিষ্ট সেলে। দরজার গরাদেগুলা পর্যন্ত জাল দিয়া ঘেরা, উপরের জানালার গরাদেও তাই, পাছে ফাঁসির আসামী গলায় দড়ি দিয়া কোন দিন ঝুলিয়া ফাঁসির দড়িকে এড়াইয়া যায়—তাই এই ব্যবস্থা।

জিনিসপত্র আর কি,—সম্বলের মধ্যে তো একজোড়া কম্বল, একখানা থালা, একটা বাটি, দু'খানা গামছা, যাই হোক—তাই গুটাইয়া লইবার সময় সাইদ সকলের নিকট বিদায় লইয়া কহিল,—আসি ভাই সব, আবার কোন্ দিন থাইসিস ওয়ার্ডে ঠেলবে—

গৌর তাহার হাত দুইটা ধরিয়া কহিল,—দু'দিনেই সেরে যাবি দেখবি।

সাইদ হাসিয়া কহিল,—না, ঝাঁজরা বুক কি আর সারে—আর সারাও আমি চাই না। কি হবে সেরে?

গৌর সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল,—পুত্রশোক বড় কঠিন, বড় খারাপ জিনিস—বুক একেবারে ঝাঁজরা করে দেয়। বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

সাইদ তেমনি হাসিয়াই কহিল,—পুত্রশোক কঠিন বটে কিন্তু তাতে বুক ছেঁদা করে না রে, এ করেছে কাচগুঁড়োয়। কাচ গুঁড়ো করে খেয়েছি আমি।

গৌর চমকিয়া উঠিল।

সাইদ কহিল,—বাঁচতে আর ইচ্ছে হয় না—খাটতেও পারি না আর। মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করেছি, কিন্তু রোজ রাত্রে ছেলেটা যেন সেই শ্বাস কাটতে কাটতে বিষের জ্বালায় আমাকে ডাকে। তার চেয়ে—

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সাইদ অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

গৌর ব্যাকুল ভাবে কহিল,—ছি-ছি, এই কি করে রে? ছেলেমেয়ে সব গিয়েও তো মানুষ সংসারী হয়!

সাইদ কহিল,—হয়, বাইরে থাকলে হয়তো হতামও, কিন্তু সে এখনও অনেক দেরি, আর এই খাটুনি—

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—নাঃ, এ বেশ হয়েছে! এ-ই ভাল, যতদিন বাঁচি ভাল খেয়ে, বিশ্রাম করে বাঁচি; তার পর দেবে মুদ্দফরাসে টেনে ফেলে, দিক—

সিপাহী সাইদকে ডাক দিল।

সাইদ সিগ্রিগেশন সেলে গিয়ে দেখে—বড় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবও সেখানে হাজির।

সাহেব বোধ করি তাহার ইতিহাস শুনিয়াছিলেন, কহিলেন,—মন খারাপ করো না তুমি, ভাল হয়ে যাবে অসুখ। আমি সরকারকে লিখছি তোমার খালাসের জন্যে। বাড়ি যাবে, শাদি হবে—আবার বাচ্চা লেড়কা হবে—

সাইদ যেন বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। সে সাহেবের মুখপানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া

রহিল। সাহেব চলিয়া গেলে জেলারের পায়ে ধরিয়া কহিল,—দোহাই হুজুর, আমায় যেন খালাস দেবেন না। বলিয়া সে হা হা করিয়া শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল।

দশ

মাসখানেক পর।

নিশাবসানের স্বচ্ছ অন্ধকারের মাঝেই জেলখানাটা যেন মুখর হইয়া উঠিয়াছে। অগণিত পদশব্দ শুধু,—কথাবার্তা বড় শোনা যায় না। এর অর্থ বন্দীদলের অজানা নয়। তারা বুঝিল—আজ আবার একজন যাইবে, ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দীপ নিভিয়া যাইবে—একটি জীবন-দীপ!

আপন জানালায় দাঁড়াইয়া অমর ডাকিল,—সুরেশবাবু!

মৃদু চাপা স্বরে সুরেশবাবু উত্তর দিল,—রায়, তুমিও জেগেছ?

—হ্যাঁ, আওয়াজ শুনছ? মানুষেরই হাতে একটা মানুষের আয়ু শেষ হয়ে গেল বুঝি।

সুরেশ এ কথার কোন জবাব দিল না। উপরের জানালা দিয়া আকাশপানে চাহিয়া কহিল,—আকাশটা কি গাঢ় কালো আর কি নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতা ওর সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করে; উঃ, ওর মাঝ দিয়েই কি৺বিগত-আয়ু মানুষের জীবনের পথ রায়?

রায় কহিল,—না সুরেশবাবু, ওর জোর করে বের-করা প্রাণ—মাটির বুকে বুকে লুটিয়ে লুটিয়ে কেঁদে বেড়াবে, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

সুরেশ কোন উত্তর দিল না, উপরের জানালা দিয়া আকাশের বুকজোড়া অন্ধকারের পানে তাকাইয়া রহিল। তার একাগ্র দৃষ্টির সম্মুখে ধীরে ধীরে অন্ধকারের রূপ ফুটিয়া উঠিতেছিল। অন্ধকারেরও একটা প্রভা আছে,—যে-প্রভার স্বচ্ছতায় সব কিছু দেখা যায়; কিন্তু মরণের সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া যে-অন্ধকার—সে-অন্ধকারের নিবিড়তা যে কল্পনাও করা চলে না। উঃ, কি ভয়াল বিভীষিকা সে! সুরেশ শিহরিয়া উঠিল।

সহসা সমস্ত জেলখানাটার বুক চিরিয়া একটা অতি কাতর চিৎকারে কে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। সুরেশের মনে হইল সুদূর আকাশের ওই সুশান্ত স্তব্ধতাটুকু পর্যন্ত এই কাতর ধ্বনিতে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল,—প্রভাত-আকাশের স্তিমিতপ্রায় তারা কয়টি পর্যন্ত বুঝি সে কম্পনে ম্লান হইয়া গেল।

শোনা গেল ও-ঘর হইতে চাটুজ্জে ভয়ার্ত কণ্ঠে কহিতেছে,—তারা তারা ব্রহ্মময়ী। শিবরাম শিবরাম। রায়, ও রায়, শালা ভূত হবে নিশ্চয়।

আবার একটা চিৎকার—

সমস্ত পাখিগুলো সে চিৎকারে কলরব করিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণের জন্য এবার সমস্ত জেলখানাটা জুতার কঠিন শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল; তারপর

সব নিস্তব্ধ—একটা ভয়াবহ নিস্তব্ধতায় সমস্ত বন্দিশালাটা ভরিয়া গেল।

পরদিন। সে দিনটা ছুটি।

সমস্ত বন্দীর দল অকারণেই একটি সেলে স্তব্ধভাবে বসিয়া আছে। একটা দুর্বহ বিষণ্ণতায় সকলেই নির্বাক্।

অমর, সুরেশ, চাটুজ্জে, এরাও আছে—কিন্তু স্তব্ধ, বিষণ্ণ, নির্বাক্। সহসা সুরেশ কহিল,—এ তো ভাল লাগে না। একটা কিছু কর,—যা হোক—anything ; আচ্ছা, সব খালাসের দিন হিসেব করি এস—

অমর কহিল,—না, সে আমার—শুধু আমার কেন সবারই পক্ষে একটা বিভীষিকা,—একটা dread! কালই বোধহয় কেষ্ট বলে সেই ছোকরা বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে সে কোথা গেল জান? বাড়ি গেল না, গেল কলকাতায় 'পিক-পকেটে'র দলে। সেই ছোঁড়াটা ওকে ঠিকানা দিয়েছে। মুক্তি কল্পনার আগে আমায় এমনি একটা দলের সন্ধান দিতে পার সুরেশবাবু?

চাটুজ্জে কহিল,—তার চেয়ে এস সকাল বেলায় এক 'দম' করে হয়ে যাক—

অমর কহিল,—The thing, ঠিক ;—এইটেই চাইছিলাম যেন। আর সুরেশবাবু, তুমি আজ থেকে আমায় তালিম দাও insolvency act-এ, যাতে বেরিয়ে একটা লাখো লাখো টাকার insolvency আমি নিতে পারি।

বলিয়া সে টেবিলে মাথা গুঁজিয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবে হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। চাটুজ্জে, সুরেশ দু'জনেই চমকিয়া উঠিল। সুরেশ তার পিঠে মৃদু ঠেলা দিয়া কহিল,—কাঁদছ তুমি?

মুখ তুলিয়া অমর হাসিটা দীর্ঘতর করিয়া কহিল,—না, হাসছি তো!

*

* *

সেদিন রাত্রিটাও কেমন থমথম করিতেছিল। সবারই যেন চোখের ঘুম কে কাড়িয়া লইয়াছে,—সবাই যেন কান পাতিয়া আছে—সে কাঁদিবে—নিস্তব্ধ অন্ধকারে সে আসিয়া পাষাণপুরীর মাটিতে মাথা কুটিয়া কুটিয়া কাঁদিবে—

কিন্তু কেউ কাঁদিল না—

সুপ্ত নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরিয়া শুধু ঝিল্লীর একটানা অবিশ্রান্ত চিৎকার—আর নিজেদের নিঃশ্বাসের মধ্যে বুকের পুঞ্জিত ব্যথা।

চাঁপাডাঙার বৌ

শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্নেহভাজনেষু

দেবগ্রামের পথে পাশের বড় গ্রাম হইতে গাজনের সঙ আসিয়া হাজির হইয়াছে। একজন ঢাকী বড় একখানা ঢাক নাচিয়া নাচিয়া বাজাইতেছে। তাহার সঙ্গে কাঁসি ও শিঙা। দলটাকে অনেক দূরে দেখা যাইতেছে। দেবগ্রামে গাজন নাই। নবগ্রামের গাজনও এ গ্রামে আসে না। এবার ব্যাপারটা নতুন।

দক্ষিণ পাড়ার মণ্ডলবাড়ি হইতে বাহির-দরজায় বধূ দুটি ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

গ্রামের সবচেয়ে সমৃদ্ধ মণ্ডলবাড়ি। মাটির ঘর টিনের চাল, পাকা মেঝে। বারান্দায় সুন্দর-গড়নের কাঠের খুঁটি। সেতাব ও মহাতাপ মণ্ডলের বাড়ি। বধূ দুইটি দুই ভায়ের স্ত্রী—কাদম্বিনী ও মানদা। কাদম্বিনী ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী এবং শ্যামবর্ণে চমৎকার লাবণ্যময়ী মেয়ে। মানদা মাথায় খাটো, একটু স্থূলাঙ্গী। কাদম্বিনী নিঃসন্তান, বয়স চব্বিশ পঁচিশ, মানদার বয়স সতেরো-আঠেরো—একটি সন্তানের জননী মানদা।

ওদিকে গাজনের সঙের দল অন্য একটা রাস্তায় ভাঙিয়া ঢুকিয়া যাইতে শুরু করিল। ঢাকের বাজনার শব্দ বাঁকের আড়ালে পড়িয়া কম হইয়া আসিল।

মানদা বলিল, মরণ! ও-রাস্তায় ঢুকে গেল যে মড়ার দল।

কাদম্বিনী গবেষণা করিয়া বলিল, বোধ হয় ও-পাড়ায় মোটা মোড়লের বাড়ি গেল।

—মোটা মোড়লের বাড়ি? কেন? আমাদের বাড়ির চেয়ে মোটা মোড়লের খাতির বেশি নাকি?

—তা বয়সের খাতির তো আছে। তা ছাড়া দিতে-থুতে মোটা মোড়লের নাম যে খুব।

ঠোঁটে পিচ কাটিয়া মানদা বলিল, নাম! বলে যে সেই—ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে কোঁচার পত্তন, তাই। এদিকে তো দেনায় শুনি একগলা জল। বাইরে দেওয়া-থোয়ার নাম।

কাদম্বিনী একটু শাসনের সুরেই বলিল, ছি এমন করে কথা বলে না। হাজার হলেও মান্যের লোক। এখন চল্, হাতের কাজ সেরে নিই। গাঁয়ে যখন এসেছে তখন এদিকেও আসবে।

তাহারা বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া গেল।

প্রথমেই গো-শালা। গরুগুলি চালায় বাঁধা। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের মধ্যে শুইয়া আছে, রোমন্থন করিতেছে, একটা রাখাল গরুর গায়ে তাকিয়ার মত হেলান দিয়া ঘুমাইতেছে।

তাহার পর খামারবাড়ি।

খামারবাড়িতে ঢুকিতেই এক কলি গান ও দুপ-দুপ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। গমের উপর বাঁশ পিটিয়া গম ঝরাইতে ঝরাইতে কৃষাণটা গান করিতেছে—

"চাষকে চেয়ে গোরাচাঁদরে মান্দেরী ভাল।"

গমের চারিপাশে পায়রা জমিয়া গম খাইতেছে।

কাদম্বিনী ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, কেন রে নোটন, এত আক্ষেপ কেন?

জিভ কাটিয়া নোটন বলিল, আজ্ঞে মুনিব্যান?

—চাষের চেয়ে মান্দেরি ভাল বলছিস?

—আজ্ঞে মুনিব্যান, মান্দেরি হলে কি আজ আর গম ঝরাতাম গো। চলে যেতাম গাজনের ধুম দেখতে।

মানদা বলিল, এবার গাজনের ধুম যে দেখি খুব নোটন। দুখানা গেরাম পার হয়ে আমাদের গাঁয়ে এল।

—সে তো আমাদের ছোট মোড়লের কাণ্ড গো। তুমিই তো ভাল জানবে ছোট মুনিব্যান।

কাদম্বিনী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কার? মহাতাপের?

—হাঁ গো। আজ ক-দিন সে হোথাকেই রয়েছে।

—সে কি? সে যে গেল শ্বশুরকে দেখতে। মানুর বাপের অসুখ—

মানদা তাহার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বলিল, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না বড়দি। শুধু শুধু আর মিছে কথাগুলো বোলো না তুমি!

—মানু! কি বলছিস তুই?

—ঠিক বলছি গো, বড় মোল্যান। সে যে যায় নাই, তা তুমি জানো।

—আমি জানি?

—জান না? যদি না জান তবে আমার যাওয়া তুমি বন্ধ করলে ক্যানে?

—এই গরমে ছ ক্রোশ পথ খোকাকে নিয়ে যাবি, খোকার অসুখ-বিসুখ করবে, তাই বারণ করলাম। বললাম—ঠাকুরপো দেখে আসুক।

—মিছে কথা। আমি জানি, আমি বুঝি। বুঝেছ, আমি সব বুঝি। আমার বাপের বাড়ি যাবে? তার চেয়ে চারদিন গাজনে নেশাভাঙ করুক, ভূতের নাচন নাচুক, সেও ভাল। আমি সব বুঝি।

মানদা হন-হন করিয়া চলিয়া গেল—খামারবাড়ি পার হইয়া বাড়ির ভিতর দিকে। খামারবাড়ির ও-দিকে পাঁচিলের গায়ে একটা দরজা। সেই দরজাটাকে সবলে ঠেলিয়া দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল। কাদম্বিনী দাঁড়াইয়া রহিল। খানিকটা ভাবিয়া দেখিয়া বলিল, তুই ঠিক জানিস নোটন, ছোট মোড়ল আজ কদিন নবগ্যারামের গাজনে মেতে সেইখানেই রয়েছে?

—এই দেখ! আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি গো। রোজ দেখা হচ্ছে।

—বলিস নাই ক্যানে?

—তার আর বলব কি বল? আর কি বলে, ছোট মোড়ল বললে—নোটন, বলিস না বাড়িতে, তা হলে দোষ কিল ধমাধম। ছোট মোড়লের কিল বড় কড়া, তেমুনি ভারী, আখিড়ে তাল।

—হুঁ। কাদম্বিনী বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

নোটন পিছন হইতে বলিল, বড় মোল্যান!

—কি?

—ছোট মোড়ল কিন্তু চাঁপাডাঙা গিয়েছিল।

—গিয়েছিল? গিয়েছিল তো নবগ্রামে থাকল কি করে?

—ওই দেখ! ছ কোশ ছ কোশ বারো কোশ রাস্তা ছোট মোড়লের কাছে কতক্ষণ! যেদিন সকালে গিয়েছে, তার ফেরা দিন ফিরেছে। এসে নবগ্যেরামেই জমে যেয়েছে। ভাঙ খেয়েছে, বোম্-বোম্ করছে; আর পড়ে আছে। শোনলাম, দশ টাকা চাঁদা দিয়েছে।

—দশ টাকা?

—হ্যাঁ।

—দশ টাকা?

—হ্যাঁ গো। ছোট মোল্যান তিরিশ টাকা দিতে দিয়েছিল বাপের বাড়িতে। তা থেকে দশ টাকা ছোট মোড়ল খয়রাত করে দিয়েছে।

—তোকে কে বললে?

—কে আবার! খোদ ছোট মোড়ল নিজে। সে সেই প্রথম দিনের কথা। যে দিনে যায় সেই দিনের। নবগ্যেরামে চাঁদা দিয়ে-টিয়ে ভাবছে—কি করি! আমার সাথে দেখা। বলে—দশ টাকা তু ধার এনে দে নোটন। বলে দোব, বড় বউ তোকে দেবে। তা কি করব? এনে দেলাম।

বড় বউ কাদম্বিনীর মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। হাসিয়াই সে বলিল, আর কাউকে এ কথা বলিস না নোটন, তোর টাকা আমি দোব।

বলিয়া সে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া গেল।

বাড়ির উঠানে ছোলা কলাই মেলিয়া দেওয়া রহিয়াছে। পাশে দুইটা ঝুড়িতে কতক তোলা হইয়াছে। বধূ দুইটি ছোলা তুলিতে তুলিতেই উঠিয়া গিয়াছিল, দেখিয়াই বোঝা যায়।

একটা ছাগল সেগুলো নির্বিবাদে খাইতেছে। দুইটি ছানা পিছনে দাঁড়াইয়া আছে, লাফাইতেছে।

ছোট বউ মানদা একটা দাওয়ায় দেওয়ালে ঠেস দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

বড় বউ ঘরে ঢুকিয়াই ছাগলটাকে তাড়াইল—মর্ মর্ সব্বনাশী রাক্ষসী, বেরো, দূর হ।

ছাগলটা পলাইল।

বড় বউ ঝুড়ি টানিয়া লইয়া বলিল, তুই বসে বসে দেখলি যাহ? তাড়ালি না?

—আমার ইচ্ছে। আমার খুশি।

—তোর খুশি?

—হ্যাঁ। খুশি। বলি, কেন তাড়াব? কি গরজ? এ সংসারে আমার কি আছে কি হবে?

বড় বউ তুলিতে তুলিতে বলিল, এত রাগ করে না। দিনে দুপুরে কাঁদে না, কাঁদতে নাই। আর তার কারণও নাই। নোটনকে তুই জিজ্ঞাসা করে আয়, ঠাকুরপো চাঁপাডাঙা গিয়েছিল। তবে হ্যাঁ, একদিনের বেশি থাকে নাই। সেখান থেকে এসে নবগ্যেরামে ডেরা নিয়েছে। আয়, ছোলা কটা তুলে নে।

—পারব না আমি।

—পারতে হবে। আয়।

—তুমি মহারানী হতে পার, আমি তোমার দাসী নই। সংসার চুলোয় যাক, আমার কি ?

একটা ঝুড়ি ইতিমধ্যে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেটাকে কাঁধে তুলিয়া ঘরে লইয়া যাইবার পথে মানদার কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু স্বরে বলিল, টাকা তিরিশটা চাঁপাডাঙায় তালুয়ের হাতে পোঁচেছে মানু। ঠাকুরপো দিয়ে এসেছে। সংসার চুলোয় গেলে, সে আর কখনও পাঠানো চলবে না। যা কলাইগুলো তুলে নে। কেলেঙ্কারি বাড়াস নে !

সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল।

মানদা চমকিয়া উঠিল। ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, কি বললে ? তুমি কি বললে ?

ঘরের ভিতর হইতেই কাদু জবাব দিল, কিছু বলি নাই। বলছি, ছোলাগুলো তুলে ফেল্।

মানদা ঘরের দিকে আগাইয়া গেল—না, টাকা বলে কি বললে তুমি বল ?

কাদম্বিনী বাহির হইয়া আসিয়া হাসিয়া বলিল, বলছি টাকা নয় রে—তারিখ, তারিখ—আজ মাসের ক তারিখ বলতে পারিস ? বলিয়াই সে মুখে আঙুল দিয়া চুপ করিবার ইঙ্গিত দিয়া আঙুল দিয়াই দেখাইয়া দিল। নিজে জানলা দিয়া উঁকি দিল।

ঘরের মধ্যে সেতাব খাতাপত্র লইয়া হিসাব করিতেছিল। বয়স বছর বত্রিশেক। শুকনা শরীর, বিরক্তি-ভরা মুখ। এক জোড়া গোঁফ আছে। সে ঘাড় উঁচু করিয়া কান পাতিয়া কথা শুনিতেছে। কথা বন্ধ হওয়ায় সে সন্তর্পণে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পা টিপিয়া আসিয়া জানালার পাশে আড়ি পাতিল। ওদিকে পাশের দরজা ঠেলিয়া বড় বউ ঢুকিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, ও কি হচ্ছে কি ?

সেতাব চমকিয়া উঠিল এবং উত্তরে প্রশ্ন করিল, কি ?

—তাই তো জিজ্ঞাসা করছি। ওখানে অমন করে আড়ি পাতার মত দাঁড়িয়ে কেন ?

—আড়ি পাতব কেন ?

—তবে করছ কি ?

—কিছু না। সে ফিরিয়া আসিয়া তক্তাপোশে বসিল। তারপর বলিল, ভক্তি দুপহরে তোমরা দুই জায়ে ঝগড়া লাগিয়েছ কেন বল তো ? পয়লা বোশেখ···শুভদিন, বলি তোমরা ভেবেছ কি ? বলি ভেবেছ কি ?

কথা বলিতে বলিতেই তাহার কথার তাপ বাড়িতে লাগিল।

ওদিকের ঢাকের বাজনা ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

বড় বউ কাদম্বিনী বলিল, ঝগড়া ? কে ঝগড়া করছে ? কার সঙ্গে ? কোথায় দেখলে তুমি ঝগড়া ? আমাদের দুই জায়ে একটু জোরে কথা বলছি। তার নাম ঝগড়া ? অমনি তুমি আড়ি পেতে শুনতে গিয়েছ ?

—শুনব না ? ছোট বউমা বললে না—টাকা বলে কি বললে বল ? তুমি ঢাকলে—না, টাকা নয়, তারিখ তারিখ বলে ? আমি তোমার স্বামী, বল তো পায়ে হাত দিয়ে ?

—হায় হায় হায়! খুট করে কোন শব্দ উঠলে বেড়াল ভাবে ইঁদুর। চোর ভাবে পাহারাওয়ালা। আর টাকার কথা শুনলে তোমার টনক নড়ে। ওই শুনেই তুমি আড়ি পাততে গিয়েছ!

—যাব না ? টাকা কত কষ্টে হয়, কত দুঃখের ধন, জান ? কই, সাত হাত মাটি খুঁড়ে টাকা তো টাকা—একটা পয়সা আনো দেখি! আমি বহু কষ্টে গড়েছি সংসার। বাবার দেনা শোধ করেছি, দশ টাকা নাড়াচাড়া করছি মা-লক্ষ্মীকে পেসন্ন করেছি। সেই টাকা আমার তছনছ করে দেবে তোমরা ? তার চেয়ে—তার চেয়ে—

—তার চেয়ে টাকার মাপে তোমার চামড়া কেটে দিতে কম দুঃখ পাও তুমি, তা আমি জানি। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাক, তোমার টাকা কেউ অপব্যয় করে নি।

—না, করে নি! আমি জানি না, বুঝি না কিছু ? বেশ তো, টাকা টাকা করে কি বলছিলে, বল না শুনি ?

—বলছিলাম মানুর বাপের অসুখ, ঠাকুরপো চাঁপাডাঙা দেখতে গেল—পাঁচটা টাকাও তো দিতে হ'ত পথ্যির খরচ বলে। তাই মানুকে বললাম, ভাশুর না দেক সোয়ামী না দেক —তুই তো নিজে নাক-ছাবি বেচেও দিতে পারতিস্ ? তোরই তো বাপ। তাই ঝেঁজে উঠল মানু।

—উঁহু। গড়ে বললে কথা। মিথ্যে বললে। বল আমার পায়ে হাত দিয়ে।

—তুমি অতি অবিশ্বাসী, অতি কুটিল। ছি-ছি-ছি—

—আমি অবিশ্বাসী কুটিল ?

—হ্যাঁ, শুধু তাই না। তুমি কৃপণ, তুমি অভদ্র!

—কাদু!

—ছোট বউয়ের বাপের অসুখে দশ টাকা তত্ত্ব বলে দেওয়া উচিত ছিল না তোমার ? ভিখিরীকে ভিক্ষে দিতে তোমার মন টনটন করে। ছি তোমার টাকা-পয়সাকে।

ঢাকের আওয়াজ খুব জোর হইয়া উঠিল।

বড় বউ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেতাব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই মরেছে। ঢাক আবার বাড়িতে কেন যে বাবা ? এই মরেছে।

সে দরজা খুলিয়া উঁকি মারিল।

দেখিল, দাওয়ায় বড় বউ ও ছোট বউ দাঁড়াইয়া আছে।

ওদিকে দরজা দিয়া উঠানে গাজনের সঙ প্রবেশ করিতেছে।

শিব সাজিয়া মহাতাপ নাচিতেছে। লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ শরীর।

শিব তাহাকে খুব ভাল মানাইয়াছে। দাড়ি-গোঁফ-জটায় তাহাকে চেনা যায় না।

সঙের দল গান গাহিতে গাহিতেই প্রবেশ করিল। তাহারা গাহিতেছে—গাহিতেছে পার্বতীর সখী, জয়া বিজয়া।

শিবো হে, শিবো হে, অ শিবো শঙ্কর হে
হাড়মালা খুলে ফুলোমালা পরো হে,
অ শিব শঙ্কর হে।
হায়—হায়—হায়—হায়—
ফুল যে শুকিয়ে যায়—
গলায় বিষের জ্বালায় শিবো জরজর হে!
অ শিবো শঙ্কর হে।—

শিবঃ— তা থৈ থৈ তা থৈ থৈ—বম্ বম্
হর হর—সব হর হে।— (নাচন)

জয়া বিজয়া :—

হায় রে হায় রে—
মদন পুড়ে ছাই রে—
লাজে কাঁদে পার্ব্বতী
ঝর ঝর হে—।
গাজনে নাচন শিবো সম্বর হে।
শিব শঙ্কর হে।

গান শেষ হইবামাত্র শিব-বেশী মহাতাপ ভিক্ষার থালাটা পাতিয়া ধরিল। ঘরের ভিতর হইতে সেতাব বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, কি? বলি এসব আবার কি?

বড় বউ বলিল, থাম তুমি। দাঁড়াও, এনে দিই আমি।

—না, যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড! আমাদের গাঁয়ে গাজন নাই, তা ভিন গাঁ থেকে গাজনের সঙ! দিন দিন নতুন ফ্যাচাং।

বড় বউ ফিরিয়া আসিয়া শিবের হাতের থালাটা টানিয়া লইয়া তাহাতে দুইটা টাকা দিয়া অন্তদের দিকে বাড়াইয়া ধরিল।

সেতাব বলিল, ও কি? দু টাকা? দু টাকা কি ছেলেখেলা নাকি?

—থাম বলছি। ও টাকা তোমার নয়। নাও গো, নিয়ে যাও তোমরা। বলিয়া শিব ছাড়া অন্য একজনের হাতে দিল। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই শিবের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না। আর তোমার যাওয়া হবে না। ঢের নাচন হয়েছে। অনেক ভাঙ খাওয়া হয়েছে। চাঁপাডাঙা যাই বলে পাঁচ দিন নিরুদ্দেশ। ছাই মেখে, ভস্ম মেখে, নেচে বেড়াচ্ছ!

ছি-ছি-ছি! যাও, তোমরা যাও বলছি। ঢের সঙ হয়েছে। যাও। এই নাও তোমার জটা-দাড়ি-গোঁফ—নাও।

দাড়ি-গোঁফ-জটা টানিয়া খুলিয়া দিল।

মহাতাপ বার-দুই চাপিয়া ধরিয়া অবশেষে কাতরভাবে অনুরোধ করিল, বড় বউ! বউদিদি! পায়ে পড়ি তোমার, পায়ে পড়ছি আমি।

মানদা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। মহাতাপের স্বরূপ প্রকাশ হইতেই ঘোমটা টানিয়া বলিল, মরণ। বলিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

—তাতে আমার পাপ হবে না। কিন্তু এমনি করে সঙ সেজে বেড়াতে তোমাকে আমি দেব না।

তারপর দলের লোকদের লক্ষ্য করিয়া বলিল, যাও না তোমরা। কথা বললে শোন না কেন? সঙ দেখাতে এসে সঙ দেখতে লাগলে যে! সংসারে সঙের অভাব? কারও বাড়িতে কি এমন সঙ হয় না? সকলের বাড়িতেই হয়—আমরা যাই দেখতে সে সঙ?

মহাতাপও এবার চেঁচাইয়া উঠিল, যাও যাও, সব বাহার যাও। নেহি যায়েগা; হাম নেহি যায়েগা। ভাগো। ভাগো।

সেতাব ওদিকে বারান্দায় আপন মনেই পায়চারি করিতেছিল এবং বলিতেছিল, হুঁ! হু! যত সব কেলেঙ্কারি! হুঁ! মান-সম্মান আর রইল না। হুঁ!

ধমক খাইয়া সঙের দল বাহিরে চলিয়া গেল।

রাস্তার উপর আসিয়া দলের মধ্যে বচসা শুরু হইয়া গেল। নন্দী নিজের জটা খুলিয়া ফেলিয়া ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, তখুনি বলেছিলাম—পাগলাকে দলে নিও না! তখন সব বললে—দশ টাকা চাঁদা দেবে। চেহারা ভাল, গানের গলা ভাল। এখন হল তো?

বিজয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, অঃ, বোঁচার এবার শিব সাজতে না পেয়ে রাগ খুব!

—খবরদার বলছি, চ্যাংড়া ছোঁড়া। একটি চড়ে তোমার বদনখানি বেঁকিয়ে দেব।

—চুপ চুপ, ঝগড়া কোরো না! চল, বাড়ি চল সব। রাস্তাতে বোঁচাকে শিব সাজিয়ে নেব চল। উ যে এমন করবে তা কে জানে!—কথাটা বলিল—জামা-কাপড়ে আধুনিক ম্যাট্রিক-ফেল চাষীর ছেলে ঘোঁতন ঘোষ।

—তা—কে জানে—! কেন, মহাতাপের মাথা খারাপ সেই ছেলেবেলা থেকে, কেউ জান না, না কি?

বিজয়া সাজিয়াছিল যে ছেলেটা, সেটা দেখিতে কুৎসিত, খুব ঢ্যাঙা, রঙ কালো। সে আবার আসিয়া বলিল, বোঁচা শিব সাজলে আমি দুর্গা হব। রমনা হবে বিজয়া। মুখে কাপড় দিয়া সে হাসিতে লাগিল।

হঠাৎ উচ্চ ক্যাঁ—চ শব্দ করিয়া মণ্ডল-বাড়ির বাহিরের দরজা খুলিয়া গেল। গলা ঝাড়িয়া সেতাব বাহির হইয়া আসিল।

জনতা স্তব্ধ হইয়া গেল। এ উহার মুখের দিকে চাহিল। দলপতি ঘোঁতনই ভ্রূ কুঁচকাইয়া

বলিল, চল চল। বলিয়া সে সর্বাগ্রে হন-হন করিয়া চলিতে শুরু করিল।

তাহার পিছনে পিছনে সকলে।

সেতাব ডাকিল, এই ঘোঁতন, এই! এই! এই!

দলের একজন বলিল, ঘোঁতনদা ডাকছে যে বড় মোড়ল!

—ডাকুক। মরুক চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে। বেটা আমার কাছে ধান পাবে। চলে আয়।

সে হন-হন করিয়া চলিতে লাগিল।

সেতাব রাস্তায় নামিল।

ঘোঁতন তাহার কথা শুনিল না দেখিয়া রাগিয়া গেল এবং চিৎকার করিয়া বলিল, নালিশ করব আমি।

ঘোঁতন এবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কর। মহাতাপ পাওনা ধান ছেড়ে দেবে আমাকে কড়ার করায় তবে ওকে আমি শিবের পাট দিয়েছি। লোকে সাক্ষী দেবে। বোঁচা বল্ না রে!

সেতাব চমকিয়া উঠিল।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া হন্-হন্ করিয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল—উঠানে একটা জল-চৌকির উপর মহাতাপ বসিয়া আছে এবং কৃষাণ নোটন উঠানের কোণের পাতকুয়া হইতে জল উঠাইতেছে, রাখালটা মাথায় ঢালিতেছে। মহাতাপ খুব আরাম করিয়া স্নান করিতেছে; মধ্যে মধ্যে মুখে জল লইয়া ফু-ফু করিয়া উপরে আশেপাশে ছুঁড়িতেছে। বড় বউ দাওয়ায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে গামছা। পাশে দড়ির আলনায় কাপড়। বড় বউয়ের কোলে মহাতাপের পাঁচ বছরের হৃষ্টপুষ্ট ছেলে—মানিক।

বাপের জল-কুলকুচার রকম দেখিয়া সে খুব হাসিতেছে।

সে বলিল, বাবা কি করছে? ব-মা?

কাদু বলিল, নোটন ও রাখালকে—ওই হয়েছে, ঢের হয়েছে। আর থাক।

মহাতাপ বলিল, উঁহু। হয় নাই, এখনও হয় নাই। ঢাল্, নোট্না ঢাল্।

বলিয়াই জল ছুঁড়িল—ফুঃ!

মানিক বলিল, বাবা কি করছ?

—গঙ্গা ঝরতা হ্যায় রে বেটা। শিবকে শির'পর গঙ্গা ঝরতা হ্যায়। গান ধরিয়া দিল—

ঝর ঝর ঝর ঝর গঙ্গা ঝরে
শিরোপরে গঙ্গাধরের রে!
ঝর ঝর ঝর ঝর—ফুঃ!

আমি শিব রে বেটা, হম শিব হ্যায়।

—শিব হ্যায়?

—হ্যাঁ, তু বেটা গণেশ। মাথায় হাতির মুণ্ডু বসিয়ে দেব।

সেতাব দাঁড়াইয়া খানিকটা দেখিল, তারপর, হুঁ। ছি-ছি-ছি! ছিঃ-ছিঃ! বলিয়া উঠান পার হইয়া চলিয়া গেল এবং দাওয়ায় গিয়া উঠিল। ঘরে ঢুকিবার সময় দাঁড়াইয়া বলিল, ঘরের লক্ষ্মীর চুলের মুঠো ধরে বনবাসে দেওয়ার পথ ধরেছিস তুই মহাতাপ। ছিঃ!

এবার মহাতাপ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া দাঁড়াইল।—কেয়া?

বড় বউ কাদম্বিনী শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকিল, মহাতাপ!

মহাতাপ আগাইয়া আসিয়া বলিল, নেহি নেহি নেহি। চামদড়ি কিপটে কেয়া বোলতা হায়—জানতে চাই আমি। ঝুট বাত হাম নেহি শুনেগা।

বড় বউ এবার মহাতাপের ছেলেকে নামাইয়া দিয়া আগাইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল—ছি, বড় ভাই গুরুজন, তাকে এমনি কথা বলে! কতদিন বারণ করেছি না?

মহাতাপ বলিল, ও মিছে কথা কেন বলবে? আমি তোমার চুলের মুঠো ধরে বনবাসে দোব—আমি!

সকলে অবাক হইয়া গেল।

সেতাব বলিল, তোর মাথা খারাপ, বুদ্ধি কম—শেষে তুই কালাও হলি নাকি? বলছি ঘরের লক্ষ্মীর কথা। বড় বউয়ের কথা কখন বললাম?

—কখন বললাম! বড় বউই তো ঘরের লক্ষ্মী।

বড় বউ হাসিয়া ফেলিল—মরণ আমার। নাও, খুব হয়েছে। চল, এখন মাথা মুছে কাপড় ছেড়ে খাবে চল। এস।

—যাবে, তার আগে একটু দাঁড়াও। মহাতাপ টাকা পেলে কোথায়? দশ টাকা চাঁদা দিয়েছে গাজনের দলে সঙ সাজবার জন্যে—তুমি দিয়েছ?

—নেহি। ছোট বউ, ছোট বউ দিয়েছে?

বড় বউ মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি ছোট বউকে দিয়েছিলাম তালুইয়ের অসুখে তত্ত্ব করবার জন্যে। মহাপুরুষ তাই দাতব্য করেছেন গাজনের দলে। হ্যাঁ, সে টাকা আমি দিয়েছি। তোমার সংসারে একটা দানা কি এক টুকরো তামা আমার কাছে বিষের মত; তোমার সংসারে দরকার ছাড়া যে আমি কিছুই ছুঁই না, সে তুমি জান। আমার মায়ের গহনা পেয়েছি, সেই বিক্রির টাকা থেকে দিয়েছি আমি। ও নিয়ে তুমি এমন করে ফোঁস-ফোঁস কোরো না গোখরো সাপের মত। এস ঠাকুরপো।

মহাতাপের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া সে ঘরে ঢুকিল। ঢুকিবার সময়ে শুকনো কাপড়টা তাহার কাঁধে ফেলিয়া দিল।

ঘরের মধ্যে কানা-উঁচু থালায় প্রচুর পরিমাণে ভাত, একটা বড় বাটিতে জলের রঙের 'আমানি' অর্থাৎ পান্তাভাত-ভিজানো জল, একটা বাটিতে ডাল, পোস্ত-বাটা অনেকটা, গেলাসে জল। মোটা ভারী বেশ বড়সড় একখানা কাঠের পিঁড়ি পাতা। পাশে মানদা শিল-নোড়া লইয়া কুড়তি কলাই বাটিতে বসিয়াছে। ঘস-ঘস শব্দে দুলিয়া দুলিয়া বাটিয়া চলিয়াছে।

মহাতাপকে আনিয়া বড় বউ পিঁড়ির উপর দাঁড় করাইয়া দিল। নাও, বস। মহাতাপ বসিয়া দেখিতে লাগিল, কি কি আছে ?

বড় বউ বলিল, যা ভালবাস তাই আছে। খাও। পান্তা ভাত, আমানি, পোস্ত-বাটা কলাইয়ের দাল, অম্বল—সব আছে। আর ওই কুড়তি কলাই তোমার সরস্বতী-ঠাকরুন বাটছে।

—কি ? সরস্বতী ঠাকরুন কুড়ৎ কলাই বাটছে ? ওই বাঁটকুল—সরস্বতী ঠাকরুন ?

—আমি লক্ষ্মী হলে, মানু সরস্বতী বইকি ? আমার ছোট বোন তো!

—আচ্ছা! ঘাড় নাড়িতে লাগিল মহাতাপ সমঝদারের মত।

—ঘাড় নাড়তে হবে না। খাও।

খাওয়ার ওপর ঝুঁকিয়া পড়িল মহাতাপ।

ওদিকে সেতাব দাওয়ার উপর এক হাতে হুঁকা ও অন্য হাতে কল্কে ধরিয়া ফুঁ দিতেছিল। সে উঠানের দিকে পিছন ফিরিয়া ঘরের দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিল। মধ্যে মধ্যে বিরক্তিভরে বলিতেছিল, হুঁ! লক্ষ্মী! সাক্ষাৎ অলক্ষ্মী। ঘরের লক্ষ্মী তাড়িয়ে দেবে। হুঁ। দশ টাকা। দশ টাকা সামান্য কথা। হুঁ।—বলিয়া হুঁকায় কল্কে বসাইয়া টানিতে টানিতে উঠিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। এবার সে দেখিতে পাইল, উঠানে বাপের চৌকিতে বসিয়া মানিক গায়ে মুখে কাদা মাখিয়াছে এবং মুখে জল লইয়া ফু ফু করিতেছে।

সেতাব হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল—এই, এই, কি বিপদ। ও কি হচ্ছে, অ্যাঁ। সে উঠানে নামিয়া মানিকের দিকে অগ্রসর হইল।

মানিক বলিল, ছিব হব, ছিব। ফুঁ। বলিয়া জল ছিটাইয়া দিল।

—ছি-ছি-ছি। অ বড় বউ। শুনছ। মানুকে কি করছে দেখ।

ছোট বউ বাহির হইয়া আসিল এবং মানিকের অবস্থা দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আধ-ঘোমটায় চাপাগলায় ক্রোধভরেই বলিল, দুষ্টু ছেলে কোথাকার!

—ছিব, ছিব—আমি ছিব!

—ছিব ? তা হবে বই কি ? তা না হলে আমার কপালের চিতের আগুন নিভে যাবে যে! শিব হবি ? শিব হবি ? ছেলের পিঠে সে চাপড় বসাইয়া দিল। মানিক কাঁদিয়া উঠিল।

সেতাব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, ছোট বউমা! মেরো না বলছি।

মানদা আরও একটা কিল বসাইয়া দিল।—হারামজাদা বজ্জাত—

সেতাব আবার বলিল, ছোট বউমা! তুমি গর্ভে ধরেছ বলে মানিক তোমার একলার নয়। বড় বউ, বলি অ বড় বউ!

বড় বউ বাহির হইয়া আসিল।—মানু!

মানু উষ্মাভরেই বলিল, কি ?

—ভাশুর বারণ করছে, তবু তুই মারছিস!

—মারব না? দেখ না কি করেছে? আমার কাপড়টা কি হল দেখ!

—কাপড় তো ছাড়লেই হবে! দে, আমায় দে।

—না। আলুনো আদর দিয়ে একজনের মাথা খেয়েছ। আর না।—বলিয়া ছেলেকে কোলে করিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেল।

—কি? কি বললি ছুটকী?

সেতাব পায়চারি করিতে করিতে হুঁকা টানিতেছিল। উল্টা মুখ হইতে ঘুরিয়া এবার সে বলিল, ছোট বউমা মিছে কথা বলে নাই বড় বউ। মহাতাপের মাথা তুমিই খেয়েছ। ছোট বউমা ঠিক বলেছে।

বড় বউ জবাব দিবার আগেই মহাতাপ ডালভাত-মাখা এঁটো-হাত চাটিতে চাটিতে বাহিরে আসিয়া বলিল, সরস্বতী! ওই বাঁটকুল, কুঁদুলে সরস্বতী—ও দুষ্টু সরস্বতী হ্যায়!

বড় বউ বলিল, সব খেয়েছ? না, না খেয়ে ঝগড়া করতে উঠে এলে কুঁদুলে ঠাকুর?

—চাট্ পোট্! চাট্ পোট্ করকে খা লিয়া।

—তা হলে হাত ধোও, ধুয়ে শুয়ে পড় গে। দেখি আমি। মানু—অ মানু! বলিয়া আবার ঘরে ঢুকিল। মহাতাপ জলের ঘটি তুলিয়া লইয়া হাত ধুইতে লাগিল।

সেতাব বলিল, গাজনে দশ টাকা চাঁদাই শুধু দিস নি, ঘোঁতনা ঘোষকে ধান পাওনা ছেড়ে দিয়েছিস?

মহাতাপ তাহার মুখের দিকে চাহিল—হাঁ হাঁ—কাগজে লিখে দিয়েছি।* ধান সব ছাড়িয়া দিলাম—শ্রীমহাতাপ মণ্ডল। দিয়েছি। ঘোঁতনার বাড়ি গেলাম, ওর মা কাঁদতে লাগল। বললে—বাবা, ঘোঁতনা তো জামা-জুতো পরে ঘুরে বেড়ায়, যাত্রা করে, চাষ করে না। ভাগিদার চাষ করে যা দেয় তাতে খেতে কুলোয় না। দেনা শোধ কি করে দেব? ঘোঁতনার বাচ্চাগুলোর টিকটিকির মত দশা। তাই ছোড়্ দিয়া। হ্যাঁ ছোড়্ দিয়া। লিখ দিয়া হ্যায়। একদম কাগজমে ঘস-ঘস করকে লিখ দিয়া হ্যায়!

—লিখে দিয়েছিস?

—হ্যাঁ। একদম লিখ দিয়া হ্যায়।

—তারপর? নিজেদের কি হবে?

মানিককে কোলে মানদা বাহির হইয়া আসিল। সে বলিল, ওই ঘোঁতনার ছেলের মত টিকটিকির দশা হবে। বলিয়া বড় বউ যে ঘরে ঢুকিয়াছিল সেই ঘরে ঢুকিয়া গেল।

মহাতাপ জ্বলিয়া উঠিল।—দেব তোর পিঠে কিল ধমাধম লাগিয়ে। আরে! আমার ছেলে টিকটিকির মত হবে? মহাতাপ নিজে হাতে চাষ করে। ভীম হ্যায়। মহাতাপ ভীম হ্যায়। ঘোঁতনাকে যে ধান ছেড়ে দিয়েছি, সে ধান আমি এবার বাড়তি ফিরিয়ে দেব। দম্ভভরে সে নিজের বুকে কয়েকটা চাপড় মারিল।

আবার বড় বউ বাহির হইয়া আসিল। তাই হবে, তাই ফলাবে। যাও, এখন শোও গে। চার রাত্তির বোধ হয় ঘুম হয় নাই। যাও। যাও। ঠাকুরপো! যাও বলছি।

—যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি।

মহাতাপ ঘরের মধ্যে ঢুকিতে উদ্যত হইল।

সেতাব বলিল, লক্ষ্মী আর এ বাড়িতে থাকবে না। মোড়লবাড়ির লক্ষ্মীকে ঘাড় ধরে বের করলে সবাই মিলে। সেকালের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলি সবাই? হায় রে হায়! হায় রে হায়!

হুঁকা ও কল্কে নামাইয়া রাখিয়া সেতাব চলিয়া গেল। বলিতে বলিতেই গেল—হায় রে হায়! হায় রে হায়!

মহাতাপ হুঁকা-কল্কেটা তুলিয়া লইয়া দাদাকে ভ্যাঙচাইয়া দিল—হায় রে হায়! হায় রে হায়! ওই এক আচ্ছা বুলি শিখেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহাতাপ কথাটা মিথ্যা বলে নাই, ওই 'হায় রে হায়' কথাটা সেতাবের মুখে লাগিয়াই আছে। উঠিতে বসিতে সে বলে—সেদিনের কথা এর মধ্যে ভুলে গেলি সব! হায় রে হায়। হায় রে হায়। অর্থাৎ কথাটা সকলেই ভুলিয়াছে কেবল সেতাব ভুলিয়া যায় নাই। কথাটার মধ্যে সেতাবের জীবনের পরম অহঙ্কার নিহিত আছে। বেশী দিনের কথা নয়, সেতাবের বাপ প্রতাপ মণ্ডল হঠাৎ মারা গেল, সেতাবের বয়স তখন বারো, মহাতাপের বয়স ছয়। মাঝের একটি ভাই তাহাদের নাই। প্রতাপের মৃত্যুর মাস কয়েক না যাইতেই মহাজন পর পর তিনটা নালিশ করিয়া প্রতাপের সম্পত্তি ক্রোক করিয়া বসিল।

প্রতাপ মণ্ডল হাঁকডাকের মানুষ ছিল। নামেও প্রতাপ কাজেও প্রতাপ ছিল। গ্রামের মাতব্বর, জমিদারের মণ্ডল, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার—অনেক কিছু ছিল। গ্রামের কাছেই আধা শহর লক্ষ্মীপুরের ব্যবসায়ী মহাজন বাবুলোকদের কাছেও খাতির ছিল। মনটা ছিল উদার, মানুষটা ছিল দুর্দান্ত। বাড়িতে চাষের ধুম ছিল। লক্ষ্মীপুরের বাবুরাও অনটনের বর্ষায় তাহার কাছে ধান 'বাড়ি' অর্থাৎ ধার লইত। হঠাৎ প্রতাপ মণ্ডল ব্যবসায়ে নামিয়া বসিল। নামিল নামিল এমন ব্যবসায়ে নামিল যাহার সঙ্গে তাহার কোন পরিচয় নাই। ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারি জগাই পাঠককে শুধু বখরাদার করিয়া ঠিকাদারির কাজে নামিয়া পড়িল।

সালটা তখন ১৯২৬-২৭ সাল। সবে দেশে ইউনিয়ন বোর্ড হইয়াছে। প্রতাপ মণ্ডলের বোর্ডে হঠাৎ বছরের শেষাশেষি খবর আসিল—সরকার পানীয় জল সরবরাহের জন্য ইন্দারা করিতে টাকা দিবেন; শর্ত ইউনিয়ন বোর্ডকে এক-চতুর্থাংশ টাকা দিতে হইবে। এক-একটা ইন্দারার প্রায় পাঁচশো করিয়া টাকা খরচ, অর্থাৎ ইউনিয়ন বোর্ডকে একশো পঁচিশ আন্দাজ দিতে হইবে। প্রতাপ নিজের গ্রামে ইন্দারার জন্য চাঁদা তুলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পায়ে অনেক ধুলা মাখিয়া হাঁটাহাঁটি করিয়া পঁচিশ টাকা কয়েক আনার বেশী চাঁদা তুলিতে পারিল

না। এই সময় জগাই পাঠক তাহাকে পরামর্শ দিল—মোড়ল এক কাজ কর। ইন্দারাটা তুমি ঠিকে নিয়ে নাও। ঠিকাদারির একটা লাভ আছে তো, সেই লাভে ও টাকা উঠে যাবে! আমি দেখে-শুনে সব ঠিক করে দোব।

ভয়ে ভয়েই প্রতাপ কাজে নামিল। কিন্তু ইন্দারাটা শেষ হইতেই ভয় কাটিয়া উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। ঠিকা অর্থাৎ কন্‌ট্রাক্ট হইতে যাহা লাভ হইয়াছে তাহা দেয় সিকি টাকার বেশ কিছু উপরে উঠিয়া গিয়াছে। লোকাল কন্‌ট্রিবিউশান অর্থাৎ স্থানীয় চাঁদার দাবি ছিল সিকি অর্থাৎ শতকরা পঁচিশ, সেই স্থানে লাভ দাঁড়াইল শতকরা পঁয়ত্রিশ টাকা। বিল আদায় করিয়া নগদ পঞ্চাশ টাকা প্রতাপের হাতে তুলিয়া দিয়া সেক্রেটারি পাঠক বলিল—দশ টাকা পুজো দিয়ো মোড়ল, পনেরো টাকা আমার, পঁচিশ টাকা তোমার।

প্রতাপের চোখ দুটো জ্বলিয়া উঠিল।

পাঠক বলিল, ইন্দারার কাজে তবু লাভ কম। রাস্তার ঠিকে কি সাঁকোর ঠিকে যদি হত না—তবে দেখতে অর্ধেক খরচ আর অর্ধেক লাভ। টাকায় টাকা। করবে ঠিকের কাজ? ইউনিয়ন বোর্ডের নয়, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ঠিকে নেবে?

প্রতাপ কথা বলিতে পারিল না, সেক্রেটারি পাঠকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পাঠক চতুর লোক, তাহার উপমা দিয়া লোকে বলে—মৃগেল মাছ। পাঁক কাটিয়া চলে আবার সমানে ভাসিয়া সাঁতারও কাটে। প্রতাপের দৃষ্টির অর্থ তাহার বুঝিতে দেরি হইল না। পুকুরের জলের মধ্যে ভাসমান টোপের সম্মুখে মাছ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাসিয়া পাঠক বলিল—রাস্তার কাজ পাথর কুড়িয়ে জমা করা আর কাঁকর কেটে তোলা, তারপর গরুর গাড়িতে বয়ে ফেলা। আলমপুরের বাবুদের জমিদারিটাই রাস্তার কাজের পয়সায়। কাঁচা পয়সা হে! তারপর দশ টাকা ওভারসিয়ারের পকেটে গুঁজে দিলে মাপ বাড়িয়ে বিশ টাকা পাইয়ে দেবে তোমাকে। লেগে যাও। আমি বরং সব দেখে-শুনে দেব তোমার। আমাকে দিয়ো কিছু। শুধু বখরাদার করে নিয়ো।

কথাগুলার একটাও মিথ্যা বলে নাই পাঠক। আলমপুরের বিখ্যাত জমিদারবাড়ির অভ্যুদয় এই রাস্তার কাজে কণ্ট্রাক্টারি হইতেই। প্রায় একশো বছর আগে দুইটা জেলায় বড় বড় রাস্তা গুলো তৈয়ারী ও মেরামতের কাজ ছিল তাহাদের একচেটিয়া। এই ঠিকাদারির লাভ হইতেই আলমপুরের চৌধুরীরা তিরিশ হাজার টাকা আয়ের জমিদারি কিনিয়া পেশা চাষের পরিবর্তে দলিল দস্তাবেজে পেশা জমিদারী লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন। আর ওভারসিয়ারের পকেটে খামে পুরিয়া টাকা দেওয়ার গল্প না জানে কে? বাইসিক্ল চড়িয়া 'হেটকোট' পরিয়া সে-ওভারসিয়ার বাবুদের সে দেখিয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার হইয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইয়াছে। সুতরাং—।

সুতরাং সে নামিয়া পড়িল। এবং নামিয়াই সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে শুরু করিল। প্রথম বছরে লাভ হইল এক হাজার টাকার কিছু বেশী। প্রতাপ মূলধন লইয়াছিল তিন হাজারের কিছু কম। তিন হাজারে এক হাজার লাভ। দ্বিতীয় বৎসরে মূলধন বাড়াইয়া সে আট হাজারে

তুলিল ; একটা ঘোড়া কিনিল, খান তিনেক সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বাইসিক্ল কিনিল এবং পাঠকের এক শালা ও এক ভাইপোকে কাজ দেখিবার জন্ম মাসিক তিরিশ টাকা বেতনে কর্মচারী নিযুক্ত করিল। চার-পাঁচজন সাঁওতাল সর্দার অর্থাৎ গ্যাঙ সর্দার, তিনজন গরুর গাড়ির সর্দার, একজন রাজমজুরদের সর্দার নিযুক্ত করিয়া শোরগোল করিয়া কাজ জুড়িয়া দিল। নিজে ঘোড়ায় চড়িয়া ঘুরিতে লাগিল। পাঠক ঘুরিত একখানা নতুন বাইসিক্লে। প্রথম বছর তিনেক নিজের বাড়িতে ছিল সকল কাজের কর্মকেন্দ্র, বাইরের চাষের ঘরটাতেই চুন, সিমেণ্ট, গাঁইতি, কোদাল, খাতাপত্র থাকিত ; চতুর্থ বৎসরে নবগ্রামে ঘর ভাড়া করিয়া আপিস বসাইয়া দিল। খাতায় পত্রে বাহিরের কাজ চলিতে লাগিল। পাঠক সদর শহরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড আপিসে বিল হিসাব ইত্যাদি লইয়া মাসে পনেরো দিনের বেশী থাকিতে হয় বলিয়া সেখানে একটা ঘর ভাড়া লইল।

প্রতাপ মোড়ল 'মোড়ল' উপাধি ছাড়িয়া ঘোষ উপাধি কায়েম করিল। গ্রামের জ্ঞাতি-কুটুম্বদের সঙ্গে ঝগড়া না করিয়াও পর হইয়া দাঁড়াইল। পোশাকে পরিচ্ছদে কথায় বার্তায় সে হইয়া গেল আর এক মানুষ। দলিলদস্তাবেজে সে 'পেশা চাষের' বদলে 'পেশা ব্যবসায়' লিখিতে আরম্ভ করিল। বাড়িতে প্রতাপের স্ত্রী শঙ্কিত হইল। প্রতাপ তাহাকে প্রায়ই বলিত, একটু সভ্য হও। চাষীর পরিবার যখন ছিলে তখন যা করেছ যা পরেছ যা বলেছ সেজেছে। এখন ভদ্রলোকের চালচলন শিখতে হবে। ও গোবর দেওয়া, কাপড় সেদ্ধ করা এসব ছাড়। মধ্যে মধ্যে বলিত, 'এখানকার ঘরবাড়ি যা আছে থাক, নবগ্রামে গিয়ে নতুন বাড়ি করব।' অন্যদিকে ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যপদের উপর বক্রব্যঙ্গদৃষ্টি হানিয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য হইবার আয়োজন করিল। এমন সময় হঠাৎ একদা সে কোথা হইতে টাইফয়েড ধরাইয়া আনিয়া বিছানায় শুইল। এবং চব্বিশ দিনের দিন মারা গেল। প্রতাপের স্ত্রী জগাই পাঠককে ডাকিয়া বলিল—পাঠক মশাই কি হবে ?

পাঠক বলিল—তাই তো ! আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে গিয়েছি বাপু। হাজার দুয়েক টাকা না হলে তো সব অচল।

প্রতাপের স্ত্রী চমকিয়া উঠিল।

পাঠক যাহা বলিল তাহা এই। একটা বড় সাঁকোর ঠিকা ছিল, সাঁকোও হইয়াছে কিন্তু সেটা ফাটিয়া গিয়াছে। রাস্তার ঠিকায় কাঁকর পাথর যাহা মজুত করা হইয়াছে নতুন ওভার-সিয়ার তাহার মাপ ঠিক দেয় নাই। প্রায় ছয় আনা পরিমাণ কাটিয়া দিয়াছে। বিল সমস্ত আটক পড়িয়াছে। এদিকে গাড়োয়ান, কুলি, রাজমিস্ত্রীদের তিন সপ্তাহের মজুরি বাকি। তহবিল শূন্য।—"এখন অন্তত হাজার টাকা চাই। এ সময় বিপদের সময়। টাকার কথা মুখে আসে না। কিন্তু না বললেও নয়। গাড়োয়ান কুলি রাজমিস্ত্রীদের কথা শুনে আমার হাত পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গিয়েছে। তারা বলাবলি করছে আমাকে ধরে মারবে আর—।"

বার দুই ঢোক গিলিয়া বলিল—"আর বলছে দল বেঁধে এসে বাড়িতে তোমাদের চেপে বসবে। না খেয়ে তো তারা খাটতে পারবে না।"

প্রতাপ জ্ঞাতি-কুটুম্ব ছাড়িয়াছিল, গ্রামের লোকও সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রতাপের মৃত্যুর পর তাহারা প্রকাশ্যে শত্রুতা না করিলেও সাহায্য করিতে এক পা আগাইয়া আসিল না। নিজেদের বাড়ির দাওয়ায় বসিয়া অধিকাংশ লোকই বলিল—এ হবে তা তো জানা কথা।

* * *

সেসব দিনের কথা সেতাবের মনে আছে। বাপ প্রতাপ মণ্ডলের ঠিকাদারির জমজমাট আমলে সেও বাপের মত নিজেকে এ গ্রামের সকল ছেলে হইতে পৃথক বলিয়া ভাবিতে শুরু করিয়াছিল। আর মহাতাপ একেবারে প্রায় আদুরে গোপাল বনিয়া গিয়াছিল। ছেলেবেলা হইতেই মহাতাপ সরল চঞ্চল। বাপের অবস্থার আকস্মিক উন্নতিতে সে আদর পাইয়া হইয়া উঠিয়াছিল দুর্দান্ত।

সবই মনে আছে সেতাবের।

ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারি পাঠক সেদিন যে বলিয়া গেল গাড়িওয়ালারা ও মজুরেরা দল বাঁধিয়া পাওনার জন্য আসিবে এবং গোলা ভাঙিয়া ধান বিক্রি করিয়া টাকা উশুল করিয়া লইবে সে কথা সে মিথ্যা বলে নাই। একদিন সত্যই তাহারা আসিল। সঙ্গে আসিল প্রতাপের জ্ঞাতি ভাই ধানের পাইকার গোপাল ঘোষ; ওই ঘোঁতন ঘোষের বাপ। সেতাব-মহাতাপের মা তখন বউ মানুষ, বয়সও অল্প, তিরিশও হয় নাই; সেদিন সে ঘোমটা খুলিয়া গিয়া দাঁড়াইল মোটা মোড়লের বাড়িতে। মোটা মোড়ল ধর্মভীরু মানুষ এবং ভাল মানুষ। প্রতাপের সঙ্গে ইদানীং তাহার কথাবার্তা বড় একটা ছিল না। মোটা মোড়ল গ্রাম সম্পর্কে দাদা বলিয়া কয়েকবার প্রতাপকে সৎপরামর্শ দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু প্রতাপ সে কথার উত্তরে বলিয়াছিল—আমার উন্নতিতে বুক সবার টাটিয়ে গেল তা আমি জানি। পরামর্শ আমি কারুর চাই না। মোটা মোড়ল এ উত্তরে আঘাত পাইয়াছিল। সেদিন হরিকে স্মরণ করিয়া প্রতাপের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল এবং সেই হইতে এদিক আর বড় মাড়ায় নাই। পথে প্রতাপের সঙ্গে দেখা হইলে পাশ কাটাইয়া সরিয়া যাইত। কিন্তু প্রতাপের বিধবা বধূ সেদিন গিয়া দাঁড়াইবা মাত্র সে বলিল—সে কি! চল মা চল! দেখি।

সে আসিয়া খাতা দেখিয়া ধান বিক্রি করিয়া সকলের পাওনা শোধ করিয়া দিল। পাঠককে বলিল—হিসাবের খাতাটা যে একবার বার করতে হবে পাঠক মশাই!

পাঠক আকাশ হইতে পড়িল—খাতা তো মোড়লের বাড়িতে। খাতাপত্র তো আমি জানি না। মোটা মোড়ল অনেক চেষ্টা করিয়াও পাঠককে কায়দা করিতে পারিল না। গোটা গ্রামের লোক প্রতাপের ছেলেদের বিরুদ্ধেই একরকম দাঁড়াইয়াছিল। মোটা মোড়ল একা কোন রকমেই তাহাদের বুঝাইতে পারিল না। দোষী প্রতাপ মরিয়া গিয়াছে, তাহার ছেলেরা নির্দোষ নিরপরাধ একথা তাহারা কোন রকমেই বুঝিল না। ওদিকে হঠাৎ মহাজন নালিশ করিয়া বসিল—সে টাকা পাইবে। তিন হাজার টাকা।

তিন হাজার টাকা? প্রতাপ মোড়ল টাকা ধার করিয়াছে?

পাঠক বলিল—করিয়াছে। হ্যাণ্ডনোটের বয়ান সে লিখিয়াছে এবং প্রতাপ সই করিয়াছে।

ব্যবসায়ের জন্য টাকার প্রয়োজন হইয়াছিল। সকল ব্যবসায়ীকেই ধার করিতে হয়। ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া মিথ্যা বলিতে পাঠক পারিবে না। আসল কথা কিন্তু অন্য। দরখাস্ত ইত্যাদির জন্য প্রতাপ কিছু সাদা কাগজে সই করিয়া পাঠককে দিয়াছিল। পাঠক মহাজনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া সেই কাগজে হ্যাণ্ডনোট বানাইয়াছে।

এদিকে ছোট ছেলে মহাতাপ পড়িল জ্বরে। জ্বর দাঁড়াইল টাইফয়েডে। প্রতাপের টাইফয়েডের বিষ তাহাকে পাড়িয়া ফেলিল। যমে মানুষে টানাটানি করিয়া মহাতাপ বাঁচিল কিন্তু কেমন বোকা বুদ্ধিহীন হইয়া গেল। প্রথম প্রথম কথার জড়তা হইয়াছিল। কথা বলিলে বুঝিতে পারিত না, ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া মানুষের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত।

সেতাবের মনে পড়ে সেতাবও সারা পৃথিবীর দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া থাকিত। সে নেহাত ছোট ছিল না। বুঝিবার বয়স তাহার হইয়াছিল। বাপ বাঁচিয়া থাকিতে শুনিত—পাঠক বলিত, আরও দু-চারজন বলিত, মোড়ল, ছেলেকে তুমি ভাল করে পড়াও। ওকে ওভারসিয়ারি পড়াবে। ওভারসিয়ার হলে এ ব্যবসা একেবারে হৈ হৈ করে চলবে।

কথাটা কি করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়া নবগ্রামের ইস্কুল পর্যন্ত পৌছিয়াছিল। সেখানে ঘোঁতন ছিল তাহার সহপাঠী। ঘোঁতন পড়াশুনাতে ভাল ছিল এবং নবগ্রামের আধাশহুরে ফ্যাশান ও কথাবার্তাতেও পাকা ছিল। সে তাহাকে ঠাট্টা করিয়া 'ওপোর স্যার' বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছিল। তাহাতে সেতাব লজ্জা অনুভব করিত বটে কিন্তু তাহার মধ্যেও গোপন অহঙ্কার অনুভব করিত। হঠাৎ বাপ মরিতেই ঘোঁতনের ওই ঠাট্টাটা মারাত্মক রূপে অসহনীয় হইয়া উঠিল। অন্যদিকে গ্রামে পথে ঘাটে লোকজন তাহাকে দেখিয়া বলিতে শুরু করিল—ছেলেটা তো বড় হয়েছে, আবার পড়া কেন রে বাপু? এই অবস্থায়! যা হোক কুলকর্মে লাগলে দুমুঠো খেতে পাবে তো। পড়েই বা করবে কি? হুঁ।

ওদিকে মহাজন নালিশ করিয়া ডিগ্রী করিল। প্রায় বিঘা দশেক জমি বিক্রি হইয়া গেল। বৎসরের শেষে কৃষাণ মজুরেরা অবশিষ্ট জমির ধান তুলিয়া ভাগ করিয়া যে ধান লইয়া মণ্ডল-বাড়ির উঠানে মরাই বাঁধিল তাহাতে বাড়ির উঠানের একটা কোণও ভাল করিয়া ভরিল না। অথচ আগে উঠানটার অর্ধেকটা মরাইয়ে মরাইয়ে ভরিয়া থাকিত। সেতাব মহাতাপের লুকোচুরি খেলার আদর্শ ক্ষেত্র হইয়া উঠিত।

সেতাবের মা মরাইয়ের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল গড়াইয়া আসিল। আর বছর দুয়ের মধ্যে আরও দুঃসময় আসিল। সেদিনও সেতাবের মা কাঁদিতেছিল। সেতাব সেদিন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া নির্বাক হইয়া বসিয়া ছিল। পরীক্ষায় সে একটা বিষয়ে ফেল করিয়াছে। প্রথম ডাকে প্রমোশন পায় নাই; দ্বিতীয় ডাকে পাইবে কি না তাহারও কোন স্থিরতা নাই। তাই চুপচাপ বসিয়া ছিল, কথাটা মাকেও বলে নাই। হঠাৎ মায়ের চোখে জল দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বার দুই পাক মারিয়া বলিল—আমি আর পড়ব না।

—পড়বি না? মা অবাক হইয়া ছেলের মুখের দিকে তাকাইল।

—না। এবার প্রমোশন পাই নাই।

বাধা দিয়া মা বলিল—না পেয়েছিস—এবার ভাল করে পড়্। আসছে বার ভাল করে উঠবি?

—না। আর পড়ব না।

—করবি কি? আমার মুণ্ডু?

—না। চাষবাস করব। নইলে যা আছে তাও থাকবে না। ধার করে ধান খেতে হবে। তার দায়ে জমি বিকিয়ে যাবে।

সেভাব পড়া ছাড়িয়া সেই সংসারের হাল ধরিল। দেহ তাহার দুর্বল ছিল, নিজে হালের মুঠা ধরিয়া বিশেষ কিছু করিতে পারিল না; কিন্তু দিনরাত্রি তদারকের ফলে চাষের উন্নতি হইল। অনাবৃষ্টির সময় গভীর রাত্রে সে মাঠে বাহির হইয়া লোকের জমির আল কাটিয় নিজের জমি ভিজাইয়া লইত। চাষের আগে রাত্রে মাঠে গিয়া দশখানা জমি হইতে দশঝুড়ি সার উঠাইয়া নিজের জমিতে ছড়াইয়া দিয়া আসিত। পথ চলিতে চলিতে গোবর পাইলে গোবরটুকু উঠাইয়া লইয়া হয় জমিতে নয় নিজের সারগাড়িতে আনিয়া জমা করিত। বৎসর দুয়েক পর সে মাথা খাটাইয়া এক ব্যবসা বাহির করিল। তরির ব্যবসা ও তাহার সঙ্গে বীজের ব্যবসা। নদীর ধারে তাহাদের খানিকটা গোচর—অর্থাৎ গোচারণভূমি ছিল। সারা বর্ষাটা নদীর বানের জলে ডুবিয়া থাকিত। বান কমিয়া গেলে প্রচুর ঘাস হইত, বর্ষার তিন মাস ছাড়া বাকি নয় মাস গোরুগুলি সেখানে ঘাস খাইত। সেইখানে সে তরির চাষ শুরু করিল। এবং বাজারে প্রথম মরসুমে তরি তুলিয়া বিক্রয় করিত। তাহার আলু উঠিত কার্তিক মাসে। তখনকার দিনে আট আনা ছয় আনা সের বেচিত টমাটো, বেগুন মূলা তাহার প্রথম ঝোঁকে উঠিত। সে ফসল লইয়া সে নিজে গিয়া হাটে বেচিয়া আসিত। আবার, একদফা এইসব ফসল লাগাইত একেবারে শেষ ঋতুতে। অর্থাৎ আলু তুলিত চৈত্র মাসে। সেই আলু পাকাইয়া বালির উপর বিছাইয়া রাখিত, বিক্রি করিত বর্ষার সময়। কতক বিক্রি করিত বর্ষার সময়, কতক বিক্রি করিত বীজ হিসাবে। মূলাবেগুনও তাই। শেষ মরসুমে পাকাইয়া বীজ করিয়া ঘরে তুলিত এবং পরবর্তী ফসলের মরসুমে গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরিয়া সেই বীজ চাষীদের সরবরাহ করিয়া আসিত। টাকা আদায় করিত ফসল উঠিবার পর। বীজে ফসল না জন্মিলে তাহার দাম লইত না। ইহাতেই তাহার দশাটা সে কিছু ফিরাইয়া ফেলিল। শুধু ইহাতেই নয়, বাড়ির হালচালও সে বদলাইয়া ফেলিয়াছিল। প্রতাপ মণ্ডল ব্যবসা ফাঁদিয়া ঘরে চুনকাম করাইয়াছিল, সে সেই চুনকাম-করা দেওয়ালের চুন ঢাকিয়া মাটি দিয়া নিকাইয়া দিল। খানকয়েক চেয়ার কিনিয়াছিল প্রতাপ মণ্ডল। সেগুলা বিক্রি করিয়া দিল। খান দুই বেঞ্চ ছিল, সেগুলার উপরে বীজের হাঁড়ি বসাইল। 'বাড়ির খাওয়াদাওয়া পোশাক-আশাক সব বদলাইয়া দিল। তাহার মা তাহাতে আপত্তি করিল না। আপত্তি করিল মহাতাপ। খাওয়াদাওয়া ভাল না হইলে তাহার চলে না। সে আঁ-আঁ করিয়া চীৎকার

করিত। দুই-তিন বৎসরে তাহার কথার জড়তা কাটিয়াছে, শরীরও সারিয়াছে, সেই পূর্বের মত সবল দেহ হইয়াছে কিন্তু মাথার গোলমালটা যায় নাই। মধ্যে মধ্যে সে সেতাবকে লাঠি লইয়া তাড়াও করিত।

সেতাব হাসিত। ভাগ্য তাহার ফিরিয়াছে, ভাইয়ের আবদারে রাগ করিতে মন উঠিত না।

ঠিক এই সময়েই একদিন এগারো বছরের চাঁপাডাঙার বউ চেলির কাপড় পরিয়া, হাতে রুপার খাড়ু, গলায় মুড়কিমালা দোলাইয়া, দুই পায়ে চারগাছা রুপার মল বাজাইয়া মণ্ডল-বাড়িতে আসিয়া ঢুকিল।

সেও এক বিচিত্র ঘটনা। লোকে বলিল, একেই বলে বিধির বিধান। যে যার হাঁড়িতে চাল দিয়াছে। নইলে ও মেয়ের বিয়ে হবার কথা কার সঙ্গে—হল কার সঙ্গে!

কথাটা মিথ্যা নয়। মেয়েটির বিবাহের সম্বন্ধ ছেলেবেলা হইতেই ঠিক ছিল গোপাল ঘোষের ছেলে ঘোঁতনের সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ সব ওলোটপালোট হইয়া গেল।

চাঁপাডাঙার বউ কাদম্বিনীর বাপ উমেশ পাল চাঁপাডাঙার সম্ভ্রান্ত চাষী। সম্ভ্রান্ত মানে আধুনিক কালের শিক্ষায় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত নয়, খাঁটি এদেশের চাষী; গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক, কাঁধে চাদর, পায়ে চটি; তার পোশাক, বিনীত মিষ্ট কথা, অথল অকপট মানুষ, দিনে চাষ করে, নিজে হাতে লাঙল বয়, গো-সেবা করে, সন্ধ্যায় মোটা গলায় হরিনাম করে; ইংরেজি জানা বাবুদের খাতির করে, ভয় করে, কিন্তু বিশ্বাস করে না, ঘৃণাও করে না। তবে তাহারা যখন তাহার বাড়িতে বর্ষায় সময় ধানের অভাব পড়িলে ধার করিতে আসে তাহাদের মনে মনে অনুকম্পা করে। মুখে প্রকাশ করে না। ধান সে দেয়। এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে ধান পাইবে না জানিয়াও দেয়। মুখে তখন সে বার বার বলে, হরিবোল—হরিবোল!

এই উমেশ পালের স্ত্রী এবং গোপাল ঘোষের স্ত্রী অর্থাৎ ঘোঁতনের মা, এক গ্রামের মেয়ে, বাল্যসখী—সই। গোপালের ছেলে ঘোঁতন ভূমিষ্ঠ হওয়ার ফলে উমেশের স্ত্রী বলিয়াছিল—আমার মেয়ে হলে তোমার ছেলেকে আমি জামাই করব। উমেশের প্রথম দুই সন্তান পুত্র, তৃতীয় সন্তান কন্যা কাদম্বিনী। কাদম্বিনী ভূমিষ্ঠ হইলে উমেশের স্ত্রী সইকে খবর পাঠাইয়াছিল যে···মেয়ে হইয়াছে। কথা যেন পাকা থাকে।

উমেশ পাল খুঁতখুঁত করিয়াছিল। কারণ গোপাল ঘোষ পাইকার অর্থাৎ দালাল মানুষ। ধানের দালালি করে। চাষবাস আছে কিন্তু ধানের দালালিতে ঝোঁক বেশি। সেই সূত্রে আধাশহুরে মানুষ। সদগোপ হইয়াও চাষ করে না, করে ধানের পাইকারী—অর্থাৎ ধান-চালের দালালি। দালালিতে কাজের চেয়ে কথা বেশী। কাজের চেয়ে যেখানে কথা বেশী সেখানে কথার সবই ভুয়া অর্থাৎ মিথ্যা। তবুও স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করে নাই। বাক্যই যখন দিয়াছে মেয়ের মা, তখন না মানিলে উপায় কি? মেয়ের জন্মের পর কিছুদিন বেশ উৎসাহের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দুই বাড়িতে খবরাখবরের আদানপ্রদান চলিল। তত্ত্বতল্লাসও চলিল। তারপর ধীরে ধীরে সব কমিয়া আসিল। তারপর কাদুর বয়স হইল এগারো।

ওদিকে বাজারে গুজব রটিল—নতুন আইন হইতেছে যে, মেয়ে যুবতী হওয়ার আগে বিবাহ দিলে জেল হইবে। বিবাহ নাকচ হইবে। কেহ বলিল চোদ্দ বছর, কেহ বলিল ষোলো, কেহ বলিল আঠারো বছর বয়স না হইলে মেয়েদের বিবাহ চলিবে না। ভীষণ আইন, সারদা আইন না কি আইন!

ওদিকে গোপাল ঘোষের ছেলে ধোঁতন নাকি ম্যাট্রিক দিয়াছে। বিবাহের বাজারে ছেলের দর খুব। গোপাল ঘোষ নাই, মরিয়াছে; উমেশ লোক পাঠাইল ধোঁতনের মায়ের কাছে, অর্থাৎ স্ত্রীর সইয়ের কাছে। বিবাহ এক মাসের মধ্যেই শেষ করিতে অনুরোধ জানাইল। উত্তর দিল ধোঁতন। সে বলিয়া পাঠাইল—বিবাহ করিতে সে এখন আদৌ ইচ্ছুক নয় এবং পরবর্তীকালেও সে যখন বিবাহ করিবে তখন লেখাপড়া-জানা মেয়ে বিবাহ করিবে। এগারো বৎসর বয়সের মেয়েকেও সে বিবাহ করিবে না। ধোঁতনের মা, লোকের সামনে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—আমার দশা দেখে যাও বাবা। সইকে বলো, সয়াকে বলো, আমি নিরুপায়। দিনরাত চোখের জল সার হয়েছে আমার। আমার কোন হাত নাই।

জবাব পাইয়া উমেশ পাল খানিকক্ষণ গুম হইয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল তারপর মুখ তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই তাহার বাড়িতে প্রবেশ করিল সেতাব। তাহার সঙ্গে একজন ভারী। তাহার কাঁধের ভারের দুই দিকে বীজের বস্তা। উমেশ পালের মুখটা প্রসন্ন হইয়া উঠিল। হ্যাঁ, পাত্র সে পাইয়াছে। ঠিক হইয়াছে। সেদিন গণৎকার কাদুর হাত দেখিয়া বলিয়াছিল—এ মেয়ের পাত্র পায়ে হেঁটে তোমার বাড়ি এসে উঠবে পাল। তুমি দেখে নিয়ো।

কথাটা শুনিয়া উমেশ পালও হাসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল—ভারী চতুর এই গণৎকার মশাই। ধোঁতনের সঙ্গে কাদুর বিবাহের সম্বন্ধের কথা এখানে মোটামুটি সবাই জানে। সেই কথাটি সে তাকমাফিক চমৎকার ঝাড়িয়া দিয়াছে। আজ কিন্তু সে সেই কালো বামুনকে মনে মনে প্রণাম করিল। প্রতাপ মণ্ডল এ অঞ্চলের নামী মানুষ ছিল। তাহার ছেলে সেতাব। বংশ উচ্চ। ছেলের যোগ্যতা ছেলে নিজে প্রমাণ করিয়াছে। যে ছেলে ডুবন্ত নৌকাকে ভাসাইয়া তুলিতে পারে, সে নাই বা হইল ম্যাট্রিক পাস। উমেশ পাল পরের দিনই সেতাবের বাড়ি আসিয়া তাহার মায়ের কাছে কথা পাড়িল। এবং এক মাসের মধ্যেই বিবাহ শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। সেতাবের মা বউ দেখিয়া খুশী হইল। মহাতাপ বউয়ের ঘোমটা খুলিয়া দিয়া বলিল—এঃ—এই আবার বউ হয়? এইটুকুন মেয়ে!

মা বলিয়াছিলেন—হয়। ওই বউ বড় হবে। তোমার বড় ভাজ—তোমার মায়ের তুল্য হবে। আমার ঘরের লক্ষ্মী।

সেতাব তাহার পর ধুলার মুঠা ধরিয়াছে, সোনার মুঠায় পরিণত হইয়াছে সে ধুলা। আবার সোনার মুঠা চোখের উপর ধুলায় পরিণত হইতে বসিয়াছে। সাধে সে হায় হায় করে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিন কয়েক পরের কথা।

ভোরবেলা সূর্য উঠি-উঠি করিতেছে। গোয়াল-বাড়িতে বলদ জোড়াটার কাঁধে হাল চাপাইয়া বাঁধিতে বাঁধিতে মহাতাপ গান ধরিয়া দিয়াছিল।

মালসাট্ মারিয়া কাপড় পরিয়াছে। মাথায় রঙীন গামছা বাঁধিয়াছে। পাশে ওধারে লাঙল নামানো। একটা ধানের বীজের ঝুড়ি। দুইখানা কোদাল। হুঁকো-কল্কে। একটা ছোট চটের থলে।

কৃষাণ নোটন সাহায্য করিতেছে।

হাল জোতা হইলে মহাতাপ বার দুই সস্নেহে গোরু দুইটার গায়ে হাত বুলাইয়া দিল। তারপর একটা ছোট টুকরিতে কিছু খইল লইয়া একটার মুখের কাছে ধরিল। গান চলিয়াছে। একটার মুখের কাছে খইল ধরিতেই অপরটা গন্ধে চঞ্চল হইয়া উঠিল স্বাভাবিকভাবে। মহাতাপ সমের মাথায় ধমক দিল তাহাকে—ধ্যাৎ তেরি!

ইতিমধ্যে বাড়ির ভিতর হইতে বধূ দুইটি, দুইটি ঘড়া কাঁখে লইয়া কাঁধে গামছা ফেলিয়া স্নানে বাহির হইল।

বড়—চাঁপাডাঙার বউ যাইতে যাইতে দাঁড়াইল। হাসিয়া বলিল, ঘরদোর চাষবাস বলে তা হলে মনে পড়ল ছোট মোড়লের এতদিনে? চারদিন গাজননাচন নেচে—পাঁচ দিন ঘুম।

মানদা বলিল, ক ঘটি ভাঙ খেয়েছিল শুধাও।

মহাতাপ বলিল, ফের ব্যাড়ব্যাড় করে। এ কদিন কেবল ওই কথা, ব্যাড় ব্যাড়—ব্যাড়র ব্যাড়র—ক ঘটি ভাঙ খেয়েছ? ভাঙ কেউ হিসেব করে খায় নাকি?

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, তা খায় না, কিন্তু ছেলেবেলায় অসুখ করে যার মাথা দুর্বল, সে ভাঙ খায় কেন? কথাটা মনে থাকে না কেন?

মহাতাপ বলিল, এই কান মলছি। বুয়েচ কি না। সত্যই সে কান মলিয়া বলিল—ওই ঘোঁতনা শূয়ার, আর ওই বোঁচা শেয়াল, ওই ওরাই—ওরাই যত অনিষ্টের মূল।

কথার উপরে কথা কহিয়া মানদা বলিল, ওরাই যত অনিষ্টের মূল। কচি খোকা! ওরা ঝিনুকে করে খাইয়ে দিয়েছিল!

—দেখ বউদিদি, দেখ। তুমি দেখ। তুমি বল ওকে—এমন করে কেন? কেমন করে দেখ। দেব আবিচে কিল পিঠে বসিয়ে, হ্যাঁক লেগে যাবে।

বলিয়া আগাইয়া গিয়া লাঙলটা কাঁধে তুলিয়া লইল।—চল্ রে, চল্। নোটন?

নোটন ইতিমধ্যে তামাক সাজিতে গোয়ালের ভিতর ঢুকিয়াছিল। তাহাকে না পাইয়া সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, নোটনা! বলি অ—বুড়ো হনু!

বড় বউ বলিল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, মানুষ ওপর রাগ করে পালিয়ে গেলে হবে না। আমার একটা কথার জবাব দাও তো। ঘোঁতনাকে ধানটা ছেড়ে দিয়ে এলে, ঘোঁতনার মায়ের

কথায় দয়া হল, তা বুঝলাম। কিন্তু একবার জিজ্ঞাসাও তো করে! দাদা রয়েছে। কী, কথা বল না যে?

—কি বলব কি? বলতে গেলে, তোমার স্বামীর নিন্দে করতে হবে।

—কার?

—তোমার ইয়ের, বরের। আবার কার!

খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল চাঁপাডাঙার বউ।

মহাতাপ ওদিকে নাকে ঘড়াত শব্দ করিয়া গোরু দুটার পিঠে হাত দিয়া তাহাদের চালাইয়া দিল।

বাড়ির বাহিরের দাওয়ায়—রাস্তার সামনে—সেতাব বসিয়া ঢেঁড়া ঘুরাইয়া শনের দড়ি পাকাইতেছিল। তাহার সামনে রাস্তার উপর দিয়া মহাতাপ হালগোরু লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। দাওয়ার উপর মানিক একটা মাটির পুতুল লইয়া খেলা করিতেছে। রাখালটা কল্কেতে তামাক সাজিয়া ফুঁ দিতেছে। একটা খুঁটিতে একটা ছাগল বাঁধা, পাতা খাইতেছে। বাচ্চা দুইটা পাশে ঘুরিতেছে। সেতাব বলিল, কতটা বীজ ফেলবি আজ?

—জোলের দু আড়াতে ফেলাব।

—দু আড়া?

—হাঁ তো কি! তোমার মত মরা থেঁকুটে নাকি আমি?

—তা না হয় তু ভীম ভৈরবই হলি। কিন্তু একদিনে এত ক্যানে?

—বাত চলে যাবে।

—বাত চলে যাবে সে জ্ঞানটা ভাঙ খাবার সময় থাকলে ভাল হত।

—ফ্যাচফ্যাচ কোরো না বেশী। এই বেটা গোরু, চল না ক্যানে। আবার নাকে ঘড়াত শব্দ করিয়া গরু দুইটার পিঠে পাঁচনের টিপ দিল এবং চলিয়া গেল।

সেতাব ডাকিল, মানকে!

—উঁ!

—বাবার মত খবরদার হাবারাম হবি নে বেটা। লোককে পাওনা ছেড়ে দিয়ে আসবি না।

—আমি ছিব হব।

—না। হবি না। খবরদার!

—কি হব?

—আমার মত হবি।

—না, তুমি ছাই। রোগা—

—ওরে বেটা, বুদ্ধিতে আমার মত হবি। অঙ্ক শিখবি। কাউকে এক পয়সা ছাড়বি না।

—পয়সা দাও।

—ওরে বেটা, অনেক পয়সা জমিয়েছি তোর জন্যে। সব তোর জন্যে, বুঝলি?

—কাউকে দেব না।

—হ্যাঁ। কেউ আমাকে দেয় নি, কেউ ছাড়ে নি মানকে। বাবা দেনা করেছিল, কেউ ছাড়ে নি। বুঝলি? আর পরিবারের কাছে টাকা নিবি না। তোর বড়মা দেনার সময় গয়না দিয়েছিল দেনা শোধ করতে। তার পাপ আমাকে আজ ভুগতে হচ্ছে। খবরদার মানকে। হাঁ।

রাখালটা হুঁকা-কল্কে সেতাবের হাতে দিল।

সেতাব বলিল, শোন্, তু একবার ঘোঁতন ঘোষের বাড়ি যাবি বুঝলি? বলবি পঞ্চায়েত মোড়লেরা একবার ডেকেছে। বুঝলি?

রাখালটা বলিল—সে আসবে না গো। বড় ত্যাঁদড় নোক ঘোঁতন।

—তা হোক, তু যাবি। আমি বলছি—তু যাবি। আসে না-আসে আমি বুঝব। এই কাগজখানা দিবি।

রাখালটা বলিল, তাহলে এখুনি যাই। নইলে ঘোঁতন মুড়ি খেয়ে বিড়ি টানতে টানতে বেরিয়ে যাবে, আর সেই ভাত খাবার বেলা পর্যন্ত পাব না।

ঘোঁতনের বাড়ি গোপডাঙায়। ঠিক পাশের গ্রামে।

এই গ্রাম ও আধাশহর লক্ষ্মীপুরের মাঝখানে গোপডাঙা—ছোট একখানি গ্রাম। লক্ষ্মীপুরেরই কাছাকাছি বেশী। লক্ষ্মীপুর অনেকদিনের সমৃদ্ধ গ্রাম। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-প্রধান সমাজ। গোপডাঙার টানটা চিরকাল ঐ দিকেই বেশী। ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোকেরা গোপডাঙার চাষীদের এবং গোপদের উৎপন্নের পুরানো খরিদ্দার। গোপডাঙার তরি-তরকারি এবং দুধ, দই লক্ষ্মীপুরের অন্নকে পঞ্চাশ না হোক বেশ কয়েক প্রকার ব্যঞ্জনে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এবং গুড় ও দুধ সহযোগে পরমান্ন না হোক পায়সান্নে পরিণত করিয়াছে। শুধু তাই নয়, এই গ্রামের চাষীরাই বরাবর ব্রাহ্মণ কায়স্থদের জমি-জেরাত ভাগে ঠিকায় করিয়া আসিয়াছে। এবং সেকালে ইহা হইতেই তাহাদের দুচার জন বছরে নিজের খামারে একটা মরাই-ও বাঁধিয়াছে। আবার অজন্মার বছরে ঠিকার ধান শোধ না করিতে পারিয়া খতও লিখিয়াছে। খতের আসল, সুদে বাড়িয়া তাহাদের পৈতৃক জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছে। এ সব পুরানো কথা। তাহার পর মাঝে একটা সময় আসিয়াছিল যখন লক্ষ্মীপুরের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ—বাঁড়ুজ্জে মশায়, মুখুজ্জে মশায়, বোস মশায়, ঘোষ মহাশয়ের সকলেই ও সব উপাধি ছাড়িয়া বাবু মশাই হইলেন; ঘরে ঘরে তক্তপোশ-ফরাসের বদলে চেয়ার-টেবিল হইল, টোল পাঠশালা উঠিয়া গেল, ইংরিজি ইস্কুল হইল, বাবুরা শহরে চাকরি ধরিল। উকিল হইল, মোক্তার হইল, ডাক্তার হইল। শরবত ছাড়িয়া চা ধরিল, হুঁকার সঙ্গে সিগারেট ঢুকিল, তখন লক্ষ্মীপুরে খান্সামার চাহিদাটা বাড়িয়া গেল। এই সময় গোপডাঙার অনেকে চাষের মত অভদ্র কাজ ছাড়িয়া এই শৌখীন কাজে ঢুকিল। ছোট বড় করিয়া চুল ইহারাই প্রথম ছাঁটিল, চাদরের বদলে কামিজ আমদানি করিল। কাছেই বক্রেশ্বর নদী—ইহার পর বক্রেশ্বর নদী দিয়া অনেক জল বহিয়া গেল। শুধু বহিয়াই গেল না, বন্যায় চারিপাশ ডুবাইয়া দিয়াও

গেল। চাষের জমিতে পলিও পড়িল, বালিও চাপিল। সেতাবদের গ্রাম নয়নপুরের চাষীরা বালিপড়া জমির বালি তুলিল, পলিপড়া জমিতে সোনা ফলাইল। কিন্তু গোপডাঙার চাষীরা চাষ একেবারে তুলিয়া না দিলেও ওই জীবিকার উপর আস্থা হারাইল। তাহারা চাষের সঙ্গে এটা ওটা ব্যবসায়ে হাত দিল। কেহ নবগ্রামে দোকান করিল। মুদীর দোকান, বিড়ির দোকান ইত্যাদি এবং ছেলেদের ইস্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। দুই চারটি ছেলে ম্যাট্রিক পাস করিল, একজন এম-এ পাস করিল, একজন বি-এল হইল এবং গোপডাঙার বাস উঠাইয়া কর্মস্থল শহরে চলিয়া গেল। ঘোঁতনের বাবা গোপাল ঘোষ নিজে চাষবাসের সঙ্গে পাইকারী অর্থাৎ ধানের দালালির কাজ ধরিয়াছিল। লক্ষ্মীপুরের বণিকদের কাছে টাকা লইয়া গ্রামে গ্রামে ধান কিনিত এবং সেই ধান গাড়ি বোঝাই করিয়া বণিকদের গদিতে পৌঁছাইয়া দিত। কিছু লাভ থাকিত দরের মাথায়, আর কিছু থাকিত ওজনের মাথায়। খরিদ্দারের ঘরে হাতের টিপে যে ওজনটা সে লাভ করিত—সেইটার দাম মিলিত। ইহার উপর আছে কিছু চলতা—কিছু আছে ঈশ্বরের নামে বৃত্তির ভাগ। ঘোঁতনকে ইস্কুলে দিয়াছিল। ঘোঁতন ও সেতাব কয়েক ক্লাস এক সঙ্গে পড়িয়াছিল। ঘোঁতন ছেলে মন্দ ছিল না, সেতাবের মত সে এম্‌'কে অ্যাম, এন্‌'কে অ্যান, এল্‌'কে অ্যাল বলত না। চোস্ত উচ্চারণ ছিল তার। লক্ষ্মীপুরের বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলিত, স্কুলে ডিবেটিং ক্লাবে ডিবেট করিত। ভাল আবৃত্তি করিতে পারিত। লক্ষ্মীপুরের থিয়েটার ক্লাবের রিহারস্তালের দিন হইতে অভিনয়ের দিন পর্যন্ত নিয়মিত আড়ালে-আবডালে থাকিয়া শুনিত, শিখিত। ক্লাবের লাইব্রেরি হইতে নাটক নভেল পড়িত। লোকে বলিত—ছেলেটির ভবিষ্যৎ আছে। মাস্টাররাও আশা করিতেন, ঘোঁতন অন্তত সেকেণ্ড ডিভিশনে পাস করিবে। মন দিয়া পড়িলে ফার্স্ট ডিভিশনেও যাইতে পারিবে।

হয়তো পারিত। কিন্তু গোপাল ঘোষ মরিয়া সব গোলমাল হইয়া গেল। ঘোঁতন বল্গাশূন্য অশ্বের মত ধাবমান হইল। ফার্স্ট ক্লাসে উঠিয়া সে প্রেমে পড়িয়া গেল। মনে মনে সে বেশ কিছুদিন হইতেই প্রেমে পড়িয়াছিল। স্থানীয় মাইনর গার্লস স্কুলের মাইনর ক্লাসের ছাত্রীদের প্রত্যেকটিকেই কিছু দিনের জন্য প্রিয়তমা ভাবিতেছিল। কিন্তু জাতের বাধা বা অন্য বাধা স্মরণ করিয়া সে কথা প্রকাশ করিতে পারিত না। নিজের খাতায় তাহাদের নাম লিখিত এবং খুব যত্নের সঙ্গে কাটিত। হঠাৎ প্রকাশ্যে প্রেমে পড়িবার সুযোগ জুটিয়া গেল। স্থানীয় সবরেজেস্ট্রী আপিসেই তাহাদের স্বজাতি এক কেরানী আসিল—এবং তাহার বড় মেয়েটি মাইনর ক্লাসে ভর্তি হইল। লম্বা ধরনের শ্যামবর্ণ মেয়ে, বয়স বোধ হয় তের চৌদ্দ; কিন্তু ঘোঁতনের প্রেমে পড়িবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। মাইনর ক্লাসে পড়ে; বেণী ঝুলাইয়া ফেরতা দিয়া কাপড় পরিয়া স্কুলে যায়—সুতরাং ইহার চেয়ে অধিক আয়োজন আর কী হইতে পারে লক্ষ্মীপুরে। ঘোঁতন প্রেমে পড়িল, মেয়েটির বাপের সহিত আলাপ করিল। তাহাদের বাড়িসুদ্ধ নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ি আনিয়া খাওয়াইল। এই সময়েই উমেশ মণ্ডল কাদম্বিনীর বিবাহের জন্য লোক পাঠাইল।

ঘোঁতন তাহাকে সোজা "না" বলিয়া দিয়া বিবাহ ভাঙিয়া দিল। সবরেজেস্ট্রী অফিসের কেরানীবাবুটি ভীরু। কন্যাদায়গ্রস্ত লোক, সেও ঘোঁতনকে পছন্দ করিল। মাস্টাররা বলেন—ছেলে মন্দ নয়। বাহিরে তো খুব চটপটে—স্মার্ট। বাড়ি-ঘরদোরও খারাপ নয়। সুতরাং আকারে ইঙ্গিতে সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করিল।

ঘোঁতন খুব উৎসাহিত হইয়া পরীক্ষা দিয়া আসিল। শহরে পরীক্ষা দিয়া ফিরিবার সময় সেলুনে চুল ছাঁটিয়া এক টিন গোল্ডেন বার্ডসাই নামক সিগারেট মিকশ্চার কিনিয়া বাড়ি ফিরিল এবং একদা শুভলগ্নে কেরানীবাবুর মাইনর-পড়া চতুর্দশী কন্যা নীহারিকাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল যে গেজেটে থার্ড ডিভিশন অবধি কোথাও ঘোঁতনচন্দ্রের নাম নাই।

ঘোঁতন বলিল—শালারা সব!

শ্বশুর বলিল—আবার ভাল করে পড়।

ঘোঁতন বলিল—না, ও গোলামী লেখাপড়া আমি আর করব না।

ঘোঁতন তখন লক্ষ্মীপুরের থিয়েটারে পার্ট পাইয়াছে। সামনে মাসখানেক পরেই অভিনয়। লক্ষ্মীপুরের ক্লাবের নিয়মানুসারে কোন স্কুলের ছাত্র পার্ট করিতে পায় না। স্কুলে আবার ভর্তি হইতে হইলে পার্ট ছাড়িতে হইবে। সুতরাং ঘোঁতন কিছুতেই রাজি হইল না, উপরন্তু শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া শ্বশুরের বাসার পথে হাঁটা বন্ধ করিল এবং কিছু জমি বিক্রয় করিয়া লক্ষ্মীপুরের গোলাম দর্জির সঙ্গে বখরায় একটা কাটা কাপড়ের দোকান করিল, এবং ইউনিয়ন কোর্টে পেটি মামলার তদ্বির আরম্ভ করিল। কিছুদিনের মধ্যে কাটা কাপড়ের দোকানের ভাল কাপড়গুলার জামা পরিয়া দোকানটা গোলামকে বেচিয়া দিল বটে কিন্তু মামলার তদ্বিরে তাহার কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। থিয়েটারেও সে সুনাম অর্জন করিল।

শ্বশুর মেয়ের বাপ, তাহার ইচ্ছা যাই থাক, মনের ইচ্ছা মনে চাপিয়া জামাইয়ের কাছে নতি তাহাকে স্বীকার করিতে হইল,—সে জামাইকে বলিল—তুমি তাহলে আর একটা কাজ কর। মামলার তদ্বিরের সঙ্গেই চলবে। সবরেজেস্ট্রী আপিসে আমি রয়েছি, তুমি সবরেজেস্ট্রী আপিসে টাউটের কাজ কর। সনাক্ত দেওয়া, দলিল লেখার কাজ কর। তা হলে মধ্যে মধ্যে যখন নকলের জন্যে একস্ট্রা হ্যাণ্ড দরকার হবে সে কাজও বলে-কয়ে করে দিতে পারব।

এ প্রস্তাবে ঘোঁতন রাজী হইল। এবং এ ব্যাপারেও সে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিল। কানে কলম গুঁজিয়া বড়তলায় ঘুরিতে লাগিল। কিছুদিন পর লক্ষ্মীপুরের সাহাদের পঞ্চানন সাহার সঙ্গে জুটিয়া একটা যাত্রার দলও খুলিয়া বসিল। পঞ্চানন সাহা লক্ষ্মীপুরের থিয়েটারে দূত-প্রহরী ছাড়া পার্ট পায় না, অথচ তাহার ধারণা ভাল পার্ট পাইলে নিশ্চয়ই নাম করিতে পারে। মধ্যে মধ্যে এ লইয়া ক্লাবে ঝগড়া-ঝাঁটিও করিত পঞ্চানন। হঠাৎ এই ঝগড়া একদিন চরমে উঠিয়া গেল এবং পঞ্চানন ক্লাব ছাড়িয়া দিল। কয়েকদিন পর শোনা গেল, পঞ্চানন সাহা যাত্রার দল খুলিতেছে। পঞ্চাননের পয়সা আছে, যথেষ্ট পয়সা, সে হাজার দুয়েক খরচ করিয়া পোশাক, চুল, বাদ্যযন্ত্রপাতি কিনিয়া ঘোঁতনকে

ডাকিয়া বলিল—বামুন-কায়েতদের সঙ্গ ছাড়। ও বেটারা আমাদিগকে দূত-প্রহরী সাজিয়ে নিজেরা রাজা-উজীর সাজে। আমার দলে আয়, রাজা-উজীর সব আমরাই সাজব এখানে। ঘোঁতন সানন্দে জুটিয়া গেল।

পঞ্চাননের দল প্রথমেই পালা ধরিল "নাগযজ্ঞ" এবং নায়ক তক্ষক নাগের পার্ট দিল ঘোঁতনকে। ঘোঁতন তক্ষক নাগের পার্টে এমন ফোঁস-ফোঁস করিয়া ফোঁসাইল যে লোকে বাহবা দিল খুব। ঘোঁতন নিজেও খুশী হইল, সত্য বলিতে পালাও জমিল।

বছর খানেক পর পঞ্চাননের শখ মিটিল, হাজার খানেক টাকা লোকসান দিয়া দল তুলিয়া দিল। তুলিয়া দিবার সময় ঘোঁতন বলিল—পঞ্চানন-দাদা! দল তুলে দেবে? কিন্তু—

—কিন্তু কি? আমার শখ মিটেছে।

—তা হলে আমাকে দিয়ে দাও ওগুলো। আমাদের শখ এখনও আছে।

—কিন্তু টাকা যে অনেক লেগেছে ঘোঁতন।

—তা লেগেছে। কিন্তু পঞ্চানন অপেরায় তোমার নামটা তো থাকবে। আমি টাকা কিছু দোব। আড়াই শো।

শেষ পর্যন্ত চারশো টাকায় রফা করিয়া পঞ্চানন সাহাকেই বিঘা দুয়েক জমি সাতশো টাকায় বেচিয়া ঘোঁতন দলের সরঞ্জাম কিনিল এবং বাড়িতে সামনের চাষের সরঞ্জামের ঘর-খানার মেঝে বাঁধাইয়া—দেওয়ালে কলি ফিরাইয়া—বাহিরে পঞ্চানন অপেরার সাইনবোর্ড খাটাইয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিল—O. K. ঠিক হয়েছে।

প্রথম বছর দুই-তিন জমজমাট আসর চলিয়াছিল ঘোঁতনের। তখন যুদ্ধ মিটিয়াছে কিন্তু বাজারে তখন অঢেল কাগুজে টাকা। তাহার পর মন্দা পড়িয়াছে। ঘোঁতনের যাত্রার দলে লোকসান যাইতে শুরু করিল। ওদিকে রেজেস্ত্রী অফিসে মন্দা পড়িল। ঘোঁতনের স্ত্রী চার-পাঁচ বছরে তিনটি সন্তান প্রসব করিয়া সংসার বৃদ্ধি করিল, নিজে রোগে পড়িল। বোন পুঁটি বড় হইয়া পনেরো পার হইয়া পড়িল ষোলো বছরে। মা মেয়ের বিবাহের জন্য তাগিদ দিলেও ঘোঁতন চঞ্চল হইল না। স্পষ্ট বলিয়া দিল—আমার টাকা নাই। ইহার মধ্যে আরও বিঘা তিনেক জমি নিলাম হইয়া গেছে। ঘোঁতন আপীল করিয়াছে। তাহার উপর পর পর দুবছর অনাবৃষ্টিতে ফসল নাই। ঘোঁতন করিবেই বা কি? গতবছর সেতাবের কাছে ধান লইয়াছিল। ভরসা করিয়াছিল ওই পাগল মহাতাপের। পাগলটাকে যাত্রার দলে ঢুকাইতে পারিলে পার্টের লোভ দেখাইয়া অন্তত বছরের খোরাকির ধানটার সংস্থান হয়। কিন্তু যাত্রাটাত্রা মহাতাপ বুঝে না। তার চেয়ে সে সঙ ভালবাসে, সংকীর্তন ভালবাসে। বাঁয়া তবলার চেয়ে খোল বাজাইতে তাহার উৎসাহ বেশী। এবার সেইজন্য মহাতাপকে গাজনের সঙে শিব সাজাইয়াছিল। দশ টাকা চাঁদাও লইয়াছে। আবার ধান ছাড়িয়া দিলাম বলিয়া লিখিয়াও লইয়াছে।

* * *

রাখালটা যখন সেখানে গিয়া পৌছিল, তখন ঘোঁতনের মা ঘরের দাওয়াটা মাটি দিয়া

নিকাইতেছে। ঘোঁতন চায়ের একটা বাটি লইয়া তক্তাপোশের উপর বসিয়া আছে। এক হাতে একটা জলন্ত বিড়ি। রুখু চুলগুলা উড়িতেছে। চোখে উদাস দৃষ্টি। সে ভাবিতেছিল পার্টের কথা।

রাখালটা আসিয়া বলিল, ঘোষবাবু মশায়!

—কে? তাহার দিকে ঘোঁতন তাকাইল।—সেতাব মোড়লের রাখাল না তুই?

—হ্যাঁ গো। এই কাগজটা দিলে মুনিব! তোমাকে যেতে বলেছে একবার।

কাগজটা দেখিয়া ঘোঁতন দাঁতে দাঁত টিপিয়া ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গিসহকারে বলিল, এক কিলে বেটার দাঁত কটা ভেঙে দোব। নোটিশ এনেছে, পঞ্চায়েতের নোটিশ! ভাগ, ভাগ বলছি! ভাগ!

রাখাল বলিল, তা আমি কি করব? ওই! আমাকে পাঠালে—। ওই—

বলিতে বলিতে সে পিছাইতে শুরু করিল।

ঘোঁতন চায়ের বাটি হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, বেটা ছুঁচোর গোলাম চামচিকে—

ঘোঁতনে মা ত্রস্ত হইয়া বলিল, ও ঘোঁতন, ওরে! কি হল'রে?

—কিপটে কঞ্জুস পেকো সেতাবের রাখাল বেটা নোটিশ নিয়ে এসেছে। পঞ্চায়েতের নোটিশ। I don't care—ওরে বেটা বলে দিবি, ঘোঁতন ঘোষ don't care—I mean does not care.

মা আবার বলিল, ঘোঁতন।

ঘোঁতন বলিল, আমি মাছে পোকা পড়িয়ে দেব। হুঁ, হুঁ—আমি ঘোঁতন ঘোষ। আমি হোৎ-তা-তা লাঙল ঠেলি না। আকাট মুখ্যু নই আমি। সেতাব মোড়লের বাড়ির কীর্তি ফাঁস করে দোব, গুপ্ত বিন্দাবনের পালা লিখে ছড়িয়ে দেব।

মা এবার কঠিনস্বরে বলিল, ঘোঁতন, তোর মুখ খসে যাবে, ও কথা বলিস নে। ঘোঁতন কি বলিতে চাহিতেছে মুখ খুলিবামাত্র সে তাহা বুঝিয়াছে।

ঘোঁতন ভেঙাইয়া বলিল, আ মলো যা। তোর দরদ উথলে উঠল যে?

তুই যা বলছিস, তা আমি বুঝেছি। চাঁপাডাঙার বউ সতীলক্ষ্মী। মহাতাপ বোকা হোক, মুখ্যু হোক, তোর মত ফেশানদুরস্ত ভদ্দনোক না সাজুক, বড় ভাল ছেলে। আমি চোখের জল ফেলে নিজের দুঃখের কথা বললাম তো এক কথায় পাওনা ধান ছেড়ে দিলে—

—দিলে? এই তো সেতাব মোড়ল পঞ্চায়েতের নোটিশ দিয়েছে।

—দিক। সে যখন বলেছে তখন সেতাব কখনও কথা ফেরাবে না। তার উপর কাদু আছে। সে আমার সইয়ের মেয়ে।

—না। ফেরাবে না। একটা আধপাগলা মুখ্যু, একটা উল্লুক, একটা পাঁঠাতে আর মহাতাপে কোন তফাৎ নাই। ঘরে খাবার আছে, সম্পত্তি আছে, তারই জোরে আমাদের চেয়ে তার খাতির। সব কলঙ্ক ঢাকা পড়ছে।

মা এবার মাটি-গোলার হাঁড়িটা হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল,

দেখ্‌, ঘোঁতন, অন্যায় কথা বলিস না! তোর যেমন পাপ মন তেমনি কূট বুদ্ধি। তত তোর মনে হিংসে। অমৃতিকে তুই বিষ বলছিস! ছি! ছি!

—যাও, যাও, মেলা ফ্যাচফ্যাচ কোরো না বলছি। বিড়ি টানিয়া ঘোঁতন খানিকটা ধোঁয়া উড়াইয়া দিল—আমি হাঁড়ি 'ব্রেক' করে দোব বাবা। হুঁ হুঁ।

বলিয়া সে হাঁটু দোলাইতে লাগিল।

মায়ের দাওয়া নিকানো শেষ হইয়াছিল। মাটি-গোলা হাঁড়িটা হাতে লইয়া সে দাওয়া হইতে নামিয়া পাঁচিলের গায়ে সদর দরজা দিয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকিতেছিল, ঘোঁতনের কথা শেষ হইতেই সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তোমার হাঁড়ি যে ভেঙে আটকুচি হয়ে আছে বাবা। চাঁপাডাঙার মেয়ে কাদুর সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ছেলে বয়েস থেকে; তুমি বাবা যাচা লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে দিয়ে—বিয়ে করলে নিজে পছন্দ করে। বউমা ভাল, নিন্দে করব না বাবা, কিন্তু সবেরই তো পয় আছে—ভাগ্যি আছে; তোমার বউয়ের ভাগ্যি বলতে কিছু নাই। তা ছাড়া ধন্যি বাপের মেয়ে, বাপ সেই যে—আলতামুটি শাঁকেরকুটি দিয়ে বিয়ে দিয়ে চলে গেল এখান থেকে আর খোঁজ করলে না। আর কাদুর বাপ মরবার সময় মেয়েকে দিয়ে গেল এতগুলি গহনা। আজ কাদুকে দেখে দশখানা গাঁয়ের লোকের চোখ জুড়োয়। বলে মরি মরি —কি লালিত্যি! এ রাগের কথা—লোকে না জানুক, আমি জানি। এতে তোমার অকল্যাণ হবে বাবা। আমার সইয়ের মেয়ে সে, আমার মেয়ের তুল্য। বিয়ে যখন হয় নাই —তখন তাকে বোন ভাবা উচিত তোমার। কিন্তু—তুমি—! প্রৌঢ়া আক্ষেপের সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

ঘোঁতন এবার হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া হাতের চায়ের বাটিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং দাওয়া হইতে রাস্তায় নামিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেল। হঠাৎ দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া বলিল, চিরকালের ঘরজ্বালানী পরঢলানী যে তুমি! কাদু তোমার সইয়ের মেয়ে—সে তোমার পেটের ছেলের চেয়ে আপন! তার জন্যে আমার উপর রাগ। ফু-ফু! ফু!

রাস্তায় নামিয়া খানিকটা আসিয়াই সে দেখিল, সেতাবের রাখাল ছোঁড়াটা একটা আমগাছের তলায় দাঁড়াইয়া গাছে ঢেলা মারিয়া আম পাড়িতেছিল। ঘোঁতন তাহাকে দেখিয়া ডাকিল, এই ছোঁড়া, শোন্‌ তো। এই! তাহার মাথার মধ্যে একটা মতলব খেলিয়া গেল।

ছোঁড়াটা ছুটিতে উদ্যত হইতেই ঘোঁতন একটা ঢেলা তুলিয়া বলিল, পালাবি তো ঢেলা মেরে ঠ্যাঙ খোঁড়া করব তোর। শোন্‌।

ছোঁড়াটা থমকিয়া দাঁড়াইল। ঘোঁতন আগাইয়া আসিয়া বলিল, তোর ছোট মনিব কোথা? একবার ডেকে দিতে পারিস?

—ছোট মুনিব মাঠে।

—মাঠে?

—হঁ। বীজ বুনতে গিয়েছে।

ঘোঁতন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কয়েক পা অগ্রসর হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বিড়ি খাবি ?

—বিড়ি ? দেবেন আপুনি ? সত্যি ?

—এই নে না।

একটা বিড়ি তাহাকে দিয়া নিজে একটা বিড়ি মুখে পুরিয়া দেশলাই জ্বালিয়া ধরাইয়া, নিজের ধরানো বিড়িটা রাখালটার বিড়িতে ঠেকাইয়া দিয়া বলিল, টান।

রাখালটা হুস করিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া দিল।

ঘোঁতন বলিল, হাঁ রে, তোদের ছোট মুনিব আর বড়-মুনিবে নাকি ঝগড়া হয় ?

—দিন রাত। সেই যে বলে, সাপে নেউলে।

—কেন বল্ তো ?

—ছোট মুনিব মানুষটা যে কেমন গো। লোকের কাছে ঠকে আসে। লোককে পাওনাগোণ্ডা ছেড়ে দেয়। টাকা হাতে পেলেই খরচ করে দেয়। এই বড় মুনিবের রাগ। আর ছোট মুনিবের রাগ, বড় মুনিব কেপন। বড় মুনিব বকে। সবচেয়ে বেশি রাগে, মোল্যানকে বকে বলে।

—হুঁ। বড় ম্যোল্যানের সঙ্গে মহাতাপের খুব মাথামাথি—না রে ?

—ওরে বানাস। বড় মোল্যান ছাড়া কথা নাই ছোট, মুনিবের। সে যা বলবে তাই বেদবাক্যি।

—তোদের ছোট মোল্যান রাগ করে না ?

—করে না আবার ? করে, মাঝে মাঝে ফোঁসফোঁস করে। তা ছোট মুনিব বলে—নেহি মাংতা হ্যায়, চলে যা বাপের বাড়ি। বড় মোল্যান আবার বকে ছোট মুনিবকে। ছোট মোল্যানকেও বকে খুব।

হুঁ। একটু ভাবিয়া লইয়া ঘোঁতন বলিল, ভাল ছেলে তুই—তোকে আমার যাত্রার দলে একটা পার্ট দোব। বুঝলি ? করবি ?

বার বার সে ঘাড় নাড়িল। মনে মনে মাকে ব্যঙ্গ করিল। চাঁপাডাঙার বউয়ের উপর মায়ের বড় দরদ। অথচ রাখাল ছোঁড়া কি বলিয়া গেল ? তাহার মানে কি ? নয়ানপুরের যত সব ভেড়ার দল—সেতাব-মহাতাপের অবস্থাকে ভয় করিয়া মুখ খুলিতে সাহস করে না। দেওর-ভাজের মাথামাখিরও একটা সীমা আছে। রাখালটাকে হাতে করিয়া ঠিক খবরটা বাহির করিবে সে।

আজকালকার ভাল ভাল উপন্যাসে নরনারী-তত্ত্বের জীবন-রহস্য সে জলের মত বুঝিতে পারিয়াছে।

ছেলেটা খুশি হইয়া ঘাড় নাড়িল।

ঘোঁতন আবার প্রশ্ন করিল, এখন বল্ তো কোন্ মাঠে বীজ পাড়ছে তোর ছোট মুনিব ?

—ওই তো গো আপনার কাছে,কেনা—কাঁড়াজোলের সেই বেঁকী বাকুড়ির মাথায়।

কাঁড়াজেলের মাঠ। এখানে ওখানে লোক হাল বহিতেছে। বৈশাখ মাস বীজ বুনিবার সময়। মহাতাপ লাঙল চালাইতেছিল। তাহার বলিষ্ঠ দেহের সকল শক্তিতে লাঙলের মুঠা চাপিয়া ধরিয়াছে। গোরু দুইটা চলিয়াছে মন্থর গমনে।

কৃষাণটা কোদাল কোপাইয়া আলের মুখ কাটিয়া জল-নির্গমের পথ করিয়া দিতেছিল।

এমন সময় আসিয়া দাঁড়াইল ঘোঁতন। ডাকিল, মহাতাপ!

মহাতাপ মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, ভাঙ খাবার দলে আমি নাই, যা।

—একটা বিড়ি খা।

—বকিস না, আমার সময় নাই। দু আড়া বীজ ফেলতে হবে আমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে নাকে তালুতে ঘড়াৎ শব্দ করিয়া গোরু দুইটাকে তাড়া দিয়া বলিল, অই-অই, বেকুব বেহুদ্দা গোরু কোথাকার! অই-অই, আবার শব্দ। কহিল—ক্যা-ক্যা-ক্যা-ক্যা।

ঘোঁতন বলিল, ওরে দাঁড়া, শোন্। কথাটা বেশ ধমকের সুরেই বলিল।

—কি?

—বলি মানুষের কথা কটা রে?

—ক্যানে? কথা একটা। দু-কথার মানুষ মহাতাপ নয়।

—তবে?

—কি তবে! মহাতাপ লাঙল ছাড়িয়া দিল এবার।

—তুমি যে দাতাকর্ণ সেজে মাকে পাওনা ধান ছেড়ে দিয়ে এলে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তোর মায়ের জন্যে দিয়েছি। তোর জন্যে নয়।

—বুঝলাম। তো তোর দাদা আবার ধান চায় কেন?

—কি?

—তোর দাদা, কিপটে সেতাব—

—এক চড়ে তোর দাঁত ভেঙে দোব ঘোঁতনা। কিপটে আছে আপন ঘরে আছে, তুই কিপটে বলবি ক্যানে?

—সে ধান চায় ক্যানে? পঞ্চায়েত ডাকে ক্যানে?

—যা যা, ঘর যা। সে আমি বড় বউকে বলে দোব। সে সব ঠিক করে দেবে।

—বড় বউকে বলে ঠিক করে দিবি? ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল ঘোঁতন। ঘাড় নাড়িয়া খুব রসিকের মত হাসিয়াই বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই দিস। কথার শেষে সে আরও খানিকটা হাসিল।

মহাতাপ তাহার হাসি দেখিয়া ক্ষেপিয়া গেল, বলিল, হাসছিস যে? এই, তুই হাসছিস যে?

ঘোঁতন বিজ্ঞের মত বলিল, হাসলাম। তা তুই রাগছিস ক্যানে?

—তু হাসবি ক্যানে? মহাতাপ আরও দুই পা আগাইল।

—ওই! ওই! সে পিছাইতে লাগিল।

মহাতাপ খপ করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—বল্ ব্যাটা কড়িং, হাসিস ক্যানে ? এমন করে হাসলি ক্যানে বল্—

—ছাড়্, ছাড়্, ছাড়্—ওরে বাপ রে !

নোটন ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ছোট মোড়ল, ছাড়, ছাড়, ছোট মোড়ল—

দূর হইতে কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—ঠাকুরপো !

দূরে একটি গাছতলায় বড় বউ কাদম্বিনী হাতে গামছায় বাঁধা জলখাবার লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মাথায় বিড়ার উপর জলের ঘটি ; মাঠে চাষের কাজের সময় চাষীদের বধূরাও মাঠে স্বামীপুত্রের জন্য জলখাবার লইয়া যায়। সেতাব ভরা চাষের সময় ছাড়া চাষে খাটে না। হিসাবনিকাশ দেনাপাওনা বীজের ব্যবসা লইয়া তাহার অনেক কাজ। মহাতাপের চাষ লইয়া মাতন।

ছোট বউকে সমাদর করিয়া কাদু মাঠে বাহির হইতে দেয় না। তাহার উপর পাগলকে তো বিশ্বাস নাই ; কোথায় মাঠেই ঝগড়া করিয়া বসিবে মানুষের সঙ্গে। তাহার যদি মনে হয় —গুড় কম কি মুড়ি নরম—তাহা হইলে এক কাদু ছাড়া আর কাহারও সাধ্য নাই যে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বুঝাইয়া খাওয়াইতে পারে। মহাতাপের জন্য জলখাবার লইয়া আসিয়া গাছতলায় দাঁড়াইয়াই তাহার চোখে পড়িল ঘোঁতন দাঁড়াইয়া আছে, কি কথা বলিতেছে। কথা যে ধানের কথা তাহা বুঝিতে তাহার কষ্ট হইল না। মুহূর্ত পরেই মহাতাপের উচ্চকণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল। তাহারও মুহূর্ত পরে মহাতাপকে যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া তাহাকে চীৎকার করিয়া না ডাকিয়া পারিল না।

মহাতাপ চমকিয়া তাহার দিকে চাহিল।

নোটন বলিল, বড় মুনিব্যান।

দূর হইতে কাদু বলিল, ছেড়ে দাও ঠাকুরপো। ছেড়ে দাও।

মহাতাপ ঘোঁতনকে ছাড়িয়া দিল, যা বেটা আলকাটার কাপ, আজ তোকে ছেড়ে দিলাম। ফের দিন তোকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকা পাকিয়ে দোব।

ঘোঁতন হাতে হাত বুলাইতে বুলাইতে চলিয়া গেল।

মহাতাপ গাছের তলায় গিয়া বসিল, ব্যাটা হাসে। দেখ তো কাণ্ড।

কাদম্বিনী বলিল, কি হল তাতে ? হাসি তো ভাল জিনিস।

—ভাল জিনিস ? ওই হাসি ভাল জিনিস ? ভাল জিনিস তো গা জলে যায় ক্যানে ?

—নাও, ভিজে গামছায় গা মুছে ফেল। জালা জুড়িয়ে যাবে। একটু বুদ্ধি কোরো। বুঝলে, সব তাতেই মারমূর্তি ভাল নয়।

—তুমি এই কথা বলছ ? তোমার কথায় কখনও রাগি আমি ?

বড় বউ জলের ঘটি আগাইয়া দিল—মুখ ধোও। হাত ধোও।

মহাতাপ হাতমুখ ধুইতে লাগিল।

বড় বউ বলিল, আমার কথায় রাগো না সে তো কথা নয়। পরের কথাতেই যা রাগবে

কেন? ছি! কি হল কি? ঘোঁতন হাসলেই বা ক্যানে?

—ক্যানে! এবার মহাতাপ চেঁচাইয়া উঠিল—ক্যানে! তোমার নাম করে হাসল ক্যানে?

বড় বউ তাহার মুখের দিকে তাকাইল, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলে, আমার নাম করে?

—হ্যাঁ। আবার হাসছে যেন মদ খেয়ে হাসছে। দাও মুড়ি দাও।

বলিয়া মুড়ির খোরাটা টানিয়া লইল। হুস করিয়া জল ঢালিয়া দিল। গুড়ের বাটি হইতে চামচখানেক গুড় লইয়া মিশাইয়া দিল। তারপর বলিল, ব্যাটার হাত ভেঙে দিতাম।

বড় বউ কাদম্বিনী বিচিত্র হাসি হাসিল।—তার চেয়ে ওরা আসুক। হাসতে দাও ওদের। পরের হাত ভেঙে তোমাকে ফ্যাসাদ বাধাতে হবে না।

প্রকাণ্ড হাতে মুড়ির গ্রাস তুলিতে গিয়া মহাতাপ বলিল, এমনি করে হাসবে ঘোঁতনা?

—যাঁর বিচারের ভার তিনিই বিচার করবেন। ওতে আমার গায়ে ফোস্কা পড়বে না। কিন্তু ও আবার তোমার কাছে এসেছিল কেন?

—ওই দেখ। ভুলে যেতাম এখুনি। তুমি সেই কেপনকে বোলো তো, আমি ঘোঁতনকে যে ধান ছেড়েছি সেটা এবার চাষে ফলিয়ে দোব—দোব—দোব!

বলিয়াই সে বড় বড় গ্রাসে খাইতে লাগিয়া গেল।

চাঁপাডাঙার বউ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, বড় মোড়ল বুঝি ছাড়বে না বলেছে?

খাইতে খাইতেই মহাতাপ বলিল, পঞ্চায়েৎ ডেকেছে। আজই সন্ধ্যেবেলা।'

চাঁপাডাঙার বউ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না-না-না। সে ঘোঁতনের জন্যে নয়। আজ পঞ্চায়েত বসবে—শিবকেষ্ট রামকেষ্টদের হাঁড়ি আলাদা হবে, বিষয় ভাগ হবে।

—উঁহু, ঘোঁতন বলে গেল। কেপনের সর্দার লোক পাঠিয়েছিল।

চাঁপাডাঙার বউ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিয়া লইল।

মহাতাপ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া বলিল, তুমি বোলো যেন!

—বলব। বলব। তুমি খাও।

—বাস। নিশ্চিন্দি তো?

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।

—এবার এমন চাষ করব—দেখবে।

—কোরো। এখন খেয়ে নাও।

মহাতাপ বড় বড় গ্রাসে মুড়ি খাইতে লাগিল।

চাঁপাডাঙার বউয়ের বুঝিতে বাকী রহিল না ব্যাপারটা। সে মণ্ডলবাড়ির গৃহিণী, সেভাবও বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি হিসাবে এখানকার পঞ্চায়েতের একজন মণ্ডল, গ্রামের সকল খবরই তাহাদের পক্ষে জানা স্বাভাবিক। রামকেষ্ট এবং শিবকেষ্ট দুই ভায়ের মধ্যে বনিবনাও অনেকদিন হইতেই হইতেছে না। কাজেই তাহারা ভিন্ন হইতে চলিয়াছে। সেইজন্য—আজই সন্ধ্যায় পঞ্চায়েত বসিবার কথা। এই সুযোগ লইয়া সেভাব ঘোঁতনের ব্যাপারটাও পঞ্চায়েতের

সম্মুখে উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে—কথাটা মুহূর্তে কাদম্বিনী বুঝিয়া লইল। ব্যাপারটা কাদম্বিনীর ভাল লাগিল না। সেতাবের উপর সে বিরক্ত হইল। এ কি? এই স্বভাবটা কি তাহার কোন দিন যাইবে না? একদিন যখন অবস্থা খারাপ ছিল তখনকার কার্পণ্যের কথা সে বুঝিতে পারে। আজ এত কার্পণ্য কেন? তা ছাড়া মহাতাপ বুদ্ধিহীন হোক, সেও তো বাড়ির অর্ধেকের মালিক! তাহার অপমান হইবে যে! মহাতাপকে সে স্নেহ করে। মহাতাপ সরল, নির্বোধ, মাথাতেও একটু ছিট আছে—তাহার উপর ভাঙ খায়, লোকের সঙ্গে মারামারি করিয়া আসে, জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াই করিয়া আসে, সবই সত্যি। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় মায়ের কথাটাও কি মনে পড়ে না সেতাবের? চাঁপাডাঙার বউয়ের তখন পনেরো যোলো বৎসর—মহাতাপের চোদ্দ-পনেরো, মৃত্যুশয্যায় শাশুড়ী বউকে ডাকিয়া বলিয়াছিল—বউমা, ওই পাগলকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, তুমি ওকে দেখো।

মহাতাপকে ডাকিয়া মা বলিয়াছিল—বড় ভাজ আর মায়ে সমান। চাঁপাডাঙার বউয়ের কথা কখনও অমান্য করবি নে। ও আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

সেতাবকে ডাকিয়া বলিয়াছিল—সবই তোমার ওপর ভার বাবা। বউমার অযত্ন কোরো না, ওই হল এ বাড়ির ঘরের লক্ষ্মী। তুমি বউমাকে দেখো; মহাতাপকে দেখো।

চাঁপাডাঙার বউ তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছে। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা শুধু কর্তব্যপালন নয়, তাহার সঙ্গে তাহার অন্তরের অকৃত্রিম স্নেহের যোগ আছে। বুদ্ধিহীন মহাতাপ আজও সেই ছেলেবেলার মত চাঁপাডাঙার বউকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়। তাহার ক্রোধ হইলে সে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। প্রতিশোধ না লইতে পারিলে সে মেঝের উপর মাথা কোটে। সে-সময় তাহার সম্মুখে কেউ দাঁড়ায় না। দাঁড়ায় ওই চাঁপাডাঙার বউ। চাঁপাডাঙার বউ দাঁড়াইলেই মহাতাপের ক্রোধের মাত্রা কমিয়া আসে। সে-ই মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকায়। চাঁপাডাঙার বউ বলে, ছি! ছি!

মহাতাপ প্রথমটায় প্রতিবাদ করে।

বড় বউ আবার বলে, ছি! ছি! তোমার জন্যে ছি-ছি করে সারা হলাম। চিরকালই কি তুমি ছেলেমানুষ থাকবে?

মহাতাপ এবার নিজের দিকের ন্যায়কে প্রবল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। বড় বউ বলে, সব বুঝেছি। অন্যায় ওদেরই। কিন্তু সংসারে যে সয়—সেই মহাশয়।

মহাতাপ শান্ত হয়।

মহাতাপের বিবাহও সে-ই দিয়াছে। মানদা তাহারই জ্ঞাতিকন্যা।

মানদা মেয়েটি দেখিতে বড় ভাল। তাহার উপর কাজে কর্মে এমন পারদম মেয়ে চাষীর বাড়িতেও বিরল। শুধু সেতাবই কি সব ভুলিয়া গেল? দিন দিন পয়সা পয়সা করিয়া সে কি হইতে চলিল!

চাঁপাডাঙার বউয়ের সদাহাস্যময়ী মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া গেল। স্বামীর এই আচরণের সংবাদে মর্মাহত হইল। মহাতাপ এ বাড়ির অর্ধেকের মালিক, তাহার বুদ্ধি নাই কিন্তু তাহার

সবল শরীরের পরিশ্রমেই জমির ধানে এ বাড়ির খামার উথলিয়া উঠে। শুধু তাই নয়—তাহাদের সন্তান নাই, ওই মহাতাপের ছেলে মানিকই এ বংশের উত্তরাধিকারী।

বিষণ্ণ মন লইয়াই সে বাড়ি ফিরিল।

খামার বাড়িতে কতগুলা কুমড়ার লতা মাচায় উঠি-উঠি করিতেছে, সেতাব একখানা কোদাল লইয়া সেগুলোর গোড়ায় চারা করিয়া দিতেছে। পাঁচিলের গোড়ায় হুঁকা-কল্কে ঠেকানো রহিয়াছে।

তাহার অনতিদূরে বসিয়া আছে—রামকেষ্ট ও শিবকেষ্টর দুই বিধবা খুড়ী। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের কাছাকাছি—ইন্দ্রাশের বউ ও টিকুরীর বউ। দুইজনেই উবু হইয়া বসিয়া আধঘোমটা দিয়া কথা বলিতেছে, একজন একটা লাঠি দিয়া মাটিতে দাগ কাটিতেছে।

একজন বলিতেছে, শিবকেষ্ট রামকেষ্ট ভেন্ন হবে বাবা, তোমরা পঞ্চায়েত মিলে ভাগ করে দিচ্ছ; কিন্তু আমাদের কি হবে, বল?

সেতাব একটু রূঢ়স্বরেই বলিল, সে একা আমাকে বললে কি হবে?

—মোটা মোড়ল তোমাকেই বলতে বললে বাবা। বললে, তোমরা বাপু সেতাবের কাছে যাও। বয়সে ছোট হলেও তার কথাই বিকুবে। তার অবস্থা ভাল। বলতে হেন লোক নাই যে সেতাবের কাছে ধান হোক টাকা হোক ধারে না। শিবকেষ্টদেরও দেনা রয়েছে।

সেতাব কোদালটা রাখিল, বলিল, মিছে কথা বুড়ী, মিছে কথা। দুনিয়া হয়েছে নেমখারামের দুনিয়া। বুঝলে বুড়ী, নেমখারামের দুনিয়া। এই দেখ, ওই ঘোঁতন—সে-ই যাত্রার দলের আলকাটার কাপ, তাকে পঞ্চায়েতে আসতে বলেছিলাম, তা সে বলেছে—নেহি যাঙ্গা।

বউ দুটির একজন বলিল, শিবকেষ্ট রামকেষ্ট তা বলতে পারবে না বাবা। তোমার ঘরে তমুহ্দে বাঁধা। তুমি বললে—তোমার কথা অমান্যি করতে পারবে না।

সেতাব গিয়া হুঁকা-কল্কেটা তুলিয়া লইল, টানিতে টানিতে আসিয়া বলিল, তা তোমরা বলছ কি? কথাটা কি?

চাঁপাডাঙার বউ ইহার মধ্যে কখন আসিয়া ঢুকিয়াছিল। সে আগাইয়া আসিয়া বলিল, কথা আর কি? বিধবা বউ, তাদের খাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তা না করে দিলে হবে ক্যানে? তা হলে তোমরা কিসের পঞ্চায়েত?

একজন বিধবা বলিল, এই হয়েছে। বউমা এসেছে। বল মা, তুমি বল তো। তুমি বলে দাও সেতাবকে।

সেতাব তাড়াতাড়ি বলিল, আহা, তাই তো বলছি গো! তোমরা কি চাইছ তা বল? বলি আলাদা করে থাকতে চাও, না, ওদের সংসারে থাকতে চাও, তা বলতে হবে তো।

একজন বিধবা বলিল, আলাদা হলেই তো ভাল বাবা। স্বাধীন মতে থাকতে পাই।

সেতাব উৎসাহের সঙ্গেই বলিল, তাই হবে। আলাদাই থাকবে। দুজনকে খানিকটা করে জমি দিতে হবে দুই ভাইকে।

অন্ত বিধবা বলিল, তাতে মোটা মোড়লের মত নাই। বলেছে, সে বলতে পারব না বাপু। তোমরা ছুদিন পর কাউকে জমি বিক্রয় কর—

সেতাব বলিয়া উঠিল, করে তো করবে।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, না। মোটা শশুর ঠিক বলেছে। তাতে সংসার নষ্ট হবে। খুড়ীদিগেও তো ভাবতে হবে—সংসার শশুরের সংসার, স্বামীর সংসার। রামকেষ্ট শিবকেষ্টই তো খুড়ীদের জল দেবে! তোমরা তা কোরো না খুড়ী, তোমাদের অধর্ম হবে।

—কিন্তু হতচ্ছেদ্দা করবে যে বউমা!

—ছেদ্দা কেউ কাউকে আপনা থেকে করে না খুড়ী, ছেদ্দা করাতে হয়। তুমি যার বাড়িতে থাকবে তাকে যদি পেটের ছেলের মত ভালবাস, তার সংসারে নিজের সংসার বলে খাটো তবে ছেদ্দা না করে সে যাবে কোথায়?

সেতাব ইতিমধ্যে কয়েকবার হুঁকায় ব্যর্থ টান দিয়া ধোঁয়া বাহির করিতে না পারিয়া বসিয়া কল্কেটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া তামাক সাজিতে বসিয়াছিল। এবং মধ্যে মধ্যে বিরক্তভাবে আপন মনেই হুঃ—হুঃ করিতেছিল। চাঁপাডাঙার বউয়ের কথাটা শেষ হইতেই সে বলিল, তাই যা হয় হবে খুড়ী, যা হয় পঞ্চ জনে করা যাবে। সন্ধ্যেবেলায় এসো বুঝলে? উ তোমরা বললেও হবে না, চাঁপাডাঙার বউ বললেও হবে না। আমরা পঞ্চজনে বুঝে-সুঝে যা হয় করব! হ্যাঁ, সে যা হয় হবে। সন্ধ্যেবেলাতে এসো চণ্ডীমণ্ডপে।

—তাই আসব বাবা।

বিধবা দুইজন চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া যাইতেই সেতাব সেইদিকে তাকাইয়া দেখিয়া আপন মনেই বলিল, এই মেয়েলোকের মুড়ুলি আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।

বড় বউ বিধবা দুইটির পিছন পিছন দরজা বন্ধ করিতে গিয়াছিল। দরজা বন্ধ করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তা পারবে কেন? খুড়ীদিগে জমির ভাগ বার করে দিয়ে জমিটা কিনে নেবার মতলবে ঘা পড়ছে বুঝি? সেই মতলব মনে এসেছে? ছি ছি ছি!

সেতাব ধরা পড়িয়া গেল। হঠাৎ সেই মতলবই তাহার মাথায় গজাইয়া উঠিয়াছিল, বোধ করি মতলবের কথাটা নিজের কাছেও ভাল করিয়া পরিষ্কার হয় নাই। ঠিক যেন রোগসংক্রামিত দেহের প্রথম অবস্থার মত। কেহ বলিয়া দিলে বুঝিতে পারে—তাই তো, শরীরটা অসুস্থই তো হইয়াছে। চাঁপাডাঙার বউ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঠিক ধরিয়াছে তাহাকে। সে চমকিয়া উঠিল। সেই চমকানির ধাক্কায় হাতের কল্কেটা উল্টাইয়া গেল, হুঁকোটা পড়িয়া গেল। সে চাঁপাডাঙার বউয়ের দিকে তাকাইয়া বলিল, তোমার দিব্যি, এই হুঁকো ছুঁয়ে বলছি।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, আমি মরে গেলেই বা তোমার কি? আর হুঁকো ছুঁয়ে মিথ্যে বললেই বা সংসারে কি হয় শুনি?

সেতাব অপ্রতিভ হইয়া বলিল, হুঁকো ছুঁয়ে বললেই বা কি হয়? তুমি মরে গেলেই বা আমার কি?

—হ্যাঁ গো! বল না কি হয়?

সেতাব আছাড় মারিয়া হুঁকাটা ভাঙিয়া ফেলিল, বলিল, হুঁকোর কিছু না বলেছে! এই নে।

—এইবার কোদাল নিয়ে আমার মাথাটা কাটো!

সেতাব চীৎকার করিয়া উঠিল, চাঁপাডাঙার বউ! যা-তা বোলো না বলছি।

চাঁপাডাঙার বউ খুব গম্ভীর ভাবে বলিল, পরের ঘর ভাঙতে যেয়ো না! তোমার নিজের ঘর ভেঙে যাবে।

সেতাব এবার হাত জোড় করিয়া বলিল, জোড় হাত করছি চাঁপাডাঙার বউ, তুমি থাম—তুমি থাম।

চাঁপাডাঙার বউ সঙ্গে সঙ্গে গড় হইয়া প্রণাম করিল, বলিল, তুমি হাত জোড় করলে, আমি তোমাকে পেনাম করছি। প্রণাম সারিয়া উঠিয়া বলিল, আরও একটা কথা তোমাকে বলি। ঘোঁতন ঘোষের ধান মহাতাপ ছেড়ে দিয়েছে, তুমি তবু লোক পাঠিয়ে পঞ্চায়েতে ঘোঁতনকে ডেকে পাঠিয়েছ। ভাল কর নি। ও-কথা আর তুলো না।

সেতাব চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, ইয়েকে বলে, ই তো ভারি ফেসাদ জুড়ে দিলে! পাওনা ধান ছেড়ে দোব?

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, মহাতাপের মানের চেয়ে ধান বড় হল? তার অপমান হবে।

—বোকা পেয়ে তাকে ঠকিয়ে নিলে, তাতে অপমান হয় না আর—

—না, হয় না। যে দান করে সে দাতা। দাতার বোকা বুদ্ধিমান নাই। মহাতাপ দান করেছে। তাকে যদি খাটো করতে চাও, তবে আমি উপোস দেব বলে দিলাম।

বলিয়া সে হনহন করিয়া বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া গেল।

সেতাব নিজের মাথার চুল খামচাইয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, আমি মানি না, মানি না। কারুর কথা আমি মানি না। আমি সেতাব মোড়ল। বলিয়া সেও বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

চাঁপাডাঙার বউকে সে ভয় করে। আবার তাহাকে নহিলে তাহার একদণ্ড চলে না। চাঁপাডাঙার বউ যেন তাহার বুকের ভিতরটা দেখিতে পায়। কোন কথা তাহার কাছে গোপন থাকে না। তার উপর তার কাটা-কাটা কথা। সেতাব থই পায় না। আবার বিচিত্র চাঁপাডাঙার বউ, সে তার বাপের মৃত্যুকালে দেওয়া হাজার টাকা দামের গহনা সেতাবের হাতে দিয়া হাসিয়া বলে—টাকার অভাবে তুমি নীলেমে লক্ষ্মীপুরের বাবুদের চরের জমিটা কিনতে পারছ না, জমিটা হাতছাড়া হলে তোমার দুঃখ হবে। কিনে ফেল জমিটা। পরে আমাকে টাকা দিয়ো।

লক্ষ্মীপুরের বাবুদের চরের জমি—সোনা-ফলানো চর। সেখানে এক-একটা তরমুজ হয় পাঁচ সের ওজনের। সেই জমি কেনার পর, মণ্ডলবাড়ি আবার পূর্বের শ্রী ফিরিয়া পাইয়াছে। আগের অবস্থাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু—। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহার হুকুমে ওই ঘোঁতনের মত পাষণ্ড উদ্ধত শয়তানকে পাওনা ছাড়িয়া দিতে হইবে! ঘোঁতনকে সে

দু-চক্ষে দেখিতে পারে না। সেই স্কুল-জীবন হইতে। মহাতাপের অপমান হইবে? মহাতাপ তাহার মায়ের পেটের ভাই। বিষয়-সম্পত্তি, এই ভূতের বেগার খাটা কাহার জন্ম কিসের জন্ম? তাহার নিজের জন্ম? সে খায় ক-মুঠা? পরে কি? তাহার নিজের সন্তান আছে? সে খাটে মণ্ডলবাড়ির জন্ম। সবই পাইবে মহাতাপের ছেলে মানিক। মানিকের যে ভাইয়েরা ইহার পর আসিবে তাহারা। চাঁপাডাঙার বউ ছাড়া অন্ত কেহ হইলে সে এতদিন বংশরক্ষার জন্ম আবার বিবাহ করিত। কিন্তু সেভাব তাহা করে নাই। তুমি সেটা মান না! ঘোঁতনকে পাওনা ছাড়িতে হইবে। রামকেষ্ট শিবকেষ্টদের জমি কিনিতে সে পাইবে না। তোমার কথায়? প্রতাপ মোড়ল মারা গেলে সম্পত্তি নীলামে উঠিয়াছিল—রামকেষ্ট শিবকেষ্টর বাপ হরেকেষ্ট মণ্ডল চাদর গায়ে দিয়া চটি পায়ে দিয়া সদরে গিয়া প্রতাপ মোড়লের খিড়কি পুকুরের অংশ কিনিয়াছিল। এখনও তাহারা সে পুকুরের অংশীদার। তোমার কথায় তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। তুমি সেতাবকে ধর্ম-অধর্ম শিখাইতে আসিয়াছ! রাগে তাহার চুলগুলা ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বাহিরে আসিয়া গোয়াল-বাড়িতে দাঁড়াইল। ডাকিল, গোবিন্দে, গোবিন্দে! ওরে অ গোবিন্দে! গোবিন্দে!

গোয়ালঘর হইতে গোবিন্দ বাহির হইয়া আসিল—কি বলছেন গো?

সে চোখ কচলাইতে লাগিল।

—ঘুমুচ্ছিলি?

—ঘুমুই নাই। বসে বসে ঢুলছিলাম।

—ঢুলছিলি?

—কি করব? বড় মনিব্যান না এলে তো দুধ দোয়ানো হবে না।

—তু এক কাজ কর্। ছুটে যাবি রামকেষ্টদের বাড়ি, বুঝলি?

ঘাড় নাড়িয়া গোবিন্দ বলিল, হ্যাঁ।

—রামকেষ্টদের দুই কাকীকে জানিস তো?

—এই তো খানিক আগে এয়েছিল, তারাই?

—হ্যাঁ। তাদের যাকে পাবি ডাকবি, আড়ালে ডাকবি, বলবি—কেউ যেন না শোনে, বুঝলি?

—হ্যাঁ, চুপিচুপি বলব।

—হ্যাঁ। বলবি—বড় মুনিব বলে দিলে, তোমরা জমি চাইবে। বাস, বলে চলে আসবি।

বলিয়াই আপন মনে বলিল, তারপর আমি দেখছি। আমি কারুর কথা শুনি না। কাউকে গেরাহ্য করি না। বড় সব বাড় বেড়ে গিয়েছে।

বলিতে বলিতে গোয়াল-বাড়ি হইতেও বাহির হইয়া গেল।

চণ্ডীমণ্ডপের পঞ্চায়েত মজলিসে সেতাব আসিল সকলের শেষে। মজলিসের সকলে

তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রায় দশ-বারো জন লোক বসিয়া আছে। পঞ্চায়েতের প্রধান মোটা মোড়ল বিপিন মণ্ডল স্থূলকায় মানুষ, গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক। শান্তদর্শন লোকটি। তাহার আশেপাশে বাকি লোক বসিয়া আছে। রামকেষ্ট ও শিবকেষ্ট দুই ভাই দুই বিপরীত দিকে বসিয়াছে। একটু দূরে বসিয়া আছে তাহাদের দুই বিধবা খুড়ী। মাঝখানে একটা হ্যারিকেন জ্বলিতেছে।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে পথের উপরে জন চার-পাঁচ ছোকরা অন্ধকারের মধ্যে বিড়ি টানিতেছে। একজন বলিতেছিল, জমি তো মোট তিরিশ বিঘে। তাতে খুড়ীদিকে জমি দিতে গেলে ওদের থাকবে কি? অন্য একজন বলিল, ওরা ধরেছে, জমিই ওরা নেবে সংসারে থাকা মানে অধীন হয়ে থাকা। সে ওরা থাকবে না।

—তা বললে চলবে কেন? ওদের দু ভায়ের কথা ভাবতে হবে তো?

—পঞ্চায়েত কি বলছে?

—মোটা মোড়ল 'না' বলেছে। আর সবাই চুপ করেই আছে। সেতাব পাক্ না এলে মুখ খুলবে না।

ঠিক এই সময়েই পিছনে শোনা গেল গলাঝাড়ার শব্দ। একজন বলিল, কে?

পথের বাঁক হইতে লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া আসিল সেতাব।

সকলে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। একজন বলিল, সেতাবদাদা!

সেতাব বলিল, আর সেতাবদাদাতে কাজ নাই। পথ ছাড়।

একজন হাসিয়া বলিল, কি হল, মেজাজ এত খারাপ কেন?

সেতাব তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের তালগাছের টুকরা দিয়া গড়া সিঁড়িতে পা দিয়া বলিল, সেতাব কারু কথা গেরাহ্য করে না, বুঝেছ? সে পেকো চাষদড়ি কৃপণ— যা বল। ন্যায্য কথা সেতাব বলবেই, আর ন্যায্য দাবি পাওনা সে কড়াক্রান্তি কাউকে ছাড়বে না।

সে গটগট করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। মেজাজটা সত্যই তাহার খারাপ হইয়া আছে।

মহাতাপ সন্ধ্যার সময় কাঁধে খোল লইয়া সংকীর্তনের দলে যোগ দিতে যাইবার পথে বাড়ির দুয়ারে প্রকাণ্ড একটা গোখুরা সাপ মারিয়াছে। বৈশাখ মাস, গোখুরা সাপকে পিতিপুরুষে ব্রাহ্মণ বলিত, তাহার উপর অনেক সাপ বাড়ির লক্ষ্মীর প্রহরী। সাপটা বাহির দরজার পাশ দিয়া যাইতেছিল। মহাতাপ একে মহাতাপ, তাহার উপর বৈকালে ভাঙ খাইয়াছে। সাপটাকে দেখিবামাত্র খোল নামাইয়া খামারের একটা বাঁশ লইয়া দুমদাম শব্দে দুই তিনটা আঘাতেই শেষ করিয়াছে। তিরস্কার করিলে বলিয়াছে—হুঁ, সাপ যদি লক্ষ্মীর পাহারা হয় তো মহাতাপও দিগগজ পণ্ডিত!

তারপর দুই হাতের বুড়া আঙুল নাড়িয়া বলিয়াছে—কচু জান তুমি! এ বাড়ির লক্ষ্মীর পাহারা সাপ নেহি হ্যায়, মহাতাপ হ্যায়। এ বাড়ির লক্ষ্মী হল বড়াবউ, আউর মহাতাপ মণ্ডল পাহারাদার!

সাপটাকে দেখাইয়া বলিয়াছে, ও বেটা লক্ষ্মীকে ডংশাতে এসেছিল। এখুনি বড় বউ আসত সন্ধ্যেতে বার দোরে জল দিতে। ব্যস্‌! ফোঁসা না-না করে লাগাত ছোবল!

বলিয়াই খোল লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

তাহার উপর পঞ্চায়েত আসরে আসিবার জন্ত লণ্ঠনটি হাতে লইয়া পা-টি সবে বাড়াইয়াছে অমনি আদরিণী বড় বউ টুক করিয়া পিছু ডাক দিয়াছে। সে ডাকার কত ঢং!

—পিছু ডাকছি না। কিন্তু মনে করিয়ে দিচ্ছি আমার মাথার দিব্যি রইল।

সেতাব চমকিয়া উঠিয়াছিল। ভুরু কুঁচকাইয়া বলিয়াছিল—মানে?

হাসিয়া কাহু বলিয়াছিল—ওর আবার মানে থাকে নাকি? মাথার দিব্যি মানে মাথার দিব্যি।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু কিসের জন্তে?

কাহু উত্তর দিয়াছে—সত্যি যদি আমাকে ভালবাস তো কিসের জন্তে তা পঞ্চায়েতের আসরে যেতে যেতে ঠিক মনে পড়বে।

সেতাব চটিয়া উঠিয়াছিল—হেঁয়ালী সে ভালও বাসে না, বুঝিতেও পারে না। অথচ এই কাহুর অভ্যাস। কাহুর স্পর্ধা একেবারে আকাশে ঠেকিয়াছে। গাঁয়ের অনেক মেয়ে আড়ালে আড়ালে বলে—মোড়লবাড়ির চাঁপাডাঙার বউ অহঙ্কারে যেন মটমট করছে। হেসে ঠেকার দিয়ে কথা কয় যেন বিন্দাবনের রাধা। সেতাবের মনে হইয়াছিল তাহারা মিথ্যা বলে না। সে উত্তরে বলিয়াছে—ভাল আমি কাউকে বাসি না; হ্যাঁ।

শুনিয়া কাহুর সে কি হাসি!—বেশ আর একবার বল—তিন সত্যি হোক।

—ক্যানে, মিছেমিছি তিন সত্যি করব ক্যানে? কি দায় পড়েছে!

সারাটা পথ সেতাব আপন মনে গজগজ করিতে করিতে আসিতেছে।

মজলিসের প্রান্তে গিয়া লণ্ঠন রাখিয়া প্রণাম করিল। তারপর মজলিসে গিয়া বসিল। বিপিন তাহাকে দেখিয়াই বলিল, এস বাবা। তোমার অপেক্ষাতেই বসে আছি। নাও, তামাক খাও। হুঁকোটা সে আর একজনকে দিল। সে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তি। সে সেতাবের দিকে আগাইয়া দিল। সেতাব হুঁকোটা লইয়া মজলিস হইতে সরিয়া গিয়া পিছন ফিরিয়া টানিতে বসিল। টানিতে টানিতে বলিল, তারপর? কি ঠিক হল সব?

বিপিন বলিল, এ দিকে তো গোল কিছু নাই। জমি মাপজোক, হিসেবকিতেব সে সব তো হয়েই আছে একরকম। রামকেষ্ট শিবকেষ্ট, আপন আপন পছন্দ করেও নিয়েছে। বাসনকোসন ভাগ কাল সকালে হবে। এখন দুই খুড়ী বলছে—আমাদের খাবার মত জমি বার করে দাও।

শিবকেষ্ট বলিল, খেতে দিতে আমরা নারাজ নই। কিন্তু জমি দিতে গেলে আমাদের থাকবে কি?

এক খুড়ী বলিল, তা বাবা, তোমাদের সঙ্গে কি বউদের সঙ্গে আমাদের যদি না বনে?

বিপিন বলিল, ও কথা অনেক হল বউমা। আর থাক্‌। আমার বাপু জমি দেবার মত নাই।

যে মাতব্বর হুঁকাটা লইয়া সেতাবকে দিয়াছিল সে বলিল, আমি বলি কি, একটা ধান বরাদ্দ করে দেওয়া হোক, দুজনে দুই খুড়ীকে দেবে। আর দুই খুড়ীর থাকবার মত দুখানা ঘর, রান্নাঘর।

বিপিন বলিল, তা মন্দ কথা নয়। সেতাব, বল বাবা, কি বলছ?

সেতাব হুঁকাটা লইয়া মজলিসের মধ্যে ফিরিয়া বলিল, লেন, খান। বিপিন হুঁকাটা লইল। সেতাব বলিল, আপনাদের উপর আমার কথা বলা ঠিক নয় জেঠা। তবু না বললেও নয়।

একজন বিধবা বলিল, বল বাবা, তুমি হক কথা বল।

—হক কথাই বলব, যেন রাগ-টাগ কেউ করবেন না। ধান ঘর এসব আমার মত নাই। দেখুন, দু বছর পর যদি ধান বন্ধ করে, কি কোন বছর যদি ভাল ফসল না হয়? দিতে না পারে?

বিধবা টিকুরীর খুড়ী বলিল, এই। বুদ্ধিগুণেই হা-ভাত, বুদ্ধিগুণেই খা-ভাত। পঞ্চায়েত বুঝে দেখুক!

ইন্দাশের খুড়ী সঙ্গে সঙ্গে সুর ধরিল, তার চেয়ে আমাদের দু জাকে পাঁচ বিঘে করে দশ বিঘে জমি আলাদা করে দাও বাবা, আমরাও নিশ্চিন্দি তোমরাও নিশ্চিন্দি। সাতখানা খাটের দড়িতে থাকব না।

—উঁহু-উঁহু। সেতাব ঘাড় নাড়িল।—সাতখানা খাটের দড়িতে থাকব না বললে কি হয় খুড়ী? তোমাদের মুখে আগুন দেবে ওরা, তোমাদের মুখে জল দেবে, শ্রাদ্ধ করবে ওরা। বুড়ো বয়সে অসুখ করলে ওদেরই তোমাদের সেবা করতে হবে। তোমাদের শ্বশুর-স্বামীর বংশ। ভাশুরের ছেলে, স্বামীর ভাইপো। তোমাদের গর্ভের সন্তান নাই; ওরাই তোমাদের সন্তান। আমি বলি, জমি দেওয়াও নয়, ধান দেওয়াও নয়, দুই খুড়ী দুই ভাশুরপোর ঘরে মায়ের মতন থাকবে, তেমনি যত্ন-আত্যি করবে, নাতিনাতনী নিয়ে ঘর করবে, এরা সেবা করবে, ছেদ্দা-ভক্তি করবে, বাস্।

বিপিন বলিয়া উঠিল, ভাল ভাল ভাল। এর চেয়ে আর ভাল কথা হতে পারে না। গোবিন্দ! গোবিন্দ! হরিবোল হরিবোল!

সেতাব বলিল, পৃথক হলেই পৃথক। মা বেটায় পৃথক হলে মা বেটা পর হয়। আবার পরকে আপন করলে পরই আপন হয়। শিবকেষ্ট রামকেষ্ট পৃথক হচ্ছে, কেন হচ্ছে জানি না। তা হচ্ছে হোক। কিন্তু তোমরা খুড়ীরা দু ভাগকে চার ভাগ করে সংসারটার সর্বনাশ করে দিয়ো না।

অন্য একজন বলিল, বাস্ বাস্। এর ওপর আর কথা নাই। হরিবোল হরিবোল!

আর একজন বলিয়া উঠিল, তাই বটে। হরিবোল হরিবোল!

মজলিসের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল।

ওদিকে ঠিক এই সময়ে বাহিরের রাস্তা হইতে কোন একজনের চীৎকার শোনা গেল—

বিচার করুক পঞ্চায়েত, এর বিচার করুক। গরীব বলে আমার মান-ইজ্জত নাই? পঞ্চায়েত—

বলিতে বলিতেই গায়ের চাদরখানা কোমরে জড়াইতে জড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইল রাখাল পাল। বিশ্বামিত্রের মত ক্রোধী শীর্ণকায় রাখাল আসিয়া বসিয়াই মাটিতে একটা চাপড় মারিয়া বলিল, পঞ্চায়েত এর বিচার করুক। মজলিসটা স্তব্ধ হইয়া গেল।

সেতাব বলিল, কিসের বিচার রে বাপু? হঠাৎ যে একেবারে গগন ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলি!

রাখাল বলিল, চেঁচাবে না? আলবত চেঁচাবে। পঞ্চায়েত বিচার করবে কি না বলুক!

বিপিন মোড়ল এবার বলিল, কি হল তাই বল?

—আমাকে মারলে। ঠাস করে এক চড়! এই গালটা দেখ, পাঁচটা আঙুলের দাগ বসেছে।

সে লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া নিজের গালের পাশে ধরিল।

—আঃ তাই তো রে; কে মারলে?

—ওই ওরই ভাই। সে আঙুল দিয়া সেতাবকে দেখাইয়া দিল।

—মহাতাপ? সেতাব প্রশ্ন করিল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ।

সেতাব মাথা হেঁট করিয়া বলিল, কি বিপদ হয়েছে যে আমার!

বিপিন প্রশ্ন করিল, এমনি মারলে তোকে মহাতাপ? মহাতাপ রাগী বটে, খানিকটা অবোধও বটে, কিন্তু এমনি কেন তোকে মারবে রাখাল?

—নাম সংকেত্তনের দলে আমি বাজাচ্ছিলাম। রাখাল পালের সঙ্গে খোলে কে হাত দিতে পারে বলুক পঞ্চায়েত। আমি হাঁক মেরে বলছি, পাঁচখানা গাঁয়ে কে আছে তা বলুক।

—নাই। তাই হল। সে কথা থাক। কি হল তাই বল।

রাখাল বলিল, তাই হল নয়। ডাক কে আছে? ডাক। একটু চুপ করিয়া রহিল। বোধ করি, কেহ তাহার এই আত্মশ্লাঘার উত্তরে সাড়া দেয় কিনা দেখিবার জন্যই চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমাকে বলে, তাল কাটছে। নিজে ভাঙ খেয়ে তাল কাটছে। তার ঠিক নাই। আমি বললাম, তোর কাটছে। তা গায়ের জোরে বলে, না, তোর। আমি বললাম, মহাতাপ, ক্ষ্যাপামি করিস তোর বউয়ের কাছে বউদির কাছে, এখানে করিস না। এই আমার গালে বসিয়ে দিলে এক চড়।

বিপিন বলিল, তুই বউ বউদির কথা তুললি কেন?

—কি, হয়েছে কি? বলি তাতে কি হয়েছে কি? তোমরা বিচার করবে কি না বল?

সেতাব বলিল, হবে। বিচার হবে নিশ্চয় হবে। বস্ তুই। আগে এই কাজ শেষ হোক। তারপর হবে।

—তারপর হবে?

হ্যাঁ। বস্ তুই।

—বসব? বসতে হবে?

—হ্যাঁ রে, তামাক খা।

—নেহি মাংতা হ্যায়। চাই না বিচার আমি। চাই না।

বলিয়া রাখাল হনহন করিয়া চলিয়া গেল। বাহির হইতে বলিল, বড়লোক কি না? নিজের ভাই কি না? বেমক্কা চড় খেয়ে যদি মরে যেতাম আমি?

বিপিন বলিল, গাঁজা খেয়ে খেয়ে রাখালের মেজাজে আগুন ধরেই আছে। মহাতাপকে সাবধান কোরো সেতাব। ভাঙ খেতে ওকে দিয়ো না।

সেতাব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমার হয়েছে মরণ। বুঝলেন? আমার কথা কি শোনে?

—চাঁপাডাঙার বউমাকে বোলো, তাকে খুব মানে শুনেছি।

হঠাৎ সেতাব বলিয়া উঠিল, আমি যাই, হতভাগাকে একবার দেখি—

—বোসো, বোসো। মাপ্পা খারাপ কোরো না। এদের কাজটা সেরে দাও বাবা।

সেতাব আবার বসিল। বলিল, এর আর সারাসারি কি বলুন? দুই খুড়ী দুই ভায়ের ভাগ। কে কাকে নেবে বলুক। খুড়ীরাও বলুক।

যে ব্যক্তি সেতাবকে হুঁকা দিয়াছিল সে বলিল, ছোট খুড়ী ইন্দেশের বউ তো ছোট ভাই রামকেষ্টর সম্পর্কে শাশুড়ী হয়। রামকেষ্টর বউ তো ভাইঝি হয়।

রামকেষ্ট বলিল, তা হোক। ছোট খুড়ীর টান দাদার ছেলেদের ওপর। ভাইঝিকে দশটা কড়া কথা না বলে জল খায় না।

ইন্দেশের বউ বলিয়া উঠিল, আর তোমার বউ মুখে ময়দা লেপে চুপ করে শোনে, না? একেবারে ভাল মানুষের পিত্তিমে। আমাকে বলে না? বলে কি বাবা সকল—তবে ভাইঝির গুণের কথা বলি শোন। লুকিয়ে চাল ধান বেচে পয়সা করে। আমি বলি, সাজার সংসারে চুরি করিস না। ভাগী ভাঁড়িয়ে খেতে নাই। তাই রাগ বাবা। সেদিন নিজের ছেলেকে একটা বাঁশি কিনে দিলে। তা শিবকেষ্টর ছোট ছেলেটা কাঁদতে লাগল। আমি বললাম, একেও একটা কিনে দে। পয়সা তো সাজার সংসারের পয়সা, মুখ বেঁকিয়ে চলে গেল। আমি বাবা তাকে একটা বাঁশি কিনে দিয়েছি। হ্যাঁ, তা দিয়েছি। ছেলেটা আমার কাছে থাকতে ভালবাসে। এই রাগ।

সেতাব বলিল, বেশ বেশ। তা হলে খুড়ী শিবকেষ্টর সংসারেই থাকবে।

—তাই থাকব। সেই ভাল।

—আর মেজ খুড়ী টিকুরীর বউ রামকেষ্টর সংসারে থাকবে। বুঝলে গা খুড়ীরা?

টিকুরীর খুড়ী বলিল, বুঝলাম বাবা, খুব বুঝলাম। এমন বোঝা আর বুঝি নাই কখনও। আঃ মরি মরি মরি।

—তার মানে?

—মানে ? তুমি বাবা দুমুখো সাপ। এক মুখে কামড়াও এক মুখে ঝাড়। তাই হল। তোমরা পঞ্চায়েত, যা বলবে তাই হল।

বলিয়া সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সেতাব ডাকিল, খুড়ো! অ খুড়ো!

বিপিন বলিল, উঁহু উঁহু! ডেকো না। যাক। ভাগ করতে গিয়ে সবাইকে সন্তুষ্ট করা যায় না বাবা। থাক। এখন শিবকেষ্ট, রামকেষ্ট, ইন্দেশের বউমা, এই যা হল—তাতে তোমরা মোটামুটি খুশী তো ?

শিবকেষ্ট বলিল, আমার আপত্তি নাই।

—রামকেষ্ট ?

—আমি মশায় যা করে দেবেন তাতেই রাজী।

ইন্দেশের বউ বলিল, আমি মেনে নিয়েছি বাবা, আমি মেনে নিয়েছি।

সেতাব উঠিল। আমি তাহলে উঠলাম জেঠা।

বিপিন বলিল, তা তোমার সেটা কি করে হবে ? ঘোত্তনের সেইটা। ঘোত্তন তো আসে নাই।

সেতাব বলিল, সে—সে আমি ছেড়ে দিলাম। বুঝেছেন ? সে ছেড়ে দিয়েছি। মহাতাপ যখন ছেড়ে দিয়েছে, তখন ও-কথা থাক। তবে বলতে চেয়েছিলাম, ঘোঁত্তন আমাকে আঙুল দেখাবে ক্যানে ? বুঝেছেন ? আর পাগলকে শিব সাজাবার লোভ দেখিয়ে দশ টাকা চাঁদাই বা নিয়েছে ক্যানে ? তারই জন্যে। বলুন না দশজনে এ জোচ্চুরি কিনা! আচ্ছা, আমি চললাম জেঠা।

সে বাহিরে আসিয়া আবার একটি প্রণাম করিয়া লণ্ঠনটি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেতাব বাড়ির দরজায় আসিয়াই চাঁপাডাঙার বউয়ের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। বাড়ির ভিতরে চাঁপাডাঙার বউ কাহাকে তিরস্কার করিতেছে।

—তোমাদের দু ভায়ের জ্বালায় হাড়ে কালি পড়ে গেল। নিন্দে শুনে কান পচে গেল।

সেতাব দরজা খুলিয়া গোয়াল-বাড়িতে প্রবেশ করিল, তাহার পর খামার বাড়িতে ঢুকিল। এবার মহাতাপের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে বলিল, আমি তোমাকে জ্বালাব ? আমি তোমার হাড়ে কালি পড়ালাম ?

—পড়াও না ?

—কক্ষনও না। সে পড়ায় তোমার স্বামী—কুচুটে পাকাটি চামদড়ি কেপন—

—ছি ছি মহাতাপ!

—আর ওই ছোট বউ। ওই কুঁদুলী, ওই ঘ্যানঘেনানী, ওই দুষ্টু সরস্বতী।

মানদার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ও মা'গ—অ! বলে সেই দরবারে হেরে বউকে মারে ধরে। আমাকে নিয়ে পড়লে কেন ?

সেতাব বাড়ি ঢুকিয়াই আলোটি কমাইয়া দিয়া খামার-বাড়িতে চুপ করিয়া বসিল।

বাড়ির ভিতরে তখন মানদা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, খবরদার বলছি, আমাকে নিয়ে কথা বলবে না বলছি।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, মান্থ, তুই চুপ কর।

—কেন? চুপ করব কেন? আমাকে নিয়ে পড়ল কেন?

মহাতাপ বলিল, পড়বে না? তুই তো আজ আমাকে ভাঙ খাওয়ালি। তুই কিনে আনিয়ে বেটে সরবত করে রাখিস নি, বললি নি? বলুক বড়গিন্নি; সারাদিন ভূতের মত খাটো, বরাবরের অভ্যেস, না খেলে বাঁচবে কেন? ভাঙ খেলে আমার চড়াত করে রাগ হয়ে যায়। দিলাম চড়িয়ে রাখালের গালে।

—এখন রাখালের বউ গাল পাড়ছে শোন গিয়ে। যত শাপশাপান্ত একরত্তি মানিকের ওপর। কেন তুমি এমন করে মেরে আসবে?

—নিজে তাল কেটে আমাকে তালকানা বলবে কেন? আমি তালকানা? ও আমাকে বললে। আমি ছাড়ি না কাটি?

—হ্যাঁ, তুমিই তালকানা, তোমার তাল কেটেছিল, আমি বলছি। নাও, মার আমাকে দেখি।

—বড় বউ! ভাল হবে না বলছি!

—নাও, মার না।

—তুমি ছোট বউ হলে সে দিতাম এতক্ষণ।

মানদা ফোঁস করিয়া উঠিল, কই, মার না দেখি।

—দেখবি?

বড় বউ দাওয়া হইতে উঠানে নামিল,—কাল সকালে আমি চলে যাব তোমাদের বাড়ি থেকে। তোমাদের দুই ভায়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তারও হবে। মহাতাপের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমারও হবে। দুই ভাইয়ে যা খুশি করবে। এই রাতদুপুরে দুদিক থেকে দুই ভায়ের ওপর গাল পড়ছে। ওদিকে রামকেষ্টদের বাড়ি থেকে, এদিকে রাখালের বউ। আমি আর পারব না, আমি আর পারব না।

বলিয়া চাঁপাডাঙার বউ ঘরে ঢুকিয়া গেল।

মানদা বলিল, নাও, হল তো। গোসাঘরে খিল পড়ল তো। আর খাবেও না, সাড়াও দেবে না, কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে।

সেতাব এবার আসিয়া ঘরে ঢুকিল; সে আর থাকিতে পারে নাই। সে বলিতে বলিতেই ঢুকিল, একে বলে, এ তো বড় ফেসাদ! একে বলে, ঘোরালে লাঠি, ফেরালে কোঁতকা—সেই বিত্তান্ত! আরে বাপু, আমার অন্যায়টা কি হল? তুমি যা বললে, তাই করে এলাম। জমি ধান সব দেওয়া বাতিল করে দুই বউকে দুই ভায়ের ভাগে ভাগ করে দিলাম। তাতেই গাল দিচ্ছে টিকুরীর খুড়ী। রামকেষ্টরা নয়। তা আমি কি করব? ঘোঁতনার ওপর নালিশ তুলে নিলাম—

মহাতাপ উঠানে তার হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তোমার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হোক—চললাম আমি।

সেতাব ব্যস্ত হইয়া বলিল—অই—অই—ওরে, চললি কোথা? ওরে। অঃ, এ গোঁয়ার-গোবিন্দকে নিয়ে কি করি বল তো? ওরে। সেতাবও বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইতে মহাতাপ বলিল, সেই রাখলার কাছে চললাম। তার পায়ে ধরে নাকে খত দিয়ে নাকের চামড়া তুলে দিয়ে আসছি।

মানদা ব্যস্ত হইয়া ডাকিল, দিদি! দিদি! শুনছ?

বড় বউ আবার বাহির হইয়া আসিল।

মানু বলিল, ওই আবার গেল, বারণ কর।

—না। যাক। রাখাল প্রবীণ মানুষ, গাঁজা খায়, কিন্তু কখনও কারুর মন্দ করে না। ধার্মিক লোক। তার কাছে মাপ চেয়ে আসুক। রাখালের বউয়ের শাপশাপান্ত আর শুনতে পারছি না।

মানদা ফোঁস করিয়া উঠিল—আর টিকুরীর খুড়ীর শাপশাপান্ত? বড় মোড়লকে পাঠাও পায়ে ধরতে।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, বড় মোড়ল ন্যায়বিচার করে এসেছে মানু। অন্যায় তো করে নি। টিকুরীর খুড়ীই অন্যায় করে শাপান্ত করছে। সে শাপান্ত আমাদিগকে লাগবে না। আর সে গাল তো দিচ্ছে বড় মোড়লকে আমাকে। তা দিক, মানিকের অকল্যাণ না হলেই হল।

শিবকেষ্ট রামকেষ্ট পালদের বাড়ির একাংশে পথের ধারে দাওয়ার উপর বসিয়া টিকুরীর বউ উচ্চকণ্ঠে গাল দিতেছিল। কিছুদূরে শিবকেষ্ট রামকেষ্ট দাঁড়াইয়া আছে। আর কয়েকজন জুটিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ঘোঁতন রহিয়াছে। দাঁড়াইয়া জটলা করিয়া বিড়ি টানিতেছে।

পল্লীগ্রামে সেই ছড়ার মত বাঁধা গালি-গালাজ—অভিসম্পাত। তাহার বাঁধুনি বিচিত্র, সুর বিচিত্র।

টিকুরীর বউ বলিতেছিল, সব্বনাশ হবে, পথে দাঁড়াবে, ফকির হবে, জমিদার মহাজন ডুগডুগি বাজিয়ে যথাসব্বস্ব নীলেম করে নেবে। টিনের চাল ঝড়ে উড়ে যাবে, পাকা মেঝে ফেটে চৌচির হবে। সাপখোপের আড্ডা হবে। অকালে মরবেন, বিনা রোগে ধড়ফড়িয়ে যাবেন—অই আতুরী গিন্দেরী পরিবার চাঁপাডাঙার বউয়ের দশা আমার মত হবেন।

ওপাশ থেকে ঘোঁতন বলিয়া উঠিল, তা হবে না খুড়ী, তা হবে না। ও শাপ দিও না। ফলবে না, ফলবে না।

টিকুরীর বউ ফোঁস করিয়া উঠিল—কে রে, বলি তুই কে রে মুখপোড়া ড্যাকড়া? তুই কে?

ঘোঁতন হাসিতে হাসিতে আসিয়া দাঁড়াইল।—মুখখানা আমার কালো বটে খুড়ী, কিন্তু পোড়ে নাই ; মেচেতা পড়েছে। আমি ঘোঁতন।

—ও। ইংরেজী-পড়া বাবু, যাত্রার দলের কাপ। তা তুই তো বলবিই রে? তোকে ধান ছেড়ে দিয়েছে, নালিশ তুলে নিলে।

—নিলে সাধে! আমি ঘোঁতন ঘোষ। হোৎ-তা-তা লাঙল-ঠেঙানো বুদ্ধি নয় আমার! আমি কলকাঠি টিপতে জানি। পাঁকাল মাছের পেটে কেঁচোর বাসার খবর জানি আমি। বুঝেছ! আমার নামে নালিশ করবে?

—তুই আমার হয়ে একটা নালিশ ঠুকে দিতে পারিস? পাপয়ের দরখাস্ত না কি বলে। টাকাকড়ি লাগে না, অনাথ গরীব বলে।

—বললেই পারি। ঘোঁতন কাউকে ডরায় না।

—তা হলে বোস্। আমি গালটা দিয়ে নিই। মনের ঝালটা মিটিয়ে নিই।

—তা লাও। ওদিকে রাখালের বউও খুব জুড়েছে—ওলাউঠো হবে, না হয় তো রাজকাশ হবে। লোহার গতর ভেঙে যাবে। ছেলে মরবে। বউ ভিক্ষে করবে—

সুর ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে টিকুরীর বউ শুরু করিল, করবে, ভিক্ষে করবে, দোরে দোরে হরিবোল বলে ওই চাঁপাডাঙার বউ—

হঠাৎ চমকিয়া টিকুরীর বউ বলিল, কে র‍্যা?

অন্ধকার পথে একটা ডুলী মাথায় করিয়া যাইতেছিল নোটন।

—আমি গো, নোটন।

—নোটনা। তা মাথায় কি? ডুলী নাকি? এত রেতে ডুলী নিয়ে কি করবি?

—হ্যাঁ গো। আকের জমিতে ছেঁচন দিতে হবে।

শিবকেষ্ট বলিল—চুপ কর খুড়ী। সেতাবদের কৃষেণ নোটন—ও সব শুনে গেল। বলবে তো গিয়ে সব মুনিব-বাড়িতে।

দুই হাতের বুড়া আঙুল নাড়িয়া বুড়ী বলিল—বয়েই গেল—বয়েই গেল। আমার বেগুন-বাড়ি ভেসে গেল! শুনবে! শোনবার জন্যেই তো বলছি! আমি কি ভয় করি নাকি কাউকে?

তখন সেতাবের বাড়িতে দাওয়ার উপর পিঁড়িতে বসিয়া রাখাল ভাত খাইতেছে। সঙ্গে বসিয়াছে—মহাতাপ ও সেতাব। পরিবেশন করিতেছে চাঁপাডাঙার বউ। সে অম্বল পরিবেশন করিতেছিল। সকলেই তালুতে টোকা মারিয়া খাইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছিল, আঃ!

রাখাল বলিল, আর একটু দাও, বউমা, আর একটু! বেড়ে রেঁধেছ! খাসা হয়েছে!

সেতাব বলিল, তা হলে কি হবে! কাঁচা তেলের গন্ধ উঠেছে। এত করে নাকি তেল দেয়! হুঃ?

মহাতাপ বলিল, তেল বেশি হয়েছে, তেল বেশি হয়েছে? তেল নইলে রান্না হয় নাকি?

রাখাল বলিল, আরে, ওই তেলেই তো অম্বলের সৈরভ···সুবাস! নেশার মুখে যা লাগছে, সে কি বলব, অমৃতের যেন। আর তেমনি কি রান্নার তাক! বেঁচে থাক মা সুখে থাক, সংসারের কল্যাণ হোক। খেয়ে মুখটা জুড়ল। পোড়া আর ধরা আলেক আর মুনচড়া খেয়ে জিভে যেন চটা ধরেছিল!

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, সব আমাদের ছোট বউয়ের রান্না।

—বা-বা-বা! বলিহারি বলিহারি! তা হবে না কেনে? মহাতাপ যে ছোকরা বড় ভাল, বড় ভাল ছোকরা! আমাকে বড় মেরেছে ভাঙের নেশার মুখে। তা মারুক! ভুল করেছে। আবার গিয়ে তো বললে—রাখালদাদা, দোষ হয়েছে। তা আমিও বললাম, বাস্ বাস্; ঠিক আছে। ভাগ্যে পঞ্চায়েতে নালিশ করি নাই! বুয়েচ, হাতের তীর ছাড়তে নাই। ছাড়লেই বাস্, ভ্যাঁক করে বিঁধে যাবে। তাই তো আমার পরিবারকে তখন থেকে বলছি—এমন করে গাল দিস না, দিস না। তা বুয়েচ, আমাকে মানুষ বলেই গণ্যি নাই। তোমরা কিছু মনে কোরো না—ওর কথায় কিছু হয় না। বুয়েচ? তা সেও ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। মহাতাপ বললে, খেতে হবে, আজই রেতে। তা আমি দোনোমনো করছিলাম, কিন্তু সে-ই বললে—সে কি, ডাকছে হাত ধরে, যাবে না কি? বুয়েচ! তা পেট খুব ভরল। খুব।

মানদা আসিয়া দুধের বাটি নামাইয়া দিল।

—আবার কিঁ?

—দুধ।

এমন সময় বাহিরে ধম করিয়া একটা শব্দ উঠিল। সকলেই চকিত হইয়া উঠিল মহাতাপ খাবার ছাড়িয়া উঠিয়া লাফাইয়া নামিল।

—কে?

ওপাশ হইতে সাড়া আসিল, আমি গো ছোট মুনিব।

মহাতাপ বাহির হইয়া গেল।

খামার-বাড়িতে নোটন চুনীটা সশব্দে ফেলিয়াছে, শব্দটা তাহারই।

মহাতাপ বলিল—চুনী আনলি?

—না আনলে? তোমার মন তো বিন্দাবন, যদি বাঁশি বাজে তো রেতেই বলবে—চল্ যাব, লাগাব চুনী! তোমার কিলকে বড় ভয়!

—দাঁড়া রে বাবা, খোল কুটে রেখেছে কি না দেখি!

—সে বড় মোল্যান ঠিক রেখেছে। কাজে তার ভুল হবে না।

—আর খোল তো এসেছে কাল বিকেলে! আজ কুটলে কখন? বড় বউ—অ বড় বউ?

ফিরিয়া আসিয়া বাড়িতে ঢুকিল। তখন সেতাব-রাখালের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। তাহারা হাত মুছিতেছে।

রাখাল বলিতেছে, তা তুমি পালদের বাড়িটা ভাগ করে ভাল করেছ সেতাব। ঠিক করেছ। বউ দুজনাকে ভাগ করে দুজনার ঘরে দিয়েছ, ন্যায্য করেছ। হুঁ! তা নইলে জমি দিলে বেচে-ঘুচে পালাত। বেশ করেছ। তা হলে আমি যাই। বুয়েচ? আর ওই আমার পরিবারের গালের জন্তে কিছু মনে কোরো না। আমি ঠাণ্ডা, সেও ঠাণ্ডা। বুয়েচ? আমি চললাম। সে আসবে, কাল মহাতাপের বউ-ছেলেকে আশীর্বাদ করতে আসবে। বুয়েচ! বলিয়া পুলকিত হাস্তে স্মিতানন হইয়া উঠিল।

সে চলিয়া গেল। ওদিক হইতে আসিয়া মহাতাপ ঘরে ঢুকিল।

মহাতাপ হাঁকিয়া বলিল, বলি কানমে কেতনা ভরি সোনা পিঁধা হ্যায় বড় মোল্যান? বলি, আকের গোড়ায় দেবার খোল কাটা হয়েছে?

মানদা বলিয়া উঠিল, বিত্তোব দেখ! ষাঁড়ের মত চেঁচানি দেখ?

কথাটা অবশ্য সে চাপা গলাতেই বলিল, কারণ ভাশুর রহিয়াছে। কিন্তু কথাগুলা কাহারও কান এড়াইল না। এড়াইবার জন্য বলেও নাই সে।

মহাতাপ ফাটিয়া পড়িল, এ্যাও! কিল মেরে দাঁত ভেঙে দোব। সে আগাইয়াও গেল।

বড় বউ বাহিরে ছিল না। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মহাতাপের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, কি হচ্ছে, হচ্ছে কি?

মহাতাপ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বড় বউ বলিল—মারবে! কেন মারবে শুনি?

মহাতাপ বলিল, তোমাকে নয়। ওই দুষ্টু সংস্বতীকে।

মানদা বলিয়া উঠিল, বটে! আমি বুঝি বানে ভেসে এসেছি?

—আরে, তুই আমাকে ষাঁড় বললি কেনে?

বড় বউ বলিল, তুমি ওকে দুষ্টু সরস্বতী বলবে কেন? আর ষাঁড় তো ভাল কথা। বাবা শিবের বাহন। মা দুর্গার সিংহ তার কাছে পারে না।

—আমাকে বোকা বোঝাচ্ছ তুমি!

—না। তাই পারি? বোসো, ঠাণ্ডা হয়ে বোসো। এখন কি বলছিলে বল? কানে কত ভরি সোনা পরেছি, না—কি?

মানদা বলিয়া উঠিল, শুধাও না, কত ভরি দিয়েছে?

মহাতাপ বলিল, সে ওই কেপনকে বলবে। কেবল ধান বেচেছে, গুড় বেচেছে আর টাকা করেছে।

সেতাব আর পারিল না। বলিল, তুমি দাতাকর্ণ হয়ে লোককে পাওনাগণ্ডা ছেড়ে দিয়ে আসছ! এমনি করলে, খাবে—দু হাতের বদলে চার হাতে খাবে।

মহাতাপ উত্তর না পাইয়া হঠাৎ মাটিতে চাপড় মারিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, আমার খোল কোটা হয় নাই কেনে? আমার আকের জমিতে ছেঁচন দিতে হবে। তার আগে খোল না দিলে, আবার সেই এক মাস পর ভিন্ন হবে না। কেনে খোল কোটা হয় নাই?

নেতাব বলিল, হবে রে হবে। ব্যস্ত হোস না। দু-তিন দিন দেরি হলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

কাদম্বিনী বলিল, কাল পরশু দু দিনে আমি কুটিয়ে দোব। তুমি খেপো না। আর ছেঁচন দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি কোরো না। জল নামবে। দু-তিন দিনের মধ্যেই নামবে।

—নামবে! তোমার হুকুমে নামবে! আকাশ খাঁ-খাঁ করছে। জ্বলে গেল সব।

—নামবে। গরম দেখছ না? তারপর ওই দেখ। লণ্ঠনটা হাতে লইয়া সে দেওয়ালের গায়ে আলো ফেলিয়া অন্য হাতের আঙুল দিয়া দেখাইল—মেঝে থেকে পিঁপড়েরা ডিম মুখে করে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

দেখা গেল, সারি বাঁধিয়া লক্ষ পিঁপড়া উপরে উঠিয়া চলিয়াছে।

বড় বউ বলিল, শুধু এক জায়গায় নয়, আজ আমি পাঁচ-সাত জায়গায় দেখেছি।

—আ—ত তেরি তোম তেরে না। বলিয়া মহাতাপ একটা লাফ দিয়া উঠিল; তারপর বলিল, দাদা, বোসো বোসো। তামুক সাজি।

বলে কলকে লইয়া তামাক সাজিতে বসিল।

বড় বউ ডাকিল, মানু আয় খেয়ে নিবি।

বড় বউয়ের দেখায় ভুল হয় নাই। রাত্রে সত্য সত্যই জল নামিল। গুরু-গুরু শব্দে মেঘগর্জনে মহাতাপের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

মানু তখন উঠিয়া পড়িয়াছে। সে ঘরের জানালা বন্ধ করিতে ব্যস্ত।

মহাতাপ সদ্য-ঘুম-ভাঙা চোখে বিহ্বলের মত চাহিয়া বলিল, জল? মেঘ ডাকছে?

মানু বলিল, ছাটে সব ভিজে গেল।

মহাতাপ বলিল, যাক যাক। বন্ধ করিস না মানু, বন্ধ করিস না।

—বন্ধ করব না?

—না। আহা-হা, কেমন জল নেমেছে দেখ দেখি!

উঠিয়া গিয়া মানুর হাত ধরিল। বলিল, বোস এইখানে। বসে বসে জল দেখি।

মানু ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, জল দেখব?

—হ্যাঁ। আমার কোলে মাথা রেখে শো। আমি জল দেখি আর তোকে দেখি। হঠাৎ এই বর্ষার আমেজে তাহার আবেগ উথলিয়া উঠিল। সে দুই হাতে মানুর মুখখানি ধরিয়া বলিল, পাগলি পাগলি পাগলি! তোকে আমি খু-ব ভালবাসি।

—ছাই বাস। দিনরাত—মারব, মারব আর অকথা কুকথা!

—আরে! সে কথা তোকে না মানু, তোকে না। তোর ক্যাটকেঁটে কথাকে—

—হুঁ। বড় মোল্যানের কথাগুলা তো মিষ্টি লাগে! তার বেলা?

—আরে বাপ রে! দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া মহাতাপ বলিল, আরে বাপ রে, বড়কী বহু, উ তো ঘরকে লছমী হ্যায়।

মহাতাপ মানদাকে সজোরে বুকে চাপিয়া যেন পিষিয়া ফেলিল।

ওদিকে চাঁপাডাঙার বউয়ের ঘরে চাঁপাডাঙার বউ আপন ঘরের জানালায় একা বসিয়া বাহিরের বর্ষণের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

সেতাব মুড়িসুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। দুর্বলদেহ সেতাবের অল্পেই শীত লাগে। গ্রীষ্ম-কালেও সে একখানা চাদর পায়ের তলায় রাখিয়া তবে ঘুমায়। চাঁপাডাঙার বউ স্বামীর জড়োসড়ো ভাব দেখিয়া একটু হাসিয়া চাদরখানা তাহার গায়ে চাপাইয়া দিল। ও ঘরে মানিক কাঁদিয়া উঠিল। চাঁপাডাঙার বউ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে বর্ষা নামিয়া পড়িল। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষেই। কি যে হইয়াছে দিন-কালের —সে কথা কৃষিজীবী সাধারণ মানুষগুলি বুঝিতে পারিতেছে না। চিরকালের প্রবাদ—খনার বচন—'চৈতে মথর মথর, বৈশাখে ঝড়পাথর, জ্যৈষ্ঠে মাটি ফাটে—তবে জেনো বর্ষা বটে'। অর্থাৎ চৈত্রে আধা শীত আধা গরম, বৈশাখে কালবৈশাখী, জ্যৈষ্ঠে প্রখর গ্রীষ্ম—এই হইলে জানিবে সুবর্ষা অবশ্যম্ভাবী। আর এ ফাল্গুনের শেষ হইতেই গরম উঠিতেছে; চৈত্রে বৈশাখে মারাত্মক রৌদ্র, কালবৈশাখী নাই! কদাচিৎ এক-আধ পশলা বর্ষা ঝড়; শিলাবৃষ্টি তো নাই। তারপর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে হঠাৎ বর্ষার মেঘ গুরু গুরু ডাকিয়া চলিয়া আসিতেছে। চাষীদের বীজ পাড়া হইতেছে না। বর্ষা তাহাদিগকে বেকুব করিয়া দিয়া বিদ্যুতের মৃদু মৃদু চমকে যেন সকৌতুকে হাসিয়া তামাশা করিতেছে। মহাতাপ বর্ষার মেঘকে নিত্য গালি পাড়ে। সে বিপুল বিক্রমে মাঠে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। শুকনো ধুলার বাতে বীজ পাড়া হইয়াছে সামান্য। বাকি বীজ আছাড়া করিয়া ফেলিতে হইবে। দশ দিনের মধ্যে সে কাজ শেষ করিয়া মহাতাপ জমিতে জল বাঁধিয়া লাঙল চালাইতে লাগিয়াছে। সেতাবও এখন মাঠে। সে কখনও খানিকটা কোদাল চালায়। কখনও এক-আধবার লাঙলের মুঠা ধরে। আলের উপর বসিয়া তামাক সাজে, নিজে খায়। মহাতাপকে ডাকিয়া হাতে হুঁকা দিয়া তাহার লাঙলটা গিয়া ধরে।

মহাতাপ বলে—ক্যাপামি কোরো না। মোষের লেজের বাড়িতে তুমি পড়ে যাবে। মহাতাপ দুইটি বিপুলকায় মহিষ লইয়া লাঙল চালায়।

নোটন কৃষাণ মুখ টিপিয়া হাসে। মিথ্যা বলে নাই ছোট মনিব। বড় মনিব তাহার তালপাতার সেপাই।

সেদিন আষাঢ়ের পনেরোই। গত দুই-তিন দিন মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছিল। মাঠ-ঘাট প্রায় ভাসিয়া গিয়াছে। সকালবেলাটাও ঘনঘটা হইয়া রহিয়াছে। টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। চাঁপাডাঙার বউ দাওয়ার উপর আঁচল বিছাইয়া শুইয়া অলস দৃষ্টিতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। মানিক একটা বাটিতে মুড়ি খাইতেছে।

মানদা ভিজিতে ভিজিতে এক পাঁজা বাসন লইয়া বাড়িতে ঢুকিল। ঝুম করিয়া দাওয়ার উপরে রাখিয়া আবার প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবার উদ্যোগ করিল।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, মানু—

—আসছি।

—যাচ্ছিস কোথা নাচতে নাচতে ?

—মাছ।

—মাছ !

—মাছ উঠেছে পুকুর থেকে। ছোট ছোট পোনা।

—পোনা বেরিয়ে যাচ্ছে ? গোবিন্দকে পুকুরের মুখে বার দিতে বল্।

—তুমি বল। আমি মাছ ধরে নিয়ে আসি। সোঁ-সোঁ করে নালার জলে ছুটছে সায়বন্দী।

সে বাহির হইয়া গেল।

মানিক দাঁড়াইয়া উঠিল—আমি যাব। সে তাহার সাধের বাঁশিটা লইয়া একবার বাজাইয়া দিল—পু!

বড় বউ তাহাকে কোলে লইয়া মাথাল মাথায় দিয়া উঠানে নামিল। নহিলে যে দুরন্ত ছেলে—জলে ভিজিয়া নাচিয়া-কুঁদিয়া একাকার করিবে। মহাতাপের ছেলে তো! খামার-বাড়িতে আসিয়া ডাকিল, গোবিন্দ! গোবিন্দ!

মানিক বাঁশি বাজাইল—পু-পু। খামারে গোবিন্দ নাই। নিশ্চয় বর্ষার আরামে গোয়ালের দাওয়ায় খড়ের গাদা বিছাইয়া শুইয়া ঘুম দিতেছে। ছোঁড়াটা ইদানীং বড় কাজে ফাঁকি দিতেছে। কোন দিন সন্ধ্যার সময় থাকে না। সন্ধ্যার আগেই গোরু গোয়ালে ঢুকাইয়া পালায়। তাও দুটা একটা বাছুর বাহিরে ফেলিয়া যায়।

সে গোয়াল-বাড়িতে আসিয়া ঢুকিল।

গোবিন্দ ঘুমায় নাই। সে গোরুর চালায় দাঁড়াইয়া কোমরে হাত দিয়া নাচ প্র্যাক্‌টিস করিতেছিল। সে ইহারই মধ্যে ঘোঁতনের যাত্রার দলে ভর্তি হইয়াছে। আপন মনেই সে—এক দুই তিন, এক দুই তিন চার গনিয়া গনিয়া নাচিতেছিল।

চাঁপাডাঙার বউ ডাকিল, গোবিন্দ!

তালভঙ্গের অপরাধে অপরাধীর মত গোবিন্দ দাঁড়াইয়া গেল।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, ও কি হচ্ছে ? অ্যাঁ ?

গোবিন্দ জিভ কাটিয়া মাথা হেঁট করিল। মানিক বাঁশিটা বাজাইয়া দিল—পু।

—বলি ক্ষেপলি নাকি ? নাচছিস আপন মনে ?

—উঁ কিছু নয়। কি বলছ ? মাথা চুলকাইতে লাগিল।

—কিছু নয়! এক দুই তিন, এক দুই তিন—বলে নাচছিলি আর বলছিস—কিছু নয় ?

এবার গোবিন্দ বলিল, নাচ শিখছিলাম গো। যাত্রার দলে সখী সাজব কিনা। তাও এখন কি বলছ বল।

—যাত্রার দলে সখী সাজবি ? তা হলে সে খুব যাত্রার দল।

—উহু! ঘোঁতন ঘোষ মশায়ের দল। দেখবে এবার কেমন গায়েন করে! হুঁ।

—ঘোতন ঘোষের দলে ঢুকেছিস ?

বড় বউ স্থির দৃষ্টিতে ছেলেটার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ধারণা করিতে চেষ্টা করিল, ব্যাপারটা কি ? তাহার যেন একটা সন্দেহ হইল।

রাখালটা অস্বস্তিতে পড়িয়াছিল। সে বলিল, বল, ক্যানে গো!

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, শাওন মাস থেকে তোর জবাব হল গোবিন্দে। তোকে আর কাজ করতে হবে না। মাসের শেষে মাইনে—। বলিয়াই মনে হইল—গোবিন্দ মাইনে পাইবে না। পূজা পর্যন্ত তাহার মাহিনা সে অগ্রিম লইয়া রাখিয়াছে। আবার একবার তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—এইজন্যেই তুই সন্ধ্যার আগে পালাস ? আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ঘোঁতন তোকে আমাদের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করে, না গোবিন্দে ? কি জিজ্ঞাসা করে ?

গোবিন্দ কিছু বলিবার পূর্বেই ছোট বউ এক আঁচল মাছ লইয়া প্রবেশ করিল। —অ দিদি! পাড়ার ছেলে জুটে সব ধরে নিলে মাছগুলো। থলবল করে বেড়াচ্ছে—এক শো, দু শো—

—করুক। তুই তো নেচেকুঁদে এলি জলে কাদায়।

—এই দেখ কত মাছ ধরেছি!

আঁচল খুলিয়া সে ঝরঝর করিয়া মাছগুলো ফেলিয়া দিল। মানিক বাঁশিটা বাজাইয়াছিল। নেহাত ছোট মাছ নয়, গত বছরের পোনা—কোনটা একপোয়া কোনটা তিন ছটাক। কাতলাগুলো পাঁচপোয়া হইয়াছে।

চাঁপাডাঙার বউ ঘোঁতনের কথা বাদ দিয়া গোবিন্দকে বলিল, গোবিন্দ, শিগ্‌গির যা যতক্ষণ আছিস কাজ করতে হবে তো। যা।

পুকুরটা ভাগের পুকুর। তবে সেতাবদের অংশই বেশি। সেতাব কিনিয়া কিনিয়া অংশটাকে প্রায় দশ আনার কাছাকাছি করিয়া ফেলিয়াছে। পুকুরটা তাহার বাড়ির কাছে, হেফাজত করিতে সে-ই করে। সেতাবের পর মোটা অংশ বিপিন মোড়লের ; প্রায় সোয়া তিন আনা অর্থাৎ পাঁচ ভাগের এক ভাগ। অবশিষ্ট এগার পয়সার মধ্যে ভাগী আছে অনেক কয়জন। রামকেষ্ট এবং শিবকেষ্টর তিন পয়সা রকমের ভাগ আছে। সেটা অবশ্য সেতাবের কাছে ঋণদায়ে আবদ্ধ। শিবকেষ্টর ভাগের খুড়ী টিকুরীর বউ 'মাছ বাহির হইতেছে এবং ছেলের পাল মাছ ধরিতেছে' সংবাদ পাইয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ছুটিয়া আসিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া ছেলের দলের উপর গালিগালাজ বর্ষণ করিতে শুরু করিল।

—বলি অ ড্যাকরারা, অ আল্‌পেয়েরা, অরে অ আবাগেরা, আবাগীর পুতেরা, বলি পরের লুটেপুটে খেয়ে কদ্দিন বাঁচবি রে ? ওলাওঠো হয়ে মরবি রে, ধড়ফড়িয়ে মরবি। পুকুরে শিবকেষ্টর দেড় পয়সা অংশ, আমার দেড় পয়সা ভাগ দিয়ে যা বলছি। বলি পালাচ্ছিস

যে! আমি বুঝি দেখতে পাচ্ছি না? আমার চোখ নাই? ঢেলা ছুঁড়ে মারব, ঢেলা ছুঁড়ে মারব বলছি। পরের পুকুরের মাছ বেরিয়েছে—বড় মজা, ভাজা খাবি, ঝোল খাবি, অম্বল খাবি, খাবি খেয়ে মরবি, ওলাউঠা হয়ে মরবি, অম্বলশূল হবে—

কয়েকটা ছেলে পথের ধারের গাছের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছিল। তাহাদের দেখিয়া টিকুরীর বউ বলিল, যাবি কোথা? পথ আগলে দাঁড়িয়েছি আমি। দে বলছি আমার ভাগের মাছ, দে।

একটা ছেলে তাহাকে জিভ কাটিয়া ভ্যাঙচাইয়া বলিল, দে! দে বললেই দেব? মাঠে মাছ ধরেছি; তোমাদের পুকুরের মাছ তা কে বললে? গায়ে নেকা আছে?

—ওরে খালভরা! নেকা নাই, কিন্তু মাছগুলো কি আকাশ থেকে পড়ল?

—তা কি জানি? ওই তো বড় মোড়লের মোটা ভাগ, তাদের ছোট বউ তো কিছু বললে না?

আর একটা ছেলে বলিল, সি এক আঁচল ধরে নিয়ে গেল—সের দরুনে।

টিকুরীর বউ এবার জ্বলিয়া উঠিল। অ্যা! ওরা নিয়ে গেল? যাই, আমি যাই একবার। আগে তোরা মাছ দিয়ে যা। দে—দে—মাছ দে। দে।

হঠাৎ একটা বড় গাছের আড়াল হইতে রাখাল পাল বাহির হইয়া আসিয়া আঁচল হইতে মাছ কয়েকটা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, ওই লে। লে তোর মাছ!

টিকুরীর বউ তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু গাছকোমর বাঁধা কাপড় খুলিল না। সে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। অ মাগো! এ কে গো? পালেদের ফাকলা?

—ফাকলা! আমার নাম ফাকলা? ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল রাখাল।

—তা ভাশুরের নাম করব নাকি?···তুই যে সম্পর্কে ভাশুর হস মিন্‌সে। বুড়ো মিন্‌সে ছেলের পালের সঙ্গে মাছ ধরতে এয়েছে! নোলাতে ছেঁকা দাও গিয়ে!

রাখাল মুহূর্তে ধ্বনির প্রতিধ্বনির মত জবাব দিল—গরম গরম মাছভাজা খেয়ে তুমি নোলাতে ছেঁকা নিয়ো মা, তুমি ছেঁকা নিয়ো। নোলাতে আরও গাল ফুটবে, তপ্ত খোলায় খইয়ের মত ফুটবে।

হনহন করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে রাখাল আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, মরে তুমি মেছো পেত্নী হবে, মাছ মাছ করে বিলে বিলে চবাং চবাং করে ঘুরে বেড়াবে, সারা অঙ্গে জোঁক ধরবে। তা আমি বলে দিলাম। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ছেলেগুলা এই অবসরে সুটসুট করিয়া পালাইতেছে। টিকুরীর বউ এবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল, মাথায় সে এতক্ষণে ঘোমটা দিতে পারিয়াছিল এবং রাখাল পালের গমনপথের দিকে চাহিয়া বলিল, মরে যাও, তুমি মরে যাও, অপঘাতে যাও, মাছ বলে সাপ ধর, সাপের কামড়ে জ্বলে পুড়ে মর। পেরেত হও। আপন জ্বালাতে তুমি দাপাদাপি করে বেড়াও।

মাছ কয়টা কুড়াইতে সে কিন্তু ভুলিল না। মাছ কয়টা কুড়াইতেছিল। এমন সময়

মাঠের খাবার লইয়া বড় বউ বাড়ি হইতে বাহিরে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, কি হল গা টিকুরীর খুড়ী?

মাছ কুড়াইতে কুড়াইতেই মুখ তুলিয়া চাঁপাডাঙার বউকে দেখিয়া টিকুরীর খুড়ী বলিল, এই যে! মোড়ল-গিন্নী! ভামিনী আমার!

মাছ কুড়াইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বলিল, তোমাদের ছোট বউ নাকি সাজার পুকুরের পাঁচ সের মাছ ধরে ঘরে ঢুকিয়েছে?

চাঁপাডাঙার বউ অবাক হইয়াও হাসিয়া কৌতুকভরে বলিল, পাঁচ সের? দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করলে কে খুড়ী?

—দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করলে কে খুড়ী! ওজন করবে কে? বলি ওজন করবে কে? আমি কি মেছুনী নাকি?

চাঁপাডাঙার বউ এবার বিব্রত হইল, সে জানে ইহার জের অনেক দূর যাইবে। সে তাই বলিল, সে আবার কখন বললাম তোমাকে?

—বললে না? তো কি বললে? ও-কথার মানে কি হয়?

—তা জানি না। ছোট বউ কতকগুলো মাছ ধরে এনেছে। মাঠে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে মাছ ঘরে আছে, তোমার ভাগ তুমি নিয়ে যাও।

—যাবই তো। ভাগের ভাগ হকের ধন। এ আমার ভাইকে ফাঁকি দিয়ে পুঁটলি-বাঁধা ধন নয়! নেবই তো ভাগ।

—কি বলছ খুড়ী যা-তা?

—ঠিক বলছি। দেওর-সোহাগী, দেওরকে সোহাগের মানে আমরা বুঝি না, না? কিন্তু ওতে নিজেই ফাঁকি পড়ে, বলি, ঠকিয়ে জমানো ধন ভোগ করবে কে? বলি হল একটা কোলে? ওই জন্যেই ছেলে নেন', যেমন সেতাব—তেমনি তুমি।

এবার চাঁপাডাঙার বউ গম্ভীরভাবে বলিল, থাম টিকুরীর খুড়ী।

টিকুরীর খুড়ী থামিয়া গেল। চমকাইয়া উঠিয়াই থামিল। চাঁপাডাঙার বউয়ের কণ্ঠস্বরে যেন কি ছিল; সে যেমন অলঙ্ঘনীয়—তেমনি ভর্ৎসনাপূর্ণ।

সেই কণ্ঠস্বরেই চাঁপাডাঙার বউ বলিয়া গেল, তুমি যা বললে তা যদি সত্যি হয়, তবে ভগবান আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত করেন। আর যদি মিথ্যা হয় তারও বিচার তিনি করবেন। কোন শাপান্ত আমি করব না।

ফিরিল সে, ফিরিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, মানু! মানু!

মানু বাড়ির ভিতর হইতেই সাড়া দিল, কি বলছ?

—এই টিকুরীর খুড়ীকে ওদের মাছের ভাগ দিয়ে দে। যাও খুড়ী, তোমার ভাগ তুমি নাও গে। মানুও সে মূর্তি সেথায় দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। কোন একটা কথাও মুখে ফুটিল না। মাছ সে বড় ভালবাসে। সেই মাছ ফেরত দিবার আদেশের বিরুদ্ধেও কোন কথা তাহার ফুটিল না।

কথা কটা বলিয়া চাঁপাডাঙার বউ আবার ফিরিল এবং আপন পথে গরবিনীর মতই চলিয়া গেল।

গ্রাম্যপথে তখন চাষীর ঘরের মেয়েরা স্বামী-পুত্রের বাপ-ভাইদের খাবার লইয়া মাঠে চলিয়াছে। কাঁকালে ঝুড়ির মধ্যে কাঁসার খোরায় মুড়ি গুড় ইত্যাদি। বৃষ্টিতে যাহাতে সেগুলি ভিজিয়া না যায়, তাহার জন্য তাহার উপর আর একটি ঝুড়ির আবরণ। এক হাতে জলের ঘটি। তাহারা আগে চলিতেছে। চাঁপাডাঙার বউয়ের আজ দেরি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও সে চলিবার গতি ত্বরিত করিতে পারিতেছে না। তাহার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিতেছে, গা যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে। টিকুরীর খুড়ী তাহার বুকে যেন শেল ছুঁড়িয়া মারিয়াছে। সে আঘাতে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। সব বল যেন ফুরাইয়া গিয়াছে। সে গ্রামপ্রান্তরের একটা গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। আর চলিতে পারিবে না।

পিছন হইতে একটি মেয়ে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। চাঁপাডাঙার বউ মাঠের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বেদনার্ত অন্তরের সঙ্গে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বোধ করি একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। মন এমন ক্ষেত্রে শূন্য বিস্তৃতির দিকে চাহিয়া সান্ত্বনা পায়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল কাদম্বিনী। এই বিস্তীর্ণ জলভরা মাঠও মাস-খানেকের মধ্যে সবুজ ফসলে ভরিয়া উঠিবে না!

মেয়েটি তাহাকে দেখিয়া বলিল—বড় মোল্যান!

চাঁপাডাঙার বউ মুখ ফিরাইল। ইহার মধ্যে কখন তাহার চোখ হইতে জলের ধারা গড়াইয়া আসিয়াছে।

মেয়েটি সবিস্ময়ে বলিল, কাঁদছ তুমি বড় মোল্যান?

চাঁপাডাঙার বউয়ের খেয়াল হয় নাই যে, তাহার চোখ হইতে জল গড়াইতেছে। কথাটা শুনিয়া সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চোখ মুছিতে চেষ্টা করিল। দুই হাত আবদ্ধ, কাজেই মুখখানি নিজের কাঁধের কাপড়ে গুঁজিয়া চোখের জল মুছিয়া লইতে চাহিল।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, কি হল গো মোল্যান?

বিষণ্ণ হাসিয়া চাঁপাডাঙার বউ বলিল, বড় মাথা ধরেছে মা। শরীরটা কেমন করছে আমার।

সে আবার মুখ ফিরাইল।

সামনেই বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র। বর্ষণের মধ্যে কর্ষণ চলিয়াছে। মাঠে মাঠে হালগোরু আর মানুষ। চাষীর পেশীবহুল দেহ সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, গোরুগুলি কাঁধ টান করিয়া লাঙল টানিয়া চলিতেছে। কতক লোক আলের উপর কোদাল কোপাইয়া চলিয়াছে। বীজক্ষেতের মধ্যে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বীজচারা তুলিতেছে।

মধ্যে মধ্যে বীজের বোঝা মাথায় করিয়া চাষী চলিয়াছে রোয়ার ক্ষেত্রের দিকে। পরিপাটি কাদা-চাষ-করা-জমিতে মেয়ে-পুরুষ মিলিয়া ধানচারা রোপণ করিতেছে। চারিদিকে

ব্যাঙের কোলাহলে মুখর। কাদা-চাষ-করা জমির চারপাশে কাক নামিয়াছে—পোকা-মাকড়ের আশায়। দুই একটা কাদাখোঁচা এখানে ওখানে ঘুরিতেছে। কালো মেঘের গায়ে সাদা বকের সারি উড়িয়া চলিয়াছে মাঝে মাঝে। মেঘমেদুর দিনটির সঙ্গে ক্লান্ত বিষণ্ণ চাঁপাডাঙার বউ যেন একাত্মতা অনুভব করিতেছিল।

যে মেয়েটি চাঁপাডাঙার বউয়ের সঙ্গে কথা বলিতেছিল সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতির সঙ্গে বলিল, দেহ ভাল নেই তো এই জলে ভিজে এলে ক্যানে মা? ছুটকীকে পাঠালেই হত।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, অমরকুড়ির পানে যাস যদি নয়ানের মা, তবে আমাদের ওদিকে ডেকে দিস, বলিস—এখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি। আর যেতে পারছি না।

—দোব—দোব। ছোঁবার তো নয় মা, নইলে আমি নিয়ে যেতাম।

—তার চেয়ে বড় মোড়লকে বলিস। মহাতাপ চাষ ছেড়ে আসতে রাগ করবে। বড়কে বলিস, সে এসে নিয়ে যাবে।

অমরকুড়ি অর্থাৎ অমরকুণ্ড। ধান সেখানে মরে না। সেখানেই তখন সেতাবদের চাষ চলিতেছিল।

চাষের সময় সেতাবও চাষে খাটে। কঠিন কাজগুলো তেমন সে পারে না, তবে অন্য সকল কাজই করে। কোদাল কোপায়, বীজচারা পোঁতে, কাদা-চাষ-করা জমিতে কোন ঠাঁই উঁচু হইয়া থাকিলে, সেও পায়ে করিয়া ঠেলিয়া সমান করিয়া দেয়।

সেতাবদের চাষ বড়। দুইখানা হাল। হাল দুইখানার কাজ শেষ হইয়াছে; লাঙল খোলা অবস্থায় হাল কাঁধে লইয়া গোরু চারিটা ঘুরিয়া ঘাস খাইতেছে। কয়েকজন সাঁওতাল মেয়ে ধান পুঁতিতেছে। মহাতাপ কোদাল কোপাইতেছে। সেতাব হুঁকা হাতে জমির এধার হইতে ওধার পর্যন্ত ঘুরিয়া উঁচু জায়গাগুলি পায়ে বসাইয়া দিতেছে।

নয়ানের মা জমির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চাঁপাডাঙার বউয়ের দেহ খারাপ, আসিতে পারিবে না শুনিয়া সেতাব উদ্বিগ্ন চিত্তেই আলপথে হাঁটিতেছিল। গাছতলায় উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, চাঁপাডাঙার বউ চুপ করিয়া যেন মাটির পুতুলের মত বসিয়া আছে।

সেতাব বলিল, নয়ানের মা বললে—দেহ খারাপ তোমার?

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে চোখের জলের বাঁধ ভাঙিয়া গেল।

—ওই—ওই, একে বলে, তা হলে জলে ভিজে এলে ক্যানে? ম্যালেরিয়ার সময়—দেখি, কপাল দেখি! সে কপালে হাত দিতে গেল।

চাঁপাডাঙার বউ কপাল সরাইয়া লইয়া বলিল, না।

—এই দেখ না ক্যানে? দেখি।

—না, কিছু হয় নি আমার।

—একে বলে, এ তো ভ্যালা বিপদ রে বাবা!

—লোকের কথা আমি আর সইতে পারছি না।

—এই দেখ। কে আবার কি কথা বললে তোমাকে? কে? কার ঘাড়ে তিনটে মাথা? বল, আমি দেখছি তাকে। মহাতাপকে বললে—

—না, সে শুনবে বলে তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে এখানে এনেছি আমি। লোকে বলছে মহাতাপকে ঠকিয়ে তুমি পুঁজি করছ। কেন তুমি মহাতাপকে সব কথা বল না?

—তোমাকেই বলি নাকি আমি?

—তাতে ক্ষেতি হয় না। কিন্তু—

—সে আমি বুঝব; সে আমার মায়ের পেটের ভাই। তাকে বলি—আর সে পাড়াসুদ্ধ গেরামসুদ্ধ বলে বেড়াক। কিন্তু কে কি বললে—আমার দিব্যি দিয়ে বলছি বলতে হবে তোমাকে।

—দিব্যি দিলে?

—দিলাম।

—বললে টিকুরীর খুড়ী।

টিকুরীর খুড়ী তখন সেতাবদের বাড়ির দাওয়াতে বসিয়া মানদার সঙ্গে মাছ ভাগ লইয়া বেশ একটা ঝগড়া পাকাইয়া তুলিয়াছিল। উঠানে মাছ ভাগ করা পড়িয়া আছে। এদিকে অনেকগুলি—সেটা সেতাবদের ভাগ, আর এক জায়গায় বিপিনের অর্থাৎ মোটা মোড়লের ভাগ, সেটা সেতাবের ভাগ হইতে কিছু কম হইলেও নেহাত কম নয়, আর কয়েকটি ভাগে—কোনটিতে দুইটি কোনটিতে তিনটি এমনি। গোবিন্দ মাছ ভাগ করিতেছে।

মানিকের হাতে একটি মাছ। সে মাছটি লইয়া টিপিতেছে।

টিকুরীর খুড়ীর ভাগ ওই তিনটি মাছওয়ালা ভাগের একটা ভাগ। মাছ তিনটি তুলিতে তুলিতে বলিল, ভাগী দাঁড়িয়ে খেতে নেই বাছা, তাতে মঙ্গল হয় না। বুঝেছ? খেয়ো না তা। তোমার একটা ছেলে। ভাশুরের কাছে জায়ের কাছে ও বিদ্যে শিখো না। ফল দেখেছ তো? তোমাদের স্বামীস্ত্রীকে ঠকিয়ে গোপনে পুঁজি অনেক করেছে ওরা। কিন্তু হয়েছে? বলি একটা সন্তান হয়েছে চাঁপাডাঙার বউয়ের? মাছসুদ্ধ হাত দুটা সে মানদার মুখের কাছে নাড়িয়া দিল।

মানদা কি বলিবে খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, মিছে কথা বলছ কেনে?

—মিছে কথা! মিছে কথা! গাঁয়ের লোককে শুধাও গা। দেওর-সোহাগী আমার! মরণ তোর দেবীপুরের বউ। কিছু বুঝিস নে তুই। শোনগে, ঘোঁতন স্থাকাপড়া-জানা ছেলে—ভদ্দর লোক—সে কি বলে শোনগে। বলে দেওর-ভাজ আমরা আর দেখি নাই কখনও। নতুন দেখছি। মর্ তুই, মর্ ছুঁড়ি! তুই মর্!

সে চলিয়া যাইতেছিল।

গোবিন্দ এবার বলিল, অই, অই, তুমি রাখাল পালের কাছে যে মাছ কটা নিলে, সে কটা

ভাগ কর এইবার। ওগো ও ম্যোলান—অই! মানিকের মা, বল না গো। অ ছোট মোল্যান! ওই ওর কোঁচড়ে ভরা রয়েছে গো।

মানদা থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল—কণ্ঠস্বর তাহার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তবু সে বিচিত্র স্থির দৃষ্টিতে টিকুরীর গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

টিকুরীর খুড়ী কিন্তু মাছগুলি লইয়া শিবকেষ্টর বাড়ি গেল না। এই জলের মধ্যেই সে গিয়া উঠিল ঘোঁতনের বাড়িতে। ঘোতন তাহার মামলা করিয়া দিবে বলিয়াছে। সেই জমি ভাগের মামলা।

সেদিন সাবরেজেষ্ট্রি আপিস বন্ধ। তাহার উপর বর্ষার দিন। ঘোঁতন দাওয়ার উপর বসিয়া বাঁয়া-তবলা লইয়া পিটিতেছিল। গান তাহার বড় আসে না। তবলাতেই তাহার সঙ্গীত-প্রিয়তার আবেগ নিঃশেষিত হয়। ধা তিন—ধা—ধা তিন ধা। তে রে কেটে—মুখে বোল বলে আর তবলা বাজায়। তবে বক্তৃতায় সে মজবুত। শকুনি, কলি, তক্ষক প্রভৃতি কয়টা পার্টে তাহার খুব নাম।

খুড়ী ঘোঁতনের দাওয়ায় মাছগুলি ঢালিয়া দিয়া বলিল, লে বাবা ঘোঁতন, ভেজে খাস। খুড়ী চাপিয়া বসিল।

ঘোঁতন খুশী হইয়া বাজনা বন্ধ করিয়া বলিল, এ যে লহনা পোনা খুড়ী!

—হেঁ বাবা। পেলাম, তা বলি ঘোঁতনকে দিয়ে আসি। তা আমার মামলার কি করলি বাবা?

—করেছি খুড়ী। ঠুকে দিয়েছি দরখাস্ত। লিখে দিয়েছি সেতাব মোড়ল বিপিন মোড়ল গং প্রভৃতি পঞ্চায়েতবর্গ ঘুষ খাইয়া বিধবাদের সম্পত্তি ঠকাইয়া শিবকেষ্ট রামকেষ্ট গংকে দিয়াছে। একেবারে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। ইংরিজীতে দরখাস্ত লিখে দিয়েছি।

বলিতে বলিতেই হেঁট হইয়া একটা মাছ তুলিয়া লইয়াই বলিল, মাছ উঠেছে বুঝি পুকুর থেকে? বেড়ে টাটকা মাছ। ভাজি যা হবে! পুঁটি, পুঁটি, অ পুঁটি!

খুড়ী বলিল, সাজার পুকুরের মাছ, বুয়েচ বাবা, মাঠ একেবারে ছয়লাপ। মহাতাপের বউ সের দরুনে ধরে ঘরে ঢুকিয়েছে। তা যদি বলতে গেলাম বাবা, তো চাঁপাডাঙার বউয়ের ঠেকার কি? আমিও টিকুরীর বেটী, আমি খুব শুনিয়ে দিয়েছি। মুখে মুখে বলে দিয়েছি —বলি দেওর-সোহাগী আমার, ঘরের ভাগী তাঁড়িয়ে খেয়ে তোমার তো একটা হল না। আবার শেষে পাড়ার সরিকদের ফাঁকি? ওদের ছোট বউকে বলে এসেছি। গলায় দড়ি তোর। দেওর ভাজ আর পৃথিবীতে নাই? তা কাকে বলছ? ছুঁড়ী ভাবলী।

ঘোতন বলিল, তুমিও ভাবলী খুড়ী, তুমিও ভাবলী।

—আমি ভাবলী?

ঠিক এই সময়েই পুঁটি—ঘোঁতনের অবিবাহিত যুবতী বোন—ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।—কি, বলছ কি?

—এই মাছ কটা নিয়ে যা। বেশ করে ভাজি করবি। কিংবা ঝাল।

টিকুরীর খুড়ী বলিল, অ মা গো! পুঁটি? তোমার বুন। এ যে হাতি হয়ে উঠেছে?

খুড়ীর কথা গ্রাহ্য না করিয়া পুঁটি বলিল, আমি পারব না। হাঁড়ি চড়ে না, তার মাছভাজা? এ ঘরে তোমার মা ধুঁকছে জ্বরে, ও ঘরে বউ ধুঁকছে। তুমি বসে বসে তবলা পিটছ! আমি এত পারব না। তোমরা সবাই আমার হাতির গতরই দেখেছ।

—পুঁটি!—কড়াস্বরে ঘোঁতন শাসন করিয়া উঠিল।

পুঁটি যাইতে যাইতে ফিরিয়া মাছ কয়টা কুড়াইয়া লইয়া বলিল, ভাজতে পারব না, পুড়িয়ে দিচ্ছি, খেয়ো। ঘরে তেল নাই। আর ডাক্তার-কবরেজ যা হয় ডাক—মায়ের জ্বর খুব।

—ম্যালেরিয়া জ্বর, ওর আবার ডাক্তার-কবরেজ কি হবে? হু হু করে উঠেছে, আবার খানিক পরে ছেড়ে যাবে। ইউনিয়ন বোর্ড থেকে মেপাক্রিন এনে দোব, খেলেই সেরে যাবে।

—ভাল, উদিকে ভাগীদার নেপাল কাহারের বউ এসে বসে আছে।

—ধান-টান দিতে আমি পারব না। সে বলে দেগা। ধান নাই তো দেব কোথা থেকে?

—ধান পরের কথা, এখন বেচন নাই। জমি চাষ হবে না। বেচন দেখে দাও গো।

—বেচন? বেচনই বা পাব কোথা আমি?

—তবে থাকবে তোমার জমি পড়ে।—বলিয়া পুঁটি ঘরে চলিয়া গেল।

—থাকুক গে! আমার কচুটা।—বলিয়া ঘোঁতন বুড়ো আঙুল দেখাইয়া দিল। তারপর খুড়ীকে বললে, খাই যেন একা আমি, বুঝলে খুড়ী? হুঁ। বলিয়া তবলায় অকারণে চাঁটি মারিয়া দিল।

—আমি চললাম বাবা। একটা তাগিদ দিস, বুঝলি?

বলিয়া খুড়ী উঠিয়া পড়িল।

আরও দিন পনের পর সেদিন বিকেলবেলা বেচারী পুঁটি আসিয়া উপস্থিত হইল বিপিন মোড়লের বাড়ি।

মোটা মোড়ল পায়ে সরিষার তেল মাখিতেছিল। তামাক সাজিতেছিল একজন কৃষাণ। পুঁটি আসিয়া দাঁড়াইল এক পাশে। বলিল, আমি একবার আপনার কাছে এলাম জ্যাঠা।

—কে? কে বল দেখি তুমি বাছা? চেনা-চেনা করছি, চিনতে ঠিক লারছি—

—আমি নবগেরেমের গোপাল ঘোষের কন্তে—

—গোপালের কন্তে? তুমি ঘোঁতনের ভগ্নি?

—হ্যাঁ।

—দেখ দেখি কাণ্ড। বড় হয়ে গিয়েছ। চিনতে লারছি।

—মা পাঠালে আপনার কাছে।

—বল, কি জন্তে পাঠালে?

—বললে পাঁচজন থাকতে বীচনের অভাবে আমাদের জমি চাষ হবে না?

—তোমাদের বীচন নাই? কি হল? তা তুমি এলে কেন? ঘোঁতন কই? ছি-ছি-ছি!

—তাকে তো জানেন। সে উ সব দেখবে না। আর তাঁর সময়ও নাই। রেজেস্টারী আপিস ইউনিয়ন বোর্ড আপিসে সারাদিন কাজ তো। পুঁটি ক্ষীণযুক্তিতে ভাইকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল।

—হুঁ, তা কতটা জমির বীচন চাই ?

—দশ বিঘে জমি ; তার বিঘে ছয়েক পুঁতেছে, চার বিঘে পড়ে আছে—বীচন নাই।

—তাই তো বাছা। আমার খানিক বীচন আছে, বাঁচবে, কিন্তু বেনো জমির জন্যে রাখতে হবে। তা—

—আমাদের কি হবে ?

ঘোঁতন হলে বলতাম, উপোস করে মরবে। তা সে কথা তো তোমাকে বলতে পারছি না। দেখি সেতাবের বীচন বাঁচবে, সেতাবের হিসেব মহাতাপের গতর—। তা সেতাব আবার ঘাড় পাতলে হয় ? তুমি বাছা ওদের বড় বউকে গিয়ে ধর গা। নাঃ চল, আমিই যাই।

মোটা মোড়ল পথে নামিল। আপন মনেই বলিতে লাগিল, বুঝেছ মা, এই সেতাবের কত্তা বাবার নাম ছিল দয়াল মোড়ল, লোকে বলত দলু মোড়ল ; আমার বাবার নাম ছিল পরেশ। দুজনা ছিল চাকলার মাথা। নবগেরামে তখন নতুন ফেশান ঢুকেছে। দেখেশুনে দুজনে পরামর্শ করত আর বলত—দলো মলেই হল, আর পরশা মলেই ফরসা। তাও আমরা কিছু কিছু বজায় রাখলাম, এর পর সব খাঁ-খাঁ। উচ্ছন্ন দিলে। ইংরেজী ইস্কুলে ঢুকে—বাবু হয়ে ফেল মেরে ঘর ঢুকছে ; জমি বেচে-বেচে খাচ্ছে বসে।

সারা পথটাই বকিতে বকিতে সেতাবদের দরজায় হাজির হইল। দরজা হইতে ডাকিল—সেতাব ? সেতাব রয়েছ ? অ সেতাব ?

বাড়ির বাহির-দরজায় বাহির হইয়া আসিল মহাতাপ, তাহার হাতে হুঁকা। ফরাত ফরাত শব্দে হুঁকাটা টানিতে টানিতে বাহির হইয়া আসিয়া মাতব্বর খুড়ো মোটা মোড়লকে দেখিয়াই অপ্রস্তুত হইয়া গেল। চট করিয়া হুঁকা সুদ্ধ হাতটা পিছনের দিকে করিল।

বিপিন বলিল, সেতাব কই ?

মহাতাপের পেট-ভর্তি তামাকের ধোঁয়া, সে দম বন্ধ করিয়া বলিল, তামাক খান। বলিয়া হুকাটা বিপিনের হাতে দিয়া পিছন ফিরিয়া হুস করিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া দিল। এবং এতক্ষণে স্বচ্ছন্দ হইয়া বলিল, বসুন, উঠে বসুন।

দাওয়ার উপর উঠিয়া মোড়াটা আগাইয়া দিল। পুঁটি অদূরে পথের ধারে দাঁড়াইয়া ছিল।

বিপিন মোড়ল দাওয়ায় উঠিয়া মোড়ায় বসিয়া ডাকিল, এইখানে এস বাছা। অ পুঁটি !

মহাতাপ সবিস্ময়ে বলিল—পুঁটি ! এই লাও, ঘোঁতনা তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি ?

পুঁটি ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল।

মহাতাপ বিপিনকে বলিল, তোমরা হুকুম দাও জেঠা, ঘোঁতনকে আমি কিলিয়ে সোজা

করে দিই। বড়া বজ্জাত। নচ্ছারটা বড় বজ্জাত। এ মেয়েটা ভাল। যা গালাগাল দেয় আর মারে ওকে—। আমি চোত-পরবের সঙের সময় দেখে এসেছি।

বিপিন বলিল, তুই থাম্ মহাতাপ! ও তার জন্মে আসে নি।

মহাতাপ আগাইয়া গিয়া বলিল, তার জন্মে আসে নি! কই বলুক পুঁটি, বলুক কালীমায়ের দিব্যি করে—ঠাস ঠাস করে চড়িয়ে দেয় কি না? বলুক।

পুঁটি দায়ে পড়িয়াছে। সে না পারে স্বীকার করিতে, না পারে প্রতিবাদ করিতে। স্বীকার করায় লজ্জা আছে, প্রতিবাদে কুণ্ঠা আছে, আশঙ্কা আছে; মহাতাপ তো নিজেই কালীর দিব্যি গালিয়া চাক্ষুষ দেখার কথা চিৎকার করিয়া বলিবে এবং হয়তো শেষ পর্যন্ত 'বীচন দিব না' বলিয়া বসিবে।

বিপিন মোড়ল প্রবীণ লোক। সে পুঁটিকে নতমুখ দেখিয়া কলিল, না রে বাপু, না। আজ ও অন্য কাজে এসেছে। ওদের জমির বীচন নাই। বীচন খোঁজ করতে এসেছে।

—হরিবোল! হরিবোল! মহাতাপ হাসিতে লাগিল।

—হাসছিস ক্যানে?

—বীচন হয় নাই তো! সে আমি জানতাম—প্রচুর কৌতুকে সে হাসিতে লাগিল।—তুষ ফেললে বীজ হয় খুড়ো? আমি জানতাম। ঘোঁতনের ভাগীদার নেপাল যেদিন বীচন ফেলে, সেইদিনই আমি বলেছিলাম। আমি বললাম, ই কি রে? এ যে সব তুষ! এতে বীজ হবে ক্যানে?' নেপাল বললে—আমি কি করব? ঘোঁতন ঘোষ বললে—যা হয় ওতেই হবে। আমি বললাম—দে তবে গোঁজ গোঁজায় নমো করে। মহাতাপ খুব হাসিতে লাগিল।

বিপিন বলিল, কিছু বীচন দিতে হবে। তোর তো নিশ্চয় আছে।

—হঁ্যা। অহঙ্কার করিয়া মহাতাপ বলিল, জরুর আছে, আলবৎ আছে। কিন্তু ঘোঁতনকে নেহি দেগা—

—দোব না বললে কি হয়? দিতে হবে। ডাক্, সেতাবকে ডাক্।

সেতাব!—রাগিয়া উঠিল মহাতাপ।—সেতাব কি করবে? সেতাব? মাঠে যতদিন বীচন থাকবে ততদিন সেতাবের এক গাছ নেহি হ্যায় বাবা। সব মহাতাপের। বিলকুল। হঁ্যা' ধান কাটেগা, ঘরে আনেগা, ঝাড়াই করেগা, গোলায় তুলেগা, তারপর উ যা করেগা তা করেগা! মাঠকে মালিক হাম হ্যায়—হাম। একবার ঘোঁতনার মায়ের কথায় ধান ছেড়ে দিয়েছি, সবাই বকেছে আমাকে। মহাদেবের পাট নিয়ে দশ টাকা চাঁদা দিয়েছি। উঁহু, আর নেহি দেগা।

এবার পুঁটি বলিল, আমার মা-ই আমাকে পাঠিয়েছে মহাতাপদাদা। জমি পোতা না হলে আমারা খাব কি বল?

—খাব কি? শুধু তোরা খাবি? ঘোঁতন খাবে না? আগে ভাত বেড়ে তো তাকে দিবি।

সত্যই বড় বউ ঘরের মধ্যে শুইয়া ছিল। শরীর খারাপ বলিয়া শুইয়া আছে। আসলে টিকুরীর খুড়ীর সেই মর্মান্তিক কথা কয়টা বিষাক্ত তীরের মত তার মর্মস্থল বিঁধিয়া অবধি তাহাকে বিষণ্ণ ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। কথা কয়টার বিষে তাহার অন্তর এমনই জর্জর হইয়া গিয়াছে যে, সংসারের জীবনে যেন রুচি পর্যন্ত বিস্বাদ ঠেকিতেছে। অপর সকলের কাছে কথাটা গোপন করিবার অভিপ্রায়েই সে শরীর খারাপের অজুহাতে আপন ঘরে শুইয়া আছে। সে চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। মাথার দিকে জানালার ধারে বসিয়া সেতাব তামাক খাইতেছিল আর মৃদুস্বরে বকিতেছিল।

—একে বলে, এ তো ভারি বিপদ করলে তুমি! এ তো বড় ফ্যাসাদ! টিকুরীর খুড়ী কি বললে, আর তুমি গিয়ে শয্যা পাতলে! ওঠ—ওঠ।

—না। আমাকে জ্বালিয়ো না। আপনার কাজ [illegible]

—ওই! তুমি না খেয়ে পড়ে থাকবে, আর [illegible]। কুকুরের কামড় হাঁটুর নীচে। টিকুরীর খুড়ী বললে, ভাগী ভাঁড়ি[illegible]লে হয় না[illegible] টিকুরীর খুড়ী একেবারে সাক্ষাৎ বেদব্যাস। তা হয় না[illegible]নাই তো নাই।

—কি বললে? বড় বউ উঠিয়া বসিল। সেতাব ভয় পাইয়া থামিয়া গেল। চাঁপাডাঙার বউয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কি বললাম?

—ছেলে নাই তো নাই! তোমরা পুরুষমানুষ, তোমাদের কথা আলাদা। কিন্তু—

বড় বউ বিচিত্র হাসি হাসিল।

সেতাব সে হাসি দেখিয়া জ্বলিয়া গেল। বড় বউয়ের হাসিতে যে আগুন ছিল, সেই আগুন তাহার অন্তরের সঞ্চিত সন্তানকামনার গোপন ক্ষোভের শুষ্ক দাহ্য বস্তুতে ধরিয়া গেল। কথাটা দুই জনেই পরস্পরের কাছে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। সেতাব চাঁপাডাঙার বউয়ের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিল—বড় বউয়ের মত বিচিত্র দৃষ্টিতে। তারপর হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া বলিল, আলাদা? পুরুষের কথা আলাদা? না? হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, একসময় মনে হয়—। সে থামিয়া গেল এবং চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বড় বউ উঠিয়া দাঁড়াইল। সেতাবের গায়ের কাপড়ের খুঁট চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কি মনে হয়? বলে যাও।

সেতাব বলিল, মনে হয় ঘর-দোর-ধান-ধনে আগুন দিয়ে চলে যাই।

বড় বউয়ের হাতখানা খসিয়া পড়িল।

আমার মনে হয় না—ছেলের কথা? আমার সাধ নাই? মনে হয় না এ সব আমি ক্যানে করছি? কার জন্যে করছি? কে ভোগ করবে? আমার জলগণ্ডূষের সাধ নাই?

পেয়েত [illegible] হা-হা করে বেড়াতে হবে [illegible] আমাকে ? তবু কি করব ?

[illegible] স্তব্ধ হইয়া গেল। মনে [illegible] আকাশ ভাঙিয়া [illegible] ফাটিতেছে। [illegible] তাই ফাটুক। সে তাহারই মধ্যে ঢুকিয়া যাক।

ঠিক এই মুহূর্তে নীচে হইতে বিপিনের ডাক শোনা গেল—বড় বউমা! চমকিয়া উঠিল চাঁপাডাঙার বউ। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। তবু মাথার ঘোমটা তুলিয়া দিল।—কে ?

পাশের ঘরের জানালাটা খুলিয়া মানদা মুখ বাড়াইয়া বলিল, পঞ্চায়েতের শিব মোড়ল—মোটা মোড়ল এসেছে দিদি!

চাঁপাডাঙার বউ কোন রকমে উঠিয়া সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইল।

বিপিন নীচেই দাওয়ার উপর চাপিয়া বসিয়া ছিল। তামাক খাইতেছিল। পুঁটি একটি খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল একপাশে। সেতাব হনহন করিয়া নামিয়া আসিল এবং পুঁটিকে দেখিয়া খানিকটা অবাক হইয়া গেল। সে পুঁটিকে ঠিক চেনে নাই। এমন কালো অথচ শ্রীমতী এত বড় একটি [illegible] সিঁদুর নাই, বিধবা বা কুমারী ঠিক ঠাওর করা যায় না; এ কে ? [illegible] দেখিয়া বিস্ময় স্বাভাবিক ভাবেই জাগিয়া [illegible]ার কথা।

মহাতাপ উঠা[illegible]য়া দাগ কাটিতেছিল এবং বলিতেছিল, সে হোগা নেহি, কভি নেহি।

সেতাব বলিল, কি গো খুড়ো ?

বিপিন বলিল, এই যে তুমি বাড়িতে আছ। তুমি নাই ভেবে অগত্যে বড় বউমাকে ডাকছিলাম।

সেতাব হুঁকোটা লইয়া টানিল না। সে পুঁটিকেই দেখিতেছিল। হাতের কাঁচের চুড়ি, লোহা দেখিয়া এতক্ষণে বুঝিল মেয়েটি কুমারী। কিন্তু এত বড় কুমারী মেয়ে ? কার বাড়ির ? বলিল, এ মেয়েটি ?

মহাতাপ উত্তর দিল—ঘোঁতনার বোন।

—ঘোঁতনের ভগ্নি ?

বিপিন বলিল, হ্যাঁ, গোপালের কন্যে। বেচারী এসেছে, ওদের বীচন নাই। জমি পড়ে আছে। চার-পাঁচ বিঘের মতন বীচন নাই। ঘোঁতন বলে দিয়েছে, সে কিছু জানে না। কি করে বল ? [illegible] আসতে হয়েছে। এত বড় কুমারী মেয়ে, এক গাঁ থেকে আর এক গাঁ—। তা পাগল বলছে—নেহি দেগা। তোমরা সব ওকে বকেছ ঘোঁতনকে ধান ছেড়ে দেওয়ার জন্য, তাই ও আর বীচন দেবে না। তাই।

সেতাব বলিল, গোপাল ঘোষ আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে খুড়ো, সে তুমি জান। কিন্তু আমি মনে রাখিনি। ঘোঁতনকে গতবার ধান দিয়েছিলাম। সে বৃত্তান্তও সব জান।

আবার বাঁচনও দোব। পাবে বাঁচন। পুঁটি এসেছে যখন বুঝছি—ওর মা পাঠিয়েছে। গোপাল ঘোষ যা করুক—ঘোঁতন যা করুক—ঘোঁতনের মা—বড় বউয়ের সইমা! আমার পূজ্য লোক। দিতে হবে বৈকি, দোব বাঁচন। বড় বউ বলবে কি? বাঁচন দোব। পাবে, বাঁচন পাবে।

মহাতাপ অবাক হইয়া গেল। সেতাবের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, বাঁচন দেবে?

—হ্যাঁ, জমি তো পুঁততে হবে?

মহাতাপ তাহাকে বলিল, তুমি আর নেহি বাঁচেগা। মর যায়েগা। জরুর মর যায়েগা।

সেতাব বলিল, কি বকছে দেখ! সিদ্ধি খেয়েছিস্?

—কি বকছি? আ-হা-হা? তুম এক বাতমে বীজ খয়রাত কর দিয়া? তুম চামদড়ি, তুম কিপটে; তুম দাতাকর্ণ বন গিয়া, তুম নেহি বাঁচেগা। কিন্তু আমি বাঁচন দোব না। কভি না। শূয়ার ঘোঁতনা যদি পিঠে একটা কিল খায় আমার তবে দোব। নেহি তো কভি না।

সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

পুঁটি হাসিয়া ফেলিল।

বড় বউ এবার বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, বাঁচন পাবে কাকা। আমি ওকে বুঝিয়ে বলব।

তারপর পুঁটিকে বলিল, ওরে তুই কত বড় হয়েছিস পুঁটি? এতদিনে বাঁচনের জন্যে দিদি বলে মনে পড়ল? সইমা কেমন আছে?

তাহাকে লইয়া সে বাড়ির ভিতর ঢুকিল।

—মায়ের খুব জ্বর দিদি। মা তোমার কথা প্রায়ই বলে।

—কি বলে রে?

—কত কথা বলে। বেশী বলে—কাদু আমার ভাগ্যবতী, গুণবতী, রূপবতী—মায়ের কাছে সবই তাই তুমি।

কাদম্বিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বলিল, সইমা আমাকে বড় ভালোবাসে।

—সেদিন রূপের কথায় বলছিল—সে দেখতে হয় কাদুকে। যেমন মুখ-চোখ, তেমনি গড়ন-পেটন—আহা-হা, এখনও যেন কনে বউটি!

—মরণ আমার রূপের! মরণ আমার কনে বউয়ের ছিরির! কে যেন কাদুর অন্তরে অন্তরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

পুঁটি তাহা বুঝিল না, সে উৎসাহভরে বলিল, শোন—এই শেষ নাকি? আমার এক পিসী বললে—তা বাঁজা মেয়ের দেহের বাঁধন ভাল থাকে। মা বললে—কি হল দিদি? দিদি?

কাদম্বিনী পাশের দেওয়ালটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। মুখখানা তাহার কেমন হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।

সে এক হাতে গলার কবচটা চাপিয়া ধরিয়াছিল, আপনার অজ্ঞাতসারেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভাদ্র মাস পড়িয়া গিয়াছে।

সেদিন ষষ্ঠীর দিন। চাষী গ্রামটির পাড়ায় পাড়ায় এক এক ঘরে হুলুধ্বনি পড়িয়াছে। মেয়েরা ষষ্ঠীর ব্রতকথা শুনিয়া উলু দিতেছে। রোদে শরতের আমেজ ধরিয়াছে। ভাল চাষীদের চাষ প্রায় শেষ। মহাতাপ তো রোয়ার কাজ শেষ করিয়া নিড়ানের কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

সেতাবের বাড়ির ভিতরেও মেয়েরা বসিয়া ষষ্ঠীর ব্রতকথা শুনিতেছে।

সেতাব গোয়াল-বাড়িতে দাঁড়াইয়া ছিল। রাখালটা দুধ দুহিতেছে। গোয়াল-বাড়ির উঠানে ধানের বীচনের একটি বোঝা পড়িয়া আছে। বীচনের বোঝাটি ঘোঁতনের জমির জন্য তুলিয়া আনা হইয়াছে।

বাড়ি আসিয়া ঢুকিল পুঁটি।

সেতাব তাহাকে দেখিয়া বেশ প্রসন্ন হইয়াই বলিল,. এই দেখ। বীচন তোলা আজ তিন দিন পড়ে আছে!

পুঁটি লজ্জিত হইয়া বলিল, কি করব। জমির পাট হয় নাই। লোকজন নাই। নেপালের এক হাতের কাজ। তার ওপরে ভাগীদের কাজ।

সেতাব অপ্রসন্ন হইয়া আসিল। বলিল, আজ আবার ষষ্ঠী। আজও ভাবলাম—। সে হাসিল।

পুঁটি বীচনের বোঝাটা নাড়িতে চেষ্টা করিল।

সেতাব বলিল, ওই—ওই! একে বলে, ওই বোঝা তুমি তুলতে পার? বীচন নেবে কে? নেপাল কই?

—নেপাল জমিতে মই দিচ্ছে। ষষ্ঠীর দিন নেপালের বউ আসে নাই।

—তবে?

—আমিই নিয়ে যাব।

—এই দেখ। বলি তাই হয় নাকি?

পুঁটি এবার ডাকিল, দাদা, অ দাদা!

বাহির হইতে ঘোঁতন সাড়া দিল, কি? আয় না বোঝাটা মাথায় তুলে নিয়ে?

সেতাব বলিল—ঘোঁতন এয়েছে? কই? অ ঘোঁতন! ঘোঁতন!

ঘোঁতন এবার ঘরে ঢুকিল। তাহার পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা হাফশার্ট—অবশ্য দুইটাই পুরানো। সে ঘরে ঢুকিতেই সেতাব বলিল, বাইরে দাঁড়িয়ে ক্যানে রে? দেখ দেখি। তা তোর লোক কই—এ বোঝা নেবে কে?

ঘোঁতন একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল—শুধাও তাই পুঁটিকে। বললাম, আজ ষষ্ঠী, কাল নেপালের বউ আসবে, কাল সে-ই নিয়ে যাবে। তা বলে—তুমি তুলে দিয়ো আমি নিয়ে

যাব। আমি বললাম—তাই যাবি তো চ! আমার কি!

পুঁটি বলিল, তাই দাও না তুলে। ধর।

সেতাব ব্যস্ত হইয়া বলিল,—এই—! ওরে নোটন! নোটন! যা তো, যা তো, বাঁচনের বোঝাটা মাঠে দিয়ে আয় তো! যা তো!

ঠিক এই সময়েই বাড়ির ভিতরে উলু পড়িল।

বাড়ির ভিতরে উঠানে ৫।৬টি মেয়ে সুপারি হাতে ব্রতকথা শুনিতে বসিয়াছে। সকলেই স্নান সারিয়া এলোচুলে গোল করিয়া বসিয়াছে।

উলু দিয়া প্রণাম করিয়া সকলে উঠিল।

যে প্রবীণা ব্রতকথা বলিতেছিল, সে বলিল, এ ব্রত করলে কি হয়?

নিজেই উত্তর দিল—নিঃসন্তানের সন্তান হয়। সন্তান মরলে, সেই সন্তান জিউ পায়। রণে গোনে অরুণ্যে মা ষষ্ঠী বুক দিয়ে রক্ষা করেন।

চাঁপাডাঙার বউ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দরজার চৌকাঠে একটি ফোঁটা দিল। ষষ্ঠীর প্রসাদী হলুদতেলের ফোঁটা।

একটি মেয়ে বলিল, দরজার মাথায় কাকে ফোঁটা দিচ্ছ চাঁপাডাঙার বউ?

বিষণ্ণ হাসিয়া বড় বউ বলিল, দেওরকে ভাই! সে তো মাঠে। শাউড়ী বলে গিয়েছে—বউমা, ওকে ফোঁটা তুমি চিরকাল দিয়ো।

মেয়েরা বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

এবার চাঁপাডাঙার বউ ডাকিল, মানিক? মানু, মানিক কই?

মানু কাছে আসিয়া বলিল, তাকে পুরে রেখেছি ঘরে। কোথায় বেরিয়ে পালাবে। বলিয়াই সে চাঁপাডাঙার বউয়ের হাতের হলুদতেলের বাটী হইতে খানিকটা হাতের তেলোয় তুলিয়া লইয়া বন্ধ ঘরের দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকিল।

বড় বউ চকিত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। একটা সন্দেহ তাহার মনে সাড়া দিয়াছে। পাছে সে আগে মানিককে ফোঁটা দেয়, এই ভয়েই কি মানু এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছে?

মানু মানিককে কোলে লইয়া বাহির হইয়া আসিল এবং বড় বউয়ের সামনে দাঁড়াইল।

বড় বউ মানিকের মুখের দিকে চাহিয়া বিচিত্র হাসি হাসিয়া বলিল, এই যে ফোঁটা দিয়েছিস তুই? বলিয়া সেও ফোঁটা দিল মানিকের কপালে।

মানু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, কিন্তু তুমি হাসলে ক্যানে বড়দি?

—আমি পাছে আগে ফোঁটা দিই, তাই তুই আগে ফোঁটা দেবার জন্যেই ওকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলি। তাই হাসলাম। তা, আমাকে আগে বললেই পারতিস!

মানু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, তোমাতে আর ভাসুরে সেদিন ঘরে কথা বলছিলে, সে সব কথা আমি শুনেছি বড়দি। মানিক নিয়েও

তো তোমাদের বুক ভরে না।

মান্থ মানিককে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল।

চাঁপাডাঙার বউ দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। দেহখানা তার অবশ হইয়া গিয়াছে। সে তাহার গলায় সুতার ডুরিতে বাঁধা কয়েকটা মাদুলি টানিয়া বাহির করিয়া নাড়িতে-চাড়িতে লাগিল।

দিন কয়েক পর সেতাব বাড়িতে আসিয়া ঢুকিল। হনহন করিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। মিনিটখানেক পরেই ডাকিল, শোন তো একবার! বলি শুনছ?

বড় বউ আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

সেতাব তাহার কোঁচড়ে কিছু গুঁজিতেছিল। দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না যে বস্তুটা টাকা। বড় বউ আসিয়া দাঁড়াইতেই সেতাব বলিল, দেখ ঘোঁতন ঘোষ এসেছে। বুয়েচ? একে বলে—বলছে, নবগ্রামের রাখহরি দত্তর ছেলে চার-পাঁচ ভরির সোনার হার বাঁধা রেখে টাকা নেবে। বলেছে তিনশো, তা আমি বলছি, দুশো! মেরে কেটে আড়াই শো। সুদ টাকায় মাসে ছ পয়সা। দোব? বলব তাকে আসতে?

বড় বউ বলিল, মহাতাপকে শুধাও।

—তুমি ক্ষেপেছ নাকি?

—না। তাকে না শুনিয়ে কোন কাজ তুমি করতে পাবে না।

স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া সেতাব বলিল, এ তো ভ্যালা আবদার রে বাবা। মহাতাপ, মহাতাপ, মহাতাপ করে আমাকে জ্বালিয়ে খেলে তুমি। বলি মহাতাপ তো আমার মায়ের পেটের ভাই। না কি? তুমি এত হাঁপাও ক্যানে?

বলিয়াই সে বাহিরে চলিয়া গেল।

সে যখন দাওয়ায় বাহির হইল, তখন মানদা এদিক হইতে ওদিকে চলিয়া যাইতেছিল।

বাহিরে ঘোঁতন দাওয়ার উপর মোড়ায় বসিয়া পা নাচাইতেছিল এবং ছোট একটা আয়না-চিরুনি লইয়া চুল আঁচড়াইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে শিস দিতেছিল।

কাছে দাঁড়াইয়া ছিল গোবিন্দ—সেই রাখাল ছেলেটি।

সেতাব আসিতেই গোবিন্দ পলাইল।

সেতাব বলিল, এই লাও। বলিয়া পাঁচটি টাকা ঘোঁতনকে দিল এবং বলিল, দোব, ভাই দোব। বুঝলে, বলে দিয়ো।

ঘোঁতন আয়না-চিরুনি পকেটে রাখিয়া টাকা পাঁচটা রুমাল বাহির করিয়া খুঁটে বাঁধিল। বলি, তোমাকে লোকে খারাপ লোক বলত বুয়েচ, আমিও বলতাম। কিন্তু তুমি তা লও। বুয়েচ, এ আমি বুঝেচি। বুয়েচ? মুখ্খুতে বলবে, কিন্তু আমি মুখ্খু লই। তুমি গুড ম্যান, তবে হ্যাঁ স্ত্রীকট্ ম্যান—

সেতাব বুদ্ধি ধরে বিচক্ষণ, সে চ্যাংড়াও নয়। তাহার উপর সে পঞ্চায়েতের মণ্ডল।

সে বলিল, তুই বড় ফাজিল ঘোঁতন। বড় বেশি বকিস। যা, বাড়ি যা। [illegible] পাঠিয়ে দিস। আর শোন্, আর একটা কথা বলি। নিজে একটু খাটিস। [illegible] বোনটাকে অমন করে খাটাস না। বুঝলি?

ঘোঁতন বিচিত্র মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, ওরে বানাস্ রে! তা এক কাজ কর না। সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর নিম্ন করিয়া বলিল, তুমি পুঁটিকে বিয়ে কর না। তোমার তো ছেলেপুলে হল না।

সেতাব প্রথমটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল—ইয়েকে বলে, ইয়েকে বলে—। তারপর অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, ঘোঁ-ত্-না—

—এই দেখ, রাগ করছ ক্যানে? ঘোঁতনা হাসিল।—ও বউয়ের ছেলেপুলে হবে না তোমার। আর তোমার উপর টানও নাই তার। সে যা কিছু—

সেতাব আবার আরও জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল, ঘোঁ-ত্-না—

ঘোঁতন আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই মহাতাপের গলা শোনা গেল রাস্তার বাঁকে। সে গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল—

কাজলী কাজলী ও আমার সাধের
বনের আদুরী, কালো বরণ[illegible]
তোর পয়ে হবে আমার [illegible]
আমার হবে মা[illegible]

ঘোঁতন চমকিয়া উঠিয়া প্রায় লাফ দিয়া নামিল রাস্তায়। বলিল, চললাম। পাঠিয়ে দোব রাখহরির ছেলেকে।

সে দ্রুতপদে পলাইয়া গেল।

সেতাবের হুঁকা ধরা হাতখানি থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। চোখে তাহার বিচিত্র দৃষ্টি ফুটিয়াছে। মুখ কেমন হইয়া গিয়াছে।

মহাতাপ ওদিক হইতে দুইজন ব্যবসায়ীকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিল, বলিল, এই লাও। গুড় কিনতে এসেছে। আলুর বীচন কিনবে। সাহজী, এই হামারা দাদা। ওই দাম-দর করেগা।

চমকিয়া উঠিল সেতাব। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিল।

মহাতাপের সর্বাঙ্গে কাদা। সে জমি নিড়াইতেছিল। বাড়ি ফিরিবার পথে [illegible] পাইকারদের সঙ্গে দেখা হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

তাহাদের বসাইয়া সে হাঁকিতে হাঁকিতে বাড়ি ঢুকিল, বড় [illegible] করিয়া আবদারের ডাক।

ছোট বউ দাওয়ায় বসিয়া ময়দা মাখিতেছিল। সে বলিল, অ মাগো! [illegible] দেখ একবার।

মহাতাপ গ্রাহ্য করিল না। বলিল, কোথা গেল বড় বউ?

ছোট বউ বলিল—উত্তাপের সহিতই বলিল, তার শরীর খারাপ! ঘরে শুয়ে আছে।

...ল, শরীরের কিছু না বলেছে! রোজ শরীর খারাপ! রোজ শরীর ...বউ! বড় বউ!

...বাহির হইয়া আসিল। বলিল, কি বলছ?

—বলি ফোঁটা দেবে না আমাকে? ষষ্ঠীর ফোঁটা?

বড় বউ হাসিয়া বলিল, দেব বইকি। চৌকাঠে দিয়েও মন তো মানে নি। জল না খেয়েই বসে আছি।

—আর একটি কথা শোন।

—বল।

—গুড়-আলুর খরিদ্দার নিয়ে এসেছি। হিন্দুস্থানী পাইকার।

—তা বেশ তো। বেচ দুই ভাইয়ে যুক্তি করে।

—সে যুক্তি তুমি তার সঙ্গে কর গিয়ে। ওসব আমি জানি না। আমার কৃষাণের ভাগের দশ মণ গুড় চাই। আমি বিক্রি করেগা। সে কথা হয়ে আছে। তুমি সাক্ষী। সে টাকা হাম লেঙ্গে। ১৮, ...রে মণ। ১৮০২ রূপেয়া।

—আচ্ছা পাগল ... ভাগ তোমার। নাও না দাদার কাছে।

—উঁহু। উ ... ার কৃষাণের ভাগটা চাই।

মাহু বলিয়া উঠিল, ...লে না! মরণ!

—চুপ রহো, চুপ রহো, আরে দুষ্টু সরস্বতী, চুপ রহো। ওহি টাকাসে হম হার গড়ায়েগা। বড়া বহুকে লিয়ে আর তুমহারা লিয়ে। কেয়া দুষ্টু সরস্বতী, এরে ময়না—বোলো রাধা কিষণ, বোলো মিঠি বাত। সোনেকা হার। সোনেকা হার।

মাহু বলিয়া উঠিল, একশো আশী টাকায় দুজনের সোনার হার! এ যে সেই দু পয়সার মণ্ডা কিনলাম, আমি খেলাম, আমার দাদা খেলে, তারপর ফেলে দিলাম, কুকুরে খেলে, তাও শেষ করতে পারলে না, পড়ে থাকল। নব্বই টাকা সোনার ভরি।

মহাতাপ এবার হুঙ্কার দিয়া উঠিল—এ, তু মু সামালকে বাত কহো—আশী রূপেয়াকে হারসে মন উঠতা নেহি; অঁঃ, তেরা লিয়ে পাঁচশো আশী রূপেয়াকে হার চুরি করকে আনেগা হম! দেখো বড়া বহু—

...বড় বউ বলিল, চুপ কর মহাতাপ। ছি, কতবার বলেছি তোমাকে, এমন কথা ...আর মাহু, মানুষটা বড় মুখ করে কথা বললে, তাকে কি ওই ভাবে ...

...! আশী টাকার হার—তাও রূপোর না সোনার! সেই পাঁচ সিকের ...!

—বেশ তো, হার শুধু তোর জন্যেই হবে।

—নেহি। কভি নেহি। কখনও না।

—আমি হার পরব না। আমার চাই না ভাই।

মানু এবার হঠাৎ খুব ভাল মানুষ হইয়া গেল ; একেবারে একমুখ হাসিয়া অত্যন্ত মিষ্টি ভাষায় অতি মোলায়েম করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আশী টাকার হার পরে, না, মানায় দিদিকে ! পাঁচশো আশী টাকার হার পরবে দিদি, হারের বায়না হয়ে গেল। বুঝেছ ?

বলিয়াই সে ময়দার থালাটা হাতে লইয়া অত্যন্ত দ্রুত উঠিয়া চলিয়া গেল।

বড় বউ আর্তকণ্ঠে ডাকিল—মানু—! তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এক মুহূর্তে ; কে যেন তাহাকে অতর্কিতে নিষ্ঠুর আঘাতে চাবুক হানিয়াছে মুখের উপর।

ছোট বউ ঘরে ঢুকিবার মুখে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চার পাঁচ ভরির হার দুশো আড়াইশো টাকায় খুব সস্তা বড়দি—জলের দর। ওতে তুমি এতটুকু খুঁতখুঁত কোরো না বড় ভাল মানাবে তোমাকে।

বলিয়াই ঘরে ঢুকিয়া গেল।

মহাতাপ কিন্তু উল্লসিত হইয়া উঠিল ; সে পরমোল্লাসে বলিয়া উঠিল, সত্যি কথা ? বড় বউ আমার দিব্যি, বল ? আরে বাপ রে বাপ রে। চামদড়ি কিপটের এ কি সুমতি ! সেদিন পুঁটি আসবামাত্র বাঁচন দিয়ে দিলে। আজ তোমাকে সোনার হার ! বলিহারি বলিহারি ! আজ দাদাকে পেনাম করেগা, পায়ের ধুলো লেগা।

সে পরমানন্দেই বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

বাহির-বাড়ির রাস্তার ধারের দাওয়ার উপর হিন্দুস্থানী দুইজন বসিয়া পিতলের থালায় ছাতু ভিজাইয়াছে, লঙ্কা-নুন রাখিয়াছে। লোটার জলে হাতমুখ ধুইতেছে। সেতাব বসিয়া হুঁকা টানিতেছে। তখনও সে যেন কেমন হইয়া আছে। মাথাটা তাহার কেমন করিতেছে।

মহাতাপ আসিয়া হঠাৎ গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বসিল।

সেতাব চমকিয়া উঠিল—ওই ! ওই ! এ কি রে বাপু ? ও কি !

—পরনাম। তোমাকে পেনাম করলাম।

—ওই। হঠাৎ পেনাম ক্যানে রে বাপু ?

—তুমি—। তারপর ওই হিন্দুস্থানী দুইজনের কথা মনে করিয়া চুপ করিয়া গেল। বলিল, শুনেছি, আমি শুনেছি। হাসিতে লাগিল।

—কি ?

—বলব, বলব। দাও, হুঁকোটা দাও।

সে হুঁকোটা প্রায় টানিয়াই লইল সেতাবের হাত হইতে এবং পিছন ফিরিয়া হুঁকা টানিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল ওই গুড়ের পাইকারদের কাছে। ভিজানো ছাতুর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। ভিজানো ছাতু বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, ই কেয়া হ্যায় ? ছাত্তু ? সাহজী ?

সাহজী উত্তর দিল, হঁ, সত্তু !

মহাতাপ বলিল, হুঁ হুঁ ! বহুত আচ্ছা চিজ ! নুন-লঙ্কা দিয়ে আচ্ছা লাগতা হ্যায়, না !

সাহু হাসিল। বলিল, বাঙালীকে হজম নেহি হোতা।

বিকালের দিকে ওজন করিয়া গুড় বিক্রয় হইতেছিল। খামারে একটা কাঁটা-ওজন খাটাইয়া টিন-বন্দী করিয়া গুড় ওজন করিতেছিল রাখাল পাল। সেতাব দাওয়ায় বসিয়া খোলার কুচিতে করিয়া মাটির উপর একটার পর একটা দাগ দিয়া হিসাব রাখিতেছিল। পাশেই একটা গামলা। গামলায় আধ-গামলা গুড় রহিয়াছে। টিনে গুড় বেশী হইলে তাহার ভিতর হইতে হাতায় করিয়া গুড় তুলিয়া গামলায় রাখিতেছিল, আবার কম হইলে পূরণ করিয়া দিতেছিল। কাঁটার ওজন করিতে রাখালের দক্ষতার খ্যাতি আছে। সে খ্যাতি—খোল বাজানোর খ্যাতির সমান। রাখালের ওজন-করা জিনিস কখনও কম-বেশী হয় না। আর তেমনি দ্রুত ওজন করে।

একদিকে একটা আধ মণ, অন্যদিকে টিন।

কাঁটাটা দুলিতেছিল। রাখাল কাঁটার উপরে একটা হাত রাখিয়া কাঁটার দিকে তাকাইয়াছিল, আর সুর করিয়া বলিতেছিল, তের রাম তের—তের রাম, তের রাম, তের রাম—

খানিকটা গুড় তুলিয়া লইয়া বলিল, তের রামে চৌদ্দ। চৌদ্দ। ওঠাও।

নোটন টিনটা নামাইয়া রাখিল। তেরটা টিন আগে হইতেই সাজানো ছিল। এটা রাখিতেই চৌদ্দ হইল। রাখাল বলিল, চৌদ্দ, চৌদ্দ। চাপাও।

নোটন আর একটা টিন চাপাইল।

—চৌদ্দ রাম। চৌদ্দ রাম। চৌদ্দ রাম।

ওদিকে কাঁকালে একটা, মাথায় একটা, দুইটা টিন লইয়া বাড়ির ভিতর হইতে আসিয়া হাজির হইল মহাতাপ!

—ধর্ নোটনা ধর্। আগে কাঁকালেরটা।

নোটন কাঁকালেরটা ধরিতেই সে নিজেই মাথারটা নামাইল। তাহার গায়ে হাতে গুড় লাগিয়াছে। রাখাল হাঁকিল, চৌদ্দ রাম, চৌদ্দ রাম—পনের। পনের। পনের।

মহাতাপ নিজের হাতটা লইয়া গিয়া গোরুটার মুখের কাছে ধরিল।—লে, চেটে লে। গোরুটাকে চাটাইয়া লইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল।

রাখাল হাঁকিতেছিল—পনের পনের পনের।

ওদিকে বাড়ির ভিতরে জালার ভিতর হইতে বাটিতে করিয়া গুড় বাহির করিয়া টিনে ঢালিতেছিল বড় বউ। গাছ-কোমর বাঁধিয়া সে কাজ করিতেছে।

দাওয়ায় বসিয়া মানিক মুড়ি ও গুড় খাইতেছে। পাশেই তাহার বাঁশিটি পড়িয়া আছে। মধ্যে মধ্যে পু করিয়া দিতেছে।

মানদা টিনের পাশে বসিয়া টিনের গায়ে যে গুড় পড়িতেছে সেই গুড় চাঁচিয়া লইয়া একটা পাত্রে জমা করিতেছে।

মহাতাপ ঘরে আসিয়া ঢুকিল। টিনে ভরা হয় নাই দেখিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল,

বলিল, আরে রাম রাম, এখনও টিন ভরে নাই ?

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, দিচ্ছি, দিচ্ছি, হাত তো আমাদের দুটো, চারটে তো নয়। চতুর্ভুজো দেখে বউ আনলেই তো পারতে তোমরা ! সবুর কর, ঘোড়াটা বাঁধ।

এখন কাজের মধ্যে চাঁপাডাঙার বউয়ের সে বিষণ্ণতাটুকু আর নাই। এই সময়ই বাহির হইতে রাখাল ডাকিল, এক ঘটি জল দেবে বউমা ? বড় তেষ্টা পেয়েছে।

মানদা বলিল, গুড়ের লোভে আবার জল খেতে এসেছে গেঁজাল। ওজন করবার আর লোক পেল না।

বাহির হইতে রাখাল বলিল, শুনছ, অ বড় বউমা !

চাঁপাডাঙার বউ একটা বাটিতে গুড় লইয়া বাহির হইয়া গেল। মহাতাপকে বলিল, তুমি বার কর হে ততক্ষণ।

রাখাল বলিল, গুড় কিন্তু ফাস্টো কেলাস মা। কি সুবাস ! আর কি তার ! সুন্দর ! সে বলিয়া হাত চাটিতেছিল। চাঁপাডাঙার বউকে দেখিয়া হাতখানা পাতিয়া বলিল, তা দেবা নাকি একটুকুন ? তা দাও।

চাঁপাডাঙার বউ বাটিটা নামাইয়া দিয়া অন্য ঘরে জল আনিবার জন্য চলিয়া গেল। রাখাল লম্বা জিভ বাহির করিয়া বাটি হইতে চাটিয়া চাটিয়া গুড় খাইতে লাগিল। হঠাৎ মহাতাপ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল—যেন পলাইয়া আসিল এবং খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হইতে প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে মানদাও পিছন পিছন বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, দেখ দেখ, কি করল দেখ ! কাণ্ড দেখ ! কথাগুলির মধ্যে আদরের সুর। ছলনা করিয়া মিছামিছি কান্নার ভান। মহাতাপ তাহার দুই গালে গুড় মাখাইয়া দিয়াছে। পুলকিত হইয়াই মানু কাঁদিতেছে।

সেই কৌতুকে মহাতাপ খিলখিল করিয়া হাসিতেছে।

রাখালও কৌতুকে খুকখুক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। বড় বউ আসিয়া জলের ঘটিটা নামাইয়া দিয়া বলিল, মানিককে বল চেটে খেয়ে নেবে, পরিষ্কার হঁয়ে যাবে। যাও তো বাবা মানিক, মায়ের গালের গুড় চেটে—

এই রঙ্গ দেখিয়া মানিকও উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সে খুব জোরে জোরে বাঁশি বাজাইতে লাগিল, পু—পু—পু—পু—

পাগল মহাতাপ এই কথা শুনিয়া যাহা করিল তাহাকে অসম্ভব কাণ্ড ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। সে অতর্কিতে তাহার দুই হাতের গুড় বড় বউয়ের গালে মাখাইয়া দিয়া বলিল, তা হলে তোমার গালের আমি চেটে খেয়ে লোব।

রাখাল অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িল।—বলিহারি—বলিহারি—বলিহারি।

ঠিক এই মুহূর্তেই গলা পরিষ্কারের শব্দ তুলিয়া সেতাব বলিল, বলি সব হচ্ছে কি ? অ্যাঁ ! প্রথমেই সে চটিয়া উঠিল রাখালের উপর। বলিল, বলি গুড় খাওয়া হল কবার ? রাখাল !

বলি হা-হা-হা-হা হাসিই বা কিসের ?

রাখাল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, মহাতাপ, বুঝলে কিনা সেতাব, ও আমাদের কি বলে—ওঃ ভারি আমুদে। ওঃ—

সেতাব রুদ্ধ রোষে ভ্যাঙাইয়া বলিল, ওঃ! ওঃ! ভারি আমুদে। দায়ে করে নিজের গলায় কুপিয়ে আমারও আমোদ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমোদ, আমোদ—

মানদা মহাতাপকে বলিল, তুমি মর তুমি মর।

মহাতাপ দুই হাত নাড়িয়া বলিল, কেয়া, হুয়া কেয়া ? আরে, হল কি ?

বড় বউ স্বামীর দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি হানিয়া বলিল, কিছু হয় নি, এস, গুড় বের করে বিক্রির কাজটা শেষ কর। বাইরে লোকেরা বসে আছে। সে ঘরে ঢুকিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভাদ্র শেষ হইয়া গিয়াছে। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহ। পূজার ঢাক বাজিতেছে। 'পূজার ঢাক বাজা' কথাটার মানে পূজার কাজ পড়িয়াছে। পূজার ঢাক সত্য সত্য বাজে বোধনের দিন হইতে। অবশ্য বোধন কোথাও একমাস আগে হয়, কোথাও বা পনেরো দিন, কোথাও বা শুক্লপক্ষের পূর্ববর্তী অমাবস্যায় অর্থাৎ মহালয়ার দিন হইতে। যেখানে যেমন নিয়ম। এখানে বোধনের ঘট আসে মহালয়ার দিন। গ্রামের মধ্যে একখানি পূজা—ওই চণ্ডীমণ্ডপে হইয়া থাকে। কয়েক শরিকের পূজা। বোধনের দেরি আছে। তবুও আশ্বিন পড়িতেই পূজার কাজের ধুম পড়িয়া গিয়াছে পল্লীতে পল্লীতে। কিন্তু আজ ঢাক সত্যই বাজিতেছে। আজ ইঁদপূজা বা ইন্দ্রপূজা। সকাল বেলাতেই ইঁদপূজার স্থানটায় ঢাকী ধুমুল দিতেছে। ইঁদপূজা সরকারী পূজা অর্থাৎ আইনমতে জমিদার মালিক। আইনমতে জমিদার মালিক হইলেও আসল মালিক গ্রামের মণ্ডলেরা। পঞ্চমণ্ডলে পূজার কাজ চালাইয়া থাকে। তাহারাই তত্ত্বাবধান করে, তাহারাই খরচ যোগায়, পরে খরচ জমিদারের খাজনা হইতে হিসাব করিয়া বাদ লইয়া থাকে।

সেতাব ইঁদপূজার বেদীর স্থানটার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। মোটা মোড়ল চণ্ডীমণ্ডপের কিনারায় বসিয়া মোটা একটা হুঁকায় তামাক খাইতেছিল। চণ্ডীমণ্ডপে একখানি একমাটি-করা দশভুজা প্রতিমা শুকাইতেছে। এখনও মুণ্ড বসানো হয় নাই। কতকগুলা উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ ছেলে ঘুরিতেছে এদিক ওদিক। তাহার সঙ্গে মানিকও রহিয়াছে। গোবিন্দ রাখালটা তাহাকে লইয়া আসিয়াছে। মানিককে নামাইয়া দিয়া সে ইন্দ্র-দেবতার বেদীটা গড়িতেছে। দশ-হাত-লম্বা দারুময়-দেহ দেবতাটি একটা বিরাটকায় ফড়িংয়ের মত ঠ্যাং উল্টাইয়া পড়িয়া আছে। মূর্তিটার মধ্যে মূর্তিত্ব নাই, নাক কান চোখের বালাই নাই। দশ-হাত-লম্বা একটা বৃক্ষশাখা, ছালটা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, একদিকে মাথায় ঢেঁকির মত ছোট দুইটা কাঠের

সঙ্গে খিল পরাইয়া গাঁথা; ওই ছোট কাঠ দুইটাকে বেদীতে পুঁতিয়া দেবতাকে টোকো দিয়া উন্নত এবং উধ্বর্শির করিয়া পূজার সময় খাড়া করা হইবে।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে গ্রাম্য রাস্তা। রাস্তার উপর দিয়া চাষীরা চলিয়াছে। কয়েকটি মেয়ে ঝুড়ি করিয়া লালমাটি লইয়া চলিয়াছে। কয়েকজনের মাথায় খড়িমাটি। তাহারা হাঁকিতেছিল—লাল মাটি লেবে গো, লাল মাটি!

খড়িমাটিওয়ালা হাঁকিল—খড়িমাটি চাই, ঘর নিকুবার খড়িমাটি! দুধের মত অং লবেন। খড়িমাটি!

চণ্ডীমণ্ডপ হইতে খানকয়েক বাড়ির পরে শিবকেষ্ট-রামকেষ্টর বাড়ি। শিবকেষ্টর বাড়ির দাওয়া হইতে টিকুরীর খুড়ো উঁকি মারিয়া মুখ বাড়াইয়া সমান জোরে হাঁকিয়া প্রশ্ন করিল, কি লা? কি?

—মাটি গো, মাটি।

—লাল মাটি, খড়িমাটি।

খুড়ী মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিল, মাটি গো মাটি! লাল মাটি! খড়িমাটি! মাটি নিয়ে কি বুকে চাপাবে লোকে? মাটি গো মাটি! ঘরে চাল সেজে না, (অর্থাৎ সিদ্ধ হয় না) লোকে তা বোঝে না। ঘরে ধান নাই, চাল নাই, খাবার নাই; যার ঘরে ধান ছিল লেবি না মেবি করে নিয়ে গেল (লেভিপ্রথা)। যার আছে সে লুকিয়ে রেখেছে। ঘর নিকুবে! লোকে রঙ করবে! মরণ!

—তা মাটি না লিলে মোরা খাব কি?

—কি খাবি তা আমি কি জানি? আমি কি খাব, পঞ্চায়েত ভেবেছে? জমি দিয়েছে আমাকে? সেই পাপেই হচ্ছে এসব। গতবারে পোকা লেগেছিল ধানে। এবারে শুকোতে যাবে। শুকিয়ে যাবে, ধান ফুলোবে না। ফুললে শুকিয়ে তুষ হবে। আর জল হবে না। আর জল হবে না। ঠায় দাঁড়িয়ে ধান মরবে। দেখবি! টিকুরীর বউ যেন নাচিতেছিল। সর্বাঙ্গ দোলাইয়া সুর টানিয়া টানিয়া কথা বলিতেছিল। আনন্দ যেন তাহার ধরিতেছে না।

মাটিওয়ালী মেয়েগুলা তাহার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। একজন ঠিক তাহারই মত সুর করিয়া বলিল—তা হবে না মোল্যান, আর সিটির জো নাই। ক্যানেল এয়েছে। মৌরক্ষী বেঁধেছে। পাকা দেওয়াল দিয়ে গো, লোহার ফটক বেঁধে। ফটক বন্ধ করলেই জল চলে আসবে।

—আসবে না, আসবে না, আসবে না; ঘোঁতন বলেছে আসবে না। খালের ভেতর গোভাল পড়ে জল চলে যাবে পাতালে। লয় তো বাঁধ ভেঙে যাবে। লয় তো সি জলে ধান বাঁচবে না। বাঁচলে পচে যাবে, লয় তো পোকা লাগবে। ধান হবে না, তুষ হবে। ঘোঁতন বলেছে।

একটি মেয়ে বলিল, ঘোঁতন ঘোষের অমনি কথাই বটে! বলে, হরিনামের নিকুচি করি আমি।

খুড়ী খ্যাক করিয়া উঠিল—ঘোঁতন ঘোষের অমনি কথাই বটে! ঘোঁতন নেকাপড়া জানে। বিদ্যে আছে পেটে। হোত-ত্যা-ত্যা করে না। এক নজরে ধরতে পারে। আমাকে সেদিন বলেছিল, ভাবলী। রেগেছিলাম আমি। হুঁ বাবা। তা ভাবলীই হলাম আমি। ভাজের গায়ে গুড় মাখিয়ে চেটে খায়! মা গো! কোথায় যাব! বলিতে বলিতে হঠাৎ সে থামিয়া গেল। কণ্ঠস্বর খাটো করিয়া বলিল, অ—মা! মহাতাপ আসছে যে। গোঁত গোঁত করে আসছে দেখ্, বুনো শুয়োর আসছে। অ—মা, হারামজাদী রাঙীকে ধরে আনছে ক্যানে। এই মরেছে। সঙ্গে আবার মোটা মোড়ল।

সে ঘরে ঢুকিয়া গেল। মেয়ে কয়টা এ উহার মুখের দিকে চাহিয়া চলিতে শুরু করিল। একজন হাঁকিয়া উঠিল—মাটি চাই মাটি, রাঙামাটি, খড়িমাটি।

মহাতাপ একটা গোরুর গলায় দড়ি বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছিল; সোজা টিকুরীর খুড়ীর বাড়ির সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিয়া বলিল, তোমার গোরু আমি খোঁয়াড়ে দিতে চললাম। গোরু ভগবতী না হলে, এ যদি ছাগল-ভেড়া হত তো ওকে মেরেই ফেলতাম আমি।

পিছনে পিছনে মোটা মোড়ল বিপিনও আসিয়াছিল। সে গোরুর দড়িটা হাতে লইয়া বলিল, চেঁচাস নে। যা বলবার আমি বলছি।

—তুমি কি বলবে? আমার এক ভিলি আকের নেতা মেরে দিয়েছে। কিছু রাখে নাই। ওটা গোরু, আর মালিক হল বিধবা মেয়েছেলে, আমি কি করব বল দিকি নি?

নিজের চুলগুলা টানিয়া কঠিন আক্রোশে ক্ষোভে বলিয়া উঠিল, আমার চুল ছিঁড়ে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমার অমন ভাল আক, লকলকে কষকষে হয়ে উঠেছিল—

বিপিন ডাকিল, টিকুরীর বউ! বেরিয়ে এস বাছা। শোন!

টিকুরীর বউ বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, কি শুনব? আমি কারু কথা শুনি না। সব মিছে কথা। আমার রাঙীকে আমি কখনও বাঁধি না। দিব্যি মাঠে ঘুরে চরে এসে ঘরে ঢোকে। আমি বিধবা মানুষ, আমি বেঁধে খেতে দিতে পাব কোথা? যারা ফসল আজায়, তারা বেড়া দেয় না ক্যানে? ক্ষেতে যখন যায় তখন হেটহেট করে তাড়িয়ে দেয় না ক্যানে?

বিপিন বলিল, তুমি ক্ষেপেছ নাকি? কি সব বলছ—

—ঠিক বলছি। দাও, আমার গোরু দাও। আমি ভাশুর বলে খাতির করব না। আমি মোড়ল বলে মানব না। খোঁয়াড়ে দেবে! অঃ!

সে আগাইয়া গেল গোরুটা বিপিনের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইবে বলিয়া। মহাতাপ অবাক হইয়া এতক্ষণ খুড়ীর দাপট দেখিতেছিল। সে এবার হাঁক দিয়া উঠিল, কভি নেহি। দাও, গোরু দাও। বলিয়া ঝটকা মারিয়া দড়িটা বিপিনের হাত হইতে কাড়িয়া লইল।—খোঁয়াড়ে দোব আমি।

গোরুটাকে সে টানিতে লাগিল।

টিকুরীর খুড়ী গাছকোমর বাঁধিয়া বলিল, ওরে, আমি তোর পারবারের মত ম্যানমেনে নই। তোর হাঁকারিকে আমি ভয় করি না—

সে আগাইয়া গিয়া মহাতাপের হাত হইতে গোরুটা ছিনাইয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইল। মহাতাপ গ্রাহ্য করিল না। সে টানিতে লাগিল গোরুটাকে।

—আয়, আয়।

টিকুরীর খুড়ী বলিয়াই চলিয়াছিল—আমি ঘরের কোণে চোখের জল ফেলব না। লাজের চড় গাল পেতে খেয়ে মনের দুক্ষু মনেই রাখব না। আমি দরখাস্ত করব। হ্যাঁ, দরখাস্ত করব। এখুনি ঘোঁতনের কাছে যাব।

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে শিবকেষ্ট টলিতে টলিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, মহাতাপ। ভাই! আমি হাত জোড় করছি, মিনতি করছি। আমার জ্বর, ঘরে পয়সা নাই, ধানচালও নাই। খোঁয়াড়ে দিলে, ছাড়াতে হবে আমাকে। নবগ্রাম হাঁটতে হবে। পয়সা লাগবে। আমার দশা দেখ। গোরুটা ছেড়ে দে ভাই।

মহাতাপ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

বিপিন বলিল, দে, গোরুটা ছেড়ে দে বাবা।

মহাতাপ বলিল, আহা-হা শিবে, তু যে মরে যাবি রে! অ্যাঁ! আহা-হা-হা রে, কি দশা হয়েছে তোর?

শিবকেষ্টর দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা ছিল না, সে উপুড় হইয়া বসিয়া হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া দুই হাতে মাথা ধরিয়া বলিল, জ্বরে একেবারে হাড় ভেঙে দিলে রে! তিনখানা কাঁথাতে কাঁপন থামে না। গোরুটা ছেড়ে দে ভাই।

খুড়ী আগাইয়া আসিয়া মহাতাপের শিথিল হাত হইতে গোরুর দড়িটা টানিয়া লইয়া বলিল, দেবে আর ভাল বলবে। দেবে না?

মহাতাপ গোরুটা ছাড়িয়াই দিল, বলিল, আজ ছেড়ে দিলাম শিবের মুখ চেয়ে। ফের দিনে কিন্তু ছাড়ব না।

খুড়ী বলিল, শিবের মুখ চাইতে হবে না। যার মুখ চাইলে ধর্ম হবে, তার মুখ চেয়ে দেখ-গে! ভাজের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিজের পরিবারের মুখের পানে তাকাগে যা! শিবের মুখ! মরণ!

খুড়ী গোরুটা লইয়া চলিয়া গেল।

বিপিন মোড়ল শিবকেষ্টকে বলিল, টিকুরীর বউকে নিয়ে বিপদ হল শিবু! ওকে সাবধান করিস।—কথাগুলি ভাল কথা নয়। বলিয়া চলিয়া গেল।

শিবকেষ্ট মাথার উপর হাতটা উল্টাইয়া দিল। সে কি করিবে?

মহাতাপ হাত বাড়াইয়া শিবকেষ্টকে বলিল, ওঠ্, আমাকে ধরে ওঠ্।

শিবকেষ্ট ধীরে ধীরে উঠিল।

মহাতাপ তাহাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। খুড়ী যেন কী কথাটা বলিয়া গেল! কি ভাজের মুখ! পরিবারের মুখ! কি সব বলিল! শিবকেষ্টর অবস্থা দেখিয়া সে তখন এমনই অভিভূত হইয়াছিল যে, কথাটা ঠিক শুনিয়াও বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। এতক্ষণে কথাটা মনে হইল। কি বলিল? সে হাঁকিয়া ডাকিল —এই, এই খুড়ী, এই বিষমুখী টিকুরীর খুড়ী! বলি শুনছ?

খুড়ী ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিল—কেন রে—ড্যাকরা? বলি বলছিস কি?

—কি বললে কি তখন? আর একবার বল দিকিন? কি ভাজের মুখ—বউয়ের মুখ —কি বলছিলে?

টিকুরীর খুড়ী হাসিয়া বলিল—তোমাদের বড় বউয়ের মুখখানি বড় সুন্দর রে, চাঁদের পারা। তাই বলছিলাম। তোর বউয়ের মুখ কিন্তু এত সুন্দর নয়, তাই বলছিলাম আমি।

মহাতাপ খুশী হইয়া গেল। সে উচ্চকণ্ঠে সমর্থন করিয়া বলিল,—হাজার বার লক্ষ বার। এ তুমি ঠিক বলেছ। আমি বলি কি বলছ! নাঃ, এ তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু এবার গোরু সামলে রেখ। তা বলে গেলাম। সে হনহন করিয়া মাঠে চলিয়া গেল। স্তব্ধ দ্বিপ্রহর তখন। মাঠে ধান ভরিয়া উঠিয়াছে। নিড়ান চলিয়াছে। নিদারুণ রৌদ্রের মধ্যে ধানের ক্ষেতে হামাগুড়ি দিয়া আগাছা তুলিয়া চলিয়াছে চাষীরা। দূরে তখনও মাটিওয়ালীদের হাঁক শোনা যাইতেছে।—মাটি, মাটি চাই গো! মাটি, লালমাটি—খড়িমাটি!

•

সেতাবের বাড়িতে সেদিন দুপুরে ঢেঁকিতে ছোলা কলাই কুটিয়া বেশম তৈয়ারী হইতেছিল। বেশম হইতে সেউই ভাজিয়া গুড়ে পাক করিয়া পূজার নাড়ু হইবে। দুইজন ভানাড়ী মেয়ে ঢেঁকিতে পাড় দিতেছিল, ঢেঁকির মুখে নাড়িয়া-চাড়িয়া দিতেছিল।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর বেলা, বাড়িটা নির্জন। বড় বউকে দেখা যাইতেছে না। এই নির্জনতার মধ্যে তাহারা গান গাহিতেছে। মানদা গাহিতেছে মূল গান, মেয়েগুলি গাহিতেছে ধুয়া।

মেয়েগুলি ধুয়া গাহিতেছিল—

আমার বাজুবন্ধের ঝুমকো দোলায়
বঁধুর মন তো দুলল না,
ও-তার সিঁথিপাটির লালমানিকের
ছটাতে চোখ খুলল না
হায় সখি, লাজে মরি লাজে মরি গো!

মানদা গাহিল—

আমার মন যে দোলন খেলে
ও-তার বনমালার দোলাতে।
আমার মন সেই গেল ভুলে,
তারে এসে ভুলাতে।

ভানাড়ী মেয়েগুলি আবার ধুয়া ধরিল—

আমার বাজুবন্ধের ঝুমকো দোলায়
বঁধুর মন তো দুলল না!
হায় লাজে মরি লাজে মরি লাজে মরি সখি গো!

মানদা আবার গাহিল—

মন কাড়িতে এসেছিলাম
মন হারায়ে ঘর ফিরিলাম—
লাজে গলার চিক মাদুলি পড়ল ছিঁড়ে ধূলাতে।

সঙ্গে সঙ্গে ভানাড়ীরা ধরিল—

হায় লাজে মরি লাজে মরি লাজে মরি সখি গো!

মানদা আবার গাহিল—

খুলতে গেলাম বাজুবন্ধ বাঁধন যে সেই খুলল না।
ভুলতে গেলাম তারে সখি ভুল যে মোকে ভুলল না।
কালনাগে ধরতে গেলাম—
কালীয়ারে জড়াইলাম—
মারতে গিয়ে অমর হলাম জনমতে জলন জ্বালাতে!
—লাজে মরি লাজে মরি লাজে মরি সখি গো!

রাধাকৃষ্ণের লীলার স্পর্শ জড়াইয়া এমন ধরনের প্রেমের গান বাংলার পল্লী অঞ্চলে কালে কালে কালোপযোগী ভাষায় ছন্দে উপমায় রচিত হইয়া আসিতেছে। এ ভাব পুরানো হয় না। নূতন ভাষায় নবীন হইয়া দেখা দেয়। সকল কালেই পুরবধূরা এ গান—বাউল বৈরাগী পাঁচালীদল, যাত্রার দলের গায়কদের কাছে শুনিয়া শিখিয়া লয়। কালে কালে এই ভাবে নির্জন দ্বিপ্রহরে গাহিতে থাকে। ঘরে গায়—ঢেঁকিশালে, ঘাটে গায়—জলে গলা ডুবাইয়া, সখিরা মিলিয়া জল আনিবার পথে গায়।

গানের মধ্যেই দরজায় ধাক্কা পড়িল। কেহ শিকল বাজাইয়া দরজার ও-পাশে সাড়া দিতেছে। মানদা সেদিকে তাকাইয়া বলিল, কে?

মেয়েলি গলায় সাড়া আসিল, একবার দরজাটা খোল।

মানদা ভানাড়ীদের একজনকে বলিল, দে তো লা খুলে।

মেয়েটি দরজা খুলিয়াই বলিল, অ। পুঁটি মোল্যান! মানদার দিকে তাকাইয়া বলিল, যৌতন ঘোষের বুন গো! বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

পুঁটি বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া বলিল, ওরে বাপরে। এ যে পুজোর ধুম পড়ে গিয়েছে যে! খুব কলাই কুটছ! খুব গান জুড়েছ!

মানদা মুখ চমকাইয়া বলিল, তা কুটছি। কিন্তু তুমি কি মনে করে হে? এই ভত্তি দুপুরে?

—বড় বউ কই ? চাঁপাডাঙার দিদি ? একটা কথা বলতে এসেছি।

মানদা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কি কথা হে ?

—না ভাই, সে আমি তাকেই বলব। আমার মা ব'লে পাঠিয়েছে, অন্ত কাউকে বলতে বারণ করেছে।

—আমি জানি হে, আমি জানি। গয়না তো ? টাকা ?

—তা জানবে বইকি ভাই। তুমি অদ্ধেকের মালিক। জানবে বইকি। তবে আমি চাঁপাডাঙার দিদিকে বলে যাই ; তুমি তার কাছে শুনো। কই, দিদি কোথায় ?

মানদা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, ধান সেদ্ধ করছে, ওদিকের চালায়।

পুঁটি আগাইয়া গেল।

মানদা হাতের কুঁচিগাছটা লইয়া বলিল, ললাটে তিন ঝাঁটা মারতে মন হয়—তিন ঝাঁটা।

বাড়ির আর একদিকে খোড়ো চালায় উনান হাঁড়িতে ধান সিদ্ধ হইতেছিল। ছোট এক টুকরা উনান, সেখানে সিদ্ধ-করা ধান মেলা রহিয়াছে। একটি মজুর মেয়ে পায়ে পায়ে ধানগুলি টানিয়া ওলট-পালট করিয়া বেড়াইতেছিল। চাঁপাডাঙার বউয়ের কাপড়খানা ময়লা, ধোঁয়ায় কালো। গাছকোমর বাঁধিয়া কাপড় পরা। মাথায় ঘোমটা নাই। চুলগুলি রুখু দেখাইতেছে। এখনও স্নান হয় নাই। মুখ-চোখ আগুনের আঁচে এবং এখনও অস্নাত অভুক্ত বলিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। একটু বেশী কালো দেখাইতেছে।

পুঁটি গিয়া একটু অবাক হইয়াই বলিল, তোমার কি অসুখ করেছে নাকি দিদি ? এ কি মুখ হয়েছে তোমার ? যেন বড় অসুখ থেকে উঠেছ ? সে সকরুণ বিস্মিত দৃষ্টিতে কাদুর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—পুঁটি ? পুঁটিকে দেখিয়া বড় বউ একটু বিস্মিত হইয়া গেল।—এমন অসময়ে ?

—মা পাঠালে তোমার কাছে। কিন্তু—

—সইমা ? কেন রে ? অসুখ শুনেছিলাম সইমায়ের— ; শঙ্কিত হইয়া উঠিল সে। পুঁটি কি তবে টাকা পয়সার জন্ম আসিয়াছে !

—উঠেছে অনেক ভুগে। কিন্তু তোমার এমন চেহারা কেন ?

এবার সলজ্জ হাসিয়া বড় বউ বলিল, উপোস কিনা আজ ! তার উপর—

—উপোস। ইদপুজোর ?

—না, আজ সংক্রান্তি। সংক্রান্তিতে কালীর উপোস করি।

—কালীর কবচ নিয়েছ বুঝি দিদি ? ছেলের জন্তে ?

—হবে না জানি, তবুও নিয়েছি। চাঁপাডাঙার বউ হাসিল—বড় বিষণ্ণ সে হাসিটুকু। উপবাসশুষ্ক মুখে ঠোঁটের সে হাসিটুকু অনাবৃষ্টি আকাশের বর্ষণহীন বন্ধ্যা মেঘের ক্ষীণ বিদ্যুৎ-রেখার মতই বিশীর্ণ।

পুঁটি বলিল, তুমি কলকাতায় গিয়ে ডাক্তার দেখাও না কেন দিদি ? ওই তো বাবুদের

গাঁয়ের রবীনবাবুর বউ কলকাতায় গিয়ে কি সব চিকিৎসা করালে—দিব্যি বছর না ঘুরতে ছেলে হয়েছে।

বড় বউ বলিল, ওসব বাবুদের যা হয় তাই কি আমাদের হয়, না সাজে? এখন কি বলেছে সইমা বল্?

পুঁটি বলিল—কেন কাদু দিদি, জামাই মোড়লের পয়সা তো অনেক। বাবুদের চেয়ে কম নয়। তবে কেন হবে না? না-না, তুমি ধর। তুমি কলকাতায় যাও।

কাদু বলিল—টাকা খরচ করবে তোর জামাই মোড়ল? তার থেকে সে নতুন বিয়ে করবে!

পুঁটি সভয়ে যেন চাপা গলায় চীৎকার করিয়া উঠিল—না—কাদুদি না।

কাদু হাসিয়া ফেলিল পুঁটির এমন ভয় দেখিয়া। হাসিয়া বলিল—মরণ। ভয় দেখ ছুঁড়ির। ভয় নেই, তাও পারবে না তোর জামাই মোড়ল। দুটো বউকে ভাত দিতে হবে না? তাতে খরচ কত জানিস?

পুঁটি স্তব্ধ হইয়া কাদুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কাদু হাসিয়াই প্রশ্ন করিল—কি—এমন করে চেয়ে রয়েছিস কেনে?

পুঁটি বলিল—ব্যাটাছেলেদের জান না দিদি, ওদের ঝোঁক চাপলে—ওরা সব পারে।

—ব্যাটাছেলেদের খবর তুই এত জানলি কি করে লা?

যেন অপ্রতিভ হইয়া গেল পুঁটি। পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—চোখের উপর দেখছি দিদি।

—তোর দাদাকে?

—হ্যাঁ। আরও কতজন দেখছি।

—মরুক গে। যে যা করছে করুক। তোর কেপন জামাই মোড়ল আর যা করবে করুক—এ কাজ করবে না। এখন সইমা কি বলেছে বল্।

পুঁটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, কাদুর শেষ কথায় চমকিয়া উঠিল—একটু আড়ালে চল দিদি।

—আড়ালে? আয়।

পুঁটিকে লইয়া সে একটা ঘরে ঢুকিল। জিজ্ঞাসা করিল, কি রে?

—জান কি না জানি না, তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার দাদার আজকাল খুব মাখামাখি। হঠাৎ অঘটন ঘটেছে যেন। মোড়ল প্রায় যায় দাদার কাছে।

চমকিয়া উঠিল চাঁপাডাঙার বউ। কিন্তু সে বড় শক্ত মেয়ে। মুহূর্তে আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিয়া বলিল—তোর দাদার কাছে যায়? তাতে কি হল? তোর দাদার সঙ্গে এককালে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল বলে, চিরকালই কি আক্রোশ থাকবে না কি?

—তুমি আমার দাদাকে জান না চাঁপাডাঙার দিদি।

—দাদার ওপরে এত রাগ ক্যানে রে? বিয়ে দেয় না?

মরণ আর কি, বিয়ের জন্তে ভাবি নে। কথাটা কিন্তু আমার নয়, মায়ের। মা বলে দিলে। দাদা বড় মোড়লকে ঠকাচ্ছে। রাখহরি দত্তের ছেলের সঙ্গে জোট করে ফাঁদ পেতেছে। দু ভরির গয়নার ভেতর লোহার তার ভরে, সীসের টোপা ফেলে, চার ভরি ওজন দেখিয়ে বাঁধা দিচ্ছে। মা বললে—আমার সইয়ের মেয়ে, তারপরে মহাতাপ এবার ধান ছেড়ে দিয়ে উপকার করেছে, তাতে এসব জেনে-শুনে চুপ করে থাকলে আমার ধর্মে সইবে না। তোমার স্বামী সেই লোভে মজেছে দাদার সঙ্গে।

—সে তো ভাই স্যাকরাকে দেখিয়ে শুনিয়ে নেয় নিশ্চয়।

—না। নেয় না। সেই তো! মা বললে—কিসে যে সেতাবকে ও বশ করলে ভগবান জানেন। কাল দুশো টাকা দিয়ে একজোড়া ক্লায়ফোরের অনন্ত বাঁধা রেখেছে। তার ভেতরে নাকি দুটো লোহার সরু শিক ভরা আছে। মা নিজের কানে শুনেছে। সে গয়না না ভাঙলে ধরা যাবে না।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল—বলব আমি তাকে। সে আসুক।

পুঁটি বলিল, আমার নাম কোরো না দিদি। দোহাই তোমার! তা হলে দাদা আমাকে—

—তোকে মারে নাকি পুঁটি?

পুঁটি হাসিল, বলিল, ও কথা ছেড়ে দাও। আর একটা কথা বলি—

চাঁপাডাঙার বুউ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পুটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পুঁটি বলিল—যা করে হোক তোমার স্বামীকে ওর সঙ্গ ছাড়াও। নইলে তোমার ঘর থাকবে না। ভেঙে দেবে। নিশ্চয়ই ভেঙে দেবে। বড় মোড়ল আমাদের বাড়ি যায়, গুজগুজ করে দাদার সঙ্গে। আমার ভাল লাগে না। হয় তোমার নিন্দে, নয় ছোট মোড়লের নিন্দে! বড় মোড়ল মধ্যে মধ্যে বলে, ইচ্ছে হয় কি জান যৌতন—ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়ে যাই, নয়তো আগুন লাগিয়ে দিই ঘরে। তোমার স্বামী আর সে মানুষ নাই দিদি। তুমি সাবধান হও।

বড় বউ বিস্ফারিত নেত্রে সম্মুখের শরৎকালের গাঢ় নীল মধ্যাহ্ন আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। সেখানে ছোটবড় হালকা মেঘের পুঞ্জগুলি ভাসিয়া মন্থরগতিতে যাইতেছিল। পুঞ্জ পুঞ্জ হালকা দুধের মত রঙের নব লক্ষ গাভীর পাল। আকাশগঙ্গার অসীম-বিস্তার কোমল নীল তটভূমিতে স্বচ্ছন্দ চারণে মন্থরগতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রৌদ্রে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ দুই-একটার গায়ে—একেবারে মাঝখানে হয়তো ঈষৎ কালো রঙের আমেজ। যেন দধিমুখী ধবলী গাইটার পিঠে টুকরাখানেক কালো রঙের বিচিত্র সমাবেশের মত। ছোট ছোট টুকরাগুলা যেন লাল্কী বাছুর, বড় মেঘের টুকরার চেয়ে ওইগুলা ছুটিতেছে দ্রুততর বেগে। প্রাণের আবেগে পিঠে লেজ তুলিয়া আকাশের অঙ্গনময় দাপাদাপি করিয়া ফিরিতেছে।

বাইরে একটা গাই ডাকিয়া উঠিল।

সেই ডাকে বউয়ের চমক ভাঙিল। পুঁটি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। গরবিনী

চাঁপাডাঙার বউয়ের নিজের মনে হইল—সে এক মুহূর্তে যেন কত গরীব হইয়া গিয়াছে। পুঁটি তাহার সে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি বলিল—আমি যাই, দিদি।

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। চাঁপাডাঙার বউ তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, পুঁটি!

পুঁটি তাহার দিকে সবিস্ময়ে তাকাইয়া বলিল—কি? চাঁপাডাঙার বউয়ের দৃষ্টি যেন কেমন! ভাদ্রের ভরা দীঘির মত তাহার চেহারা। কূলে কূলে ভরা অথৈ জলতল হইতে যেন কোন একটা জলচারী নড়িয়া উঠিতেছে। সে নড়ায় উপরটায় কাঁপন জাগিয়াছে।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল—অত্যন্ত চাপা স্বরে, আমার স্বামী আর সে মানুষ নাই? আমার নিন্দে করে? কি নিন্দে করে পুঁটি? আমি কি করেছি? কি বলে?

পুঁটি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, সে ভয় পাইয়া গিয়াছিল; সভয়ে হাত টানিয়া লইয়া সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানি না চাঁপাডাঙার দিদি, আমি জানি না।

সে এক রকম ছুটিয়াই পলাইল। যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, গুজগুজ করে কথা বলে দিদি। শুনতে পাই না। শুনতে পাই না। কিন্তু অনেক কথা—অনেক কথা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইহার পর প্রায় এক মাসের উপর চলিয়া গিয়াছে। পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। ষষ্ঠীর দিন। চণ্ডীমণ্ডপে যথানিয়মে ঢাকের সঙ্গে ঢোল সানাই কাঁসী আসিয়া পূজার সুর জমাইয়া তুলিয়াছে। দেশে অন্নের অভাব, কাপড়চোপড় দুর্মূল্য, এসব সত্ত্বেও পূজার সুর একেবারে কাটিয়া যায় নাই। আগেকার কালে এ সুর একটা দেশব্যাপী ঐকতানের ঝঙ্কার তুলিত, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌঁছিয়া সে গ্রামের বাজনার সঙ্গে সুর মিলাইত। আজ সুর ওঠে, কিন্তু সে সুর ঐকতান তুলিতে পারে না; গ্রামের প্রান্তদেশ পর্যন্ত গিয়া গ্রামান্তরের মধ্যবর্তী মাঠের সীমানার মুখেই এলাইয়া পড়ে। সেদিন বেলা তখন প্রহরখানেক, নবগ্রামের বাজারে কাপড় কিনিতে গিয়াছিল সেতাব। কেনা-কাটা শেষ করিয়া ফিরিবার পথে ঘোঁতনের দলিজায় উঠিল। পুঁটি সত্য সংবাদই দিয়াছিল; ঘোঁতনার সঙ্গে সেতাবের এখন খুব মাখামাখি। নবগ্রামের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক-শ্রেণীর অর্থাভাব ক্রমশই দারুণ হইতে নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। সকলের আগে এ অবস্থায় তাহারা গহনা বন্ধক দিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। প্রাণ ধরিয়া বিক্রয় করিতে পারে না। ঘোঁতন এই কারবারটায় সেতাবকে ঢুকাইয়া দিতে সাহায্য করিতেছে।

ঘোঁতন বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল। কোথায় পূজামণ্ডপে সানাই বাজিতেছে। দাওয়ার পাশেই একটা শিউলিগাছের তলায় শিউলি ঝরিয়া পড়িতেছে।

সেতাব আসিয়া দাওয়ায় উঠিতেই সে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বসাইল। বিড়ি দিল। সেতাবের বগলে একটি বাণ্ডিল, হাতে একটি পোঁটলা। বিনা ভূমিকাতেই সে ঘোঁতনের হাতে দিয়া বলিল, দেখ দিকি, ছেলেগুলার গায়ে হয় কি না।

পোঁটলা খুলিয়া ঘোঁতন দেখিল, কয়েকটা ফ্রক জামা, দুইখানা শাড়ি, একখানা ধুতি, একখানা থান কাপড়, দুইটা ব্লাউজ ও একটা সার্ট। ঘোঁতন বুঝিল, এগুলি তাহার জন্যই লইয়া আসিয়াছে। সে দন্ত বিস্তার করিয়া বলিল, দাঁড়াও, দিয়ে আসি বাড়িতে, বুঝলে।

পোঁটলাটা লইয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল।

সেতাবের উবু হইয়া বসা অভ্যাস। সে হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া মাথায় এক হাত দিয়া অন্য হাতে বিড়ি টানিতে লাগিল।

পথের উপর দিয়া কয়েকটা গরু লইয়া একটা রাখাল চলিয়া গেল। তাহার পিছনে বহুবল্লভ বাউল একতারা এবং কোমরে গামছা বাঁধিয়া টুংটুং শব্দ তুলিতে তুলিতে যাইতেছিল। বহুবল্লভ সেতাবকে দেখিয়া বলিল, বড় মোড়ল এখানে বসে?

সেতাব বলিল, বলি তার কৈফিয়ত তোকে দিতে হবে নাকি?

বহু বলিল, কাপড় কিনতে এসেছিলে?

সেতাব বিড়িতে টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, উঁহু, আকাশের তারা গুনতে এসেছিলাম।

বহু বৈষ্ণব মানুষ, রাগ তাহার নাই; সে হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল, দিনের বেলায়?

সেতাব বলিল, রেতের বেলা পথে সাপ-খোপ শেয়াল কুকুর; রেতের বেলা নিজের বাড়িতে তারা গুনি। নবগেরামের আকাশের তারা দিনে গুনতে আসাই ভাল!

—তা দিনে তারা দেখবার সময় তোমাদের বটে! যা ধান জমেছে তোমাদের! আঃ, যেমন কালো কবকবে রঙ, তেমনি গোছ! তা মহাতাপ একটা মরদ বটে! ক্ষ্যামতা ধরে বটে!

সেতাব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ফতুয়ার পকেট হইতে একটা পয়সা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, যা যেখানে যাবি চলে যা। বকর বকর করে কানের পোকা মারিস না আমার। মেজাজ খারাপ করে দিস না।

হরিব-ল—হরিব-ল!—বলিয়া পয়সাটি কুড়াইয়া কপালে ঠেকাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, তা মেজাজ খারাপ হবার কথা বটে! আঃ, আকাশ খাঁ খাঁ করছে। মেঘের চিহ্ন নাই। তোমার উ মাঠে এখনও ক্যানেল আসে নাই। জল না হলে এমন বাহারের ধান সব মরে যাবে। আঃ! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, তা, ভেবো না, জল হবে। এই পুজোতেই হবে জল।

—না, হবে না।

বহু চমকাইয়া উঠিল কথার সুর শুনিয়া।

সেতাব আবার বলিল, একেবারে শুকিয়ে খড় হয়ে যাবে। জলে যাবে।

বঙ্কু বলিল, না না না। হবে। ভগবান তা করবেন না। না না। দেবেন দেবেন। মা ভগবতী আসছে—ভোগ খাবেন, মুখ ধোবেন না, এই হয়? হে মা, জল দাও। জল দিয়ে সৃষ্টি রাখ মা।

সেতাব বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাওয়ার উপর ঘরের দরজার মুখে গিয়া ডাকিল, ঘোঁতন! ও ঘোঁতন!

বঙ্কু আর দাঁড়াইল না, সে চলিয়া গেল।

ঘোঁতন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। সে ইহার মধ্যে নতুন জামাটা পরিয়া ফেলিয়াছে। হাসিয়া বলিল, দেরি হয়ে গেল। চা করতে বললাম। দুধ নাই ঘরে, পুঁটি গেল দুধ আনতে।

—জামাগুলো গায়ে হল ছেলেগুলার?

—হয়েছে। তোমার চোখ আছে হে!

—তা বউয়ের, পুঁটির কাপড় পছন্দ হয়েছে?

—বউয়ের হয়েছে, পুঁটির কথা জানি না। ঝাঁটাখাগী আবার কথা বলে না। ওই এক রকম। বড় বজ্জাত হে।

—না না। বড় কাজের মেয়ে। ভাল মেয়ে।

—বউ কিন্তু হাসছিল।

—ক্যানে, হাসির কথাটা কি এর মধ্যে?

—সেই চাঁপাডাঙার বউয়ের সঙ্গে আমার ছেলেবেলায় বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, সেই নিয়ে ঠাট্টা করছিল। সতীনের আড়ি প্রেম হল শেষে!

সেতাব একটু হাসিল, তারপর সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, তুই ভাগ্যিবান ঘোঁতন। তোর ভাগ্যি ভাল। অনেক ভাগ্যি তোর।

তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ওই ওর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়নি ঘোঁতন, তুই বেঁচে গিয়েছিস।

ঠিক এই সময় ঘোঁতনের মা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, ধনে পুত্রে তোমার লক্ষ্মীলাভ হোক বাবা, কিন্তু এত টাকার জিনিস তুমি না দিলেই পারতে। এমন মিষ্টি কথাগুলি বলিলেও তাহার কণ্ঠস্বর কেমন বিরস। কেমন যেন বেসুর বাজিতেছে।

সেতাব চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, সইমা।

—হ্যাঁ বাবা।

—ঘোঁতনের ছেলে কাঁদছিল দেখে গেলাম, তা বলি—

—তা ছেলেদের দিলেই হত। এই বাজার। তার ওপর, কিছু মনে কোরো না, তোমার ভাই-ভাজ নিয়ে সংসার—

ভাই-ভাজ। সেতাব রাগিয়া উঠিল।—ভাই-ভাজের কি আছে এতে? আমি দোব আমার অংশ থেকে। তার ছেলে আছে। আমার ছেলে নাই, পুলে নাই। আমার খাবে

কে ? কি করব আমি ? কি দরকার আমার ঘুগিয়ে ?

—কান্তুকে বলেছ বাবা ?

—কান্তুকে ? চমকাইয়া উঠিল সেতাব। মাথা হেঁট করিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না, তাহাকেও বলে নাই।

—তুমি বাবা, আমার আর পুঁটির কাপড় দু জোড়া নিয়ে যাও।

—নিয়ে যাব ?

—হ্যাঁ।

—মা! চীৎকার করিয়া উঠিল ঘোঁতন।

মা তাহাতে দমিল না। বলিল—কথা হবে বাবা। হবে নয়—হয়েছে। টিকুরীর বউ—সে থামিয়া গেল। একটু পর যেন শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিল—টিকুরীর বউ আমাকে কাল বলছিল, সেতাব খুব আসছে যাচ্ছে। কনেও খুঁজছে। তা—পুঁটিকে—। আবারও সে থামিয়া গেল।

সেতাব বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঘোঁতনের মায়ের দিকে চাহিয়া রহিল। এই কথাটাই যেন তাহার একান্তভাবে মনের কথা—অথচ এই মুহূর্তের পূর্বেও তাহার মন কথাটি হাতড়াইয়া পায় নাই। হ্যাঁ, সে সন্তান চায়। কাদু বন্ধ্যা; সে তাহার প্রতি একান্তভাবে অনুরক্ত আসক্ত—তাহার প্রতি প্রেমপ্রীতিতে অভিষিক্ত স্ত্রী নয়। কাদু মহাতাপ মহাতাপ করিয়া সারা। তাহার প্রথম যৌবন অর্থোপার্জনের নীরস কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে উপবাসী রহিয়া গিয়াছে। বহুজনের বঞ্চনায় কৈশোরে সে নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া সংসারকে কুটিল অবিশ্বাসী হিসাবেই দেখিয়াছে। ঘোঁতন তাহার মনে সন্দেহ জাগাইয়া দিয়াছে। টিকুরীর খুড়ী তাহাতে বাতাস দিয়াছে। অবিশ্বাস তাহার জাগিয়াছে। এই লগ্নে পুঁটি আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়াছে। যুবতী মেয়ে। বিবাহ হয় না। বড় দুঃখী। এই তো—ইহাকে বিবাহ করিলে এ তাহাকে পরম কৃতজ্ঞতায় আঁকড়াইয়া ধরিবে। আজ সব কথাগুলি এক কথায় পরিষ্কার হইয়া গেল। সে বলিতে গেল—চোখ তাহার জলজল করিয়া উঠিল—বলিতে চাহিল—হ্যাঁ। আমি পুঁটিকে চাই। আমি আমার সব—সব তাহাকে দিব—।

কিন্তু বলা হইল না।

ঠিক এই সময়েই সেতাবের রাখাল গোবিন্দ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, মোড়ল মশায়, শিগগির আসেন। বাড়ি চলেন।

—ক্যানে রে, কি হল ? প্রশ্ন করিল ঘোঁতন।

সেতাব বলিল, কি হবে ? নিশ্চয় সেই আমার জন্ম-শত্রু কিছু করেছে। তাই তো নয়—জন্ম-শত্রু আমার। চিরদিন জ্বালিয়ে খেলে। সে-ই কিছু করেছে।

—হ্যাগো। মাঠে একেবারে কাটাকাটি লাগিয়ে দিয়েছে। নিজের মাথা ফেটেছে। এই রক্ত পড়েছে। আর মীরবক্সের শেখেদের দুজনার মাথা ফাটিয়েছে। সেও রক্ত-গঙ্গা। জল নিয়ে মারামারি।

সেতাব চিৎকার করিয়া উঠিল, মরুক মরুক, নয় তো ধরে নিয়ে যাক। আমি জানি না, কিছু জানি না।

বলিয়া হন হন করিয়া অগ্রসর হইল।

এত বড় কাণ্ডটার কারণ যেটি, সেটি শুনিতে সামান্য মনে হয়, কিন্তু চাষার জীবনে তাহা অসামান্য, তাহার গুরুত্ব অনেক বেশী।

কারণ, জল চুরি।

মহাতাপ নিজের মুখেই বলিল, কাল রাত এক প্রহর পর্যন্ত ধরে অমরকুণ্ডির বেঁকে বাকুড়িতে আল-ছাপু-ছাপু জল করেছি আমি। আঙুল দিয়ে মেপে দেখেছি, আল ছাপতে দু আঙুল বাকি ছিল। সেই জল চুরি করে নেবে শেকের পো? বললাম, তো বলে—ক্যাপামি করিস না, বাড়ি যা। চাঁপাডাঙার বউ ভাত বেড়ে রেখেছে, খা গা। ধরলাম টুঁটি চেপে তো হায়দার মাথায় বসিয়ে দিলে পাঁচনের বাড়ি। আমি মহাতাপ! সেই পাঁচন কেড়ে নিয়ে দিলাম দু ভাইয়ের মাথা পিটিয়ে ফাটিয়ে।

মহাতাপ তখন বাড়িতে বসিয়া বড় বউয়ের পরিচর্যা লইতেছিল। ভাল করিয়া রক্ত ধুইয়া গাঁদাফুলের পাতা বাটিয়া চাপান দিয়া ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিতেছিল। মানদা জল দিয়া রক্তাক্ত দাওয়াটা ধুইয়া ফেলিতেছিল।

সেতাব গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। মহাতাপের কথা শেষ হইতেই বলিল—বেশ করেছ, খুব করেছ। এইবার ফৌজদারী মামলা হোক। যাও জেলে। একটা পয়সা আমি খরচ করব না। সে আমি বলে দিলাম।

—তা বলে আমার জল চুরি করে নেবে?

—জল চুরির প্রমাণ হয় নাকি? জলের গায়ে নাম লেখা থাকে না কি?

—ও জল পেল কোথা থেকে?

—যেখান থেকে পাক। তুই কোথা পেলি? গাড়োল, মুখ্যু পাগল কোথাকার!

বড় বউ এবার বলিল, দেখ, এমন করে ওকে তুমি যা মুখে আসে তাই বোলো না। তোমাকে বারণ করছি আমি। সহোদর বড় ভাই তুমি, তোমার মুখে এ সব বলতে বাধছে না?' ছি-ছি!

মহাতাপ বড় বউয়ের হাত দুখানি পরম আবেগের সহিত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, যার বড় বউ নাই তার কেউ নাই।

মুহূর্তে সেতাব যেন জোর পাইল; সে জ্বলিয়া উঠিল। চাঁপাডাঙার বউকে বলিল—তোমাকেও ছি, তোমাকেও ছি, তোমাকেও ছি! বুঝলে! বলিয়া কাপড়ের বাণ্ডিলটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিল কাদু। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া স্বামীর গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর মহাতাপকে বলিল, ছাড়, তোমার জন্য দুধ গরম করে আনি। যাও, ঘরে গিয়ে শোও একটু। মানু, নিয়ে যা ওকে।

বড় বউ রান্নাশালে আসিয়া উনানে দুধের বাটি বসাইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মহাতাপ ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া আপন মনেই বলিল, চামারের নেতার আমি একদিন নিকেশ করে দোব।

পাশের বিছানায় মানিক শুইয়া ছিল। মানু তাহার চাপাপড়া হাতখানা সরাইয়া দিতেছিল। চামার কথাটা সে শুনিতে পায় নাই। নেতার মারিয়া দিবে শুনিয়াই সে ভাবিল—তাহাকে বলিতেছে মহাতাপ। এ সংসারে পোড়াকপালী মানদা ছাড়া এত সহজে নেতার আর কাহার মারিবে সে! চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কার?

—কার আবার, ওই চামারের, কেপনের; ওই বড় বউয়ের স্বামীর। ওই আমার দাদার, তোর ভাশুরের।

—তোমাকেও ছি! বুঝলে?

—তোমার নেতারভি এক রোজ মার দেগা। হ্যাঁ!

বড় বউ কথাগুলি সিঁড়ি হইতেই শুনিতেছিল, বলিল, কি যা তা বলছ? তোমার জন্যে কি আমি শান্তি-স্বস্তি এক দণ্ড পাব না মহাতাপ? নাও, দুধটা খেয়ে ফেল।

—না। দুধ খাব না আমি। ভাত দাও। মছলি আওর ভাত। কাল পলুইয়ে ধরা মাছ আছে। মনে পড় গিয়া। মাছের মাথা আর ভাত। লে আও।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, মানু ভাত এনে দে।

বলিয়া সে ফিরিল। মহাতাপ তাহার আঁচলটা ধরিয়া বলিল, নেহি, উ হামকো ছি করতা। উসকে হাতমে নেহি খায়েগা। তুমি এনে দাও ভাত।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, ছাড়, আঁচল ছাড়।

তাহার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে মহাতাপ আঁচল ছাড়িয়া দিয়া বলিল, কি, হল কি তোমার, বলতে পার?

—কিছু হয় নি, মাছ আজ ছোঁব না আমি। মানু এনে দিক্।

বলিয়া নামিয়া গেল।

মহাতাপ চিৎকার করিয়া উঠিল, ছোঁবে না ক্যানে? তুমি বিধবা হয়েছ, না, খড়দার মাঠাকরুন হয়েছ? মাছ ছোঁবে না?

সিঁড়ির মধ্যধাপ হইতেই উত্তর আসিল—আজ ষষ্ঠী।

—ষষ্ঠী?

মানদা মুখ বাঁকাইয়া এবার বড় বউ চলিয়া যাওয়ার সুযোগ পাইয়া স্বামীর কাছে আসিয়া বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ষষ্ঠী। ছেলে, বংশধর। চাই না? ছেলের জন্যে কি করছে দেখ না। গলায় এই এক বোঝা মাদুলি। নিত্য উপোস, কানা না কি?

মহাতাপ আজ রাগ করিল না। সে এক মুহূর্তে বিষণ্ণ বেদনায় অভিভূত হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ অস্ফুটস্বরে সে বলিল—ছেলে! সন্তান! সীয়ারাম, সীয়ারাম! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল সে।

মানদা বলিল, বড় দরদ বড় বউয়ের জন্তে? এইবার বোঝ।

আবার একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহাতাপ বলিল, তুই ঠিক বলেছিস মানু, আমি বুঝতে পারতাম না। একটু পর বলিল, আমি তো একটু ক্যাপাটে বটে! মাথা তো একটু খারাপ!

—একটু? কিন্তু এইবার আক্কেল হল তো?

—হ্যাঁ, হল। আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নেহি। ই হাম নেহি বুঝা!

—এখন যদি বুঝে থাক, তবে সময়ে বিধান কর। বুঝলে?

—কি করি বল্ তো মানু?

—কি করবে? তাও বলে দিতে হবে আমাকে? দাদাকে গিয়ে সোজা জিজ্ঞাসা কর, ঘোঁতনের সঙ্গে শলা করে কত টাকার গয়না বাঁধা রেখেছে বল? এ পর্যন্ত কত টাকার ধান বেচেছে, হিসেব দাও।

—বিষয়? মহাতাপ ঘৃণাভরা তিক্ত দৃষ্টিতে মানদার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, শিব-শিব-শিব! এতক্ষণ ব্যাড়র ব্যাড়র করে হল বিষয়!

মানদা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। মহাতাপ তাহাকে সিঁড়ি দেখাইয়া দিয়া বলিল, বেরিয়ে যা, আমার সামনে থেকে তুই বেরিয়ে যা। আমার সারা অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। বেরিয়ে যা। বিষয়!

—বেরিয়ে? মানদা ফোঁস করিয়া উঠিল।—বেরিয়ে যাব ক্যানে? আমি ছেলের মা, এ আমার ছেলের ঘর।

—হাম ছেলের বাবা। আর বেরিয়ে যাবি আর আর ভাল বলবি। বলিয়া ঘাড়টি ধরিয়া তাহাকে সিঁড়িতে বসাইয়া দিয়া আসিল। আসিয়া মানিকের মাথার শিয়রের কাছে জানালার ধারে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

নীচে বড় বউ ক্লান্ত দেহে বিষণ্ন অন্তরে দাওয়ার উপর আঁচল বিছাইয়া শুইয়া ছিল। শুইয়া ছিল ঠিক নয়, অন্তরের দুর্বিষহ আবেগের আলোড়ন সম্বরণ করিবার জন্য উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল। সে আর পারে না, পারিতেছে না। এমন সময় মানদা দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিয়া বড় জাকে এইভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। নিরুপায় দুরন্ত ক্রোধ যেমন মানুষ সর্বংসহা পৃথিবীর বুকে পা ঠুকিয়া জাহির করে, কখনও বা মাথা ঠুকিয়া নিজের কপাল ফাটাইয়া শান্ত হয়—আঘাত করে মাটিকেই, রক্তাক্ত করে মাটিকেই—তেমনি ভাবেই মানদা বড় জায়ের উপর সব ক্রোধ ক্ষোভ দিয়া আঘাত করিল। বলিল, তুমিই—তুমিই আমার কপালে আগুন ধরিয়ে দিলে। তুমি।

বড় বউ তেমনি ভাবে পড়িয়া থাকিয়াই উত্তর দিল, দিনরাত চোখের জল ঢেলেও যে নেবাতে পারছি না, কি করব বল্?

বলিতে বলিতে সে উঠিয়া বসিল। চোখের জল তখনও গড়াইয়া পড়িতেছিল।

মানু আজ প্রায় ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়াছে। সে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, এখন

হয়েছে কি ? অনেক কাঁদতে হবে। অনেক কাঁদতে হবে তোমাকে।

মানদার চিৎকারেই বোধ করি এক সঙ্গে দুই দিক হইতে সেতাব ও মহাতাপ দুই ভাই আসিয়া হাজির হইল। সেতাব আসিয়াছে বাড়ির বাহির হইতে; মহাতাপ উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছে। মহাতাপের কোলে মানিক।

সেতাব তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, একদণ্ড শান্তি দেবে না তোমরা ? এত অশান্তি কিসের ? কাঁদছ ? তুমি কাঁদছ ? কেন কাঁদছ ? কেন কাঁদছ শুনি ?

মহাতাপ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে হঠাৎ গতি সঞ্চয় করিয়া বড় বউয়ের কাছে আসিয়া কোলের মানিককে প্রায় বড় বউয়ের কোলে ফেলিয়া দিয়া বলিল, এই নাও, ছেলের জন্যই যদি এত দুঃখু তোমার, তবে এই নাও। আমার ছেলে তোমাকে দিলাম। নাও।

মানদা চিৎকার করিয়া উঠিল, না-না-না। আমার ছেলে—

মহাতাপ পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল—না।

সেতাব অধীর পদক্ষেপে আসিয়া বড় বউয়ের কোলের মানিককে তুলিয়া লইয়া মানদা ও মহাতাপের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল, না। পরের ছেলে, আমি চাই না। ভগবান যদি আমাকে দিয়ে থাকে, তবে সে আমি পাব। আমার হবে।

বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

বড় বউ তাহাকে ডাকিল, শোন, শোন, যেয়ো না।

—কি ?—সেতাব ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বড় বউ বলিল, আমাকে তুমি খালাস দাও।

সেতাব বলিল, বাঁচি বাঁচি, তা হলে বাঁচি আমি।—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বড় বউ উঠিল এবং খিড়কির পথের দিকে পা বাড়াইল।

মহাতাপ বলিল, কোথা যাবে তুমি ?

বড় বউ বলিল, সর। পুকুরে ডুব দিয়ে আসি।

বলিয়া পাশ কাটাইয়া সে বাহির হইয়া গেল। মহাতাপ তাহাকে অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়া ডাকিল, বড় বউ!

মানদা বলিল, আদিখ্যেতা কোরো না। ডুবে মরবে না।

মহাতাপ মানদার দিকে ফিরিয়া বলিল, তোরা সাপের জাত। তোরা সাপের জাত। বিষ ছাড়া তোদের কিছুই নাই। জীবনটা জ্বালিয়ে দিলি। বলিস বড় বউকে, তোর কামড় সয়েও ছিলাম। ওর কামড় সইল না। আমি চললাম। এ বাড়িতেই আর আসব না আমি। দু চোখ যেদিকে যায় চলে যাব আমি। হে শিবো! হে ভগবান—

বলিতে বলিতে সে চলিয়া গেল।

গেল সে খিড়কির পথেই। পুকুরঘাটে তখন বড় বউ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভরা পুকুরের দিকে তাকাইয়া ছিল সে। ডান হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়াছিল গলার কবচ-মাদুলিগুলি।

দূর হইতে মহাতাপ তাহাকে দেখিয়া বলিল, আমি চললাম। আর আমি ফিরব না।

বড় বউ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল, কথা বলিতে পারিল না।

মহাতাপ যাইতে যাইতেই বলিল, না। ছেলে—ছেলে তোমার হোক। তাই নিয়ে তুমি সুখে থাক। আমি চললাম। কি দরকার তোমার আমাকে?

সে চলিয়া গেল। বড় বউ দাঁড়াইয়া রহিল। মুখে তাহার বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল; তারপর সে সজোরে টান দিল হাতে ধরা কবচের মুঠায়; কবচ-বাঁধা সুতার ডোরটা পট করিয়া ছিঁড়িয়া গেল। কবচগুলা সে জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। সেখানে একটা টুপ করিয়া শব্দ তুলিয়া কবচগুলি জলে ডুবিয়া গেল। তারপর সে ধীরে ধীরে জলে নামিল। হাঁটু-জলে নামিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইতেছিল।

মহাতাপ দুই চোখ যেদিকে যায় সেই দিকেই চলিবার সংকল্প লইয়াই বাহির হইয়াছিল। আধপাগলা মানুষ। সে আজ গভীর আঘাত পাইয়াছে। বড় বউ তাহার ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী। দশ-এগারো বছরের কাদম্বিনী শ্বশুর-ঘরে আসিয়া দেওরের সঙ্গে খেলাঘরে খেলা করিত—সে সাজিত মা, মহাতাপ সাজিত ছেলে। কাদাধুলার ভাত রাঁধিয়া দেবরকে খাইতে দিত। উঠানের একটা খাল অংশকে পুকুর কল্পনা করিয়া সেখানে মহাতাপকে স্নান করাইয়া দিত। ছোট আঁজলায় শূন্যকে জল কল্পনা করিয়া তাই মহাতাপের মাথায় ঢালিয়া দিয়া মুখে বলিত—হুপুস হুপুস।

ছেঁড়া ন্যাকড়ায় গা মুছাইয়া দিত।

এক একদিন মারিত। মহাতাপ কাঁদিত এবং কান্না থামাইয়া হঠাৎ চাঁপাডাঙার বউয়ের ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উল্টা মার মারিত।

মহাতাপের মা আসিয়া বলিত, কি হল?

কাদু লজ্জায় চুপ করিয়া থাকিত।

মহাতাপ বলিত, আমাকে মারলে।

—তুমি কি করেছিলে?

—বলেছিলাম ভাত খাব না। ও মা সেজেছে কিনা!

—ও! তুমি ছেলে, ও মা।

—মা না কচু! ছাই! ছাই!

—না-না-না। ও বলতে নাই, ও বলতে নাই। বড় ভাজ মায়ের মত। মত নয়—মা।

—ওইটুকু মেয়ে আবার মা হয়?

—হয়। লক্ষ্মণের চেয়ে সীতা বয়সে ছোট ছিলেন; তবু সীতা লক্ষ্মণের মায়ের চেয়ে বেশী। জান?

শুধু কি এই খেলা! কত খেলা তাহারা খেলিয়াছে—তাহার কথা একটা পালাগানের চেয়েও বেশি। সে ফুরায় না। লিখিতে গেলে রামায়ণ মহাভারত হইবে বোধ হয়,

বলিতে গেলে রাত ফুরাইয়া যায়। এইভাবে একসঙ্গে কতদিন কাটিয়াছে। তাহার উপর এতদিন নিঃসন্তান অবস্থায় মহাতাপকে নিবিড় ভালবাসায় জড়াইয়া থাকিয়া, আজ হঠাৎ সে ভালবাসাকে খাটো করিয়া তুচ্ছ করিয়া সন্তান-কামনাকে বড় করিয়া তোলার সংবাদে মহাতাপ মর্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছে।

সে নিজেদের স্বজাতি জ্ঞাতিগোষ্ঠীর পাড়া বাদ দিয়া আসিয়া উঠিল গ্রামপ্রান্তে বাউরীদের পাড়ায়। বাউরীপাড়া পার হইয়া আসিয়া উঠিল মাঠের প্রান্তে।

আশ্বিন মাসে ধানের জমিতে কানায় কানায় জল প্রয়োজন। কিন্তু সারা আশ্বিন জল নাই, মাঠ শুকাইয়া গিয়াছে। মাঠের মধ্যে উৎকণ্ঠিত চাষীরা কোদাল কাঁধে ফিরিতেছে। মহাতাপের ওই মাঠের মধ্যেই ঘুরিবার কথা। এই সকালবেলাতেও সে ঘুরিয়াছে ; মারপিঠ করিয়া মাথা ফাটাইয়াছে। কিন্তু আর তাহার সে ইচ্ছা নাই। পাগল, মাঠের সীমানার প্রান্তে একটা গাছে চড়িয়া ডালে বসিয়া পা ঝুলাইয়া গান ধরিল—

"এ সংসারে কেবা কার মন,
কেবা তোমার তুমি বা কার ?
আমার আপন জনা যে জন
কে জানে হায় ঠিকানা তার ?"

দুই কলি গাহিয়াই তাহার কি মনে হইল। সে লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল এবং হনহন করিয়া আলপথ ধরিয়া হাঁটিয়া আসিয়া নিজের জমিগুলি যেগুলিতে সে দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া দুনীতে তুলিয়া জল ভরিতেছিল, সেই জমিগুলির বাঁধ পায়ে লাথি দিয়া ভাঙিয়া দিল। জল বাহির হইতে লাগিল। সে সোল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল—বিষয়! বিষ—বিষ! যা! বিষ বেরিয়ে যা! ধান মরে যাক! মরে যাক!

চারিপাশের মাঠেও চাষীরা অবাক হইয়া গেল। ছোট মোড়লের এ কি মতি! ইহাদের অধিকাংশই মজুর-শ্রেণী লোক, ধান বাঁচাইবার জন্য মাঠে আসিয়া বুক দিয়া পড়িয়াছে। পুকুরে পুকুরে দুনী বসাইতেছে। নালা কাটিতেছে। খাওয়া-দাওয়া মাঠেই, মাঠেই রাত্রি কাটিবে। কড়া পচাই মদের ভাঁড়ে চুমুক দিতেছে, কড়া তামাক টানিতেছে আর খাটিয়া চলিয়াছে। মহাতাপদের কৃষাণ নোটনও মাঠে ছিল। সে ছুটিয়া আসিল। সে মদের হাঁড়িতে চুমুক দিতেছিল, সেটা হাতে করিয়াই সে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ছোট মোড়ল! ছোট মোড়ল!

মহাতাপ বলিল, যাক যাক, বিষ বেরিয়ে যাক।

নোটন হাঁড়িটা আলের উপর রাখিয়া ভাঙা আল বাঁধিতে লাগিল। মহাতাপের নজর পড়িল হাঁড়িটার দিকে। সে হাঁড়িটা তুলিয়া নাক সিঁটকাইয়া মুখ ঘুরাইতে বাধ্য হইল। আবার জোর করিয়া মুখ ফিরাইল। সে খাইবেই!

নোটন সবিস্ময়ে বলিল, কি, হচ্ছে কি ? মদ খাবা নাকি ?

—খাব। খাব।

—এই দেখ, বাড়িতে বকবে।

—বাড়ি? আমি আর বাড়ি যাব না।

বলিয়া চুমুক দিল ভাঁড়ে।

ওদিকে চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা তুলিয়া মোড়লেরা একদিকে পূজার আয়োজন করিতেছিল, অন্যদিকে জমিতে জলের কথা হইতেছিল।

বিপিন, সেতাব, রামকেষ্ট এবং আরও মোড়লেরা বসিয়া আছে। ঘোঁতনও আসিয়া জুটিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে টিকুরীর খুড়ী এবং আরও দুই-তিনজন প্রবীণা মিলিয়া কেহ ঝাঁটা বুলাইতেছে, কেহ পূজার বাসনগুলিতে জল বুলাইতেছে অর্থাৎ ধুইতেছে। একজন খড়ের দড়িতে আমের শাখা পরাইতেছে। গোটা কয়েক ছেলে রঙীন কাগজ কাটিয়া শিকল তৈয়ারী করিতেছিল। একজন একখানা কাগজে মোটা হরফে লিখিতেছিল—যাত্রাভিনয়। এক পাশে বসিয়া ছিল ঘোঁতন।

বিপিন বলিতেছিল, তা পূজার কটা দিন যাক। তারপরেতে ক্যানেল অফিসে চল। জল যখন আসছে ক্যানেলে, তখন মাঠে এখনও থাল আসে নাই বলে জল দেবে না, ই তো হয় না। জল দেক। আমরা কোন-রকমে নিয়ে আসব।

ঘোঁতন বলিয়া উঠিল, সে দেবে না। পরম বিজ্ঞভরে সে ঘাড় নাড়িতে লাগিল।

বিপিন ঘাড় ঘুরাইয়া ঘোঁতনকে দেখিয়া বলিল, কে বটে? ঘোঁতন! ই, তাই বলি এমন বিজ্ঞ মানুষটা কে? ইউনিয়ন কোর্টের উকিল কি না? আইন একেবারে ঠোঁটস্থ। দেবে না! ক্যানে দেবে না? তুই এখানে কোথা? অ্যাঁ?

সেতাব বলিল, ও আমার কাছে এয়েচে।

—তোমার কাছে! তা বেশ। এসেছে বেশ করেছে! তা ই সব কথার মধ্যে ও ক্যানে? আমাদের কথা আমরা বুঝব। সব তাতেই ওর পাক মারা চাই। দেবে না! চল সব জোট বেঁধে যাই। বলি, ক্যানেল যখন ধান বাঁচাবার জন্তে, তখন ক্যানে দেবেন না মশায়? না কি হে?

রামকেষ্ট শিবকেষ্ট এবং অন্যান্য মোড়লেরা সায় দিয়া বলিল, সেই কথাই ভাল। গেরামসুদ্ধ লোক যাবে—

সেতাব উঠিয়া পড়িল। তার এসব ভাল লাগিতেছে না। তাহারও সংসার বিষ হইয়া গেছে।

সে ডাকিল, ঘোঁতন!

ঘোতন উত্তর দেবার পূর্বেই বিপিন বলিল, উঠলে যে সেতাব?

—কি করব? আমার জলে দরকার নাই। মরে যাক ধান, জলে যাক মাঠ। যা হবে হোক। বুয়েচেন?

শিবকেষ্ট বলিল, সেতাবের জমিতে জল আছে। সে মহাতাপ করে রেখেছে আগে

থেকে। ওর ভাবনা নাই।

—ওহে! বলিয়া সেতাব চিৎকার করিয়া উঠিল। তারপরই কিন্তু হঠাৎ থামিয়া গেল। বলিল, থাক সে সব কথা। আমার কথা আমার মনেই থাক্। বলিয়া সে খানিকটা চলিয়া গেল। কিন্তু একটা কথা মনে হতেই সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হ্যাঁ, আর একটা কথা জ্যাঠা। আমার পরিবার তো পূজার বরণের ডালা ধরে; তা এবার অন্য লোক দেখুন। সে ধরবে না।

ওদিক হইতে টিকুরীর খুড়ী সর্বাগ্রে বলিয়া উঠিল, তা ভাল, তা ভাল বাবা। আমরা বলতে পারছিলাম না। এ সুমতিটি ভাল হয়েছে তোমার।

বিপিন দৃঢ়স্বরে বলিল, কি, বলছ কি গো টিকুরীর বউমা?

—ন্যায্য কথা বলছি। মোড়ল কি কালা না কি? কানে কথা যায় না?

—না। যায় না। অন্যায় কথাগুলান বোলো না।

সেতাব বলিল, ন্যায় অন্যায় বিচারে কি কাজ জ্যাঠা? তার দেহ ভাল নয়, মন ভাল নয়—

—ক্যান রে? মন ভাল লয় ক্যানে? মহাতাপ নিজের ছেলে বড় বউকে দিয়েছে শুনলাম, তবু মন ভাল লয়? বাবা রে, দেওরের কি ভালবাসা?

—খুড়ী! সেতাব কঠিন স্বরে বাধা দিয়া বলিল, মহাতাপের ছেলে আমি নেব ক্যানে? আমার কপালে থাকে—

—হবে না রে বাঁজার ছেলে কার্তিক ঠাকুরের বাবা এলে। চাঁপাডাঙার বউয়ের কোঁক ফলবে না।

বাধা দিয়া সেতাব বলিল, চাঁপাডাঙার বউয়ের কপালের নেকনই তো একটি নেকন নয় খুড়ী। আমার কপালের একটা নেকনও তো আছে!

সেতাব হনহন করিয়া পথে নামিয়া গেল। ঘোঁতন বলিল—দাঁড়াও, দাঁড়াও!

সে সেতাবের সঙ্গ লইয়া বলিল—আচ্ছা কথাটা তুমি বলেছ! ঠিক বলেছ! পরের ছেলে নিয়ে নিজের সাধ মেটে? মেটে না। মেয়ের অদেষ্ট আর পুরুষের অদেষ্ট এক নয়। বিয়ে করবে তুমি পুঁটিকে? দেব। আমি দেব। বল তুমি।

সেতাব কথা বলিতে গেল কিন্তু পারিল না। অন্তর তাহার লালায়িত। কিন্তু চাঁপাডাঙার বউ! চাঁপাডাঙার বউ! সে? ওঃ সে যেন পাগল হইয়া যাইবে!

ঘোতন পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া নিজে একটা মুখে গুঁজিয়া একটা সেতাবকে দিল, বলিল—খাও।

—সিগারেট?

—হ্যাঁ। লাও ধরাও।

সে দেশলাই জ্বালিল।

ঘোঁতন আবার বলিল—ওই যে বললে, ন্যায় অন্যায় বিচারে কাজ কি জ্যাঠা? খুব

বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছ। কথাটা যখন পাঁচজনে বলছে, সন্দেহ যখন—

সেতাব বলিল—চুপ কর্ ঘোঁতন! চুপ কর্। ওরে তুই চুপ কর্।

সে রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

পথে নামিতেই দেখা হইল নোটনের সঙ্গে। নোটন বলিল—বড় মুনিব! ছোট মুনিব—

—ছোট মুনিবের কথা আমি কিছু জানি না। সে চলিতেই লাগিল।

—সে চলে গেল—

নোটনও সঙ্গ ধরিয়া পিছন হইতে কথা বলিতেছিল। মহাতাপ মদ খাইয়া মাঠ হইতে চলিয়া গিয়াছে। বলিয়া গিয়াছে, সে বিবাগী হইবে। নোটন কোনমতেই তাহাকে. ফিরাইতে পারে নাই।

—যাক—যাক—যাক।

—ওগো, নেশা করে—

—করুক, মরুক; উচ্ছন্নে যাক, চুলোয় যাক। যা বলবার বল্‌গা বড় বউকে।

—তিনি কথা বললে না।

—তবে ছোট বউকে বল্‌গা।

—সেও বললে, জানি না।

—আমি জানি না। বুঝলি! আমিও জানি না।

সেতাব আর কথা না শুনিয়া হনহন করিয়া চলিতে লাগিল।

ঘোঁতন ডাকিল, দাঁড়াও হে। দাঁড়াও।

সেতাব যেন ছুটিয়া পলাইতে চাহিতেছে। কোথায় সে তাহা জানে না।

মহাতাপ তখন প্রান্তরের মধ্যে একটা গাছতলায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নেশায় সে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের বাড়িতেও সেই অবস্থা। বড় বউ তেমনি ভাবে উপুড় হইয়া শুইয়া আছে। ছোট বউ আপনার ঘরে মানিককে লইয়া বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছে। শরতের আকাশ নীল, মেঘের দু-একটা টুকরা মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া যাইতেছে। বৃষ্টির কোন লক্ষণ নাই।

অপরাহ্ন গড়াইয়া আসিল। তবু বড় বউ উঠিল না, মানু বাহির হইল না, মহাতাপ ফিরিল না, সেতাবও সেই গিয়াছে—এখনও ফেরে নাই। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। নির্মল নীল শরৎ আকাশ—ষষ্ঠীর চাঁদের জ্যোৎস্না উঠানে, ঘরের চালে, গাছের শাখায় পল্লবে স্বপ্নালোকের শোভা জাগাইয়া ফুটিয়া উঠিল। সে আলো যেন স্বপ্নে দেখা রহস্যপুরীর আলোর মত স্পষ্ট অথচ আবছা, আবছা অথচ স্পষ্ট। আকাশে ষষ্ঠীর চাঁদ, সন্ধ্যাতেই একেবারে সিকি আকাশ পার হইয়া ফুটিয়া উঠে। যেন আকাশের নীল সায়রের তলা হইতে মাথা তুলিয়া হাসিতে থাকে। চাঁদের আশেপাশে তারা ফুটিয়াছে। অসংখ্য—সংখ্যা নাই, সীমা নাই, এক তারা

উকিঝুঁকি, তুই তারা ঝিকিমিকি, তিন তারা ঘোর নামে, চার তারা পাখি থামে, পাঁচ তারা পঞ্চদীপ, ছয় তারা শাঁখ বাজে, সাত তারা সাতভেয়ে, আট তারা অরুন্ধতী, ন তারা অন্ধকার, দশ তারাতে একাকার—শুনিতে শুনিতে দশ তারা ফুটিতেই অগুন্তি তারা ফুটিয়া উঠে, আর গণনা করা যায় না। তাই উঠিল। তবু মণ্ডলবাড়িতে কেউ উঠিল না, আলো জ্বালিল না, রান্না চড়াইল না, বাহির-দুয়ার খোলা হাঁ-হাঁ করিতে লাগিল। ওদিকে চণ্ডীমণ্ডপে ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দেবীর আবাহন অভিষেক হইয়া গেল, ঢাক ঢোল সানাই কাঁসি বাজিয়া থামিয়া গেল। সেতাব সেখানকার কাজ সারিয়া এতক্ষণে বাড়ি ঢুকিল। ষষ্ঠীর আবছা জ্যোৎস্নায় স্তব্ধ বাড়িখানা যেন শোকাতুরা সদ্য বিধবার মত বিষণ্ণ নির্বাক হইয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া বসিয়া আছে। সেতাব ঘরে ঢুকিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—এ কি!

কেহ উত্তর দিল না।

সেতাব আরও চটিয়া বলিল, বলি কাণ্ড-কারখানাটা কি? ঘরে আলো নাই। উনোন জ্বলে নাই, ষষ্ঠীকৃত্যের দিন। শুভদিন! সব মরেছে নাকি?

বড় বউ দাওয়ার উপর শুইয়া ছিল; সেতাব তাহাকে এতক্ষণে ঠাওর করিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—শুনতে পাও না?

কাদু ক্লান্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ওগো আর আমি পারছি না। আমাকে তুমি মায়ের কাছে পাঠিয়ে দাও।

—ভাল। দেব। তাই দেব। ভাল করেই দেব। তাই হবে।

বলিয়া সে উপরের সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইল।

—একটা কথা বলি। যতক্ষণ আছি ততক্ষণ বলতে হবে।

—কি?

—মহাতাপ সেই দুপুরে না খেয়ে চলে গিয়েছে। সেই ফাটা মাথা নিয়ে। এখনও ফেরে নি।

—তার কথা আমি জানি না।

—তোমার মায়ের পেটের ছোট ভাই।

—আমার শত্রু; তা ছাড়া সে কচি খোকা নয়।

—জেনেশুনেও একথা বলছ তুমি?

—বলছি! বলছি! বলছি! সে আমার শত্রু, তুমি আমার শত্রু, ঘর দোর সব আমার বিষ। আগুন। শ্মশান।

বলিয়া সে চলিয়া গেল।

যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়া বাহিরের দরজাটা বন্ধ করিল এবং হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

মানদা আপনার ঘরে বন্ধ দরজার গায়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল।

বাঘিনীর মত চোখ দুইটা তাহার ক্রোধে জলিতেছিল—এবং সে ক্রোধের সবটাই গিয়া পড়িতে চাহিতেছে ওই বড় জায়ের উপর। ও-ই তাহার অদৃষ্টকে ওই মহাতাপের মত পাগলের অদৃষ্টের সহিত জড়াইয়া দিয়াছে। গরীবের মেয়ে সে। সেই দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া তাহার পিতৃকুলের জ্ঞাতিকন্যা হিসাবে হিতৈষিণী সাজিয়া সচ্ছল অবস্থার লোভ দেখাইয়া মহাতাপের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধে তাহার বাপকে রাজী করাইয়াছিল। প্রথম প্রথম বড় বউয়ের স্নেহ যত্ন, মহাতাপের সঙ্গে তাহার অন্তরঙ্গতা মানদার ভালই লাগিত। ক্রমে ক্রমে চোখ খুলিয়া সে আজ দিব্য দৃষ্টি পাইয়াছে। বুকের ভিতর তাহার আগুন জলিয়াছে। সেই আগুন চোখের দৃষ্টির মধ্যে দিয়া বাহির হইয়া সব কিছুকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া খাক করিয়া দিতে চাহিতেছে! আজ এই দুর্গাষষ্ঠীর দিন তাহার নাড়ী-ছেঁড়া ধন, একটি সন্তান তাহার, তাহাকে মহাতাপ দান করিয়া দিল ওই বন্ধ্যা নারীকে! বন্ধ্যা নারীর দৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষা বড় প্রবল, আকর্ষণ দুর্নিবার। ইহার জন্য যদি—

সে আর ভাবিতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া মানিককে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অস্ফুটস্বরে বলিল, হে মা ষষ্ঠী! পাগল মানুষ মায়াবিনীর মায়ায় ভুলে বলেছে—দান করলাম ছেলে। আমি বলি নাই মা, আমি বলি নাই! হে মা! রক্ষা করো তুমি।

সে ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বালিশে মুখ গুঁজিল।

আপন ঘরে সেতাব উত্তেজিত মনে অন্ধকারের মধ্যে চালের কাঠের দিকে চাহিয়া জাগিয়া ঘুমন্তের মত পড়িয়া ছিল। মনে মনে তাহার অনেক আলোড়ন, অনেক চিন্তা, অনেক কল্পনা।

বাহিরের পথে চৌকিদারের হাঁক উঠিল। ও—ওই—

কয়েক মিনিট পর চৌকিদারটা বাড়ির দরজায় আসিয়া ডাকিল—বড় মোড়ল! বড় মোড়ল!

সেতাব হাঁকিল—হ্যাঁ, জেগেছি।

চৌকিদারটা বলিল, তোমাদের ছোট মোড়ল, ওই খিড়কির পুকুরের গাছের তলায় বসে কাঁদছে।

—কাঁদুক। তুই যা।

তবু সেতাব উঠিয়া বসিল।

কথাগুলা মানদাও শুনিয়াছিল। সেও উঠিয়া বসিল।

সিঁড়ি বাহিয়া নামিবার মুখেই শুনিল, একটা দরজা খুলিয়া গেল।

দরজা খুলিয়া সেতাব দাওয়ায় আসিয়া দেখিল, বাহিরের দরজাটা খোলা।

দরজা খুলিয়া বড় বউই বাহির হইয়াছে। কি করিবে সে? দুর্নিবার প্রাণের আকর্ষণ লঙ্ঘন করিতে সে পারিয়া উঠে নাই। সেই গভীর রাত্রে একাকিনী নারী অন্ধকার পথ অতিক্রম করিয়া পুকুরের ধারের গাছতলাটিতে আসিয়া মহাতাপের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, ওঠ।

মহাতাপ বলিল, না—না। আমাকে তোমার দরকার নাই। তোমার সব মিছে কথা।

—না—না। কোন মিছে কথা নয়। মিছে নয়—নয়—নয়। হল তো? ওঠ এখন।

—আমাকে ধর। আমি নেশা করেছি। মদ খেয়েছি।

—শুনেছি। নোটন বলেছে আমাকে।

—আমাকে বকবে না?

—তোমার দোষ কি? সবই আমার অদৃষ্ট। ওঠ, আমার কাঁধ ধরে ওঠ।

মহাতাপকে সে ধরিয়া তুলিল। মহাতাপ তাহার কাঁধে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, জান, আমি বিবাগী হয়ে চলে যেতাম। কিন্তু ফিরে এলাম—

বড় বউ অন্ধকারের মধ্যে একটু হাসিল।

পাগল বলিল, তোমার জন্যে ফিরে এলাম—

আর একপাশের অন্ধকার হইতে সেতাব বলিয়া উঠিল, তুমি আর আমার বাড়ি ঢুকো না, আমি বারণ করছে। ঠাঁই না থাকে তো গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে মর।

বড় বউ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং পর-মুহূর্তেই সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরদিন সপ্তমীর সকাল।

সুখের রাত্রি সোনার নূপুর বাজাইয়া চঞ্চলা বিলাসিনীর মত অকস্মাৎ পোহাইয়া যায়। কেমন করিয়া কোন্ দিক দিয়া চলিয়া গেল বুঝা যায় না, ফুরাইয়া গেলে চমক ভাঙে। দুঃখের রাত্রিও দাঁড়াইয়া থাকে না; বিষণ্ণ ক্লান্তি অসহনীয় হইয়া উঠে, মনে হয় রাত্রির পার নাই, শেষ নাই; কিন্তু সেও এক সময় ফুরাইয়া যায়। রাত্রি শেষ হয়। সকাল হয়। মণ্ডলবাড়ির সেই দুঃখের ষষ্ঠীর রাত্রিও শেষ হইল। বড় বউ অচেতন হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। জ্ঞান হইয়াছে এই সকালবেলা। 'বাড়ি ঢুকো না' এ কথা বলিয়াও সেতাব এই অবস্থায় তুলিয়া না আনিয়া পারে নাই। পথে পড়িয়া মরিতে দিবার মত অমানুষ সে নয়। অবশ্য পথে পড়িয়া মরিবার কথা নয়। মহাতাপ থাকিতে বড় বউ পথে পড়িয়া কখনও মরিবে না। মহাতাপকে সে কাহুকে তুলিয়া আনিতে দিবে না। কখনও না। একদিন সে বড় সাধ করিয়া ঘরে আনিয়াছিল। নিজেকে ভাগ্যবান ভাবিয়াছিল।

সকালবেলা চাঁপাডাঙার বউ চোখ মেলিয়া চাহিল।

মাথার শিয়রে সেতাব দাঁড়াইয়া ছিল, বসিয়া ছিল রাখাল ও বিপিন মণ্ডল। জ্ঞান হইতেছে না দেখিয়া রাখাল এবং বিপিনকে সেতাবই ডাকিয়া আনিয়াছে। রাখাল ভাল হাত দেখিতে পারে, বাজনায় যেমন তাহার দক্ষতা, নাড়ীজ্ঞানও তাহার তেমনি সূক্ষ্ম। রাখাল তাহার হাতখানি দেখিতেছিল, চাঁপাডাঙার বউয়ের জ্ঞান হইতে দেখিয়া সে হাতখানি

নামাইয়া দিল। বলিল—জ্ঞান হয়েছে, ভয় নাই। কি মা, চিনতে পারছ সব? মনে পড়ছে?

বড় বউ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল।

রাখাল বলিল—এই দেখ। তবে নাড়ী বড় দুর্বল। যেন কদিন খায়-টায় নাই। বুঝেচ না? ভাল করে খেতে দাও। এক বাটি গরম দুধ করে দাও দেখি।

অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে বড় বউ মৃদুস্বরে বলিল—মোড়ল জ্যাঠার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।

—আমার কাছে? বিপিন মোড়ল এ কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

—আপনার কাছেই। হ্যাঁ।

—বল মা বল! কি বলছ বল!

—আমাকে একখানি গাড়ি ডেকে আমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন।

—ক্যানে মা? এই পূজার দিন!

সেতাব আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। সে বলিয়া উঠিল—যাবে যাবে, তার জন্যে মোড়ল জ্যাঠাকে ক্যানে? আমিই পাঠিয়ে দোব। হ্যাঁ, দোব। হবে। হবে।

বড় বউ সে কথা গ্রাহ্য করিল না। বলিল—আর আপনারা পাঁচজনে থেকে, ওই মহাতাপকে তার ভাগ বুঝিয়ে দেন। সে পাগল। বিষয়-আশয় হাতে পেলে হয়তো বুঝবে, ঘরে থাকবে, নইলে ও ঘরে থাকবে না। বিবাগী হয়ে যাবে।

সেতাব বলিল, হবে, তাও হবে। এই পূজোর ভেতরেই চুল-চেরা করে ভাগ করে দোব। পঞ্চায়েত ডেকেছি।

বিপিন বলিল, আঃ সেতাব! ছিঃ, তুমিও কি পাগল হলে?

—হয়েছি। হয়েছি। আপনারা সব ভাগ করে দেন। নইলে গলায় দড়ি দিতে হবে আমাকে। বলিতে বলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাখাল ও বিপিন তাহার পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

দাওয়ার উপর তখন মহাতাপ টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত দিনের মাথার আঘাতের ফলে এবং সারাদিন অনাচারের ফলে তাহার জ্বর হইয়াছে। এই দেহ লইয়াই কখন বড় বউয়ের চেতনা হইবে—এই প্রত্যাশায় সে দাওয়ায় বসিয়া ছিল। সেখানে বসিয়াই ঘরের কথাগুলি সব শুনিয়াছে। ক্রুদ্ধ উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সেতাব এবং বিপিন বাহির হইয়া আসিতেই সে বলিল—হ্যাঁ। আমার বিষয় আমাকে বুঝিয়ে দাও। ভাগ করে দাও। ভাগ করে দাও।

সেতাব তাহার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বিপিন সে দৃষ্টি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া সেতাবকে ডাকিল—সেতাব! বাবা!

সেতাব মহাতাপকে বলিল, দোব। সেতাব না থাকলে পেতাপ মোড়লের জমিজেরাত সব দেনার দায়ে নীলেম হয়ে যেত। ভিক্ষা করে খেতে হত। তা হোক। আমার কর্তব্য

আমি করেছি। তোর ন্যায্য ভাগ তুই পাবি।

—ঘোতন ঘোষের সঙ্গে সলা করে কত টাকার গয়না বাঁধা নিয়েছ—সে সব হিসেব আমাকে দিতে হবে।

—সে টাকার একটা পয়সা পেতাপ মোড়লের বিষয়ের টাকা নয়। সে আমার পরিবারের গয়না বিক্রি করা টাকা। গাঁয়ের পঞ্চায়েত জানে—বিয়ের সময় পাঁচশো টাকার অলঙ্কার দিয়েছিল শ্বশুর। সে গয়না বেচে দেনা শোধ করেছি। তাকেই আমি বাড়িয়েছি। সে আমার বিয়ের যৌতুক। আমার নিজস্ব।

মহাতাপ বলিল, বড় বউ সে টাকা তোমাকে দেবে না।

—মহাতাপ!—চিৎকার করিয়া উঠিল সেতাব।—বড় বউয়ের নাম তুই মুখে আনিস না। তোকে আমি বারণ করছি। তোকে আমি বারণ করছি।

সে হনহন করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার সঙ্গে বিপিন চলিয়া গেল। শুধু রাখাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল।

মহাতাপ সেতাবের শেষ কথাটায় খানিকটা দমিয়া গিয়াছিল; কেন সে বড় বউয়ের নাম মুখে আনিবে না? কেন? হঠাৎ সেই প্রশ্নটা তুলিয়া সে উঠানে নামিল—ক্যানে? ক্যানে শুনি? ক্যানে আমি বড় বউয়ের নাম মুখে আনতে পাব না, শুনি?

ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া মানদা তাহার হাত ধরিল—না, যেতে পাবে না।

উপর হইতে বড় বউয়ের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—মহাতাপ, যেয়ো না, ঘরে গিয়ে শোও। আমার দিব্যি, আমার মরা মুখ দেখবে।

মহাতাপ দাঁড়াইয়া গেল।

এতক্ষণে রাখাল বলিল—ছোট বউমা, চাঁপাডাঙার বউকে একটু দুধ গরম করে দাও বাপু।

ছোট বউ সে কথায় কর্ণপাত করিল না। সে মহাতাপের পায়ের কাছে প্রায় পাগলের মত হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, মাথা খুঁড়ে মরব আমি।

রাখাল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া সে দেখিল, সেতাব বসিয়া পত্র লিখিতেছে। দাঁড়াইয়া আছে নোটন। চিঠিখানা শেষ করিয়া সে পড়িয়া লইল—

শ্রীমণিলাল পাল কল্যাণবরেষু,

অত্র পত্রের ব্যাপার জরুরী জানিবে। তুমি পত্রপাঠ লোক মারফত চলিয়া আসিবে। এখানে তোমার ভগ্নী কিছুতেই থাকিতে পারিতেছে না। আমরা ভায়ে ভায়ে পৃথকান্ন হইতেছি। এ সময় চাঁপাডাঙার বউকে এখানে লইয়া না গেলে কোন মতেই চলিবে না। তুমি পত্র পাঠ আসিবে। অন্যথায় চাঁপাডাঙার বউকে হয়তো একাই পাঠাইয়া দিতে হইবে। সে ক্ষেত্রে আমাকে দোষ দিলে চলিবে না। ইতি—

শ্রীসেতাবচন্দ্র মণ্ডল

পড়িয়া দেখিয়া চিঠিখানি মুড়িয়া নোটনের হাতে দিয়া বলিল, চলে যা। কাল মণিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। খবরদার, কোন কথা ভাঙবি না।

নোটন চিঠিখানা লইতে হাত বাড়াইল।

রাখাল বলিল, সেতাব!

—ফ্যাচফ্যাচ করিস না রাখাল। পিছু ডাকিস না। বাড়ি যা।

—ওহে, চাঁপাডাঙার বউমাকে—

—রাখাল, তু বাড়ি যা।

রাখাল থামিয়া গেল। ভয় পাইল।

সেতাব চিঠিখানা নোটনের হাতে দিয়া বলিল—তু সব বলবি। যা ঘটেছে মুখে বলবি। বুঝলি?

রাখাল চলিয়া গেল এবার।

সেতাব আবার বলিল—যাবার পথে ঘোতনকে—ঘোতনকে বলবি, আমি ডেকেছি। আমি ডেকেছি।

নোটন তবু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেতাব বলিল—কি? দাঁড়িয়ে রইলি যে?

ওদিকে চণ্ডীমণ্ডপে সানাই ঢোল বাজিয়া উঠিল। সপ্তমী পূজার ঘট আনিবার সময় হইয়াছে।

সেতাব আবার বলিল, নোটন!

এবারে নোটন বলিল, ওই শোন, পূজার ঢাক বাজছে। ঘট আসছে মোড়ল। সে সব বুঝিয়াছে।

সেতাব রূঢ়কণ্ঠে বলিল, নোটন!

নোটন পুরানো লোক, এই ঘরের সুখদুঃখের সঙ্গে তাহার জীবনটা জড়াইয়া গিয়াছে শত পাকে সহস্র বয়নে। সে বলিল, যা করবে পূজার পরে কোরো। মোড়ল, আজ সপ্তমী পূজোর দিন; ঠাকুরুনের ঘট আসবে, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী পাতবে, আজ ঘর ভাঙার ধুয়ো তুলো না। বেসজ্জনের বাজনা বাজিও না।

সেতাব তাহার হাতের চিঠিটা লইতে উদ্যত হইল। বলিল, তুই যাবি কি না বল?

নোটন তাহার হাতখানা সরাইয়া হইয়া বলিল, যাব। তুমি মনিব। কথা শুনতে হবে আমাকে। চললাম আমি। কিন্তু মাঠে ধান মরছে, সোঁ সোঁ ডাক ধরেছে মাটিতে। জল নাই। জল হবে না। আকাশের জল হবে না। এ আমি বললাম তোমাকে। যা হয় কোরো!

সে চলিয়া গেল।

পথে একটি বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া তখন বহুবল্লভ বাউল একতারা এবং বাঁয়া বাজাইয়া গান ধরিয়াছিল—

কমল-মুখ শুকায়ে গেছে, আয় মা আয় মুছায়ে দি,
মায়ের কোলে শয়ন কর মা, শীতলপাটি বিছায়ে দি ॥
বল বল মা কানে কানে
কি দুঃখ পেলি কোমল প্রাণে
শ্মশান-তাপে জলছে দেহ,
আঁচল-বায়ে ঘুচায়ে দি।
আয় মা মুখ মুছায়ে দি।

আগমনী-গানের বাৎসল্য-রস অনাবৃষ্টি-শুষ্ক শরতের আকাশের উত্তপ্ত নীলিমাকে সকরুণ করিয়া তুলিয়াছিল।

বড় বউয়ের কানে ওই গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। এ গান যেন দূর চাঁপাডাঙায় বসিয়া তাহারই মা গাহিতেছে। সে তো যাইবে। এ বাড়ির মেয়াদ তাহার ফুরাইয়াছে। সে কথা সে জানিয়াছে। তাহার নিজের চিত্তের সকল মায়া সব মমতাই কাটিয়াছে। তাহার স্বামীরও কাটিয়াছে। সব ভালবাসা মায়ানদীর মত শুকাইয়া গিয়া মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সেই মরুভূমির বুকের মধ্যে সেতাবের অন্তরের রূপটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে চায় নূতন ঘর, নূতন সংসার, নূতন—

হাসি ফুটিয়া উঠিল তাহার মুখে। তাহার প্রতি এই কদর্য সন্দেহ একান্ত ভাবেই মিথ্যা। এতকাল এইভাবেই তো ঘর করিয়া আসিল সে। এমনি ভাবেই তো সে মহাতাপকে স্নেহ করিয়াছে, এমনিভাবেই তো মহাতাপ আবদার করিয়াছে! কই, এতকালের মধ্যে এমন সন্দেহ তো হয় নাই! হঠাৎ আজ, আজ কেন হইল? ওই তাহার নূতন গোপন সাধটা তাহার চোখে ঠুলি পরাইয়া দিয়া সংসারটাকে কালো করিয়া দেখাইয়া তাহাকে জোর দিতেছে।

ঠিক এই সময়েই কে ডাকিল, বউমা!

চমকিয়া উঠিল চাঁপাডাঙার বউ। সে সবিস্ময়ে প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল।

সিঁড়ির নীচে হইতে আগন্তুক কথা বলিল, আমি মা, রাখাল।

চাঁপাডাঙার বউ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

রাখাল উঠিয়া আসিল; সে একা নয়, তাহার সঙ্গে একটি আট-নয় বছরের মেয়ে। তাহার হাতে এক বাটি দুধ। রাখাল বলিল, তোমার জন্যে দুধটুকু নিয়ে এলাম মা। খাও তুমি। দে মা খেঁদী, খুড়ীমাকে দুধের বাটিটা দে।

চাঁপাডাঙার বউ মাথার ঘোমটাটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, পূজার ঘট আসছে। আমাকে লক্ষ্মী পাততে হবে। তার আগে তো খাব না।

—মা, এই দেহে তুমি মাথা ঘুরে আবার পড়ে যাবে।

—না! পারব আমি। খুব পারব।

সে ধীরে ধীরে দেওয়াল ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তুই রাখ্, খেঁদী, আমি লক্ষী পেতে এসে খাব।

রাখাল বলিল, খেঁদী, তুই সঙ্গে যা। বুঝলি, সঙ্গে যা।

ওদিকে ঢাক ঢোল সানাই কাঁসির শব্দ উচ্চ হইয়া উঠিল। চণ্ডীমণ্ডপে ঘট আসিল। শাঁখ বাজিল, উলু পড়িল।

চণ্ডীমণ্ডপে এবার পূজার আয়োজন সবই হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রাণ নাই, সমারোহ জমিয়া উঠিতেছে না। সব যেন বিষণ্ণ চিন্তাভারক্লিষ্ট। আকাশে জল নাই, চাষীর দৃষ্টি আকাশের দূর দিগন্তে, চিত্ত উদ্বেগকাতর। তাহার উপর সেতাবদের এই কলহটাও একটা বেদনাতুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ছেলেরা শুধু ছুটাছুটি করিতেছে। তাহার মধ্যে মানিকও রহিয়াছে। তাহাকে আনিয়াছে গোবিন্দ। খালি গা, জামাও কেহ একটা পরাইয়া দেয় নাই। সে একটা রঙীন বাঁশি লইয়াই খুশী আছে। সেইটাই সে বাজাইতেছে—পু-পু! পু-পু! বাজাইতেছে আর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

মণ্ডলেরা বসিয়া আছে, তামাক টানিতেছে, কিন্তু আসর ঝিমাইয়া গিয়াছে। কেহ বড় একটা কথা বলে না। চেঁচাইতেছে শুধু টিকুরীর খুড়ী।

—অবিশ্বেস, অনাচার, অবিচার—বলি এর চেয়ে পাপ আর কি হবে? বলি ইয়েতে কি ধর্ম থাকে, না দেবতা তুষ্ট হয়। মোড়লেরা কি সব ধর্মজ্ঞান চিবিয়ে খেয়েছে না কি? বলি পূজা করা কেনে?

বিপিন মণ্ডল সোজা হইয়া বসিল। বলিল—টিকুরীর বউ, তুমি এমন করে চেঁচাও ক্যানে গো? বলি এমন করে চেঁচাও ক্যানে গো?

—চেঁচাবে না? বলি মোড়লেরা যে চোখ-কানের মাথা খেয়েছে। বলি সেতাবের থেকে এখনও পুজো এল না, সেদিকে নজর আছে?

পাঁচ আনার অংশীদার সেতাব চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে রাস্তার উপর মোড়লের সঙ্গে কথা বলিতেছিল।

বিপিন মণ্ডল বিস্মিত এবং ব্যস্ত হইয়া উঠিল। প্রতি বৎসর পূজায় চাঁপাডাঙার বউ ষষ্ঠীর সন্ধ্যা হইতে দশমী পর্যন্ত চণ্ডীমণ্ডপে সারাক্ষণ হাজির থাকিয়া সকল অনুষ্ঠান নিখুঁত করিয়া দেয়। সেতাবের দৃষ্টিও এদিকে খুব প্রখর। ভাগের ব্যাপারে যে সকল ভাগীর পূজা বুঝিয়া লয়, নিক্তির ওজনে মাপিয়া বুঝিয়া লইয়া ছাড়ে। একুশ সের আতপের নৈবেদ্য বরাদ্দ আছে। সেতাব চণ্ডীমণ্ডপে মাপের সের হাতে করিয়া বসিয়া থাকে। সর্বাগ্রে চাঁপাডাঙার বউ তাহাদের একের-তিন অংশের সাত-সের আতপ, সোয়া-পাঁচ গণ্ডা রম্ভার ভাগ সাতটা রম্ভা, সোয়া-পাঁচ পো চিনির সাত ছটাক চিনি, তাহার সঙ্গে আনুষঙ্গিক পূজার জিনিসগুলি একটি ডালায় গুছাইয়া সাজাইয়া লইয়া আসিয়া নামাইয়া দেয়। সেতাব সব বুঝিয়া লইয়া হাঁকাহাঁকি করে—কই সব, কই গো! ভাগীদাররা সব ঘুমুচ্ছে না কি?

এবার তাদের বাড়িতে একটা আকস্মিক কলহ বাধিয়া উঠিয়াছে, তবু পূজা আসিবে না—এ কথা কল্পনা করিতে পারে নাই। চাঁপাডাঙার বউয়ের অবস্থাও বিপিন নিজে দেখিয়া আসিয়াছে; সেতাবও কথার মধ্যে অনেক কিছু বলিয়াছে, তাহার অবশ্য আজ বাহির হইবার কথা নয়, সামর্থ্যও নাই। কিন্তু সেতাব আছে, ছোট বউ আছে।

বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইল। ডাকিল—সেতাব!

রাস্তার উপর হইতে সেতাব উত্তর দিল—যাই।

—যাই নয়। বাড়ি যাও। পূজার সামিগ্যিরি আসে নাই। পাঠিয়ে দাও।

টিকুরীর খুড়ো হাঁকিয়া বলিল—তোমাদের ছোট বউকে পাঠিয়ে দিও, বুঝলে বাবা! বড় বউকে পাঠিও না।

ঠিক সেই মুহূর্তেই চণ্ডীমণ্ডপের পিছন দিক দিয়া প্রবেশ করিল পুঁটি ও বড় বউ। পুঁটি স্নান করিয়াছে, বড় বউও স্নান করিয়াছে। পুঁটির হাতে পূজার সামগ্রীর ডালা। সে আসিয়া ডালা নামাইয়া দিল।

পুঁটিকে তাহার মা পাঠাইয়া দিয়াছে। পাঠাইয়াছে গুজবের কথাটা বলিতে। বলিয়াছে, লজ্জা করলে চলবে না। বলবি। কাদু আমার পেটের মেয়ের অধিক! কিন্তু কাদুর অবস্থা দেখিয়া পুঁটি সে কথা বলিতে পারে নাই। বলিয়াছে, পুজো দেখতে এলাম দিদি তোমার বাড়ি। কাদু পূজার সামগ্রীর ডালাটা তাহার হাতেই দিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

বড় বউকে দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। এত বড় ঘটনা গ্রামে চাপা থাকিবার কথা নয়, সেতাব নিজেই চেঁচামেচি করিয়াছে। ইহার পরও বড় বউ আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে সকলের সম্মুখে দাঁড়াইবে, এ কথা কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই।

পুঁটি পূজার ডালাটা নামাইয়া দিল। বড় বউ গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল।

সমস্ত চণ্ডীমণ্ডপটা কয়েক মুহূর্তের জন্য এমন হইয়া রহিল যে স্ফুচ পড়িলেও শুনা যায়।

প্রণাম সারিয়া উঠিয়া বড় বউই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। বলিল—আমাদের পুজোর সামগ্রী। দেখে নাও, কে দেখছ?

এবার টিকুরীর খুড়ো মুখ খুলিল। সে বলিল, আমি দেখে নিচ্ছি, তা—। ডালাটার দিকে একবার তাকাইয়া আবার পুঁটির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চাঁপাডাঙার বউকে ছুঁয়েছিস না কি পুঁটি?

বড় বউ দাঁড়াইয়া বলিল—মোড়ল-বাড়ির ভাঁড়ার এখনও আমার হাতে টিকুরী খুড়ো। সেখানে লক্ষ্মী পেতে নিজে হাতে সামগ্রী বার করে সাজিয়ে নিজেই নিয়ে আসছিলাম। পুঁটি হঠাৎ এসে পড়ল। তুলে নাও। তোমাদের 'না' বলায় হবে না। 'না' বলতে হয় বলবেন ওই দেবতা। বলিয়া নিজেই সমস্ত সামগ্রী প্রতিমার সামনে নামাইয়া দিয়া বলিল—'না' বলতে হয় তুমি বল মা। আর কারুর কথা আমি শুনব না। আমার হাতের পুজো অশুদ্ধ যদি হয় তবে বজ্রাঘাত কর আমার মাথায়; না হয় সর্পাঘাত হোক আমার। না হয় নিজের হাতের খাঁড়াটা দিয়ে আমার বুকে মার!

সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল। শুধু বিপিন চিৎকার করিয়া উঠিল—বউ মা! বউ মা! বউ মা!

বড় বউ কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া পুঁটিকে বলিল—চল্ পুঁটি। তাহারা দুইজনে চলিয়া গেল।

টিকুরীর খুড়ী বলিল—গঙ্গাজলের ঘটিটা কই? অ-ইন্দেশের বউ।

সেতাব রাস্তার উপর হইতে উঠিয়া আসিয়া বিপিনকে বলিল—আজ সন্ধ্যেবেলা তা হলে আমার ভাগের কাজটা সেরে দেন।

—আজ? সেতাব—

—না জ্যাঠা, আজই! আজই! আজই! এ কেলেঙ্কারি আমি আর সইতে পারছি না।

তাহাই হইল।

পঞ্চায়েত বসিয়া সেতাবের বিষয় ভাগ করিয়া দিল। সেতাবের হিসাবের কাজ বড় পরিষ্কার, কাগজপত্রে খুঁত ছিল না; এবং জমিগুলির মধ্যে কোন্ জমি কেমন ইহাও মোড়লদের কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। জমি পুকুর ভাগ কাগজ লইয়া বসিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই হইয়া গেল।

শেষের দিন বাসন-কোসন ভাগ হইল এবং বাড়ির উঠানে দড়ি ধরিয়া মাপিয়া ঘর ভাগ করিয়া দিল পঞ্চায়েত মণ্ডল। পঞ্চায়েতরা বাড়ির উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল। সেতাব মহাতাপ দুইজনে দুই দিকে দাঁড়াইল। মানিক বাঁশিটা বাজাইয়া ফিরিতেছে—পু-পু-পু। বউয়েরা দুইজনেই ঘরের ভিতর।

ভাগের ব্যাপারে সেতাব কথা বলিল না। গোড়াতেই সে বলিয়াছে—আগে ও-ই বেছে নিক। শেষে আমি ঠকিয়েছি—এ কথা শুনব না।

উঠানে দড়ি ধরিয়াছিল একদিকে রামকেষ্ট, অন্যদিকে আর একজন। বিপিন বলিল—বল এখন কে কোন্ দিকে নেবে? এ দিকের ঘরখানা ভাল, তেমনি ওদিকে রান্নাঘর করে নিতে হবে। সেতাব—?

মহাতাপ উঠিয়া আসিয়া বলিল—ভাল ঘর আমি নোব।

সেতাব হাসিয়া বলিল—তাই নেক। আমি পুরনো ঘরই নিলাম।

মহাতাপ নূতন ঘরের দাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসিয়া বলিল—বাস্।

সেতাব বলিল, আপনারা একটু দাঁড়ান। আমি কাঁচা ইট, রাজ-মজুর ঠিক করে রেখেছি। মাটির দেওয়াল দিতে দেরি হবে। ইটের গাঁথনি আজই দেবে।—আয় রে! ওরে! শুনছিস!

কয়েকজন মজুর আসিয়া ঢুকিল। সেতাব বলিল—ওর মুখ আর আমি দেখব না।

মহাতাপ হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া বলিল—গয়না যা বাঁধা নিয়েছে তার হিসেব কই? বিপিন জ্যাঠা!

সেতাব বলিল—সে তো আমার যৌতুক।

—সে তো বড় বউয়ের গয়না। বড় বউকে তো ও নেবে না!

—সে আমি বুঝব। তা নিয়ে তোর ওকালতি করতে হবে না।

—আলবাত হবে।

বিপিন বলিল—মহাতাপ, তুমি মিছে চেঁচামেচি কোরো না।

ঠিক এই সময়েই বড় বউয়ের ভাই মণিলাল আসিয়া বাড়ি ঢুকিল। মহাতাপ চিৎকার করিয়া বলিল—ওই, ওই বড় বউয়ের ভাই এসেছে। নোটন আনতে গিয়েছিল।

মণিলাল আসিয়া সেতাবকে প্রণাম করিল। বয়সে বড় বউ অপেক্ষা বছর তিনেকের ছোট। বেশ স্বাস্থ্যবান। চাষীর ছেলে। প্রণাম করিয়া বলিল—এ সব কি বললে নোটন, জামাই-দাদা?

—তোমার ভগ্নীকে নিয়ে আমার ঘর করা অসম্ভব মণিলাল।

বিপিন আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল—সেতাব, এ কাজ তুমি হঠাৎ কোরো না। সেতাব!

—না। সে আর হয় না জ্যাঠা। মণিলাল, তুমি তোমার ভগ্নীকে নিয়ে যাও। গাড়ি আমি ঠিক করে রেখেছি।

মহাতাপ ঘাড় নাড়িয়া বিজ্ঞের মত বেশ উল্লাসের সঙ্গেই বলিল—আমিও রেখেছি, গাড়ি ঠিক করে আমিও রেখেছি। হাঁ, আমিও মহাতাপ! হাঁ!

সে বেশ অহঙ্কারের সঙ্গেই, যাহাকে বলে দর্পভরে পদক্ষেপ, তেমনি পদক্ষেপে, কর্মরত মজুরওয়ালার কাটা, দেওয়ালের ভিতরটার চারিদিকে বেড়াইয়া আসিল। যেন লাঠি-খেলোয়াড় পাঁয়তারা ভাঁজিতেছে। সেই ভাঁজিবার মুখে তাহার চোখে পড়িল মানদা কখন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া এক ভাগ লইয়া গুছাইতেছে। মহাতাপ থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর বলিল—নেহি নেহি নেহি।

মানদা থমকিয়া গেল। তারপর ঘোমটা টানিয়া চাপা গলায় বলিল—কোন্‌টা আমাদের?

—এইটাই। ওটাই মহাতাপ নিয়েছে।—বলিল বিপিন।

—তবে?

মহাতাপ কাছে আসিয়া বলিল—তোকে ছুঁতে হবে না আমার ভাগ। তুই তোর কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নে। হাঁ! গাড়ি ঠিক করে রেখেছি আমি। তোর সঙ্গে আমার ঘর করা নেহি চলেগা। হাঁ!

মানদার হাত হইতে বাসন কয়েকখানা পড়িয়া গেল।

সকলেই চমকিয়া উঠিল। বিপিন বলিল, ওরে মুখ্যু, আধ-পাগলা, বলছিস কি! ক্ষেপলি না কি?

—অন্যায় কি বললাম? ক্ষেপব কেন?

—তবে এসব কি বলছিস? নিজের পরিবারকে নিবি না ক্যানে?

—ও নেবে না ক্যানে? ও পাঠিয়ে দেবে ক্যানে?

সকলে অবাক হইয়া গেল।

মহাতাপ বলিল, ওকে পাঠিয়ে দোব আমি। দিয়ে সেই গাড়িতে বড় বউকে নিয়ে আসব আমি। আর নইলে শিবকেষ্ট রামকেষ্টদের টিকুরীর খুড়ী ইন্দেশের খুড়ীর মত বড় বউকে ছোট বউকে ভাগ করে দাও তোমরা। বড় বউয়ের সঙ্গে ওর বনে না, আমার ছোট বউয়ের সঙ্গে বনে না। ছোট বউ ওর ভাগে যাক, বড় বউ আমার ঘরে থাকবে।

বিপিন বলিল, ছি-ছি-ছি! মহাতাপ তুই চুপ কর্। কেলেঙ্কারি বাড়াস নে। বাড়াস নে।

মহাতাপ চিৎকার করিয়া উঠিল—না-না-না, বড় বউকে আমি যেতে দোব না। বড় বউ ছাড়া আমার চলবে না।

সেতাব এক টুকরো ভাঙা ইট লইয়া সজোরে ছুঁড়িল।

মহাতাপকে লক্ষ্য করিয়া নয়। ছুঁড়িল বড় বউকে লক্ষ্য করিয়া। বড় বউ কখন আসিয়া সিঁড়ির দরজার মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই। সেতাব দেখিয়াছিল। কাঁচা ইটের টুকরাটা বড় বউয়ের পাশে দেওয়ালে লাগিয়া চুরমার হইয়া গেল। বিপিন সেতাবের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, এস, বাইরে এস। তাহাকে টানিয়া সে লইয়া গেল। খামার-বাড়িতে আসিয়া সেতাব বলিল, আমি নতুন করে সংসার করব। আবার বিয়ে করব আমি।

—করবে। আর আপত্তি আমি করব না।

—ঘোঁতনের বোন পুঁটির কথা আমি ঘোঁতনেকে বলেছি।

নবম পরিচ্ছেদ

নবমীর রাত্রিকাল। মণ্ডলবাড়ির সম্পত্তি ঘর-দুয়ার আজ দিনের বেলা ভাগ হইয়া গিয়াছে।

বাড়ির বাহিরে টাপর-দেওয়া গোরুর গাড়ি সাজানো রহিয়াছে। সকালেই বড় বউ চাঁপাডাঙা যাইবে—চিরকালের মত হয়তো যাইবে।

বাড়ির উঠানে এক কোমর উঁচু কাঁচা ইটের দেওয়াল গাঁথা হইয়া গিয়াছে। ভারা বাঁধা রহিয়াছে। কাল বাকিটা শেষ হইবে।

সেতাব সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছে তাহার সন্তান চাই। সে আবার বিবাহ করিবে। তবু তাহার বুকে যেন আগুন জ্বলিতেছে। কাদম্বিনীর উপর একটা কঠিন আক্রোশ বুকের মধ্যে আগুনের মত জ্বলিতেছে।

রাত্রি প্রথম প্রহর পার হইয়াছে, জ্যোৎস্না ঝলমল করিতেছে। আকাশে আজ মেঘ দেখা দিয়াছে।

শুইবার ঘরে বড় বউ শুইয়া ছিল। সেতাবও শুইয়া ছিল, কিন্তু ঘুম তাহার আসে নাই। বড় বউকে বিদায় দিব, বিদায় দিব বলিয়া কয়দিন মাতিয়া উঠিয়াছিল; কাল বড় বউ চলিয়া

যাইবে, আজ রাত্রে তাহার অন্তর কেমন অধীর অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ক্রোধ, ক্ষোভ, জ্বালা, বেদনা, দুঃখ—সে যেন সব-কিছুর একটা সংমিশ্রণ। যেন আগ্নেয়গিরির গর্ভে ফুটন্ত বহু ধাতুর আলোড়ন। সে হঠাৎ উঠিয়া বসিল, কতদিন থেকে তুমি আমার চোখে এইভাবে ধুলো দিয়ে আসছ, বলতে পার? কতদিন?

বড় বউ উত্তর দিল না। সেতাব ঘরের মধ্যে একবার পায়চারি করিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। বলিল, আমার মুখে ক্যানে এমন করে চুনকালি মাখালে, ক্যানে? বলিয়াই দ্রুতপদে জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি তো বিষ খাইয়ে আমাকে মেরে যা খুশি তাই করতে পারতে। তারপরই বলিল, গয়না, ওই গয়না কটা দিয়ে বিষয় বাঁচিয়ে তুমি আমায় ঠকিয়েছ। আমি কানা, আমি অন্ধ। তোমাকে তার একটি পয়সা আমি দোব না।

সে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া কাছে গিয়া বসিল, বলিল, তোমাকে যেতে আমি দোব না। তোমার গলা টিপে মেরে ফেলব আমি।

বলিতে বলিতেই সে অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এক পাক ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, জবাবও তুমি দেবে না! চাঁপাডাঙার বউ!

এতক্ষণে চাঁপাডাঙার বউ বলিল—বল।

—আমার পা ছুঁয়ে বল তুমি।

—কি?

—যা দেখেছি তা ভুল। যা বুঝেছি তা ভুল। বল, আমার পা ছুঁয়ে বল? ওঠো।

সে বড় বউয়ের হাত ধরিয়া রূঢ় আকর্ষণে টানিয়া তুলিল এবং নিজের পাখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, আমার পা ছুঁয়ে বল?

বড় বউ তাহার মুখের দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থামিয়া বলিল, না! তারপর উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িল।

সামনে জ্যোৎস্না-ঝলমল পৃথিবী। আকাশে জ্যোৎস্না, গাছের পল্লবে জ্যোৎস্না। কিন্তু তাহার উপর একটা যেন ছায়া পড়িয়াছে! পূর্ব দিকে দিগন্তে মেঘ উঠিয়াছে, এক কোণে তাহারই ছায়া পড়িয়াছে—জ্যোৎস্না-আলোকিত পৃথিবীর উপর। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। সে চমক চকিত স্বল্প অস্পষ্ট। ইঙ্গিত—স্পষ্ট প্রকাশ নয়।

শুইয়া শুইয়া কত কথাই তাহার মনে উঠিল। একবার মনে হইল সেতাবের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া পা দুইটাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিবে—তুমি সত্যিই অন্ধ, তুমি সত্যিই অন্ধ। এই কথাটাই তোমার পা ছুঁয়ে আমি তোমাকে বলছি। আর শেষ মিনতি করছি, মেরেই ফেল আমাকে। মেরেই ফেল। কি করে এই মুখ নিয়ে চাঁপাডাঙায় গিয়ে দাঁড়াব আমি?

•

সেতাব ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছিল। চিন্তায় সে অধীর অস্থির।

চাঁপাডাঙার বউয়ের উপর নিষ্ঠুর আক্রোশ যেন মুক্ত প্রবাহে বাহির হইবার পথ পাইতেছে

না। কোথায় যেন বাধা পাইয়া নিজের বুকে ফিরিয়া আসিয়া ধাক্কা মারিতেছে। কোন মতেই সে অপরাধের পাহাড়টা উহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে না। বড় বউ উপুড় হইয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়া পিষিয়া যাইতেছে না। সে জলের ঘটি হইতে জল দিয়া মাথা ধুইয়া ফেলিল। তারপর শুইয়া পড়িল।

সব স্তব্ধ। রাত্রি শন-শন করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। অসংখ্য-কোটি কীটপতঙ্গ অবিরাম এক বিচিত্র ঐকতান বাজাইয়া চলিয়াছে। বাহিরে এক সময় একটা প্যাঁচা ডাকিয়া উঠিল। সেতাব চমকিয়া উঠিল। কান পাতিয়া কিছু শুনিবার চেষ্টা করিল। কই, বড় বউয়ের নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায় কই? সে সন্তর্পণে বিছানা ছাড়িয়া বারান্দার দিকের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল।

আকাশের জ্যোৎস্না-আভাস আসিয়া পড়িয়াছে। বারান্দার ভিতরে বারান্দার রেলিংয়ের খানিকটা পাশ পর্যন্ত জ্যোৎস্নাই রহিয়াছে। সেখানে রেলিংয়ের ছায়া পড়িয়াছে। ভিতরটায় আবছা আলো-আঁধারি, তাহারই মধ্যে সাদা-কাপড়-ঢাকা বড় বউ নিথর হইয়া পড়িয়া আছে।

সে আবার আসিয়া বিছানায় শুইল। আবার উঠিল, একটা বালিশ তুলিয়া লইয়া জানালার ধারে রাখিয়া শুইয়া পড়িল। বাহিরে দিগন্তে মেঘ ঘন হইতেছে। বাতাস উঠিতেছে মৃদুমন্দ। সেই বাতাসে তাহার তন্দ্রা আসিল।

হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। পায়ে যেন কিছুর স্পর্শ অনুভব করিতেছে সে। দেখিল, পায়ের তলার দিক হইতে চাঁপাডাঙার বউ সিঁড়ির দিকে মুখ ফিরাইয়া পা বাড়াইয়াছে। বারান্দার দরজাটা ঠিক পায়ের কাছেই। বারান্দা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে বড় বউ। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়াছে। সেতাব চঞ্চল হইল না। সে স্থির হইয়া ঘুমন্তের মত পড়িয়া রহিল। বড় বউ নামিয়া গেল। সে উঠিয়া কান পাতিয়া রহিল। সিঁড়ির দরজাটা খুলিয়া গেল। এবার সে উঠিল, ঘরের এক কোণে কয়েকটা জিনিসের সঙ্গে ছিল একখানা দা। সে দাখানা লইয়া নামিয়া গেল।

মহাতাপ বাহিরের বারান্দায় পড়িয়া আছে। শুইবার আগে মানদাকে বলিয়াছে, শাসাইয়াছে—না, না। আমার কাজ নাই। নে, তুই ঘর নে, দোর নে, বিষয় নে, আমি চাই না। এই বাইরে থাকছি রাতটার মত। কাল চলে যাব। নিশ্চয় চলে যাব।

বড় বউ সত্যই মহাতাপের বাড়ির দিকেই গেল। মাঝখানে উঠানে পাঁচিল পড়িয়াছে। প্রায় হাত দুয়েক উঁচু পর্যন্ত গাঁথা হইয়া গিয়াছে। বড় বউ সন্তর্পণে পাঁচিল পার হইয়া ওপারে দাওয়ার ধারে দাঁড়াইল। মহাতাপ বারান্দাতেই শুইয়া আছে। বারান্দার গায়ে খোলা দরজার ভিতর মিটমিটে লণ্ঠনের স্বল্পালোকিত ঘরে মানদা মানিককে লইয়া শুইয়া আছে, দেখা যাইতেছে। বড় বউ দাওয়ায় উঠিল। মহাতাপের মাথার কাছে একটি ছোট পুঁটুলি নামাইয়া দিয়া দ্রুতপদে বারান্দার ওই প্রান্তে খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

মহাতাপও ভাল করিয়া ঘুমায় নাই। বড় বউয়ের দরজা খোলার শব্দে সে জাগিয়া উঠিল, তাকাইয়া দেখিল—একটি মূর্তি বাহির হইয়া গেল; অস্ফুটস্বরে সে সবিস্ময়ে বলিল,

বড় বউ ? সে হাতে ভর দিয়া উঠিয়া গেল। দেহে তাহার জর রহিয়াছে। হাতে একটা কি ঠেকিল। সে সেটা লইয়া টিপিয়া দেখিল। এ কি ? টাকা ? গয়না ? বড় বউয়ের দ্রুত অনুসরণ করিল। সে বুঝিয়াছে, সে বুঝিয়াছে। বড় বউয়ের মতলব সে বুঝিয়াছে।

সে বাহির হইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মানদাও বাহির হইয়া আসিল বারান্দায়। খোলা খিড়কির দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল সে। একটু হাসিল, তারপর সে অনুসরণ করিল।

এবার উঠানে নামিয়া আসিল সেতাব তাহার হাতের দাখানা জ্যোৎস্নায় ঝলকিয়া উঠিল।

মহাতাপ খিড়কির দরজার বাহির হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কয়টা গাছের তলায় অন্ধকার, তাহার ওপারে জ্যোৎস্নালোকিত পৃথিবী। ভরা পুকুরটা জ্যোৎস্নায় ঝকমক করিতেছে। চাঁদ পুকুরের জলে চাঁদমালা হইয়া কাঁপিতেছে।

পুকুরের ঘাটে দাঁড়াইয়া বড় বউ।

বড় বউ বসিল। কাপড়ের আঁচলের ফালি ছিঁড়িয়া ফেলিল। সে মরিবার জন্য আসিয়াছে। সে জলে ডুবিয়া মরিবে। কাপড়ের ফালি দিয়া পা দুইটিকে বাঁধিবে। বুকের কাপড়ে একখানা ইট। শুইয়া শুইয়া সে অনেক ভাবিয়াছে। ছিঃ! ছিঃ! কোন্ মুখে সে চাঁপাডাঙায় ফিরিয়া যাইবে ? লোকে শুধাইলে কি বলিবে ?

সে সঙ্কল্প করিয়াই বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় তাহার গায়ের গহনা কয়খানা এবং গোপন সঞ্চয় শ দুয়েক টাকা পুঁটলি বাঁধিয়া মহাতাপের মাথার শিয়রে নামাইয়া দিয়া আসিয়াছে। তাহার ছিল অনেক। সবই স্বামিত্বের দাবিতে সেতাব লইয়াছে। সে একটি কথাও বলে নাই। এই সামান্যটুকু সে মহাতাপকেই দিয়া যাইবে। মহাতাপকে বঞ্চিত করিয়াছে সেতাব।

বড় বউ পায়ে বাঁধন দিতেছিল।

গাছের তলার ছায়া হইতে মহাতাপ আসিয়া দাঁড়াইল। ডাকিল—বড় বউ!

চাঁপাডাঙার বউ চমকিয়া উঠিল। তাহার দিকে তাকাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, মহাতাপ!

মহাতাপ বলিল, তুমি জলে ডুবতে এসেছ বড় বউ ?

বড় বউ অবোধকে ছলনা করিতে চাহিল—কে বললে ? আমি ঘাটে এসেছি ভাই। শরীরটা বড় জ্বলছে। চান করব।

—না।—ঘাড় নাড়িয়া মহাতাপ বলিল, আজ তুমি আমাকে ঠকাতে পারবে না। পায়ে তুমি দড়ি বাঁধছ! আমার মাথার শিয়রে তুমি গয়না টাকা ফেলে দিয়ে এলে। আমি তখুনি বুঝেছি।

বড় বউ বলিল, আমি এই কলঙ্ক মাথায় নিয়ে চাঁপাডাঙায় কোন্ মুখে ফিরে যাব ভাই ? তুমি কেন এসে এই সময়ে সামনে দাঁড়ালে মহাতাপ ?

—আমি চলে যাচ্ছি। আমি কিছু বলব না। তুমি তাই মর ওরা যে এমন ভাবে, তা আমি বুঝতে পারতাম না। তোমার গয়না টাকা তুমি নাও। আঁচলে হাত না বেঁধেই ডুবে মর তুমি। যার পাওনা সে নেবে।

সে ফিরিতে উদ্যত হইল।

—মহাতাপ! দেওর!

মহাতাপ ফিরিল। বড় বউ বলিল, ও তোমার পাওনা। তোমার দাদা তোমাকে ফাঁকি দিয়েছে।

—আমি নিয়ে কি করব? তুমি ডুবে মর। আমিও চলে যাব ঘর থেকে। তুমি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পথ ধরতাম।

—না, না। ও কথা বলতে নেই। মাস্থর কি হবে? মানিকের কি হবে!

—সে ওই জানে।—হাতখানা উপরের দিকে তুলিয়া দিল।—তুমি যে ঘরে থাকবে না, সে ঘরে আমি থাকব না।

বড় বউ নিজেও আজ সচকিত হইয়া উঠিল। বিরক্ত হইল। ছি-ছি, ছি-ছি!—কঠিন কণ্ঠেই বলিল, কিন্তু ক্যানে? ক্যানে তুমি আমার জন্যে ঘর ছাড়বে মহাতাপ? তোমার বউ, তোমার ছেলে, তোমার ঘর, তোমার বিষয়—

—আঃ! তুমিও তাই বলছ? হা-হা-হারে। সে যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। তারপর আবার বলিল—শুধু বউ বেটা বিষয় নিয়ে ঘর হয়? মা না থাকলে হয়, মা থাকতে তাকে ছেড়ে বউ-বেটা নিয়ে ঘর? আমার মা বলে গিয়েছে, বড় ভাজ তোর মা। ছেলেবেলায় খেলাঘরে তুমি মা হতে আমি ছেলে হতাম—মনে নাই? বলে নাই লক্ষ্মণের কথা, সীতার কথা?

সে ছবি মুহূর্তে মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল; সে কি ভুলিবার?

মনে হইল, সেই সেকালের যুগেই যেন ফিরিয়া গিয়াছে।

মহাতাপ আবার বলিল, মরণকালে মা তোমাকে বলে নাই—বউমা, মহাতাপ আমার পাগল, ও মা ছাড়া থাকতে পারে না—তুমি ওর মা হয়ো? তোমার ছেলে-পুলে হোক, কিন্তু ঐ তোমার বড় ছেলে। বলে নাই? মনে নাই?

—আছে ভাই।

মনে আছে কেন, এই মুহূর্তে চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

শুধু তাহারই নয়, শুধু মহাতাপেরই নয়, সেতাবের চোখের সম্মুখেও ভাসিতেছে। সে যে তাহার সাক্ষী। মায়ের মৃত্যুকালে মা যখন কথাগুলি বলে তখন সেও যে দাঁড়াইয়া ছিল সেখানে।

একটা গাছের তলায় দা হাতে সেতাব দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিতেছিল; থরথর করিয়া সে কাঁপিয়া উঠিল। মনে পড়িল সব-শেষে মা তাহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিল—তুমি আমার বটবৃক্ষ। ঝড় বাজ অনেক সহ্য করে পোড়ো মণ্ডল-বাড়িকে খাড়া করেছ। তোমার

ছায়ার তলায় এই ছুটিকে দিয়ে গেলাম। মহাতাপ পাগলাটে, তাকে বউমা দেখবে। তুমি বড় বউমাকে দেখো। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আমার। ওর পয়েই সব। ওর অপমান কোরো না কখনও। ও আমার বড় অভিমানী।

এই নিশীথে গাছের ছায়ার মধ্যে সেই ছবি যেন স্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল।

ওদিকে আকাশে শন-শন করিয়া মেঘ উঠিতেছিল, কখন মেঘ জমিয়াছে—পাক খাইয়াছে: গুমোট ধরিয়াছে—তাহার পর মৃদু বাতাস উঠিয়াছে, মৃদু বাতাস প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মেঘ ধাবমান হইয়াছে—আকাশ ঢাকিয়া অসীম বিস্তারে প্রসারিত হইতেছে। মেঘে মেঘে সংঘর্ষ বাধিয়াছে। বিদ্যুৎ চমকাইয়া একটা মেঘগর্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। গম্ভীর গুরুগুরু দীর্ঘায়িত মনোহর মেঘধ্বনি।

মহাতাপ বড় বউকে বলিল, তুমি তাই মর মা; মা-ই বলছি আজো। তুমি মর, আমিও চলে যাচ্ছি—এই পথেই যাব। একেবারে গঙ্গাসাগর।

বড় বউ বলিল, মহাতাপ! না। সে কোরো না ভাই!

—না নয়! আমি ঠিক করে রেখেছি। তুমিই কি কম দুঃখ দিলে আমাকে? আমাকে নিয়ে তো ছেলের সাধ মেটে নাই তোমার! কত কবচ পরলে, কত উপোস করলে! গঙ্গাসাগরে ডুবে মরব আমি। যেন আসছে জন্মে তোমার কোলেই জন্মাই আমি।

বড় বউ চিৎকার করিয়া উঠিল, আমার মাদুলি আমি ছিঁড়ে জলে ফেলে দিয়েছি।

একবারে বাধাবন্ধনহীন চিৎকার—ওই মেঘের ডাকের মত।

সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে শিশুকণ্ঠের স্বর ধ্বনিত হইল—ব-মা! ব-মা!

বড় বউ চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল—মানিক!

ওদিকে একটা গাছের ছায়ার তলা হইতে মানদা চিৎকার করিয়া উঠিল, মানিক!

মানিককে যে সে ঘরে একলা রাখিয়া আসিয়াছে! বাড়ির দরজাগুলা যে খোলা হাট হইয়াছে! মানিক!—বড় বউ উঠিতে লাগিল। কিন্তু পায়ের বাঁধনের জন্য পারিল না, পড়িয়া গেল। সে বলিল, মহাতাপ, মানিককে দেখ। মহাতাপ! আঃ, আমার পায়ের বাঁধনটা, আঃ!

দা হাতে গাছতলা হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল সেতাব।

মহাতাপ চিৎকার করিয়া উঠিল, না—না—

সেতাব বলিল, তোর পায়ে পড়ি। মহাতাপ। তোর পায়ে পড়ি। কেলেঙ্কারি বাড়াস নে। যা মানিককে দেখ! ওরে ছোট বউমা আমারই মত বাগানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। মানিক একলা ছিল। দেখ। আমি ওর পায়ের বাঁধন কেটে নিয়ে যাচ্ছি। যা।

সে বড় বউয়ের পায়ের বাঁধন কাটিয়া দিতে বসিল। বলিল, ছি-ছি-ছি!

ওদিকে বাড়ির ভিতর হইতে মানদার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—মানিক! মানিক!

একা মানিক ঘরে শুইয়া ছিল। বিদ্যুতের আলোয় মেঘের ডাকে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে মাকে ঘরে পায় নাই। বাহিরে আসিয়াও কাহাকেও পায় নাই। দরজা খোলা হাট। অন্ন ছিলকে মেঘ অবশ্য আকাশময়ই কুয়াশার মত দাগিয়া উঠিয়াছে। তাহাতে

জ্যোৎস্না ঢাকা পড়ে নাই, ম্লানও ঠিক হয় নাই, একটু রহস্যালোকের চেহারা পাইয়াছে। সে সেই আলোয় খোলা দরজায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ বড় বউয়ের উচ্চকণ্ঠের 'মহাতাপ' ডাকের মধ্যে বড়মায়ের সাড়া পাইয়া 'বড়মা' বলিয়া ডাক দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় বড়মা! সকলেই তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

মানদা ঘরে ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, মানিক!

কিন্তু কই মানিক?

সে দিশাহারা হইয়া ওই বাগানের খিড়কির পথেই বাহির হইয়া ডাকিল, মানিক!

মহাতাপ ছুটিয়া আসিল—কই—মান্‌কে?

—জানি না—মানদা কাতর ভাবে স্বামীর দিকে চাহিল।

মহাতাপ দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া বলিল, কথা শুনতে গিয়েছিলে, ছেলেকে একা রেখে?

মানদা একবার ডাকিল, দিদি!

বাগানের ভিতর হইতে বড় বউ সাড়া দিল—মানু! মানিক!

—বাড়িতে নাই।—সে কাঁদিয়া উঠিল।

বড় বউ আসিয়া দাঁড়াইল। সে হাঁপাইতেছিল। তাহার পিছনে সেতাব। বড় বউ চিৎকার করিয়া ডাকিল—মানিক!

সেই মুহূর্তের ঘন কালো ঈশান কোণের মেঘে চাঁদ ঢাকিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে আসিল বাতাস—একটা দমকা বাতাস। বাতাসের প্রথম ঝটকাটা চলিয়া গেল। তাহার পর সমান বেগ লইয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে লাগিল। সেই বাতাসের মধ্যে শোনা গেল একটা রঙীন বাঁশির ক্ষীণ আওয়াজ—পু-পু!

বড় বউ বলিল, সদর রাস্তায়। ওই মানিকের বাঁশি।

সদর রাস্তাতেই বাহির হইয়াছিল মানিক। তাহার শিশুমনে চণ্ডীমণ্ডপে পূজাসমারোহের স্মৃতি। ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া সকলে পূজা দেখিতে গিয়াছে। সেই পথেই তাহার বাঁশিটি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছিল—পু-পু-পু-পু!

অকস্মাৎ জ্যোৎস্না মেঘে ঢাকিয়া অন্ধকার হইয়া গেল।

মানিক ছুটিতে শুরু করিল।

সেও শুনিতে পাইতেছে বড়মা ডাকিতেছে, বাবা ডাকিতেছে, জ্যাঠা ডাকিতেছে, মা ডাকিতেছে—মানিক! মানিক! মানিক! মানিক!

চণ্ডীমণ্ডপ হইতেই তাহারা ডাকিতেছে তাহাতে তাহার সন্দেহ নাই। সে ছুটিতে ছুটিতে পথের বাঁকে দাঁড়ায়, রাস্তাটা চিনিয়া লয়, আবার চলিতে শুরু করে, একবার দুইবার হাতের বাঁশিটা বাজাইয়া লয়।

চণ্ডীমণ্ডপের প্রান্তে সে আসিয়া উপস্থিত হইল।

চণ্ডীমণ্ডপে তখন বড় বউ মাথা ঠুকিতেছে।—আমার মানিককে ফিরে দাও। আমার মানিককে ফিরে দাও।

মানিক উল্লাসের সঙ্গে বাঁশিতে ফুঁ দিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বড়মায়ের কাছে দাঁড়াইল।

ওদিকে ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল।

৬ পরদিন সূর্য উঠিলেন মনোহররূপে।

বর্ষণসিক্ত রাত্রির শেষে কাটা-কাটা মেঘের ফাঁকে উকিঝুঁকি মারিয়া পূর্বাকাশ লালে লাল করিয়া পশ্চিম আকাশে রামধনু আঁকিয়া পৃথিবীকে বরবর্ণিনীর মত সাজাইয়া দিয়া দিনের ঠাকুর হাসিতে হাসিতে আবির্ভূত হইলেন।

মণ্ডলবাড়ির সামনে তখন মণিলাল বিদায় লইতেছে।

যে টোপর-দেওয়া গাড়িখানায় বড় বউয়ের যাইবার কথা, সেই গাড়িখানাতেই মণিলাল একা বাড়ি ফিরিতেছিল।

সেতাব তামাক খাইতেছিল। মণিলাল হাসিয়া বলিল, মাকে কি বলব? শুধাবে তো কি হল? কাহু এল না ক্যানে?

সেতাব বলিল, বলবে! একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল, তেনার জামাইকে ভূতে পেয়েছিল। আর কি বলবে? ভূত ছেড়ে গেল। পাঠালে না।

বড় বউ বাড়ির ভিতর হইতে মানিককে কোলে করিয়া আসিয়া বলিল, যাব রে যাব। বলবি মাকে, এই কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর পরই যাব; আমি, তোর জামাইদাদা দুজনাতেই যাব। ল-সম্বন্ধ করতে যাব। তোর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যাব। বলবি, কনে খুব ভাল। বেশ ডাগর। মায়ের সইয়ের মেয়ে। পুঁটি। তোর জামাইদাদা তো পাগল—

সেতাব বলিল, এই দেখ! এই দেখ! রাধে-রাধে-রাধে! কি যে বল!

বড় বউ হাসিতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে মহাতাপ আসিয়া হাজির হইল। তাহার সর্বাঙ্গে কাদা। মাথায় ব্যাণ্ডেজ ভিজা, চুল ভিজা, কাঁধে কোদাল। সে ইহার মধ্যে কখন মাঠে গিয়াছিল। সে নিজে মাঠের আল ভাঙিয়া দিয়াছিল; সেই কথা মনে পড়িয়া সে স্থির থাকিতে পারে নাই।

"কর্কটে ছরকট, সিংহে শুকা, কন্যা কানে কান,
বিনা বায়ে তুলায় বর্ষে কোথা রাখিবি ধান।"

কর্কট অর্থাৎ শ্রাবণে জলে জল ছরকট করিয়া দিলে, সিংহ অর্থাৎ ভাদ্রে শুকা—রৌদ্র হইলে, কন্যা অর্থাৎ আশ্বিনে আল ভরিয়া কানায় কানায় জল থাকিলে ও তুলা অর্থাৎ কার্তিকে বিনা বাতাসে বর্ষণ হইলে ধান রাখিবার জায়গা কুলায় না খামারে। আশ্বিনে জমির আল কাটা থাকিলে চলে?

ওই খনার বচনটাই চাষীরা এমন দিনে গানের সুরে গাহিয়া বলে—

"কর্কট ছরকট, সিংহে শুকা, কন্যা কানে কান,
বিনা বায়ে তুলা বর্ষে কোথায় রাখিবি ধান,
বউ কনে যতন করে নিকাও অঙনখান।"